বাংলাদেশের মুসলিম পুরাকীর্তি

মাওলা ব্রাদার্স ॥ ঢাকা

প্রকাশনার পাঁচ দশকে
মাওলা ব্রাদার্স



ফেব্রুয়ারি ১৯৭১

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ চিত্রের নির্দেশিকা :
সামনে : বাগেরহাট, খুলনা, জিন্দাপীরের মসজিদ (ধ্বংসপ্রাপ্ত)
পিছনে : টেরাকোটা নকশা ঝুলন্ত ফুল

কম্পোজ
এ্যাপেলটক কম্পিউটার
৩৮ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০

উৎসর্গ

তিন প্রাণাধিক পুত্রসন্তান--আমিনুল,
কামরুল ও খালিদ হাসানকে

সূচিপত্র

(গ) নতুন ঢাকা গ্রুপ

(ঘ) পুরাতন ঢাকা গ্রুপ

শেরপুর

পাঁচবিবি

কুমিল্লা

২৩°১´ দক্ষিণ এবং ২৪°১৬´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০ ৩১ পশ্চিম এবং ৯১°২২´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে কুমিল্লা জেলা অবস্থিত। এর উত্তর-পূর্বে সিলেট, পূর্বে পার্বত্য ত্রিপুরা, দক্ষিণে নোয়াখালী এবং পশ্চিমে মেঘনা নদী। এই জেলার আয়তন ২৫৯৪ বর্গমাইল এবং এটি চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

'রাজমালা' বা 'ত্রিপুরা রাজাদের ইতিহাস' গ্রন্থে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে এ জেলার কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। ধন্য মাণিক্যের শাসনামলে 'রাজমালা' রচিত হয়। সুতরাং কুমিল্লা জেলার প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য রাজমালায় পাওয়া যাবে না। আর্য যুগে এ অঞ্চলটি 'পাণ্ডববর্জিত দেশ' নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন যুগের মহাকাব্যে ও ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে কুমিল্লার যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরানো এ অঞ্চলটি 'সুকমা' নামে অভিহিত। কালিদাস এ অঞ্চলটিকে 'তালিবান শ্যাম উপকণ্ঠ' অর্থাৎ 'তালগাছসমৃদ্ধ সমুদ্র সৈকত' নামকরণ করেন। খ্রিস্টীয় শতাব্দীর পূর্বে মেঘনা নদীর পূর্ব প্রান্তে ত্রিপুরা রাজ্যের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। 'মহাভারতে' ত্রিপুরা'র যে রেফারেন্স পাওয়া যায় তা কুমিল্লা জেলার অন্যান্য অঞ্চলকে ইঙ্গিত করে। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনা পর্যটক হিউএন সাং কুমিল্লা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উপর বিষদ বিবরণ দেন। তিনি বলেন, সমতাত বা পূর্ববঙ্গ নামে অঞ্চলের উত্তর-পূর্বে সমুদ্রের তীরবর্তী পাহাড়ী এলাকায় 'চি-তেহ-টা-টা' (Chi-teha-ta-ta) বা 'শ্রীক চাখভা' নামে এক রাজ্য ছিল এবং এর দক্ষিণ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে 'কিয়া-নো লানে-কিয়া' (Kia-no-lane-kia) বা 'কামালাঙ্কা' নামে এক জনপদ ছিল এবং আরও দক্ষিণে 'তো-লো-পো-তি' (To-lo-po-ti) বা দরপতি নামে একটি রাজ্য ছিল। বিশেষজ্ঞগণ এই কামালাঙ্কাকে কুমিল্লা বলে চিহ্নিত করেছেন। "তো-লো-পো-তি" সম্ভবত ত্রিপুরার অপভ্রংশ। 'রাজমালায়' বর্ণিত রয়েছে যে খ্রিস্টীয় ১০৫৮ সনে পতিকেরার এক রাজা বার্মা পরিভ্রমণ করেন এবং একজন বর্মী রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। এ রাজার দুই সন্তান বার্মায় দুই শতাব্দী রাজত্ব করেন।

এফ. এ. খান মন্তব্য করেন, "সমতটের এলাকা বর্তমানে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে আসরাফপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন থেকে এ অঞ্চলের সাথে কুমিল্লা এবং ঢাকার যে সম্পর্ক ছিল তা নিশ্চিত করা যায়। এই তাম্রশাসন তিনজন খড়গ (Khadga) শাসকের নাম পাওয়া যায়: যথা, খড়গোদ্যম, তাঁর পুত্র জাতখড়গ এবং পৌত্র দেবখড়গ। তাম্রশাসনে দেবখড়র্গর রানী প্রভাবতী এবং তাঁর পুত্র রাজারাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। খড়গগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন, তাঁরা সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রায় সত্তর বছর রাজত্ব করেন। এ সমস্ত তাম্রশাসনে প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে জয়কর্মন্ত-ভাসকের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ স্থানটি সম্ভবত কুমিল্লা শহরের ২০ মাইল পশ্চিমে বাদকামতা নামের গ্রামকে চিহ্নিত করা হয়। কুমিল্লা জেলা এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাণকেন্দ্র ছিল, এর প্রমাণ এখানে প্রাপ্ত অসংখ্য বুদ্ধের ভাস্কর্য মূর্তিতে (বোধিসত্ত্ব এবং অন্যান্য নিম্নস্তরের বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি)। খড়গ রানী প্রভাবতীর নাম সম্বলিত শিলালিপিসহ দেবী স্বরবাণীর যে ভাস্কর্য মূর্তি কুমিল্লা শহরের বিশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত দেউলবাদীতে পাওয়া যায়, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে সমতটের এ অঞ্চলে খড়গদের সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল।"

খড়গ রাজত্বের অবসানে দেবরাজাগণ সমতট অঞ্চল শাসন করেন। ময়নামতিতে খননের ফলে প্রাক-মুসলিম যুগের দেব এবং চন্দ্রবংশীয় রাজাদের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তা ছাড়া বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে যে প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ পাওয়া গেছে তা প্রমাণ করে যে তারা বিশাল অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। শালবন বিহারে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে দেবরাজাদের বংশতালিকা এবং রাজকীয় ভূমিদান (grants) সম্বন্ধে সবিষদ বিবরণ পাওয়া যায়। এ সমস্ত তাম্রশাসনসমূহে যে সমস্ত দেবরাজাদের নাম উল্লেখ আছে তার মধ্যে শ্রীআনন্দ দেব, শ্রীশান্তি দেব এবং শ্রীভবদেবের নাম পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। শিলালিপির রীতি এবং মুদ্রার উপর ভিত্তি করে খড়গদের উত্তরসূরি হিসেবে দেবরাজাগণ যে ক্ষমতা লাভ করেন তা প্রতীয়মান হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত দেবরাজাগণ রাজত্ব করতেন বলে মন্তব্য করেছেন। চারপত্র মূড়া থেকে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসনে চন্দ্র নামে অপর একটি রাজবংশ এ অঞ্চলে রাজত্ব করেন বলে জানা যায়। এ সমস্ত তাম্র-শাসনে শ্রী লাদাহা চন্দ্র দেব, শ্রীকল্যাণচন্দ্র দেব নামে দু'জন নৃপতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ধারণা করা হয় যে চন্দ্র রাজবংশের রাজধানী ছিল রোহিতগিরি বা লাল পাহাড়, যা লালমাই পাহাড়কে ইঙ্গিত করে। চন্দ্রবংশীয় রাজাগণ দশম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত শাসন করেন। চন্দ্রদেব সম্বন্ধে এফ. এ. খান বলেন, "এ সমস্ত তাম্রশাসনগুলো থেকে প্রথম বারের মতো আমরা এ সমস্ত রাজবংশের প্রকৃত বংশতালিকা, সামরিক অভিযানই নয়, বরঞ্চ তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার কথা জানতে পারি, যা প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপর আলোকপাত করে। এসমস্ত তাম্রশাসনগুলো চন্দ্রদেবের সাথে পার্শ্ববর্তী রাজন্যবর্গ বিশেষ করে গৌড়ের পালদের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্কের উপর আলোকপাত করে। এর ফলে চন্দ্রদেবের রাজত্বকাল সঠিকভাবে নির্ধারিত করা সম্ভব হয়েছে।

চন্দ্রবংশের উত্তরসূরি হিসেবে সমতটে বর্মগণ শাসন কায়েম করেন। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে চন্দ্রবংশীয় রাজাগণ রাজত্ব করতে থাকেন। ময়নামতিতে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, রানাভনকমাল্লার রাজ পরিবার কামলাঙ্ক, পট্টিকেরা এবং অন্যান্য স্থানসমূহ অধিকার করেন। ১২০২ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ এই তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে পট্টিকেরা শহরে তিনি একটি বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেন। পট্টিকেরা রাজ্যের সীমানা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়; তবে ধারণা করা হয় যে কুমিল্লা সদর জেলা চাঁদপুর এবং নোয়খালীর উত্তরাঞ্চল ব্যাপী বিস্তীর্ণ এলাকায় বর্মগণ রাজত্ব করতেন।

কিংবদন্তি অনুযায়ী ইয়াইয়াটির পৌত্র ত্রিপুরার নাম থেকে ত্রিপুরা বাজ্যের নামকরণ হয়েছে। ত্রিপুরা রাজা থেকে আজ পর্যন্ত সর্বমোট ১১৭ জন নৃপতির নাম পাওয়া যায়। তারা তিব্বতী-বর্মী বংশোদ্ভূত। তারা উপজাতীয় তিপরা গোষ্ঠীর থেকে উদ্ভূত এবং তাদের ভাষাও তিপরা। 'রাজমালা'য় বর্ণিত রয়েছে যে, ত্রিপুরার ৯৫তম রাজা চেথুম্পার (Chhethumpha) সঙ্গে গৌড়ের সুলতানের যুদ্ধ হয় এবং মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করে ত্রিপুরায় একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাঙ্গরফার (Dungurpha) পুত্র রত্নফা-র সময় থেকে ত্রিপুরা রাজাদের সাথে গৌড়ের শাসক ও সুলতানদের রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে রত্নাফা বাংলার সুলতান ইলিয়াস শাহের (১৩৪২–৫৮ হিঃ) সাহায্য প্রার্থনা করেন। রত্নফাকে ত্রিপুরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁকে 'মাণিক্য' উপাধি প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ 'মাণিক্য' উপাধি ধারণ করে রয়েছেন। কথিত আছে যে, ইলিয়াস শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী সেকেন্দর শাহ হাতি সংগ্রহের জন্য ত্রিপুরায় অভিযান করেন; অবশ্য ত্রিপুরায় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অবশ্য পঞ্চদশ শতাব্দীতে ধন্য মানিক্য বাংলায় অভিযান করে বিক্রমপুর বিধ্বস্ত করেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে ত্রিপুরা রাজা ধন্য মাণিক্য গৌড়ের সুলতানের নিকট পরাজিত হন। আবদুল করিম হোসেন শাহের ত্রিপুরা অভিযান সম্পর্কে বলেন, "হোসেন শাহের ত্রিপুরা অভিযান সম্পর্কে তাঁর নিজের শিলালিপি এবং ত্রিপুরা রাজমালায় তথ্য পাওয়া যায়।" সোনারগাঁও-এ প্রাপ্ত এবং ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ হোসেন শাহের এক শিলালিপিতে দেখা যায় সে খাওয়াস খান নামের এক সেনাপতি ত্রিপুরা ভূমির সর-ই-লস্কর ছিলেন। অতএব শিলালিপির সাক্ষ্যমতে হোসেন শাহ ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তত কিছু অংশ জয় করেছিলেন। কিন্তু শিলালিপিতে হোসেন শাহের ত্রিপুরা রাজ্য বিজয়ের কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। ত্রিপুরা 'রাজমালায়' এ বিষয়ে আরও তথ্য পাওয়া যায়। এ তথ্য থেকে জানা যায় যে ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দে ধন্য মাণিক্য চট্টগ্রাম জয় করলে হোসেন শাহ তাঁর সুযোগ্য সেনাপতি গোরাই মল্লিকের নেতৃত্বে ত্রিপুরা আক্রমণের জন্য পাঠান। গোরাই মল্লিক হোসেন শাহের হৃত রাজ্যগুলো পুনরাধিকার করেন। কিন্তু এ অভিযান ব্যর্থ হয় কারণ পরের বছর ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে ধন্য মাণিক্য পুনরায় দক্ষিণে অভিযান করে চট্টগ্রাম পুনঃদখল করেন। হোসেন শাহ হৈতন খাঁকে

এক বিরাট বাহিনীসহ ধন্য মাণিক্যের বিরুদ্ধে পাঠান। এ অভিযান আংশিকভাবে সফল হয়। রাজমালায় একতরফাভাবে ত্রিপুরা রাজাদের সামরিক সাফল্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কিন্তু আবদুল করিম উল্লেখ করেন যে, ধন্য মাণিক্য বারংবার চট্টগ্রাম অঞ্চল দখলের চেষ্টা করলেও তা সফল হয়নি। হোসেন শাহী আমলে ত্রিপুরার কিয়দংশ গৌড় সুলতানের দখলে ছিল। উল্লেখ্য যে, ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ বণিক জো-আঁ-দে-সিলভেরা চট্টগ্রামে এসে এটিকে গৌড়ের সুলতানের অধীনে দেখতে পান। কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত 'মহাভারতে' উল্লেখ করেন :

"সুলতান হোসেন শাহ পঞ্চ গৌড় নাথ।
ত্রিপুরার দ্বার সমর্পিল যার হাথ॥"

সুলতান হোসেন শাহ্ ধন্য মাণিক্যকে পরাস্ত করে কালিয়ারগড় বা কসবায় একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে দেব মাণিক্য পুনরায় চট্টগ্রামে অভিযান করেন কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকানীগণ চট্টগ্রাম দখল করে ত্রিপুরা পর্যন্ত অভিযান করেন। তাঁদের এ অভিযান উদয়পুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ত্রিপুরা রাজা রাজধার মাণিক্য মুঘলদের নিকট পরাস্ত হলে ত্রিপুরা মুঘল শাসনাধীনে চলে যায়। তাঁর উত্তরাধিকারী যশোধর মাণিক্যের সঙ্গে মুঘলদের সংঘর্ষ বাধে এবং যশোধর মাণিক্য পরাজিত হয়ে বন্দি অবস্থায় দিল্লিতে প্রেরিত হন। ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে কল্যাণ মাণিক্যকে মিত্র রাজা হিসেবে সিংহাসনে বসানো হয়। কিন্তু তিনি পরবর্তী পর্যায়ে শাহ সুজা কর্তৃক সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে পরাজিত হন। কল্যাণ মাণিক্যের উত্তরসূরি রত্ন মাণিক্য স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন এবং পরবর্তী ত্রিপুরা রাজা ধর্ম মাণিক্যের শাসনামলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরা মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখলে চলে যায়।

১। বড় গোয়ালিয়া, মসজিদ, ষোড়শ শতাব্দী

আহমদ হোসেন দানী বলেন, "দাউদকান্দির নিকট বড় গোয়ালিয়ায় এক গম্বুজ-বিশিষ্ট একটি মসজিদ রয়েছে। হিঃ ৯০৬/ ইঃ ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এই মসজিদটি গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদের অনুকরণে নির্মিত।" কিন্তু দানীর মন্তব্য বিভ্রান্তিকর। কারণ আয়তকার বহু গম্বুজবিশিষ্ট ছোট সোনা মসজিদ, দিনাজপুরের গোপালগঞ্জ ও সূরা মসজিদের সাথে সাদৃশ্যবিশিষ্ট বর্গাকারে এক গম্বুজবিশিষ্ট বড় গোয়ালিয়া মসজিদটির কোনো মিল নেই। তা ছাড়া মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত।

২। কয়লারগড়, দুর্গ (অধুনালুপ্ত), ষোড়শ শতাব্দী

কসবার নিকট কয়লারগড় নামক স্থানে গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ্ একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। ত্রিপুরারাজ ধন্য মাণিক্যের বিরুদ্ধে অভিযানকালে এই দুর্গটি নির্মাণ করা হয়।

৩। কুমিল্লা, শাহ সুজার মসজিদ, সপ্তদশ শতাব্দী (১)

কুমিল্লা শহরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ শাহ সুজার মসজিদ। শাহ্ জাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ্ সুজা বাংলার সুবাদার ছিলেন। কুমিল্লার শাহ্ মসজিদটি প্রসঙ্গে দুটি

প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে– শাহ্ সুজা ত্রিপুরা জয় করে বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ কুমিল্লায় মসজিদ নির্মাণ করেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে–শাহ সুজার মিত্র বন্ধু ও আশ্রয়দাতা ত্রিপুরারাজ গোবিন্দ মাণিক্য শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ এই মসজিদ নির্মাণের জন্য অর্থ দেন, যা দিয়ে মসজিদটি নির্মিত হয়। শাহ সুজা ১৬৩৯ থেকে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় সুবাদার ছিলেন এবং তাঁর রাজধানী ছিল রাজমহল। মসজিদের নির্মাণকাল ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে বলে আ. ক. ম. যাকারিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু শাহ্ সুজা ত্রিপুরায় এসেছিলেন কি না সঠিকভাবে বলা যায় না। তিনি আওরঙ্গযেবের নিকট পরাজিত হয়ে চট্টগ্রামে সড়কপথে আরাকানে আত্মগোপন করেন এবং মগদের হাতে সপরিবারে নিহত হন। 'রাজামালা'র প্রণেতা কৈলাসচন্দ্র সিংহ বলেন,

"মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্য সুজার নিমচা তরবারি বিক্রি করে সেই অর্থ সৎকাজে ব্যয় করেছিলেন। গোমতী নদীর তীরে সুজা মসজিদ নামে একটি ইটের নির্মিত বড় মসজিদ আজও দেখা যাবে।"

গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত শাহ সুজার মসজিদটি শাহ সুজা স্বয়ং নির্মাণ করেননি। তবে সুজাগঞ্জ এবং শাহ সুজা মসজিদ তাঁর নাম থেকে নামকরণ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। মসজিদটি সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত হলেও পরবর্তীকালে এটি সংস্কার করা হয় এবং সামনে একটি বারান্দা নির্মিত হয়। আ. ক. ম. যাকারিয়া এই মসজিদ প্রসঙ্গে বলেন, "উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই মসজিদের বাইরের দিকের আদি আয়তন ৫৮×২৮ ফুট। দেয়ালগুলো ৫–৮˝ প্রশস্ত। মসজিদের সামনে ছিল ২৪ ফুট প্রশস্ত খোলা বারান্দা। চার কোণায় ৪টি অষ্টকোণাকার মিনার (turret) ছিল। পূর্ব দেয়ালে ছিল খিলানযুক্ত ৩টি প্রবেশপথ। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ অপেক্ষাকৃত বড় এবং বাইরের দিকে তা উদ্গত এবং এর দু'পাশে আছে দু'টি সরু ও গোলাকার মিনার। উত্তর ও দক্ষিণ প্রাচীরে একটি করে প্রবেশপথ ছিল। অভ্যন্তরে পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মিহরাব। পাশের দু'টি মিহরাব তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু অর্ধবৃত্তাকারে নির্মিত কেন্দ্রীয় মিহরাবটিতে সুন্দর আস্তরণ ছিল। সামনের দেয়ালে ছিল অতি সুন্দর প্যানেলিং-এব অলংকরণ। উপরে ছিল ৩টি সুন্দর গম্বুজ। কেন্দ্রীয় গম্বুজটি অন্য দু'টির চেয়ে আকারে অনেক বড়। আহ্মদ হাসান দানী এ মসজিদটির বিবরণ দেন। তিনি বলেন যে, খিলানপথগুলো চার কেন্দ্রবিন্দু থেকে টানা খিলান (four-centred arch) দ্বারা শোভিত। আদি মসজিদটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট আয়তকার মসজিদ, যা মুঘল আমলের স্থাপত্য রীতির প্রতিফলন। আদি মসজিদের ছাদে ছোট ছোট গোলাকার ট্যারেট দ্বারা শোভিত। ছাদের চার পাশে প্যারাপেট রয়েছে। গম্বুজ তিনটির মধ্যে মাঝেরটি আকারে বড়। গম্বুজগুলো কলসচূড়া দিয়ে শোভা বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং পদ্মপাতার ভিত থেকে উপরে উঠে গেছে। গম্বুজগুলো পেনডেনটিভের সাহায্যে নির্মিত এবং ছাদের উপর অষ্টভুজাকৃতি ড্রাম রয়েছে। অভ্যন্তরে একটি সুদৃশ্য অবতলাকৃতি কেন্দ্রীয় মিহরাব দেখা যাবে। পার্শ্ববর্তী অপর দুটি মিহরাব দেয়ালসংলগ্ন।

৪। সরাইল, মসজিদ, ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দ (২)

কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৭ মাইল উত্তরে সরাইল নামক স্থানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এটি সম্ভবত ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ারের মতে জনৈক নূর মুহাম্মদ কর্তৃক তাঁর স্ত্রীর স্মৃতির উদ্দেশে এটি নির্মিত। নূর মুহাম্মদ সম্ভবত মুঘল আমলে স্থানীয় রাজস্ব কর্মকর্তা ছিলেন। সরাইলে নির্মিত মসজিদটি আয়তকার এবং এর পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ৪৫ ফুট এবং প্রস্থে ১৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। দেয়ালের প্রশস্ততা ৪–৫´´। তিন গম্বুজবিশিষ্ট এই মসজিদটিতে পূর্ব দিক থেকে তিনটি খিলানপথ দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। এ ছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে খিলান-পথ রয়েছে। চার কোনায় চারটি অষ্টকোণাকারে টাওয়ার বা বুরুজ রয়েছে। এ ছাড়া প্রাচীরের চতুর্দিকে ছোট ছোট টারেট নির্মিত হয়েছে। খিলানগুলো বহু খাঁজবিশিষ্ট। কার্নিশ ও সমান্তরাল ছাদের উপর খাঁজকাটা প্যারাপেট দেখা যাবে। সরাইল মসজিদটি তিনটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। আকারে গম্বুজ তিনটি একই রকম এবং মুঘল স্থাপত্যরীতির অনুকরণে ড্রামের উপর নির্মিত। গম্বুজগুলোর উপরিভাগে কলসচূড়া শোভা পাচ্ছে। চূড়াগুলো নিচে পদ্ম পাতার ভিত থেকে নির্মিত। পেনডেনটিভের সাহায্যে গম্বুজ তিনটি নির্মিত হয়েছে। অলংকরণের দিক থেকে খুবই সাদামাটা। আয়তকার ও বর্গাকারে প্লাস্টারের প্যানেল ও কুলুঙ্গি দিয়ে দেওয়াল অলংকৃত করা হয়েছে। অভ্যন্তরে কিবলা প্রাচীরে তিনটি মিহরাব দেখা যাবে, মধ্যবর্তী মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড়। স্থানীয়ভাবে এই ইমারতটি হাবিকেলের মসজিদ নামেও পরিচিত।

৫। বড় শরিফপুর, মসজিদ, ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দ (৩)

লাকশাম থানার বড় শরিফপুর গ্রামে একটি অপূর্ব সুন্দর মসজিদ দেখা যাবে। নাটেশ্বর দিঘির পূর্ব পাশে স্থাপিত এই মসজিদটি আয়তকার ও তিন গম্বুজবিশিষ্ট। মুহাম্মদ আয়াত কর্তৃক নির্মিত এই মসজিদটি কোতওয়ালী মসজিদ নামেও পরিচিত, কারণ তিনি কোতওয়াল ছিলেন। চারদিকে প্রাচীরঘেরা ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে বড় শরিফপুরের মসজিদটি চিরাচরিত মুঘলরীতিতে নির্মিত। ঢাকায় লালবাগ দুর্গের মসজিদের অনুকরণে নির্মিত এই ইমারতের পূর্ব দিকে তিনটি প্রবেশপথ দেখা যাবে। খিলানপথগুলো আলকোভ (alcove) দ্বারা আবৃত। সমান্তরাল লিন্টেল দিয়ে প্রবেশপথ সৃষ্টি করা হয়েছে, যার উপর কৃত্রিম খিলনের সৃষ্টি করা হয়েছে। মধ্যবর্তী প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত বড়। প্রবেশপথগুলো আয়তকার ফ্রেমে আবদ্ধ এবং দু'পাশে আয়তকার কুলুঙ্গি প্যানেল দেখা যাবে। প্রবেশপথের উভয় পাশে সরু ট্যারেট ছাদ পর্যন্ত গেছে এবং এর উপরের অংশ কুপোলা দ্বারা আবৃত। মসজিদের চার কোনায় অষ্টকোণাকৃতি বুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলো ছাদের উপরে উঠে গেছে এবং কলসচূড়াসম্বলিত কুপোলা এগুলোকে আরও আকর্ষণীয় করেছে। লক্ষণীয়, মুঘলরীতিতে কার্নিশ সমান্তরাল, বক্রাকারে নয়। নক্শা করা প্যারাপেট ছাদকে চারিদিকে ঘিরে রেখেছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। মসজিদটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট এবং মধ্যবর্তী

গম্বুজটি আকারে সামান্য বড়। কলসচূড়া পদ্মপাতার ভিত থেকে উপরে উঠে গেছে। অষ্টকোণাকার ড্রামের উপর গম্বুজগুলো স্থাপিত। ড্রামগুলোর চারপাশে প্যারাপেটের নকশা দেখা যাবে।

বড় শরিফপুরের মসজিদের অভ্যন্তর এক আইল বিশিষ্ট, পেনডেনটিভের মাধ্যমে তিনটি গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। কিবলা প্রাচীরে খিলানসম্বলিত অবতলাকারে তিনটি মিহরাব দেখা যাবে। মিহরাবগুলো আয়তকারে ফ্রেমে আবদ্ধ। এই মসজিদে দু'টি শিলালিপি রয়েছে: একটি কেন্দ্রীয় মিহরাবের উপরে আর একটি পূর্বদিকে প্রবেশপথের উপরে। নাসতালিক রীতিতে উৎকীর্ণ ফার্সি শিলালিপিতে পদ্যে রচিত সাংকেতিক ভাষায় (বা Chronogram) নির্মাণ তারিখ দেয়া হয়েছে। একটির পাঠোদ্ধার করে হিঃ ১০৬৮/ইং ১৬৫৭-৫৮ এবং অপরটির ১৭০৬-০৭ ইংরেজি সনের উল্লেখ আছে।

৬। আখাওড়া, করমপুর, দরগা, অষ্টাদশ শতাব্দী

আখাওড়া কুমিল্লার একটি অংশ এবং রেলওয়ে জংসন। এখানে করমপুর নামে একটি মহল্লা রয়েছে। জনশ্রুতি রয়েছে যে এ অঞ্চলের মশহুর পীর ও সাধক হযরত সৈয়দ আহমদ গেসুদরাজেব একটি দরগা ভক্তদের সর্বদা আকর্ষণ করে। গেসুদরাজ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তিনি সম্ভবত অষ্টদশ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত ধর্মপ্রাচরক ছিলেন বলে ধারণা করা হয়।

৭। চান্দিনা, প্রাচীন মসজিদ ও ঈদগাহ, সপ্তদশ শতাব্দী

কুমিল্রা জেলার চান্দিনায় একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এবং এর সংলগ্ন একটি ঈদগাহ দেখা যাবে। এ সমস্ত ইমারত সপ্তদশ শতাব্দীর বলে মনে হয় এবং সম্ভবত শাহ সুজার কোনো অনুচর বা সেনাপতি এগুলো নির্মাণ করেন।

৮। উলছাপাড়া, মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দী

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানাধীন উলছাপাড়া নামের একটি লোকালয়ে একটি আয়তকার তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে। একটি উঁচু প্লাটফর্মের উপর নির্মিত এই মসজিদটি ব্যতিক্রমধর্মী এজন্য যে এটিতে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ বা সাহনে রয়েছে। এই প্লাটফর্মের পশ্চিম দিকে মসজিদটি নির্মিত। গৌড়ের ছোট সোনা বা ঢাকায় শাহবাজ খানের সমাধি মসজিদ কমপ্লেক্সে প্রবেশের জন্য যেমন একটি প্রবেশপথ নির্মিত হয়েছে অনুরূপ একটি প্রবেশপথ উলছাপাড়া মসজিদে দেখা যাবে। প্রবেশপথটি চার ফুট প্রশস্ত। মসজিদটির বাইরের দিকের আয়তন ৪২ × ২২ এবং অভ্যন্তরে ৩৪ × ১৪। চার কোনায় চারটি বুরুজ দ্বারা মসজিদটিকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। পূর্ব দিকে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে খিলানপথ রয়েছে। মধ্যভাগ আয়তকার ফ্রেমে আবদ্ধ এবং দু'পাশে সরু ও দীর্ঘ টারেট দ্বারা সমৃদ্ধ, বৃহদাকারে প্রবেশপথটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। এই অংশ বাইরের প্রাচীর থেকে কিছুটা সামনের দিকে উদ্গত। এর উপরে ফার্সি ভাষায় উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি রয়েছে।

উলছাপাড়া মসজিদটিতে বক্রাকার কার্নিশ নেই, সমান্তরাল কার্নিশ দেখা যাবে। অভ্যন্তরে তিনটি বর্গাকার এলাকার উপর তিনটি গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। মধ্যভাগের গম্বুজটি বড়। কলসচূড়া দ্বারা শোভিত গম্বুজগুলো ড্রামের উপর নির্মিত। কিবলা প্রাচীরে খিলানসমৃদ্ধ তিনটি অবতলাকৃত মিহরাব দেখা যাবে। খিলানগুলো খাঁজকাটা। মধ্যবর্তী মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং পশ্চিমদিকে বাড়তি (Projection) রয়েছে। মিহরাবের উপরিভাগ খাঁজকাটা মার্লন বা প্যারাপেট দ্বারা শোভিত। শিলালিপির পাঠোদ্ধার না হওয়ায় মসজিদের নির্মাণ তারিখ সঠিকভাবে জানা যায় না তবে স্থাপত্যের ও আলঙ্কারিক বৈশেষ্ট্যের ভিত্তিতে এটি সপ্তদশ শতাব্দীর ইমারত বলে মনে হয়।

৯। নবীনগর, দরগা, অষ্টাদশ শতাব্দী

কুমিল্লা জেলার নবীনগরে স্থানীয়ভাবে পরিচিত সানাউল্লাহ শাহ্ নামে একজন দরবেশের দরগা রয়েছে। এখানে তিনি একটি চিল্লাখানায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। তাঁর চিল্লাখানাটি শাহ্ সাহেবের বাড়ি নামে পরিচিত। তিতাস নদীর তীরে করিম শাহ নামের আর একজন ওলির সমাধি দেখা যাবে। শাহ্ মুহাম্মদ ইলিয়াস বা সাধারণভাবে পরিচিত গুলবদন শাহ্ নামে আর এক জন পীর নবীনগরের নিকট বাগদাহার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরবর্তী পর্যায়ে ঢাকার চকবাজার এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। তার সমাধি এ স্থানে দেখা যাবে।

১০। আলীপুর, শাহ্ সুজার মসজিদ, ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ

হাজীগঞ্জ থানার ৬ মাইল পশ্চিমে ডাকাতিয়া নদীর তীরে আলিপুর নামের একটি গ্রাম অবস্থিত। এ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণ একটি বিশাল দিঘি রয়েছে। এ দিঘির উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে দুটি মসজিদ দেখা যাবে। উত্তর পাড়ের মসজিদটি শাহ্ সুজার আমলে নির্মিত বলে অনেকে মনে করেন এবং এর নির্মাণকাল ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ। আ. ক. ম. জাকারিয়া এই সনের উল্লেখ করেছেন, যদিও কোনো শিলালিপি পাওয়া যায়নি। তবে এটি মুঘল যুগের শেষার্ধ অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর বলে মনে হয়। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এই মসজিদের আয়তন ৪৮´ × ২৪´। দেয়ালগুলো ৫´ প্রশস্ত। পূর্ব দেওয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে দরজা রয়েছে। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি মিহরাব দেখা যাবে। মসজিদটি আয়তকার তিন গম্বুজবিশিষ্ট, মধ্যবর্তী গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত বড়।

দিঘির দক্ষিণপাড়ে আর যে মসজিদটি নির্মিত হয়েছে তা আলমগিরী মসজিদ নামে পরিচিত। সম্ভবত সম্রাট আওরঙ্গযেবের রাজত্বকালে হিঃ ১১০৪/ ইঃ ১৬৯২-৯৩ সনে এই মসজিদটি স্থাপিত হয়। যাকারিয়া বলেন যে, শিলালিপির পাঠোদ্ধার হয়নি, তা হলে ১৬৯২–৯৩ সন বলা একটু বিভ্রান্তিকর। যাহোক সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মুঘল আমলের কীর্তি হিসেবে এ দু'টি মসজিদকে চিহ্নিত করা যায়। এ মসজিদটির পরিমাপ ৫২´× ২৮´। দেয়ালগুলো ৫ ফুট প্রশস্ত। এ মসজিদে ৫টি গম্বুজ রয়েছে। ঢাকার

কারতালাব খানের মসজিদের মতো এই মসজিদটি পাঁচ গম্বুজবিশিষ্ট এবং মধ্যবর্তী গম্বুজটি পাশের গম্বুজ অপেক্ষা একটু বড়।

১১। আরিফাইল, মসজিদ, সপ্তদশ শতাব্দী

সরাইল বাজারের দুই মাইল পশ্চিমে দুটি বড় দিঘি রয়েছে। দিঘি দু'টি সাগর দিঘি এবং মুঘলাই দিঘি নামে পরিচিত। এ দু'টি দিঘির মধ্যবর্তী স্থানে আরিফাইল মসজিদ অবস্থিত। মসজিদটি চিরাচরিত আয়তকার তিন গম্বুজবিশিষ্ট মুঘল মসজিদের মডেলে নির্মিত। এ মসজিদটির পরিমাপ ৭০´ × ২০´ এবং প্রাচীরের প্রশস্ততা ৫–৬´´। পূর্ব দিক থেকে তিনটি খিলানপথে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে দরজা আছে। মসজিদটির চার কোনায় চারটি বুরুজ রয়েছে। বুরুজের চূড়া কুপোলা বা নিরেট ক্ষুদ্রাকার গম্বুজ দ্বারা আবৃত। অভ্যন্তরে তিনটি বর্গাকার এলাকায় তিনটি গম্বুজ রয়েছে। পূর্ব-পশ্চিমে সমান্তরাল খিলান দ্বারা তিন ভাগ করা হয়েছে। ড্রামের উপর গম্বুজ তিনটি স্থাপিত। মসজিদের সম্মুখভাগ প্লাস্টারে কাটা নকশা দেখা যাবে। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকার অর্ধগোলাকৃতি মিহরাব রয়েছে। মিহরাবগুলো আয়তকার ফ্রেমে আবদ্ধ। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড়।

আ. ক. ম. যাকারিয়ার মতে, মসজিদটি শাহ আরিফ নামে স্থানীয় একজন দরবেশ কর্তৃক নির্মিত হওয়ায় এটি আরিফাইলের মসজিদ নামে পরিচিত। শাহ আরিফের সঠিক পরিচয় জানা যায় না। শায়েস্তা খানী স্টাইলে নির্মিত মুঘল মসজিদগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে আরিফাইল মসজিদটি সপ্তদশ শতাব্দীর ইমারত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

১২। ফিরোজপুর, মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দী

কুমিল্লা জেলার হাজীগঞ্জ থানার ফিরোজপুর গ্রামে অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি মসজিদ লক্ষ করা যাবে। ফিরোজ শাহ লস্করের দিঘির পাশে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। ফিরোজ শাহ সম্রাট আকবরের আমলের একজন সেনাপতি। যাকারিয়ার মতে, এটি হিঃ ১৩০০/ই. ১৫৯১–৯২ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত কিন্তু এখানে শিলালিপি না থাকায় এরূপ *সঠিকভাবে বলা দুষ্কর। তা ছাড়া স্থাপত্যিক ও আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্যগুলোর বিচারে এটি* অষ্টাদশ শতাব্দীর ইমারত বলে মনে হয়। মসজিদটির পরিমাপ ২২ বর্গফুট। এটি এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার মসজিদ। প্রাচীরের প্রশস্ততা ৪ ৬´´। পূর্বদিকে তিনটি খিলানাকৃতি প্রবেশপথ রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে প্রবেশপথ দেখা যাবে। কিবলা-প্রাচীরে একটি অবতলাকৃতি মিহরাব দেখা যাবে।

কুষ্টিয়া

২৩°২২´ দক্ষিণ এবং ২৪° ১৫´ অক্ষাংশ এবং ৮৮° ৪০´ পশ্চিম এবং ৮৯°২২´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে কুষ্টিয়া জেলা অবস্থিত। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত কুষ্টিয়ার উত্তরে রাজশাহী, উত্তর-পূর্বে এবং পূর্বে পাবনা ও ফরিদপুর, দক্ষিণে যশোহর এবং পশ্চিমে নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ) জেলা।

'মহাভারত' ও 'পুরাণে' উল্লেখ আছে যে, কুষ্টিয়া বঙ্গরাজার অধীনে ছিল পঞ্চম শতাব্দীতে। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন-সাঙ কুষ্টিয়াকে সমতটের অংশ হিসেবে দেখতে পান। দশম এবং একাদশ শতাব্দীতে এই জেলা পালরাজাদের অধীন ছিল। এ সময়ে বিশেষ করে দ্বাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সর্বশেষ সেনবংশীয় রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি নদীয়া আক্রমণ করেন এবং লক্ষণ সেনকে নদীয়া থেকে বিতাড়িত করেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে কুষ্টিয়া বাংলার মুসলিম শাসনাধীনে আসে এবং গৌড় মুসলমানের কর্তৃত্বাধীনে থাকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর থেকেই এ অঞ্চলে মুসলিম স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। মিনহাজউস সিরাজ তাঁর 'তাবাকাত-ই নাসিরী' গ্রন্থে বহু মসজিদ, খানকা, মাদ্রাসা প্রভৃতি নির্মাণের উল্লেখ করেন।

কুষ্টিয়ার প্রাচীন ইতিহাস রহস্যাবৃত। এমনকি কুষ্টিয়া নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানা যায় না। অবশ্য এ প্রসঙ্গে নানা মত প্রচলিত রয়েছে। একটি হচ্ছে 'কোস্তা' নামে এক ধরনের পাট উৎপন্ন হত এ অঞ্চলে। অন্য একটি প্রবাদ হচ্ছে 'কুশা' নামে একটি ছোট দ্বীপ থেকে কুষ্টিয়া নামের উৎপত্তি হয়েছে। যদিও কুষ্টিয়া ও এর প্রতিষ্ঠাতার নাম সঠিকভাবে বলা যায় না; তবুও একথা নিশ্চিত যে এ অঞ্চলে বহু প্রাচীনকাল থেকে পীর-দরবেশ, আওলিয়াদের আগমন ঘটে, এ সমস্ত সুফী সাধকগণ এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা সুলতান ও বাদশাদের নিকট থেকে লা-খেরাজ সম্পত্তি লাভ করতেন এবং মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা পরিচালনা করতেন। সমগ্র জেলায় বহু প্রাচীন মুসলিম কীর্তির নিদর্শন দেখা যাবে।

১। গোয়ালদারী, সুলতানী আমলের মসজিদ, ষষ্ঠদশ শতাব্দী (অধুনালুপ্ত)।

কুষ্টিয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা মহকুমার (বর্তমানে জেলা) আলমডাঙ্গা থানাধীন গোয়ালদারী গ্রামে সুলতানী আমলের একটি মসজিদ দেখা যাবে। কুষ্টিয়া জেলায় জরিপ করলে অনেক পুরাতন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ করা যায়। গোয়ালদারী মসজিদটি হোসেন শাহী আমলের আয়তকার তিন গম্বুজবিশিষ্ট ইমারত এবং সুলতানী স্থাপত্যের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এতে রয়েছে।

আ. ক. ম. যাকারিয়া এই মসজিদকে ঘোলদাড়ী মসজিদ হিসেবে বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, "এটি একটি প্রাচীন মসজিদ। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ৩রা মার্চ ১৯৭৪ সালে নিজস্ব সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যে জানা যায় যে, বাংলা ৪১৩ সালে (১০০৬ খিস্টাব্দে) হযরত খায়রুল বাশার ওমর (রঃ) নাকি এ মসজিদ নির্মাণ করেন; মসজিদের পাশে নির্মাতার মাজারও নাকি আছে। একাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে একজন মুসলমান ফকির কর্তৃক কুষ্টিয়া জেলায় একটি মসজিদ নির্মাণের ঘটনা কল্পনারও অতীত। সে মসজিদ এতদিন টিকে থাকারও কথা নয়। এদেশে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে নির্মিত প্রায় সব কটি মসজিদই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এ মসজিদ একাদশ শতাব্দীর হতে পারে না। মসজিদটি দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। তবে যতদূর শুনেছি, তাতে মনে হয়, এটি মুঘল আমলে নির্মিত হয়েছিল।"

২। স্বস্তিপুর, মসজিদ, ষষ্ঠদশ শতাব্দী (অধুনালুপ্ত)

কুষ্টিয়া শহরের ৬ মাইল দক্ষিণে কুষ্টিয়া ঝিনাইদহ পাকা সড়কের পশ্চিম দিকে স্বস্তিপুর নামে একটি গ্রাম রয়েছে। স্বস্তিপুরের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রবাদ রয়েছে। অনেকের ধারণা স্বস্তিপুর সুবাদার শায়েস্তা খানের নামানুসারে শায়েস্তাপুরের অপভ্রংশ। এখানে একটি উঁচু ভিত্তি বেদীর উপর একটি মসজিদ ছিল বলে স্থানীয় লোকেরা বিশ্বাস করেন। এই মসজিদটি প্রাক-মুঘল যুগের ছিল এবং গোয়ালদারী মসজিদের সমসাময়িক ছিল বলে অনেকে মনে করেন : কারণ হোসেন শাহী আমলে ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে নির্মিত এটি ছিল আয়তকার তিন গম্বুজবিশিষ্ট ইমারত। বর্তমানে এটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

৩। স্বস্তিপুর, মুঘল আমলের কীর্তিসমূহ, সপ্তদশ শতাব্দী

সুবাদার শায়েস্তা খানের শাসনামলে কুষ্টিয়া একটি সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলে পরিণত হয়। অনেকের ধারণা শায়েস্তা খানের নামানুসারে এ স্থানটি স্বস্তিপুর বা শায়েস্তাপুর নামে পরিচিত। এখানে মুঘল স্থাপত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। এখানে সপ্তদশ শতাব্দীর মসজিদ ও সুফী দরবেশদের মাজার দেখা যাবে। মুঘল আমলের মসজিদটির ভূমি নক্‌শা আয়তকার এবং ইমারতটি তিনটি গম্বুজ দিয়ে আবৃত। পূর্ব দিক থেকে তিনটি খিলানপথ দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। মসজিদে কোনো চত্বর নেই এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। কৌণিক বুরুজ দিয়ে মসজিদটি সংরক্ষণ করা হয়েছে। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি মিহরাব দেখা যাবে। মসজিদটি প্লাস্টার দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়েছে। মসজিদের সম্মুখে দুটি ইটের শবাধার রয়েছে এবং ধারণা করা যায় যে এ শবাধার দু'টি কোন সুফীসাধকের।

৪। ঝাউদিয়া, মুঘল আমলের মসজিদ, সপ্তদশ শতাব্দী (৪)

কুষ্টিয়া শহর থেকে প্রায় ১২-১৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং কুষ্টিয়া ঝিনাইদহ পাকা সড়ক থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে ঝাউদিয়া নামে একটি গ্রাম রয়েছে। এই গ্রামের সর্বাপেক্ষা প্রধান আকর্ষণ মুঘল আমলের একটি মসজিদ। ধারণা করা হয় যে সুবাদার শায়েস্তা খানের আমলে এই আয়তকার তিন-গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি নির্মিত হয়। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই মসজিদের বাইরের পরিমাপ হচ্ছে ৫৮ ফুট × ২৪ ফুট। দেয়ালগুলো ৪ ফুট প্রশস্ত। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর-দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে খিলানপথ রয়েছে। কিবলার দিকে মিহরাবের সংখ্যা তিনটি এবং মিহরাবগুলো অবতলাকৃতি; কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড়। পাশের মিহরাব দু'টি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

মসজিদটি তিনটি গম্বুজ দিয়ে আবৃত এবং এগুলোর আকৃতি সুলতানী আমলের মতো অর্ধগোলাকৃতি নয় বরং কিছুটা চাপা। গম্বুজগুলো ড্রামের উপর নির্মিত। গম্বুজগুলো পদ্ম ফুলের ভিতরে উপর থেকে উঠে গেছে এবং কলসচূড়া দ্বারা শোভিত। দেওয়ালে প্লাস্টারের ব্যবহার, গম্বুজের আকৃতি, দেয়ালে প্যানেলের নকশা এবং চার কেন্দ্রবিন্দু থেকে সৃষ্ট খিলান দেখে প্রতীয়মান হয় যে ঝাউদিয়া মসজিদটি মুঘল আমলের অসাধারণ স্থাপত্যকীর্তি।

৫। সাতবাড়িয়া, মসজিদ এবং মাজার, অষ্টাদশ শতাব্দী

ভেড়ামারার নিকটবর্তী সাতবাড়িয়া গ্রামে একটি অতি সুন্দর প্রাচীন মসজিদের সন্ধান পাওয়া গেছে। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ মসজিদটির চার কোনায় চারটি অষ্টকোণাকার বুরুজ বা টারেট রয়েছে। পূর্ব দিকে তিনটি খিলানপথ, উত্তর ও দক্ষিণে একটি করে প্রবেশপথ দেখা যাবে। খিলানগুলো খাঁজকাটা। আয়তকার তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটিতে কোনো শিলালিপি নেই। এর ফলে এর নির্মাণকাল সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। তবে স্থাপত্যিক কীর্তি দেখে মনে হয় নবাব মুর্শিদ কুলী খানের শাসনামলে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সাতগাছিয়া মসজিদটি তৈরি করা হয়। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকার মিহরাব রয়েছে ; কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড়। বাইরের প্রাচীর অলঙ্কারবিহীন, তবে প্লাস্টারে কাটা নকশা শোভা পাচ্ছে। গম্বুজগুলো ক্ষুদ্রাকৃতি হলেও এর চূড়ায় কলস দেখা যাবে, যা 'ফিনিয়েল' নামে পরিচিত। মসজিদসংলগ্ন একটি মাজার রয়েছে।

৬। ধরমপুর, ফতেহ দেওয়ানের দরগা, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে

যশোহর জেলার ধরমপুর গ্রামে একটি দরগা দেখা যাবে। সমগ্র যশোহর অঞ্চলে বাগেরহাটের খান জাহানের অনুচরেরা বসতি স্থাপন করে ইসলাম প্রচার করেন। এজন্য অসংখ্য পীর-দরবেশের আস্তানা, চিল্লাখানা ও দরগাহ দেখা যাবে। ধরমপুরের দরগাটি ফতেহ দেওয়ানের নাম থেকে গৃহীত।

খুলনা

৩১°৩৮ দক্ষিণ এবং ২৩°১´´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°৫৪´´ পশ্চিম এবং ৮৯°৫৮´´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে খুলনা জেলা অবস্থিত। খুলনা বিভাগের প্রধান কার্যালয় এবং সুন্দরবন অঞ্চলের ৪৬৫২ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বৃহত্তর খুলনা এলাকা গঠিত। এর উত্তরে যশোর, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ এবং পশ্চিমে পশ্চিম-বঙ্গের চব্বিশ পরগণা। প্রাচীনকালে খুলনা বঙ্গরাজ্য বা সমতট (Samatata)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ধারণা করা হয়ে থাকে যে বঙ্গ অঞ্চলের আদি জনপদ চণ্ডাল নামে পরিচিত। ঐতরিয়া অরণ্যক (Aitariya Aranyka) গ্রন্থে বলা হয়েছে যে এ অঞ্চলের আদিম জনগোষ্ঠী অখাদ্য-কুখাদ্য খেত এবং অধিক সন্তান উৎপাদন করত। 'রঘুবংশে' উল্লেখ আছে যে এ অঞ্চলের জনসাধারণ নৌকায় বসবাস করত এবং জমি থেকে উৎপাদিত শস্য আহার করত। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে সমুদ্র গুপ্তের রাজত্বের সীমানা খুলনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনা পরিব্রাজক হুয়াংচুয়াং সমতট সম্বন্ধে বিষদ বর্ণনা দেন। আবহাওয়া খুবই মনোরম এবং জনসাধারণের আচার-ব্যবহারও সন্তোষজনক। লোকেরা স্বল্প দীর্ঘ এবং গায়ের রং কালো। তারা বিদ্যার্জনে বিশেষ আগ্রহী ছিল না। এখানে প্রায় ৩০টি বৌদ্ধবিহার (monastery) এবং ২০০০ পুরোহিত বসবাস করত। এ ছাড়া ১০০টি হিন্দু মন্দির এখানে নির্মিত হয়। স্থানীয় বৌদ্ধগণ শীলভদ্র ও ইন্দ্রভদ্র নামে পরিচিত ছিল।

একাদশ শতাব্দীতে খুলনা অঞ্চল 'বগরী' (Bogri) নামে পরিচিত ছিল। এ নামটি সাধারণত বল্লাল সেনের রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলকে বলা হত। এ অঞ্চলের তথ্যবহুল লিখিত ইতিহাসের সূচনা হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন বাগেরহাটের খান জাহান এ এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। মনে করা হয়ে থাকে যে, খান জাহান গৌড়ের সুলতানের নিকট থেকে জায়গীর প্রাপ্ত হয়ে জঙ্গলাকীর্ণ সুন্দরবন অঞ্চলকে বাসপোযোগী করে তোলেন এবং ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতাসহ শাসন করেন। অবশ্য ব্রকম্যান মনে করেন যে, দিল্লির সম্রাট খান জাহানের মতো

একজন সাধক পুরুষ ও বীর যোদ্ধাকে বাংলায় প্রেরণ করেন এবং তিনি এ অঞ্চলে অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করেন এবং বহু কীর্তি স্থাপন করেন। অবশ্য ব্রকম্যানের মন্তব্য বিভ্রান্তিকর কারণ তাঁকে দিল্লি থেকে প্রেরণ করা হয়নি। তিনি স্থানীয় একজন সাধক ও সেনাধ্যক্ষ এবং স্বীয় কর্মতৎপরতা, উদ্দম ও দূরদর্শিতার দ্বারা বসবাসের অনুপযুক্ত সুন্দল বনকে জনবহুল নগরীতে পরিণত করেন। এক্ষেত্রে খান জাহানকে শ্রীহট্টের শাহ জালালের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তারা উভয়ের ধর্মপ্রচারক ছিলেন এবং সামরিক ক্ষমতোায় তাঁদের অঞ্চলগুলো দখল করে জনপদ গড়ে তোলেন। তাঁরা উভয়ে সম্মানিত পীরের মর্যাদা লাভ করেন। খানজাহানের পৃষ্ঠাপোষকতায় সুন্দরবন অঞ্চলে ইসলাম কায়েম হয় এবং তাঁর অবদান স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। কথিত আছে যে, তিনি বৃহত্তর খুলনা এলাকায় ৩৬০টি মসজিদ ও ৩৬০টি দিঘি খনন করেন।

খান জাহান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শহরের প্রকৃত নাম কি ছিল তা বলা যায় না। বাগেরহাট ব্রিটিশ আমলে প্রদত্ত নাম এবং হোসেনশাহী আমলে ষোড়শ শতাব্দীতে এ অঞ্চলটিতে যে টাকশাল ছিল তা খলিফাতাবাদ নামে পরিচিত ছিল। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে ভ্যান ডেন ব্রুক কর্তৃক অঙ্কিত মানচিত্রে খলিফাতাবাদকে 'কুইপিটাভা' (Cuipitava) বলা হয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে দাউদ খান যখন মুগল সম্রাট আকবরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানান এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, তখন বিক্রমাদিত্য, যিনি দাউদ খানের একজন মন্ত্রী ছিলেন, স্বাধীনভাবে দক্ষিণ বঙ্গে রাজত্ব করতে থাকেন। তিনি দাউদ খানের নিকট থেকে সুন্দরবন অঞ্চল ইজারা নেন এবং ঈশ্বরীপুরে রাজধানী স্থাপন করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। বিক্রমাদিত্যের পুত্র উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার মৃত্যুর পর রাজত্ব করতে থাকেন। বার ভুঁইয়াদের মধ্যে তিনি খুবই প্রভাবশালী ছিলেন। যদিও তিনি পরবর্তীকালে আকবরের সেনাপতি মানসিংহের নিকট পরাজিত ও বন্দি হন।

খলিফাতাবাদ (বাগেরহাট)

নামের উৎপত্তি ঃ প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ, ভ্যান লুহাইযেন বলেন, "খুলনা জেলার অন্তর্গত বর্তমান বাগেরহাটের (বর্তমানে জেলা) সন্নিকটে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উলুগ খান-ই জাহান অথবা খান জাহান অজ্ঞাত নামধারী একটি জনপদ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে হোসেনশাহী আমলে এটি একটি মুদ্রা ছাপার কেন্দ্রে (mint town) পরিণত হয় এবং তখন এটির নাম ছিল খলিফাতাবাদ (মুদ্রায় উৎকীর্ণ নাম থেকে)। অতঃপর খান জাহান যখন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে সুন্দরবনের দক্ষিণাংশে বাসের অনুপযুক্ত জঙ্গলাকীর্ণ ও নোনাভূমিতে এসে বসতি স্থাপন করেন তখন এ অঞ্চলটির কোনো নামই মানচিত্রে ছিল না। বর্তমানের বাগেরহাটের সন্নিকটে খান-ই জাহান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শহরে পূর্বে কোনো ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ছিল কি না তা সঠিকভাবে বলা যায় না। এতটুকু জানা যায় যে, খান-ই জাহান নামে এক ব্যক্তি এ অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু

করেন এবং তিনি কে, কখন এ অঞ্চলে আসেন; তিনি কিভাবে জনমানববর্জিত বন্য জন্তু পরিপূর্ণ ডেল্টা অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে বর্তমানে তাঁর সমাধিতে প্রোথিত একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি হিজরী ১৪৫৯ সনে এখানে মৃত্যুবরণ করেন অর্থাৎ খান-ই-জাহানের সময়কাল পঞ্চদশ শতাব্দী। খলিফাতাবাদ শব্দটি পরবর্তীকাল হোসেনশাহী আমলে প্রচলিত হয়। খান-ই-জাহানের আমলে এ অঞ্চলের বা নগরীর নাম কি ছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। নাম যা-ই হোক না কেন কালের আবর্তে এ স্থানটির নাম বিলুপ্ত হয় এবং এর বিভিন্ন নাম হতে থাকে। খলিফাতাবাদ নামটি বর্তমাজার বাগেরহাটের নাম অপেক্ষা প্রাচীন হলেও এ নামটি ইতিহাসের পাতায় সীমাবদ্ধ। বর্তমান নাম বাগেরহাটের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতোবিরোধ রয়েছে। বর্তমান নগরীটি কতকগুলো গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত এবং বর্তমানে এখানে বিশাল এলাকা জুড়ে অসংখ্য ইমারত নির্মিত হয়। স্থানীয় কিংবদন্তি অনুসারে বর্তমানে যেখানে খান-ই-জাহানের বসতবাড়ি, যা বহুপূর্বে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে সেখানে সপ্তাহে দু'বার হাট বসত। বিভিন্ন পণ্যের সমারোহ হত এবং স্থানীয় বাসিন্দাগণ তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এখান থেকে ক্রয় করত। 'হাট' শব্দটির উৎপত্তি সম্ভবত এ থেকেই।

'বাগ' ফারসি শব্দ অর্থাৎ বাগান (শাহবাগ, পীরবাগ, চামেলীবাগ, লালবাগ প্রভৃতি মুঘল আমলে ঢাকার বিভিন্ন এলাকার নামাকরণ হয়েছে) এবং তার সাথে 'হাট' শব্দটি সংযোগ করে হয়েছে 'বাগেরহাট'। ব্রিটিশ সরকারের আমল থেকে এ অঞ্চলটি বাগেরহাট নামে পরিচিত হয়। সুতরাং একথা বলা যায় যে, খলিফাতাবাদ অথবা বাগেরহাট স্থানীয় এলাকার মূল নাম ছিল না। লুহাইযেন যথার্থই বলেন যে, "মূল নাম সঠিকভাবে জানা না গেলেও একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে খান-ই-জাহান এ অঞ্চলটিকে বিস্মৃতির গহ্বর থেকে একটি সমৃদ্ধিশালী ও তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করেন। তাঁর মতো অসাধারণ কর্মদক্ষ এবং সাধক পুরুষ খান-ই-জাহান সুন্দরবন অঞ্চলে বনজঙ্গল পরিষ্কার করে বাসোপযোগী করেন এবং এখানে তিনি তাঁর প্রশাসনের প্রধান কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া তিনি এ অঞ্চলে যে সমস্ত ইমারত নির্মাণ করেন তা তাঁর স্থাপত্যকলার প্রতি অসাধারণ মোহ ও শৈল্পিক অনুভূতির ইঙ্গিত বহন করে। খান-ই-জাহানের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে ধর্মান্তরিতকরণ, যার ফলে বর্তমান যশোহর ও খুলনা অঞ্চলের অসংখ্য হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

খলিফাতাবাদ

একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, খলিফাতাবাদ নামটি বর্তমান বাগেরহাটের মূল নাম ছিল না। কারণ এইচ. ব্লকম্যান মনে করেন যে, এ নামের উৎপত্তি পঞ্চদশ-ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে হোসেনশাহী আমলে (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রীঃ), সুলতান হোসেন শাহ, সুলতান নসরত শাহ এবং সুলতান মাহমুদ শাহ খলিফাতাবাদ থেকে কতিপয় রৌপ্যমুদ্রা জারি করেন। এ ছাড়া সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে টোডরমলের রেন্ট রোলে বা খাজনার

তালিকায় সরকার খলিফাতাবাদ দক্ষিণ যশোহর এবং পশ্চিম বাকরগঞ্জ (বরিশাল) ও খুলনায় নিয়ে গঠিত হয়। সতীশচন্দ্র মিত্র মনে করেন যে, খানজাহান তৎকালীন বাগদাদের খলিফা অথবা তার প্রতিনিধি নাসিরউদ্দীন, মাহমুদ শাহ খলিফার নাম থেকে এ অঞ্চলের নামকরণ করেন খলিফাতাবাদ। কিন্তু এ মন্তব্য সঠিক নয়। এরূপ মন্তব্যের বিপরীতে আবদুল করীম ও হাবিবা খাতুন বলেন যে, সুলতান মাহমুদ শাহ খলিফাতুল্লাহ বিল হুজ্জাতুল বুরহান উপাধি ব্যবহার করেন। কিন্তু খলিফাতাবাদের সাথে সুলতান মাহমুদ শাহের উপাধির কোনো সম্পর্ক নেই। কতিপয় ঐতিহাসিক বলেন যে, খলিফাতাবাদ নামকরণের পূর্বে এ অঞ্চলটি 'শহর-ই-নৌ' বা নূতন শহর নামে পরিচিত ছিল। দক্ষিণাঞ্চলের জলাভূমি বা 'ভাট্টি' অঞ্চল ইলিয়াস শাহের রাজত্বকালে এ নামে অভিহিত হত। অবশ্য খান-ই-জাহান যখন এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন তখন তা জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। একথার পুনরুক্তি করেন ভ্যান লুহাইযেন। হাবিবা খাতুন বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, সুলতান ইলিয়াস শাহ, সিকান্দার শাহ এবং গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের রাজত্বকালে এ অঞ্চল যে ঘনবসতিপূর্ণ ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। রাজনৈতিক অরাজকতা ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার ফলে এ অঞ্চল জনশূন্য হয়ে পড়ে। যাহোক, খলিফাতাবাদ শব্দটি ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে অঙ্কিত ভ্যান ডেন ব্রুক কর্তৃক মানচিত্রে 'কুইপিটাভা' (Cuipitava) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বাগেরহাট

পূর্বে বলা হয়েছে যে সাপ্তাহিক দুবার হাট বসত এ অঞ্চলে এবং এ থেকে বাগেরহাট শব্দটির উৎপত্তি। 'বাগেরহাট' অর্থ বাগানের হাট (Fair oPtJ gardens)

বাগিরহাট

কতিপয় ঐতিহাসিক বাগেরহাটের নামকরণের সাথে 'বাগিরহাট' শব্দটি জড়িত বলে মনে করেন। 'বাগিরহাট' অর্থ 'সুন্দরবনের বিখ্যাত ও ভয়ঙ্কর রয়েল বেঙ্গল টাইগারে ভরপুর' এ অঞ্চলটিকে বাগিরহাট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নাযিমউদ্দীন আহমদ, যিনি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন পরিচালক ছিলেন, মনে করেন যে বাগেরহাট শব্দটি এতই অপ্রচলিত ছিল যে এর সঠিক অর্থ করা কঠিন। 'বাঘ' হিংস্র জন্তুর বাসস্থান হিসাবে এ অঞ্চলটি বাগিরহাট নামে পরিচিতি লাভ করেছে। তিনি বলেন, নামকরণের উৎসের সাথে সাথে বাগেরহাটের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা যায় না। কারণ কে এই খান জাহান, তিনি কোথা থেকে এদেশে আসেন, কখন আসেন, কোথায় এবং কখন বসতি স্থাপন করেন তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। বর্তমানে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ মাইল জুড়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় বঙ্গোপসাগরের জলাভূমিতে লম্বালম্বিভাবে গড়ে ওঠে এক বিশাল জনপদ। জঙ্গলাকীর্ণ ও হিংস্র জন্তুর উপদ্রব সত্ত্বেও খান জাহান অসীম সাহসিকতার সাথে এখানে বসতি স্থাপন করেন। বর্তমাজার বাগেরহাট এবং পূর্ববর্তী খলিফাতাবাদে বিভিন্ন ধরনের ইমারত নির্মিত হয়েছে, যা কালের সাক্ষ্য বহন করে রয়েছে। এর মধ্যে মসজিদের সংখ্যা বেশি। এ ছাড়া রয়েছে পুণ্যাত্মা খান জাহানের

সমাধি, হাভেলী, মাজার, দিঘি ইত্যাদি। এ. এফ. এম. আবদুল জলীল বলেন, "উলুঘ খান জাহানের কর্মক্ষেত্র ছিল খুলনা, যশোর ও বাকেরগঞ্জ-ফরিদপুর নহে। তিনি ছিলেন মুকুটহীন রাজা। কখনও সুলতান বা বাদশাহ উপাধি গ্রহণ করেননি। এ তিনটি জেলা জুড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক কীর্তির ধ্বংসস্তূপ ও অসংখ্য ইমারতের নিদর্শন দেখা যাবে। ব্যাপকতা ও স্থাপত্যিক ঐতিহ্যের দিক থেকে বাগেরহাটকে গৌড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রাক-মুঘল যুগে বাগেরহাটে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, প্রশাসনিক দফতর, অসংখ্য দিঘি ও স্থাপত্যকীর্তিসমূহ খান জাহানের কৃতিত্বের স্বাক্ষ্য বহন করে রয়েছে।

স্বাধীন শাসক

১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বাগেরহাটে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা করে। জন স্যান্ডি এ জরিপে নেতৃত্ব দেন। শুধুমাত্র এলাকা জরিপ করে প্রাচীন কীর্তিসমূহের তালিকা প্রণয়নই নয়, সেগুলো নোনাপানির আক্রমণ থেকে কিভাবে রক্ষা করা যায় তারও পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক সংরক্ষণের ফলে এখনও অসংখ্য ইমারত দেখা যায়।

স্থাপত্যকলার পৃষ্ঠপোষক

উলুঘ খানজাহান স্থাপত্যকলার যে একজন প্রখ্যাত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তা তাঁর অসংখ্য কীর্তি থেকেই প্রতীয়মান হয়। পুরাতন ভৈরব নদীর তীরবর্তী পূর্বে বর্তমান বাগেরহাট থেকে পশ্চিমে ঘোড়া দিঘি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে খানজাহানের সময়ের অসংখ্য ইমারত নজরে পড়ে। যে সড়কটির পাশে এ সমস্ত কীর্তি রয়েছে তাও খানজাহানের সড়ক নামে পরিচিত। মূল সড়কটি ৮ থেকে ১০ ফুট প্রশস্ত ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক ভ্যান লুহাইযেন বাগেরহাটের ইমারতসমূহকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

(ক) খানজাহানের সমাধি কমপ্লেক্স। ভ্যান লুহানযেনের মতে এ অঞ্চলে মোট পঞ্চাশটি ইমারত ও দিঘি ছিল। এই কমপ্লেক্সে যে সমস্ত ইমারত ঠাকুরদিঘির পাশে রয়েছে তা হচ্ছে—

১. খানজাহানের সমাধি এবং সংলগ্ন দরগাহ মসজিদ, একটি শবাধার এবং খানজাহানের প্রিয় শীষ্য পীর আলী বা পীর মুহম্মদ তাহেরের সমাধি।

২. নয়-গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ

৩. রেজা খোদা মসজিদ

৪. জিন্দাপীর মসজিদ ও সমাধি

৫. রণবিজয়পুর মসজিদ

৬. চিল্লাখানা

খ. তথাকথিত ষাইট গম্বুজ মসজিদ কমপ্লেক্স। ঘোড়াদিঘির সংলগ্ন যে সমস্ত ইমারত এই কমপ্লেক্সের মধ্যে পড়ে তা হচ্ছে—

১. তথাকথিত ষাইট গম্বুজ মসজিদ

২. সিংগাইর মসজিদ

৩. বিবি বেগনীর মসজিদ

৪. চুনী খোলা মসজিদ

৫. খানজাহানের বসতবাড়ি বা হাভেলি

খান জাহানের পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমান বাগেরহাটের অসংখ্য ইমারত নির্মিত হয়। এগুলোকে মোটামুটিভাবে দুভাগে ভাগ করতে হয় (ক) ধর্মীয় ইমারত-যার মধ্যে মসজিদ, সমাধি ও মাজারের প্রাধান্য রয়েছে। (খ) জাগতিক ইমারত, যেমন বসতবাড়ি, জাহাজঘাটা, অস্ত্রাগার, মুসাফিরখানা, দিঘি, সড়ক ইত্যাদি। এ সমস্ত পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত।

ক. ধর্মীয় ইমারত

১। দরগা মসজিদ, পঞ্চদশ শতাব্দী (সংস্কারকৃত) (৫)

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে আর. সি. স্ট্রার্ণডেল এ সমস্ত ইমারত পর্যবেক্ষণ করেন। সে সময়ে তিনি সুন্দরবন অঞ্চলে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, "প্রাচীর-বেষ্টিত যে তিনটি ইমারত রয়েছে তা অযত্নের ফলে এবং আগাছা জন্মে ধ্বংসের পথে এবং বটগাছের শিকড় ইটের গাঁথনিতে এমনভাবে গজিয়েছে, তা দেওয়ালগুলোকে ধ্বংস করে ফেলেছে এবং বুরুজ ও গম্বুজের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে।" কিন্তু খান জাহানের মূল গম্বুজ সুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। প্রাচীরবেষ্টিত যে দুটি ইমারত বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে খান জাহানের সমাধি এবং সংলগ্ন মসজিদ। মসজিদটি এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকৃতি এবং সমাধি থেকে পৃথকভাবে নির্মিত। মসজিদকে পৃথক করার জন্য মাজারে আর একটি স্বল্প উঁচু বেষ্টনিপ্রাচীর দেওয়া হয়। খান জাহান স্থাপত্য-কীর্তির প্রতিফলন দেখা যাবে এ দুটি ইমারতে। মসজিদটির চার কোনোায় গোলাকৃতি বুরুজ রয়েছে, যা ছাদ পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। বুরুজের চূড়ায় খাঁজকাটা নিরেট কিউপলা রয়েছে এবং কিউপলার চূড়া কলসাকৃতি। বুরুজগুলো সমান্তরাল ভাগে কয়েকটি অংশে বিভক্ত।

দরগা মসজিদটিতে বক্রাকার কার্নিশ দেখা যাবে এবং দুই স্তরবিশিষ্ট মোল্ডিং বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। ড্রামবিহীন এক গম্বুজ দ্বারা আবৃতো এই মসজিদটি তীর্থযাত্রী বা জিয়ারতকারী দর্শকদের ব্যবহারের জন্য নির্মিত হয়। গম্বুজটি মোট ৩৬ ফুট উঁচু এবং চার কোনোায় স্কুইঞ্চের সাহায্যে নির্মিত। পশ্চিমদিকে মাত্র একটি অবতলে মিহরাব আছে। কিবলা দিকের মিহরাবটিতে দিল্লির আলাই দরওয়াজার মতো ফলক দ্বারা শোভিত (spearhead)। এ মসজিদ উত্তর এবং দক্ষিণদিকের খিলান-দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। সম্মুখভাগে তিনটি খিলানসম্বলিত প্রবেশপথ রয়েছে। মধ্যবর্তী খিলানটি অপেক্ষাকৃত বড়। মাজারের মতো মসজিদটি প্রত্নবিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত না হওয়ায় এটির মৌলিকত্ব পূর্বেই নষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমানে রং দিয়ে সেন্ট করা এবং মার্বেলের ব্যবহার দৃষ্টিকটু মনে হয়।

২। রণবিজয়পুর মসজিদ (৬)

খানজাহানের নবআবিষ্কৃত বসতবাড়ির এক মাইল পূর্বে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গম্বুজবিশিষ্ট রণবিজয়পুর মসজিদটি স্থাপিত হয়। রণবিজয়পুর অঞ্চল থেকে মসজিদটির নামাকরণ হয়েছে। সম্ভবত এখানে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং বিজয়ের স্মরণে এ স্থানের নামাকরণ হল রণবিজয়পুর। খান জাহানের আমলে প্রতিষ্ঠিত রণবিজয়পুর মসজিদটি এক গম্বুজবিশিষ্ট চতুষ্কোণাকার মসজিদসমূহের অন্তর্গত যা ১৪৫৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় নির্মিত বিনত বিবির মসজিদে দেখা যাবে। বাইরের দিকে এর পরিমাপ ৫৬ বর্গফুট এবং ভিতরের দিকে ৩৬ বর্গফুট। অর্থাৎ প্রাচীর খুব মোটা করে তৈরি করা হয়। প্রায় ১০ ফুট প্রশস্ত। চারকোণে স্কুইঞ্চের সাহায্যে বিশালাকার গম্বুজটি নির্মিত।

রণবিজয়পুর মসজিদের চারকোণে গোলাকার বুরুজ দেখা যাবে। এ বুরুজগুলো তিনটি সমান্তরাল মোল্ডিং দ্বারা চার অংশে বিভক্ত। এর উপরের অংশ বর্তমানে ছাদ পর্যন্ত গিয়ে সোজা হয়েছে। কারণ বুরুজের উপরের অংশ বহুপূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। চারপাশের কার্নিশ বক্রাকার। মসজিদের প্রবেশের জন্য পূর্ব দিকে তিনটি খিলানপথ রয়েছে। খিলানগুলো কৌণিক ধরনের এবং মধ্যবর্তী খিলানপথটি পার্শ্ববর্তী দুটি অপেক্ষা বড়। এ ছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুটি অনুরূপ খিলানপথ দেখা যাবে। প্রবেশপথগুলোর উপরে পোড়ামাটির মোল্ডিং ও বেড়ি দ্বারা অলঙ্কৃত। প্রধান প্রবেশপথটির অভ্যন্তর চারচালা ছাদ দ্বারা আবৃতো। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রণবিজয়পুর মসজিদের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এর বিশালাকার গম্বুজ, যার জন্য মোটা প্রাচীরের প্রয়োজন হয়।

অভ্যন্তরে কোনো স্তম্ভ দেখা যাবে না। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব নির্মিত হয়। মিহরাবগুলো খাঁজবিশিষ্ট এবং অলঙ্করণ হিসাবে তীরের ফলা (spearhead) ব্যবহৃত হয়েছে। মিহরাবের অভ্যন্তর ছয় অংশে বিভক্ত এবং প্রতিটি প্যানেলে অপুর্ব নকশা দেখা যাবে। পোড়ামটির ফুল, লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশা এখানে শোভা পাচ্ছে।

৩। সিংগার বা সিংড়া মসজিদ (৭)

আ. ক. ম. যাকারিয়া বলেন, "ষাট গম্বুজ মসজিদ থেকে ৩০০ গজ দক্ষিণ-পূর্বদিকে সুন্দর ঘোনা গ্রামে সিড়া (সিংগার) নামে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদের প্রত্যেক বাহু বাইরের দিকে ৩৯ ফুট ও ভিতরের দিকে ২৫ ফুট লম্বা এবং ইটনির্মিত প্রাচীরগুলি প্রায় ৭ ফুট প্রশস্ত। চার কোণে ৪টি মিনার বা টারেট আছে। সেগুলোর নিম্নাংশ প্রায় নষ্ট (লোনা ধরে) হয়ে যাবার পথে। উপরের অংশ এবং ক্ষুদ্র গম্বুজটি, এখনও টিকে আছে। পূর্ব দেয়ালের আছে ৩টি প্রবেশপথ। কেন্দ্রীয় দরজা বরাবর পশ্চিম দেয়ালে আছে একটি অলঙ্কৃত মিহরাব। এই মিহরাবের উভয় পার্শ্বে পূর্ব দেয়ালের প্রবেশপথ দু'টির বরাবর পশ্চিম দেয়ালে ২টি কুলুঙ্গি আছে। উত্তর ও দক্ষিণদিকের দেয়ালে আছে ১টি করে প্রবেশপথ। এ দরজা দু'টির দু'পাশে

প্রত্যেক দেয়ালেই আছে দু'টি করে কুলুঙ্গি। এ মসজিদের বক্রাকার কার্নিশ সহজেই নজরে পড়ে।"

৪। বিবি বেগনীর মসজিদ (৮)

ঘোড়াদিঘির পশ্চিম থেকে প্রায় ৪০০ গজ দূরে তথাকথিত ষাইট গম্বুজ মসজিদের অদূরে বিবি বেগনী নামে একটি মসজিদ দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ মসজিদের নির্মাতা সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তি রয়েছে। কে এই বিবি বেগনী সঠিকভাবে বলা যায় না, তবে ধারণা করা হয় মসজিদের প্রতিষ্ঠান বিবি বেগনী (Scarlet Lady) মস্তবড় কোনো সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলা ছিলেন। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের অনেক মসজিদই মহিলা কর্তৃক নির্মিত হয় যেমন ঢাকার নারিন্দায় নির্মিত বিনত বিবির মসজিদ এবং গৌড়ে লোটন (বিবি) মসজিদ। যাহোক এক গম্বুজবিশিষ্ট এ মসজিদটি রণবিজয়পুর ও সিংড়া মসজিদের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাইরের দিকে ৫০ বর্গফুট এবং ভিতরের দিকে ৩০ বর্গফুট পরিমাপের এ মসজিদটি একটিমাত্র গম্বুজ দ্বারা আবৃতো এবং অন্যান্য ইমারতের মতো বক্রাকারে কার্নিশ দ্বারা শোভিত। দেওয়াল খুবই প্রশস্ত, প্রায় ৯ ফুট। পূর্বদিক দিয়ে তিনটি খিলানপথ দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয় এবং মধ্যবর্তী খিলানপথটি আকারে বড় এবং আয়তকার ফ্রেমে আবদ্ধ। কৌণিক খিলান ব্যবহৃত হয়েছে এবং খিলানের উপরে বেড়ি বা মৌল্ডিং দেখা যাবে। খুব সম্ভবত খিলানগুলো খাঁজকাটা। বাইরের প্রাচীর বা সম্মুখভাগ খুবই সাদামাটা, অলঙ্করণ দেখা যায় না। চার কোনোয় বুরুজ বা টারেট দ্বারা সুগঠিত এবং এগুলো বেড়ির সাহায্যে কয়েকটি অংশে বিভক্ত। গম্বুজটির ব্যাস ৩২ ফুট। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব রয়েছে এবং মিহরাবগুলো খাঁজকাটা খিলান দ্বারা অলঙ্কৃত। নাসিমউদ্দীন আহমদ তাঁর "Bagerhat" শীর্ষক গ্রন্থে মিহরাব খিলানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। বহু খাঁজ-বিশিষ্ট এ খিলানগুলো পোড়ামাটির অলঙ্করণে শোভিত। প্রধান মিহরাবের মধ্যভাগে ঝুলন্ত শিকল এবং ফুলের আকৃতিতে নকশা দেখা যাবে।

৫। চুনীখোলা মসজিদ (৯)

তথাকথিত ষাইট গম্বুজ মসজিদের অর্ধ-মাইল উত্তর পশ্চিমে চুনীখোলা নামে অপর একটি মসজিদ বহুদিন অবহেলিত অবস্থায় পড়ে ছিল। দক্ষিণাঞ্চলে লোনা পানি এবং বৃষ্টিপাতের ফলে অধিকাংশ খান জাহানী ইমারতসমূহ ভগ্নদশায় পৌঁছায়। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ জরিপকাজ চালিয়ে জরুরি ভিত্তিতে বাংলার সুলতানী স্থাপত্যকীর্তির অপূর্ব নিদর্শনসমূহ সংস্কার ও সংরক্ষণ করেছে। চুনের খোলায় একটি ধানক্ষেতে অবস্থিত থাকায় সম্ভবত এটিকে চুনীখোলা মসজিদ বলা হয়ে থাকে। বাগেরহাটের মসজিদসমূহের প্রকৃত কি নাম ছিল বলা যায় না। ফলশ্রুতিতে এগুলোর নাম হয়েছে হয় রণবিজয়পুর, নাহয় বিবি বেগনী, না হয় চুনীখোলা। সিংড়ার মসজিদের হুবহু অনুকরণে চুনীখোলা মসজিদের নির্মাণ সম্পন্ন হয়। কথিত আছে যে, খান জাহান বছরের ৩৬০ দিনের স্মরণে এ অঞ্চলে ৩৬০টি মসজিদ নির্মাণ করেন। তবে এটি কতটুকু সত্য তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। ধ্বংসস্তূপে এত সংখ্যক মসজিদের ভিত পাওয়া যায়নি।

সম্ভবত কথাটি আপেক্ষিক। খান জাহান সুন্দরবন অঞ্চলে মুসলিম স্থাপত্যকীর্তির ধারক ও বাহক হিসাবে স্বীকৃত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

একগম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকারে চুনীখোলা মসজিদটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সংস্কার করেছে। এ মসজিদের চার কোনোয় বুরুজ দেখা যাবে। আ. ক. ম. যাকারিয়ার ভাষায়, "বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদের প্রত্যেক বাহু বাইরের দিক থেকে প্রায় ৪০$\frac{১}{২}$ ফুট এবং ভিতরের দিক থেকে প্রায় ২৫ ফুট লম্বা। দেয়ালগুলি ৭ – ৯" প্রশস্ত। চারকোনায় ৪টি গোলাকার মিনার (টারেট) রয়েছে। পূর্ব দেয়ালে আছে ৩টি প্রবেশপথ, মধ্যেরটি অপেক্ষাকৃত বড়। প্রবেশপথগুলোর বরাবর পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মিহরাব আছে। মিহরাবের নিচের অংশ মাটির দিকে দেবে গেছে। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে আছে একটি করে প্রবেশপথ। এগুলোর পাশে দু'টি করে প্রদীপ কুলুঙ্গি আছে। সুক্ষ্ম খিলানের ওপর বর্শাফলকের প্রবেশপথগুলি নির্মিত। খান-ই-জাহানী স্থাপত্যশিল্পের এটি একটি বৈশিষ্ট্য। উপরে একটিমাত্র গম্বুজ দেখা যাবে, ব্যাস ২৫ ফুট। বিবি বেগনীর মিহরাবের অলঙ্করণের প্রতিফলন চুনীখোলা মসজিদের মিহরাবে দেখা যাবে।

৬। সোনা মসজিদ (ধ্বংসপ্রাপ্ত)

আধুনিককালে আবিস্কৃতো খান জাহানের হাভেলি বা বসতবাড়ি এলাকার অন্তর্গত সোনা মসজিদ নামে একটি মসজিদ জরিপে দেখানো হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে "খান জাহানের হাভেলীতে খননকাজ চলাকালে পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি পরিখা কাটা হয় এবং তখন সোনা মসজিদের ধ্বংসস্তূপ নজরে পড়ে।" সোনা মসজিদের নামাকরণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে গৌড়ে ছোট সোনা ও বড় সোনা নামে দু'টি মসজিদ সুলতানী আমলে নির্মিত হয়।

৭। জিন্দাপীর মসজিদ (১০)

বাগেরহাটের ষাইট গম্বুজ কমপ্লেক্সের মতো জিন্দাপীর মসজিদ গ্রুপটিতে একটি মসজিদ ও মাজার রয়েছে। জিন্দাপীর কে ছিলেন তা সঠিকভাবে বলা যায় না। 'সুন্দরবনের ইতিহাস' প্রনেতা আ. ক. ম. আবদুল জলীলের ভাষায় "হযরত খান জাহান আলীর সমসাময়িক বা পরবর্তী কীর্তিরাজির মধ্যে জিন্দাপীরের সমাধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চারটি সুদৃঢ় স্তম্ভের উপর গম্বুজ নির্মিত। ইহার চতুর্দিকে ইষ্টকের গাঁথুনি। জিন্দাপীর সম্পর্কে কয়েকটি অলৌকিক গল্প এদেশে প্রচলিত আছে। সিলেটে শাহজালালের সঙ্গে একজন জিন্দাপীর ছিলেন। তাঁহারই নামে তথাকথিত জিন্দা বাজারের নামাকরণ হইয়াছিল। খলিফাতাবাদের জিন্দাপীর সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, প্রতি রাত্রিতে তিনি নামাজ বাদ আল্লাহর অনুগ্রহে সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইতেন এবং পরদিন ভোরে উহার সমস্তই দীন দরিদ্রদিগকে দান করিয়া দিতেন। কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন না। একদা তাঁর সহধর্মিণী ঐ অর্থ হইতে কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার পর সেইরূপ অর্থের সমাগম একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। কথিত আছে যে, ইহার কয়েকদিন পরে এই মহাত্মা পবিত্র কোরান হাতে লইয়া উহা পাঠ করিতে করিতে

কবরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর ফিরিয়া আসেন নাই। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন আজও তিনি কবরের মধ্যে জীবিত আছেন এবং কোরান পাঠ করিতেছেন। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি কোরান পাঠ শ্রবণ করিতে পারেন এবং এই জন্যই তাঁহার নামকরণ হইয়াছিল জিন্দাপীর। জিন্দা শব্দের অর্থ জীবিত। এই কাহিনীর ভিতর কোনো সত্যতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। পবিত্র কোরানে আছে প্রত্যেক মানব মরণশীল। অতএব কাহাকে জীবিত থাকার কল্পনা করা সমীচীন নহে, ধর্মবিরুদ্ধ কার্যও বটে।" এ প্রসঙ্গে সম্রাট আওরঙ্গজেবকেও 'জিন্দাপীর' বা Living Saint বলা হত। এর অর্থ চিরজীবিত পীর নয় বরং ধর্মপ্রাণ ও পুণ্যাত্মা সাধক ব্যক্তিদের এ ধরনের পাদবি দেওয়া হয়।

জিন্দাপীর মসজিদ ও মাজার কমপ্লেক্সটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এ ধরনের কমপ্লেক্স গৌড়ের শাহ নিয়ামতোউল্লাহ ওয়ালীর মসজিদ, মাজার এবং ঢাকায় হাজী খাওয়াজা শাহবাজের মসজিদ মাজার কমপ্লেক্স বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২০ বর্গফুট পরিমাপের মসজিদটি এক গম্বুজবিশিষ্ট। এর গম্বুজটি বহু পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং পুনঃনির্মিত হয়নি। স্কুইঞ্চের সাহায্যে যে গম্বুজ নির্মিত হয়েছে তা অভ্যন্তরের কোনোয় স্পষ্টভাবে দেয়ালে বোঝা যায়। ভগ্নপ্রাপ্ত মসজিদটির যে অংশ এখনও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে তা থেকে বলা যায় যে চারকোনায় গোলাকার বুরুজের স্থানে আষ্টকোণাকার বুরুজ নির্মিত হয়। নিচের অংশ মোটা করে পোড়ামাটির বেড়ি বা মৌল্ডিং দ্বারা অলঙ্কৃত। পূর্বদিকে তিনটি খিলানপথ রয়েছে যার ভিতর দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। খিলানগুলো খাঁজকাটা। মধ্যবর্তী প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং প্রশস্ত। আয়তকার ফ্রেমে আবদ্ধ এ খিলানপথ দিয়ে কিবলার দিকে যাওয়া যায়, যেখানে তিনটি মিহরাব রয়েছে। মিহরাবগুলো চাতুর্যের সাথে পোড়ামাটির অলঙ্করণ দ্বারা শোভিত। খাঁজকাটা মিহরাবের খিলান দুই পাশের অলঙ্কৃত ও পিলাস্টারের উপর থেকে নির্মিত। বিভিন্ন লতাপাতা, ঝুলন্ত ফুল ও জ্যামিতিক অলঙ্ককরণপ্রধান মিহরাবটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

৮। বড় আজিনা, মসজিদ (অধুনালুপ্ত)

বর্তমান বাগেরহাট শহরের পশ্চিমে প্রাচীন খলিফাতাবাদ নগরী অবস্থিত। বাগেরহাট খুলনা সড়কের উত্তরে বড় আজিনা নামে একটি মসজিদের নিদর্শন পাওয়া যায়। ইউ. এন. ডি. পি. কর্তৃক প্রণীত রিপোর্টে বর্ণিত আছে যে "বড় আজিনা নামে যে উঁচু টিপি রয়েছে সেখানে অন্যান্য টিপির মতো অসংখ্য ইটের ভগ্নাংশ দেখা যাবে। এখানে কয়েকটি পাথরের স্তম্ভও বিদ্যমান। তথাকথিত ষাইট গম্বুজের স্তম্ভের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় ধারণা করা হয় যে বড় আজিনায় একটি মসজিদ নির্মিত হয়, যা বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।"

৯। মিঠাপুকুর, মসজিদ (অধুনালুপ্ত)

বাগেরহাটের বহু প্রাচীন কীর্তি কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, যার কোনো চিহ্নই নেই। এ ধরনের একটি অত্যুৎকৃষ্ট ইমারত ছিল মিঠাপুকুর মসজিদ। মিঠাপুকুরের নাম থেকে মসজিদের নামাকরণ হয়েছে। স্থানীয় লোকেরা অসংলগ্ন ও অবিন্যস্তভাবে খনন

করে এ মসজিদের ভিত আবিষ্কার করে। মসজিদের প্রাচীরের কিছু অংশ পাওয়া গেছে. তার ভিত দেখে ধারণা করা হয় সে মসজিদটি আয়তকার ছিল, বর্গাকৃতি নয়।

পরিমাপে উত্তর-দক্ষিণে ২২ ফুট ৮ ইঞ্চি লম্বা এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৮ ফুট ৩ ইঞ্চি প্রশস্ত। এ মসজিদটি তিনটি গম্বুজ দ্বারা আবৃতো ছিল। এক আইলবিশিষ্ট এ মসজিদটি স্থানীয় উদ্যোগে পুনঃনির্মিত হয়েছে। হাবিবা খাতুন বলেন যে মিঠাপুকুরে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তকার মসজিদের যে রীতি দেখা যায় পরবর্তীকালে তা অন্যান্য মসজিদে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রাক-মুঘল যুগে সম্ভবত এটিই প্রথম তিনগম্বুজবিশিষ্ট আয়তকার মসজিদ যা মুঘল আমলে একটি স্থায়ী রীতিতে পরিণত হয়। যেমন বগুড়ার শেরপুরে খেরুয়া মসজিদ, ঢাকার শাহবাগের মসজিদ, লালবাগের দুর্গ মসজিদ।

১০। রেজা খোদা মসজিদ (ধ্বংসপ্রাপ্ত)

খানজাহানের সমাধির পশ্চিমে এবং জিন্দাপীর মসজিদের একশত গজ পশ্চিমে রেজা খোদা মসজিদ অবস্থিত। বাগেরহাটে 'ছয় গম্বুজ'-বিশিষ্ট মসজিদের নিদর্শন রয়েছে রেজা খোদা মসজিদে। ছয় গম্বুজবিশিষ্ট সুলতানী মসজিদ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নির্মিত হয়। যেমন বিক্রমপুরের রামপালের বাবা আদমের মসজিদ (১৪৮৩), চট্টগ্রামের হাটহাজারী মসজিদ (১৪৭৪-৮১)। অভ্যন্তরে দু'টি করে দুই সারি পাথরের স্তম্ভ রয়েছে এবং এর সাহায্যে ছয়টি গম্বুজ নির্মিত হয়। বর্তমানে এ মসজিদটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তবে ধারণা করা যায় যে, এটির চার কোনোায় চারটি বুরুজ ছিল, সম্ভবত আটকোণাকৃতি। কিবলার দিকে তিনটি মিহরাব ছিল।

১১। নয়গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ (১১)

বাংলাদেশের সুলতানী আমলের নয়গম্বুজ মসজিদ। নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। ঠাকুরদিঘির পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত নয় গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি সম্বন্ধে আ. ক. ম. যাকরিয়া বলেন, "বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদের প্রত্যেক বাহু আনুমানিক ৫৪ ফুট লম্বা। পূর্ব দেয়ালে আছে ৩টি প্রবেশপথ। উত্তর এবং দক্ষিণ দেয়ালেও আছে ৩টি করে প্রবেশপথ। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালের আছে ৩টি সুন্দর মিহরাব। দেয়ালগুলি ৮$\frac{১}{২}$ ফুট প্রশস্ত। মসজিদের অভ্যন্তরভাগে ৪টি পাথরের স্তম্ভ আছে। স্তম্ভগুলি ১১ ফুট উঁচু। এই ৪টি স্তম্ভ ও চারপাশের দেয়ালের উপর মসজিদের ৯টি গম্বুজ প্রতিষ্ঠিত। গম্বুজগুলি দেখতে অতি মনোরম।

নয়গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল যা বহু পূর্বে ভেঙে পড়েছে। মসজিদের ছাদ বহু পূর্বে ভেঙে গেছে, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এগুলো পুনঃনির্মাণ করে। ভ্যান লুহাইযেন বলেন যে, প্রকৃত নামের অভাবে স্থানীয় লোকজন এ ইমারতটিকে নয়গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ বলে ডেকে থাকে।

হাবিবা খাতুন এবং পরবর্তীকালে হোসনে জাহান লীনা বাংলাদেশের নয় গম্বুজ-বিশিষ্ট মসজিদরীতির উপর তথ্যবহুল নিবন্ধ লিখেছেন। তাঁরা যথার্থই বলেছেন যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কয়েকটি নয় গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ নির্মিত হয়েছে;

যেমন বাখরগঞ্জের (বরিশাল) কসবা মসজিদ, ফরিদপুরের সাটইরের মসজিদ এবং খুলনায় মসজিদকূড় মসজিদ।

বাগেরহাটের নয় গম্বুজ মসজিদটি বর্গাকার এবং প্রাচীর ৭′ ৭″ প্রশস্ত। এর চারকোনায় গোলাকার বুরুজ রয়েছে, যা ছাদ পর্যন্ত বিস্তৃতো কিন্তু ছাদের উপর কোনো কুইপোলা বা নিরেট গম্বুজ দেখা যায় না। বুরুজগুলো মৌল্ডিং বা বেড়ি দ্বারা বিভক্ত। দুই স্তরে মোটা করে ছাদের বক্রাকার কার্নিশ বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। পূর্বদিকে তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে। প্রবেশপথগুলো কৌণিক এবং খিলানপথগুলো আয়তকার ফ্রেমে আবদ্ধ। খিলানের উপর সমান্তরাল তিনটি বেড়ি বা মৌল্ডিং দেখা যাবে। খিলানের দু'পাশে ইটের জাফরি নকশা শোভা পাচ্ছে। মসজিদের বহিঃপ্রাচীর সামান্য ঢালু, যা দিল্লিতে ফিরোজশাহ তুঘলকের রাজত্বে নির্মিত ইমারতসমূহে দেখা যাবে। অভ্যন্তর দু'টি পাথরের স্তম্ভ দ্বারা নয়টি অংশে বিভক্ত। স্তম্ভগুলোর উচ্চতা ১১ ফুট এবং এর নিম্নাংশ আট কোনোকার এবং উপরের অংশ ১৬ পাশবিশিষ্ট। এ ছাড়া দেয়ালে আটটি সংলগ্ন ইটের পিলার রয়েছে। পেনডেনটিভের সাহায্যে নয়টি অংশের উপর নয়টি গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। কিবলা প্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃতি অর্ধবৃত্তাকার মিহরাব রয়েছে। প্রধান বা কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পার্শ্ববর্তী মিহরাব দুটি থেকে অপেক্ষাকৃত বড় এবং অধিক অলঙ্কৃত। পোড়ামাটির নকশা নয় গম্বুজ মসজিদকে সুদৃঢ় করেছে। মিহরাবগুলো খাঁজকাটা ও ঝুলন্ত ফুল, লতাপাতা দ্বারা শোভিত।

১২। রণবিজয়পুরের দশ গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ

রণবিজয়পুর থেকে বাগেরহাটের আধুনিক নগরের দিকে যে সড়কটি গেছে তার পাশেই দশগম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ অবস্থিত। আ. ক. ম. যাকারিয়া বলেন, "রণবিজয়পুর মসজিদ থেকে প্রায় এক মাইল পূর্ব দিকে বাগেরহাট শহরে যাবার পথে পাকা সড়কের উত্তর পাশে কৃষ্ণনগর গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। এটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা ও মসজিদের আয়তন ভিতরের দিকে ৬০ × ২০ ফুট। ইটের নির্মিত প্রাচীরগুলি ৬ ফুট প্রশস্ত। পূর্ব দেয়ালের আছে ৫টি প্রবেশপথ ও এগুলির বরাবর ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৫টি মিহরাব। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে আছে ২টি করে দরজা। মসজিদের উপরে ২ সারিতে ১০টি গম্বুজ আছে। গম্বুজগুলো আকারে ছোট এবং তলদেশে এগুলির ব্যাস মাত্র ১২ ফুট। বর্তমান সংস্কার করে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। এ মসজিদটিতে বর্তমানে এর মূল কোনো স্থাপত্যিক অলঙ্করণ অবশিষ্ট নেই। কিবলাপ্রাচীরে পাঁচটি মিহরাব দেখা যাবে। এ ধরনের মসজিদযুগলির ত্রীবেণীতে দশগম্বুজবিশিষ্ট জাফর খান গাজীর মসজিদে দেখা যাবে।

মসজিদটির নির্মাণকাল সম্বন্ধে মতোবিরোধ আছে। নাসিমউদ্দীন আহমদ এবং হাবিবা খাতুন এটিকে সুলতানী আমলের, বিশেষভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীর খান জাহানী রীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করেন; অন্য দিকে আবার যাকারিয়া এটিকে ষোড়শ শতাব্দীর হোসেনশাহী আমলের ইমারত বলে অভিহিত করেন।

১৩। সাবেকডাঙ্গা মসজিদ (১২)

বাগেরহাটের চালাছাদবিশিষ্ট সাবেকডাঙ্গা ইমারতটি খুবই ব্যতিক্রমধর্মী। এ অঞ্চলে এ ধরনের ছাদ নির্মাণ খুবই বিরল। সোনারগাঁয়ের মোগরাপাড়ায় ইব্রাহিম দানিশমন্দ এবং গৌড়ের দোচালা ফতেহ খানের সমাধির সাথে সাবেকডাঙ্গা ইমারতের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। খান জাহানের সমাধি থেকে ৪.৮৪ কিলোমিটার উত্তরে নির্মিত এ ইমারতটি কি উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। উত্তর-দক্ষিণে আয়তকার এ ইমারতটির সম্বন্ধে নাসিমউদ্দীন আহমদ বিস্তারিত আলোচনা করেন। সাধারণভাবে এটি সাবেকডাঙ্গা মসজিদ নামে পরিচিত। ভিতরের দিকে এর পরিমাপ ৫.৫৯ × ৩.৫৩ মিটার এবং এর প্রাচীর ১.২৬ মি. প্রশস্ত। দোচালা কুঁড়েঘরের অনুকরণে নির্মিত সাবেকডাঙ্গা ইমারতটিকে নাজিমউদ্দীন আহমদ প্রাক-ইসলামি ইমারত বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর ভাষায় এটি মন্দির ছিল যা পরবর্তীকালে মসজিদে রূপান্তরিত হয় কিবলার দিকে একটি মিহরাব প্রতিষ্ঠা করে। তাঁর ভাষায়, "দোচালা মন্দিরের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় সাবেকডাঙ্গা ইমারতকে মসজিদ বলা যায় না।" নাসিমউদ্দীন আহমদের মন্তব্য বিভিন্ন উপায়ে খণ্ডন করা যায়। প্রথমত, যদি এটি প্রাক-মুসলিম যুগের মন্দির হত তাহলে মূর্তি রাখার জন্য কুলুঙ্গি বা apse থাকত। দ্বিতীয়ত, দোচালা ছাদ থাকলেই মন্দির হবে এমন কোনো কথা নেই, কারণ বহু মুসলিম ইমারত দোচালা রীতিতে নির্মিত, যেমন-গৌড়ের ফতেহ খানের সমাধি। তৃতীয়ত, নাসিমউদ্দীন আহমদ বলেন যে, মসজিদে বা মুসলিম ধর্মীয় ইমারতে কোনো জীবজন্তুর মূর্তি খোদিত হয় না মন্দিরের মতো। কিন্তু দিনাজপুরের নয়াবাদ মসজিদে (১৭৮৫) পাখির মূর্তি পাওয়া গেছে। এমনকি হযরত পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদে মূর্তিসম্বলিত পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। চতুর্থত, এটি মোটেই প্রাক-মুসলিম যুগে নির্মিত হয়নি। ভ্যান লুহাইযেন বলেন, সাবেকডাঙ্গা অন্যান্য ইমারতসমূহ থেকে পৃথক এবং ভিন্ন রীতিতে নির্মিত। এ থেকে ধারণা করা যায় যে এ ইমারতটি খান জাহানের আমলের পরে নির্মিত হয়। এ ক্ষুদ্র ইমারতটি অষ্টাদশ অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে স্থাপিত হয়।

সাবেকডাঙ্গা ইমারতটি বর্তমানে মসজিদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ঢাকা কলেজের পিছনে একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দোচালা মসজিদ দেখা যাবে। পোড়ামাটির অলঙ্করণ এ ইমারতের শোভা বৃদ্ধি করেছে। বিভিন্ন ধরনের লতাপাতা, ফুল, ঝুলন্ত নকশা সাবেকডাঙ্গা ইমারতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাঘা মসজিদ, গৌড়ের তাঁতিপাড়া এবং সোনারগাঁর গোয়ালদি মসজিদে পোড়ামাটির অনুরূপ অলঙ্করণ দেখা যাবে।

১৪। তথাকথিত ষাইট গম্বুজ মসজিদ (১৩-১৪)

বাংলাদেশের মুসলিম স্থাপত্যকীর্তির সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিদর্শন হচ্ছে খান জাহান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাগেরহাটের তথাকথিত ষাইট গম্বুজ মসজিদ। এ মসজিদের নামকরণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতোবিরোধ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাগেরহাটের কোনো মসজিদের সঠিক নামাকরণ করা সম্ভব হয়নি যেমন গৌড় এবং হযরত পাণ্ডুয়ার

মসজিদগুলো হয়েছিল, আদিনা মসজিদ, সোনা মসজিদ, রাজবিবি মসজিদ। বাগেরহাটের মসজিদগুলো স্থানীয়ভাবে যেমন চুনীখোলা, অথবা গম্বুজভিত্তিক যেমন নয় গম্বুজ, দশ গম্বুজ, তথাকথিত ষাইট গম্বুজ অথবা কাল্পনিক যেমন বিবি বেগনী অথবা দিঘিভিত্তিক, যেমন মিঠাপুকুর মসজিদ। বাংলাদেশের মসজিদে প্রায় শিলালিপি পাওয়া যায় যাতে নির্মাতার নাম, নির্মাণকাল এবং কোনো সুলতানের আমলে নির্মিত হয় তার উল্লেখ থাকে। কিন্তু বাগেরহাটের খান জাহানের সমাধি ছাড়া অপর কোনো ইমারতে শিলালিপি পাওয়া যায়নি। তবে স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য এবং নির্মাণকৌশল দেখে বাগেরহাটের ইমারতগুলোকে খান জাহানী বলা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় ইমারত বাগেরহাটের তথাকথিত ষাইট গম্বুজ মসজিদটির নামাকরণ সঠিক নয় কারণ ভূমিনকশা অনুযায়ী এ ইমারতে মধ্যভাগ বা নেভে ৭টি চৌচালা ছাদ এবং এর উভয় পাশে ৩৫টি করে মোট ৭০টি, অর্থাৎ সর্বমোট ৭৭টি চালা-গম্বুজ রয়েছে। সুতরাং এর নামাকরণ গম্বুজভিত্তিক সঠিকভাবে করতে হলে বলতে হয় ৭৭ গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ। ঘোড়াদিঘির উত্তর পাশে অবস্থিত বিশালাকার মসজিদটির অভ্যন্তরে ষাইটটি স্তম্ভ রয়েছে। এ থেকে এটিকে ষাইট স্তম্ভবিশিষ্ট মসজিদ হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এ ধরনের স্তম্ভভিত্তিক মসজিদের নামাকরণ বিদরের একটি মসজিদে দেখা যায়, যেমন–ষোলখাম্বা বা ষোল স্তম্ভ বিশিষ্ট মসজিদ।

তথাকথিত ষাইট গম্বুজ মসজিদটি ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের আর. সি. স্ট্রার্নডেল পর্যবেক্ষণ করেন। সম্ভবত তিনিই সর্বপ্রথম এ ইমারতের স্থাপত্যকৌশল বর্ণনা করেন। তাঁর ভাষায় : "চার মাইল যাওয়ার পর হঠাৎ সড়কটি উঁচু হয়ে প্রায় ৫০ ফুট টিবির দিকে চলে গেছে। এটি একটি কৃত্রিম দিঘির (ঘোড়া) পাড়, যেখানে ঘন বনজঙ্গল দেখা যাবে এবং ছিদ্রবিশিষ্ট এক ইটের প্রাচীর একটি খিলান প্রবেশপথের দিকে চলে গেছে। এ ফটকের মধ্য দিয়ে একটি মসজিদের চত্বরে পৌঁছানো যায়।" বাগেরহাটের এ অত্যুৎকৃষ্ট ইমারতটি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এদের মধ্যে স্ট্রার্নডেলের নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া যারা বিশেষভাবে এ ইমারতটির স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন গৌরচন্দ্র বসাক, সতিশ চন্দ্র মিত্র, ভ্যান লুহাইযেন, আহমদ হাসান দানী, ক্যাথারিন আশের, নাসিমউদ্দীন আহমদ, হাবিবা খাতুন এবং আ. ক. ম. যাকারিয়া। আ. ফ. ম. আব্দুল জলীল 'সুন্দরবনের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রণেতা। একজন স্থাপত্যিক বিশেষজ্ঞ না হলেও তিনি স্থানীয় ব্যক্তি হিসাবে এ ইমারতটি পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর ভাষায় : "ঘোড়া দিঘি পূর্ব পশ্চিমে দীর্ঘ। ইহার পূর্ব তীরে খান জাহানের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি সুবিখ্যাত ষাট গম্বুজ অট্টালিকা (মসজিদ) ইহার ন্যায় বৃহৎকার ভজনালয় পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশ) আর নাই। ইহার দৈর্ঘ্য ১৬০ ফুট এবং প্রস্থ ১০৮ ফুট, গৃহের অভ্যন্তরে গুম্বজের উচ্চতা ২২ ফুট। এই বিশালকায় হর্মের সম্মুখ দিকে মধ্যস্থলে একটি বড় খিলান ও উহার দুই পার্শ্বে পাঁচটি করিয়া ছোট খিলান আছে (মোট ১১টি)। ইহার প্রাচীরের প্রশস্ততা প্রায় ৯ ফুট । ষাট গম্বুজ ও খান জাহান আলীর সমাধি সৌধ বিশেষ স্থাপত্য বৈচিত্র্যে ভাস্বর। এ সকল স্থাপত্যের কোণাস্থিত

গোলাকার গম্বুজের (টারেট), হেলানভাব (bater), সকল অলঙ্করণ ও কার্নিশের বক্রতায় (curvilinear cornice) তোঘলক স্থাপত্য রীতির প্রভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট।"

আব্দুল জলীল পুনরায় বলেন, "ষাট গম্বুজ অট্টালিকার (মসজিদ) গম্বুজ সংখ্যা ষাটটি নহে। উহার সংখ্যা মোট ৭৭টি। মিনারের (কৌণিক বুরুজ) চারটি সর্বমোট ৮১টি গম্বুজ আছে। কিন্তু তবুও ইহাকে ষাট গম্বুজ বলা হইল কেন? সাতটি সারিবদ্ধ বলিয়া ইহা সাত গম্বুজ এবং তা হইতে ষাইট গম্বুজ নামও হইতে পারে। তবে মসজিদের স্তম্ভগুলি ৬০টি প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভের উপর অবস্থিত। এজন্যও ষাট গম্বুজ নাম হইতে পারে। আমাদের মনে হয় ৬০টি খাম্বাজ বা স্তম্ভ হইতে ষাট গুম্বুজ নামাকরণ হইয়াছে। খাম্বাজ শব্দ সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে গুম্বজে পরিণত হইয়াছে।" আব্দুল জলীল যে ৭৭টি এবং বুরুজসহ ৮১টি গম্বুজের কথা বলেছেন তা সঠিক নয় কারণ মোট গম্বুজের সংখ্যা ৭০টি এবং ৭টি চৌচালা ছাদ। উপরন্তু, কৌণিক বুরুজের উপর যে কিউপোলা বা নিরেট গম্বুজবিশিষ্ট আচ্ছাদন রয়েছে তাকে ফাঁপা ধরনের গম্বুজ বলা যাবে না। তবে তিনি ষাইট খাম্বাজ কথাটি সঠিক বলেছেন যার সমর্থন পাওয়া যায় হাবিবা খাতুনের 'সোনার গাঁ' নিবন্ধে।

তথাকথিত ষাইট গম্বুজ মসজিদটি কোনো এক সময় প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। বর্তমানে এর কোনো চিহ্ন নেই। এর দুই পাশে কর্মচারী, ইমাম ও অন্যান্য পরিচারকদের যে গৃহ ছিল তাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ইদানীং খনন করে পশ্চিমদিকে কিছু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার প্রণেতা ডাব্লু ডাব্লু হান্টার বলেন যে, ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে তথাকথিত ষাইট গম্বুজ মসজিদটির সর্বত্র জঙ্গলাবৃতো ছিল। উক্ত গেজেটে প্রকাশিত ছবিতে দেখা যাবে যে এ অতুলনীয় স্থাপত্যকীর্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার পথে কারণ এটির দেয়াল, ছাদ ও গম্বুজগুলোর উপর বহু আগাছা বট বা পিপুল গাছের চারা প্রভৃতি জঙ্গল দ্বারা আবৃতো। ও'মালি মসজিদের স্থাপত্যশিল্পকে খান জাহানের সমাধি অপেক্ষা নিম্নমাজার বলে যে মন্তব্য করেন তা সঠিক নয়। অভ্যন্তরের খিলানরাজি দ্বারা যে বিশাল হলের সৃষ্টি হয়েছে তা দেখে অনেক পণ্ডিত একে দিওয়ান-ই-আল বা দিওয়ান-ই-খাসের মতো দরবারকক্ষ বলে অভিহিত করেছেন, যেখানে শাসক খান জাহান তাঁর নিয়মিতো সভা করতেন। কিন্তু ও'মালি এবং অপরাপর প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মিহরাবগুলো পর্যবেক্ষণ করে এটিকে মসজিদ বলে সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছেন। ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ কর্তৃক এ অসাধারণ ইমারতটি পুরাকীর্তি সংরক্ষণ আইন মোতাবেক সংস্কার ও সংরক্ষিত করা হয়।

আবদুল জলীল বলেন, "(তথাকথিত) ষাট গম্বুজ দেখিবার জন্য আজও দৈনিক অসংখ্য লোকের ভীড় হয়। প্রতি বৎসর চৈত্র পূর্ণিমায় যে মেলা হয় সেই সময় অগণিত দর্শক এই অট্টালিকা দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করে এবং উহার স্থাপত্য শিল্প দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া যায়। বিশালকায় জলাশয়, পার্শ্বে বিশালাকার মসজিদ ও দরবার গৃহ (?) উহার নির্মাণকর্তার অন্তরের বিশালতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।" তিনি বলেন যে, খান

জাহান জৌনপুর থেকে বহু রাজমিস্ত্রি এনে এ সুরম্য হর্ম নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করেন এক জৌনপুরের সুলতানের সাথে খান জাহানের সুসম্পর্ক ছিল। সম্ভবত তিনি জৌনপুর থেকে বাংলাদেশে আসেন। আব্দুল জলীল এখানে অতিদ্রুত অনেকগুলো মন্তব্য করেছেন, যা নির্ভুলভাবে ধরে নেওয়া যায় না। প্রথমত, তিনি স্থানীয় ওস্তাগার, মিস্ত্রি ও কারিগরের সাহায্যেই নির্মাণকাজ সমাধা করেন। জৌনপুর থেকে কোনো রাজমিস্ত্রী আনা হয়নি। দ্বিতীয়ত, তার সাথে জৌনপুরের প্রতিষ্ঠাতা খান জাহানের কোনোই সম্পর্ক ছিলনা। তৃতীয়ত, তিনি জৌনপুরের অধিবাসী ছিলেন না। বাগেরহাটের প্রতিষ্ঠাতা ও সাধক পুরুষ ছিলেন এবং যশোহর, খুলনা এমনকি বরিশাল পর্যন্ত খান জাহানী ইমারতের নিদর্শন দেখে ধারণা করা হয় যে তাঁর প্রশাসনিক এলাকা খুবই বিস্তৃতো ছিল।

শুধুমাত্র খান জাহানী রীতির অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তই নয়, তথাকথিত ষাট গম্বুজ মসজিদটি বাংলাদেশের মুসলিম স্থাপত্যের অতুলনীয় নিদর্শন হিসাবে পরিগণিত। পরিমাপে আয়তকার এবং দৈর্ঘ্যে উত্তর-দক্ষিণে ১৬০ ফুট এবং প্রস্থে পূর্ব-পশ্চিমে ১০৮ ফুট। লাল পোড়া ইটের তৈরি এই আকর্ষণীয় মসজিদটির দেওয়াল ৬ ফুট প্রশস্ত, ভুলবশত আ. ক. ম. যাকরিয়া এটি ৯ ফুট বলেছেন। নাসিমউদ্দীনের ভাষায়, খান জাহান আলী রীতিতে নির্মিত যে কয়েকটি ইমারত ধ্বংস থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের অত্যন্ত বৃহদাকার ও আকর্ষণীয় তা হচ্ছে (তথাকথিত) ষাইট গম্বুজ। বাইরের দিকে অতি সাদামাটা সম্মুখভাগ থাকলেও এই ইমারতেই অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত অংশগুলো হচ্ছে চারকোনায় গোলাকৃতি বুরুজ, যা তুঘলকীয় ঢালুর (taper) মতো সামান্য ঢালু, ছাদের সুবিস্তীর্ণ সমান্তরাল বক্রোকার কার্নিশ, আয়তকার ফ্রেমে আবদ্ধ কৌণিক খিলানপথ ইত্যাদি। কৌণিক বুরুজ সম্বন্ধে আহমদ হাসান দানী বলেন, সেগুলো সুবৃহৎ এবং ঢালু এবং উপরিভাগ কিউপলা বা নিরেট গম্বুজদ্বারা আবৃতো। সম্মুখের কৌণিক বুরুজে যে প্যাঁচান সিঁড়ি রয়েছে তা দিয়ে দ্বিতলে খিলান-সম্বলিত কক্ষে যাওয়া যায়। পিছনে অর্থাৎ মিহরাব প্রাচীরের দুই দিকে যে কৌণিক বুরুজ রয়েছে তা ফাঁপা নয়, নিরেট। এ চারটি কৌণিক বুরুজ মধ্যভাগে সমান্তরাল ব্যন্ড বা মোল্ডিং দ্বারা বিভক্ত। বুরুজগুলোর উপরিভাগ ছাদ থেকে ১৫ ফুট উঁচু। বুরুজগুলোর নামকরণ প্রসঙ্গে অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করেছেন। সাধারণভাবে মিনার বলা হলেও সব বুরুজগুলোকে মিনার বলা যাবে না। কেবলমাত্র সে সমস্ত ফাঁপা বুরুজ, যেগুলো থেকে মুয়াজ্জিন দাঁড়িয়ে আজান দেয় কেবলমাত্র সেগুলোকেই মিনার বলা যাবে। তথাকথিত ষাইট গম্বুজ মসজিদের সম্মুখের ফাঁপা বুরুজ দুটিকে মিনার বলা যুক্তিসঙ্গত। আবদুল জলীল সম্মুখভাগের বুরুজ দুটিকে 'রওশন কোঠা' এবং পিছনের নিরেট বুরুজ দুটিকে 'অন্তরাল কোঠা' বলে অভিহিত করেছেন। কি কারণে এ ধরনের নামাকরণ হয়েছে তা সঠিকভাবে বলা যায় না তবে সম্ভবত রাত্রে সম্মুখদিকে বুরুজ দু'টিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হত চলাচলের সুবিধার্থে, সে কারণে 'আলোকরশ্মিময়

বুরুজ' বলা হত এবং যেহেতু পিছনের নিরেট বুরুজ দুটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল এ কারণে তাদের বলা হত 'অন্তরাল কোঠা'। যাহোক বিশেষজ্ঞগণ এ ধরনের বিশালাকার গোলাকৃতি বুরুজগুলোকে দুর্গের ঠেসা বা buttress বা bastion-এর সাথে তুলনা করেছেন। তাঁদের মতে, এটিতে দিল্লির তুঘলক স্থাপত্যরীতি প্রতিফলিত হয়েছে।

বাগেরহাটের বৃহদাকার মসজিদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য বক্রাকার কার্নিশ-এর প্রসঙ্গে আহমদ হাসান দানী বলেন যে. বাংলাদেশে জলবায়ু ও আবহাওয়ার দরুন কার্নিশগুলো বক্রাকার করা হয়েছে, যাতে বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি সহজে ঝরে গিয়ে ইমারতের কোনো ক্ষতি করতে না পারে। সম্ভবত এই একই কারণে দো-চালা ও চার-চালা ছাদবিশিষ্ট ইমারতের সৃষ্টি হয়েছে। বক্রাকার কার্নিশ প্রসঙ্গে বলা যায় যে. হযরত পাণ্ডুয়ায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত একলাখী সমাধিতে। জালালুদ্দীন মোহম্মদ শাহের সমাধিতে প্রথম এ ধরনের স্থাপত্যিক কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য যে. বাগেরহাটের প্রায় প্রত্যেকটি স্থাপত্যকীর্তিতে. যেমন- চুনীখোলা. বিবি বেগনী. রণবিজয়পুর. নয় গম্বুজ মসজিদ-এর প্রতিফলন রয়েছে। বাগেরহাটের তথাকথিত ষাট মসজিদের প্রধান আকর্ষণ বক্রাকার কার্নিশটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এটি দুই অংশে বিভক্ত। সম্মুখভাগে প্রধান খিলানপথের উপরে পেডিমেন্ট রয়েছে, যা গ্রিক স্থাপত্য-রীতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এর দু'দিকে মোটা সমান্তরাল বক্রাকার কার্নিশ সম্প্রসারিত। এ ধরনের বক্রাকার কার্নিশ বাগেরহাটের ইমারত ছাড়াও ময়মনসিংহের অষ্টগ্রামের কুতুবশাহী মসজিদ ও টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদেও দেখা যাবে।

মসজিদে প্রবেশের জন্য প্রধান খিলানপথটি পাশ্ববর্তী খিলানপথগুলো অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত উঁচু ও প্রশস্ত। সর্বমোট ১১টি খিলানপথ রয়েছে এবং এগুলোতে যে খিলান আছে তা দ্বিকোণবিশিষ্ট। কেন্দ্রীয় পথটি ৯ ফুট ৭ ইঞ্চি এবং পার্শ্ববর্তী খিলানপথগুলো ৫-৯ ইঞ্চি থেকে ৬ ফুট ২ ইঞ্চি পরিমাপের। এ ছাড়া অনুরূপ দ্বিকোণ বিশিষ্ট কৌণিক খিলানপথ উত্তর ও দক্ষিণদিকে দেখা যাবে। প্রতিটিতে ৭টি প্রবেশপথ রয়েছে। খিলান-পথগুলোর উপরে বেড়ির বা মৌল্ডিং-এর নকশা দেখা যাবে।

অভ্যন্তরে মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে ছয়টি স্তম্ভসারি দ্বারা সাতটি আইলে বা অংশে বিভক্ত। প্রতিটি সারিতে ছয়টি করে পাথরের স্তম্ভ বা পিলার রয়েছে। উত্তর-দক্ষিণের ৭টি আইল এবং পূর্ব-পশ্চিমের ১১টি 'বে' বা অংশ সমগ্র অভ্যন্তরকে ৭৭টি খণ্ডে বিভক্ত করেছে। অভ্যন্তরে মধ্যবর্তী অংশটিকে 'নেভ' বলা হয় এবং এই নেভটি সাতটি চৌ-চালা বা চার-চালা ছাদ দ্বারা আবৃতো। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের দোচালা অথবা চারচালা কুঁড়েঘর দেখা যাবে এবং এগুলোর অনুকরণে মসজিদের চারচালা নির্মিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ ধরনের চারচালা এ ইমারতেই সর্বপ্রথম দেখা যাবে এবং পরবর্তীকালে গৌড়ের ছোট সোনা এবং দরসবাড়ি মসজিদের নেভ-এ অনুরূপ চারচালা আচ্ছাদন দেওয়া হয়। পাশ্ববর্তী দুটি অংশে উত্তর ও দক্ষিণে ৩৫টি করে যে খোপ বা কক্ষ রয়েছে যা গোলাকার গম্বুজ দ্বারা আবৃত। অর্থাৎ সর্বমোট ৩৫ × ২ = ৭০টি গম্বুজ

নির্মিত হয়। অভ্যন্তরে ৬০টি পাথরের স্তম্ভ রয়েছে, যার উপর থেকে কৌণিক খিলান উঠে গেছে। সরু ও মসৃণ স্তম্ভগুলো ১১ ফুট উঁচু। একটি স্তম্ভ থেকে অপর একটি স্তম্ভ পর্যন্ত দূরত্ব ১৩ ফুট। কিন্তু নেভটি সর্বাধিক প্রশস্ত, প্রায় ১৬ ফুট ৬ ইঞ্চি। দূর থেকে বাগেরহাটের এই বিশালাকার মসজিদটি দেখলে মনে হয় দিগন্তবিস্তৃত স্তম্ভসারি 'forest of columns' যা যে-কোনো দর্শককে শুধু স্তম্ভিতই করে না, বরং অপরূপ অনুভূতির সৃষ্টি করে। একনজরে দেখলে মনে হবে কোনো রাজপ্রাসাদের দরবারকক্ষ। স্তম্ভগুলো পীঠের বা base-এর উপর স্থাপিত এবং শীর্ষদেশ বা Capital পর্যন্ত কয়েকটি অংশে বিভক্ত।

তথাকথিত ষাইট গম্বুজ মসজিদটিতে কোনো শিলালিপি না থাকলেও এটি যে খান জাহানের অমর কীর্তি একথা নিশ্চিত করে বলা যায়। কথিত আছে যে, ৩৬০টি মসজিদ এবং অন্যান্য ইমারত দিয়ে সুসজ্জিত ছিল, যার অধিকাংশ কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এ সমস্ত মসজিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং আকর্ষণীয় মসজিদ ছিল এটি। ড্রামবিহীন গম্বুজগুলোতে কোনো চূড়া বর্তমানে দেখা যাবে না তবে ধারণা করা যায় যে এগুলোর শীর্ষে এক সময় কলসচূড়া শোভা পেত। কিবলাপ্রাচীরে ১০টি অর্ধগোলাকৃতি অবতল মিহরাব রয়েছে।

কিবলাপ্রাচীরে একটি দরজা দেখা যাবে, যার ফলে মোট ১১টির স্থলে ১০টি মিহরাব রয়েছে। অনুরূপ কিবলার দিকে দরজা হযরত পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদে পাওয়া গেছে। মিহরাবগুলো আয়তকার ফ্রেমে আবদ্ধ এবং কোনো এক সময় পোড়ামাটির নকশা দ্বারা শোভিত ছিল। আ. ক. ম. আবদুল জলীল বড় আযম খান ও ছোট আযম খান নামে দুজন স্থপতির নাম উল্লেখ করেন। কোন তথ্যের ভিত্তিতে তিনি একথা উল্লেখ করেছেন তা জানা না গেলেও একথা বলা যায় যে, খান জাহান ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের 'দিওয়ান-ই-ইমারত' নামীয় স্থাপত্যের দফতর স্থাপন করেন এবং এখানে প্রধান নক্শাবিদ, স্থপতি, কারুশিল্পী ও ওস্তাগার নিয়োগ করা হত।

খান জাহান স্বয়ং নির্মাণকার্য তাদরক করতেন। খাঁর দুয়ারে হর্ম রাজির মালমশলা প্রস্তুত ও সুরকি ভাঙার কারখানা ছিল। এই কারখানায় সুরকি ভাঙার জন্য ৬০টি বা ১০০টি ঢেঁকি একসঙ্গে কাজ করত।

১৫। খান জাহানের সমাধি, হিঃ ৮৬৩/ইঃ ১৪৫৯ (১৫)

বাংলার দক্ষিণাঞ্চলকে জঙ্গল ও হিংস্র বন্য পশু থেকে উদ্ধার করে যিনি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এবং ইসলাম প্রচার করে ধর্মান্তরিত করে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে রূপান্তরিত করেন তিনি হচ্ছেন শিলালিপি অনুযায়ী উলুখ খান জাহান। তিনি 'একগম্বুজবিশিষ্ট' একটি সমাধিতে শায়িত। আ. ক. ম. যাকারিয়া বলেন, "বাগেরহাটের সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর দিঘি, বা খাঞ্জালী দিঘির উত্তর তীরে একটি প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে এ 'সমাধিসৌধ অবস্থিত। এখানেই খান-ই-জাহান চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। খান জাহান জীবিতকালেই খুব সম্ভব এ মাজার নির্মাণ করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তিনি এখানে বেশ

কিছুকাল ধরে বসবাস করেছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে এবং তা বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা বলেই মনে হয়। মাজারের চারদিকে যে অনুচ্চ বেষ্টন প্রাচীর আছে, তার বাইরে আরও একটি বেষ্টনী প্রাচীর ছিল এবং পূর্ব দিকের প্রাচীরে ছিল নগর থেকে মাজারে প্রবেশ করার তোরণ দ্বার। এখন সে প্রাচীর নেই তবে তোরণের কিছু কিছু এবং ধ্বংসাবশেষ এখনও টিকে আছে। বর্তমানে যে অভ্যন্তরীণ বেষ্টক প্রাচীর আছে তার চারকোণে দেয়াল সমান উঁচু ৪টি স্তম্ভ আছে। দক্ষিণ দেয়ালের মাঝামাঝি অংশে এবং দিঘির পাকাঘাটের কিছু উত্তরে মাজারে প্রবেশ করার তোরণ। প্রাচীর ঘেরা স্থানের প্রায় মাঝামাঝি অংশে মাজার ইমারতটি অবস্থিত।"

১৮৬৬-৬৮ খ্রিস্টাব্দে বাগেরহাটের ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট আর সি স্ট্রার্নডেল যে পাণ্ডুলিপিতে মাজারের বিষদ বিবরণ দিয়েছেন তা বর্তমানে লন্ডনে সংরক্ষিত রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন তিনি মাজার দেখেন তখন ইমারতটি খুবই আকর্ষণীয় ও অক্ষত ছিল। ভ্যান লুহাইযেন বহিঃপ্রাচীর প্রসঙ্গে বলেন যে মসজিদ ও মাজার দুটি একটি বেষ্টনি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল এবং মাজারটি অপর একটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রাচীরটি অনুচ্চ এবং চারকোনায় চারটি অনুচ্চ গোলাকার বুরুজ দিয়ে সুগঠিত। বুরুজের চূড়া গোলাকৃতি। এ বুরুজের সাথে মূল মাজারের বুরুজের সাদৃশ্য রয়েছে। অভ্যন্তরীণ বেষ্টনিপ্রাচীরে জমির নকশা (balustrade) দেখা যাবে। স্ট্রার্নডেল জালিগুলোকে 'ছিদ্র' বা loophole বলে অভিহিত করেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ যে সমস্ত জালি ভেঙে গেছে সেগুলো পুনঃনির্মাণ করেছে।

আ. ক. ম. যাকারিয়া খান জাহানের সমাধির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর ভাষায়, "বর্গাকারে নির্মিত এ সমাধিসৌধের প্রত্যেক বাহু ৪৬ ফুট লম্বা। চারকোণে ৪টি গোলাকার মিনার বা টারেট আছে। টারেটগুলি বলয়াকারের স্ফীত রেখা দ্বারা অলঙ্কৃত। টারেটগুলির উপরেরও অংশ ছাদ থেকে বেশি উঁচু নয়। এগুলির শীর্ষদেশ ক্ষুদ্রাকৃতির গম্বুজ দ্বারা সুশোভিত। ইমারতের দেয়ালগুলি মাটি থেকে উপরে ৩ ফুট পর্যন্ত প্রস্তর নির্মিত। ২′ × ১′ × ৯′ আয়তনের পাথরগুলি প্রায় সমআয়তনের। পাথরের গাঁথুনি এখন পর্যন্ত প্রায় অটুটু অবস্থায় আছে। এর পরে আছে ইটের গাঁথুনি, দক্ষিণ. পূর্ব ও পশ্চিম প্রাচীরে আছে একটি করে প্রবেশপথ। উভয় দেয়ালে কোনো প্রবেশপথ নেই। পত্রাকৃতির খিলানযুক্ত দরজাগুলি ৬′ - ১০′ উঁচু। দেওয়ালগুলি ৮′ - ৩″ প্রশস্ত। বাইরের দিকে চতুষ্কোণাকৃতির হলেও অভ্যন্তরভাগে এই ইমারতটি দেখতে প্রায় স্পষ্ট কোনোকৃতির। প্রাচীরগুলি প্রায় ২৪ ফুট উপরে উঠার পর সেখান থেকে ইমারতের গোলাকার গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। গম্বুজের উপরিভাগে নানারকম কারুকার্য ছিল বলে জানা যায়। এখন কোনো কারুকার্য নেই। তবে গম্বুজের উপরের জমাট এত শক্ত ও সুন্দর যে, এখন পর্যন্ত তেমন কোনো মেরামতো ছাড়াই গম্বুজটি অত্যন্ত সুন্দর রূপ নিয়ে ৫০০ বছরের বেশি সময় ধরে টিকে আছে। মাটি থেকে চূড়া পর্যন্ত ইমারতের উচ্চতা ৪৭ ফুট।'

খান জাহানের সমাধিটিতে বাগেরহাটের অন্যান্য ইমারতের মতো দুইস্তরে সমান্তরাল বক্রাকার কার্নিশ দ্বারা শোভিত। চার কোনোয় যে গোলাকার বুরুজ রয়েছে, তাও অন্যান্য ইমারতের মতো সমান্তরাল বেড়ী বা মৌল্ডিং দ্বারা বিভক্ত। বুরুজগুলোর শীর্ষদেশ অনুচ্চ এবং নিরেট গোলকার কিউপোলা দ্বারা আবৃতো। পূর্ব দিকের প্রাচীর ফটক দিয়ে মাজারের প্রবেশ করতে হয়। এই ফটক প্রসঙ্গে নাযিম উদ্দীন আহমদ বলেন, "এ দুটি (পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের) ফটকের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চৌ-চালা ছাপ যুক্ত ভল্ট, আয়তাকার বিশিষ্ট এই ফটক দু'টির প্রসারিত দিকে খিলান রয়েছে এবং অভ্যন্তরে ষাইট গম্বুজের নেভের চৌ-চালা ছাদের মতো এ দুটির ছাদ নির্মিত।"

মাজারে প্রবেশের জন্য পূর্ব এবং উত্তর দিকে খিলানপথ রয়েছে। মাজারের অভ্যান্তরের কেন্দ্রস্থলে ১৪ × ৮ ফুট আয়তনের একটি বেদি রয়েছে। বেদিটি ইটের তৈরি মিনাকরা টালি (glazed tile) দ্বারা সুশোভিত ছিল। বর্তমানে সেগুলো নেই। স্ট্রার্নডেল শাবাধারটির (cenotaph) বর্ণনা দেন। শবাধারটি কালো (কষ্টি) পাথরের এবং একই উপকরণের সাহায্যে তিন স্তরে নির্মিত, যা ফার্সি ও আরবি হরফে কুরআনেব বাণী দ্বারা শোভিত। উপরিভাগ সোনালি রং দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। গৌড় এবং রাজমহল থেকে সম্ভবত পাথরসমূহ আনা হয়, মাজারটির তিনটি বেদি নিচ থেকে উপরে ক্রমশ পিরামিড আকারে ছোট হয়ে গেছে। প্রতি স্তরে ৪ খণ্ড পাথর দিয়ে তৈরি সর্বোচ্চ স্তরটি ৬ ফুট দীর্ঘ এক খণ্ড অর্ধগোলাকৃতির কাল পাথরে আবৃতো। শীর্ষ দেশের এ পাথর ও নিচের দুই তাকের পাথরের উপর আরবি ফার্সি ভাষায় অতি সুন্দরভাবে বিভিন্ন লিপি উৎকীর্ণ আছ। লিপিগুলোতে আছে বিভিন্ন ধরনের কলেমা। আল্লাহর ৯৯টি নাম, চার খলিফার নাম, কোরানশরিফের আয়াত, ফার্সি কবিতা, খান-ই-জাহানের মৃত্যো ও দাফনের তারিখ ইত্যাদি রয়েছে।

যে শিলালিপিটিতে খান জাহানের মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ আছে তার বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ :

"[আল্লাহর] দুর্বল ভৃত্য বিশ্বপ্রভুর কৃপাভিখারি নবীদের নেতার (হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার) বংশধরদের প্রেমিক, সত্যনিষ্ঠ, আলেমদের প্রতি একনিষ্ঠ, কাফের ও অবিশ্বাসীদের ঘৃণাকারী, ইসলাম ও মুসলমানদের সহায়ক উলুঘ (মহান) খান-ই-জাহান তাঁর উপর আল্লাহর কৃপা ও ক্ষমা বর্ষিত হোক। এ পৃথিবীর বাসস্থান ছেড়ে চিরদিনের বাসস্থানে চলে গেছেন জিলহজ্জ মাসের ২৬ তারিখ বুধবারে এবং ঐ মাসের ২৭ তারিখ বৃহস্পতিবার তাঁকে সমাহিত করা হয় ৮৬৩ হিঃ সন/২৬শে অক্টোবর ১৪৫৯ খ্রিঃ।"

দ্বিতীয় শিলালিপির অনুবাদ হচ্ছে নিম্নরূপ :

"খান-উল-আযম (মহান খান) খান-ই-জাহানের এই পবিত্র সমাধি বেহেশতর উদ্যানের অংশবিশেষ [আল্লাহর] রহমতো ও করুণাময় দৃষ্টি তাঁর উপর পতিত হয়। ৮৬৩ হিঃ সনের ২৬শে জিলহজ্জ [তারিখ] এটি লিপিবদ্ধ হয়েছে (২৫শে অক্টোবর ১৪৫৯ খ্রিঃ)।"

অলঙ্করণের দিক থেকে খান জাহানের মাজারটি অতুলনীয়। ঢাকার বিবি পরির মাজার ব্যতীত বাংলাদেশের অপর কোনো ইমারতে এরূপ ব্যাপকভাবে উজ্জ্বল বর্ণের বিভিন্ন নকশাসম্বলিত মিনাকরা টালি (glazed tile) দেখা যায় না। গৌরচন্দ্র বসাক (১৮৬৭) বলেন, শবাধারের স্তরগুলো নানাবর্ণে রঞ্জিত এবং উচ্চমাজার মিনাকরা টালি দ্বারা আবৃতো। এগুলো এতই সুন্দর ও টেকসই যে চারশত বছর ধরে এগুলো অক্ষত অবস্থায় আছে। কোনো কোনো টালি চতুষ্কোণাকার (আবার) কোনো কোনোটি ছয়বাহু-বিশিষ্ট, বিভিন্ন লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশাসমৃদ্ধ। খান জাহানের সমাধিতে ব্যবহৃত মিনাকরা টালি অন্য কোথাও থেকে আমদানিকৃত নয়, বাগেরহাটে প্রস্তুত। অবশ্য মিনাকরা টালির ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। গৌড়ের লোটন মসজিদ, অধুনালুপ্ত হোসেন শাহের সমাধিতে মিনাকরা টালির ব্যবহার ছিল। অবশ্য মিনাকরার টেকনিক পারস্য থেকে বা মতোন্তরে তুরস্ক থেকে এদেশে আসে, যা সিন্ধুর থাট্টায় দেখা যাবে।

১৬। জিন্দাপীরের মাজার (১৬)

খান জাহানের মসজিদ-এ মাজার কমপ্লেক্সের মতো জিন্দাপীরের মসজিদ ও মাজার কমপেক্সটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। খান জাহানের সমাধির উত্তর-পূর্বে প্রায় ৫০০ গজ দূরে অবস্থিত এই কমপ্লেক্সটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, যদিও দুটি ইমারতেই খান জাহানের সমাধি। কে এই জিন্দাপীর তা সঠিকভাবে বলা যায় না। ও'মালি বলেন যে, আহমদ আলী নামে একজন কামেল সুফীসাধক জিন্দাপীর নামে আখ্যায়িত হন। তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। বর্তমাজার মাজারটির দেওয়াল ও গম্বুজ বহুপূর্বেই ভেঙে গেছে। উত্তর-দক্ষিণ বরাবর মাজারটি মধ্যভাগে অবস্থিত। এক গম্বুজ-বিশিষ্ট চতুকোণাকার জিন্দাপীরের সমাধিটির সঙ্গে খান জাহানের সমাধির সাদৃশ্য রয়েছে। তবে কিছু বৈসাদৃশ্যও দেখা যায়। যেমন বহিঃপ্রাচীরে কৌণিক বুরুজগুলো আটকোনাকার এবং নিম্নভাগে মৌল্ডিং বা বেড়ি দ্বারা সমৃদ্ধ (balustrade)। পূর্বদিকে একটি প্রবেশপথ রয়েছে। বর্গাকৃতি মাজারের প্রতিবাহু ২০ ফুট দীর্ঘ। দেয়ালগুলি ৫ ফুট প্রশস্ত। পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণদিকে তিনটি করে যে খিলান রয়েছে তা পূর্বে জালি দ্বারা আবৃতো ছিল। গম্বুজের আকৃতি খুবই বড় এবং এর অংশবিশেষ এখনও দৃষ্টিগোচর হয়।

১৭। আলী মোহাম্মদ তাহের বা পীরালীর সমাধি

খান জাহানের সমাধির পশ্চিমে খান জাহানের নিত্যসহচর আলী মোহাম্মদ তাহেরের সমাধি অবস্থিত। তিনি জাতিতে হিন্দু ছিলেন এবং ধর্মান্তরিত হয়ে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম ও ইসলামপ্রচারক হিসাবে আত্মনিয়োগ করেন। আ. ফ. ম. আব্দুল জলীলের ভাষায় "হযরত খান জাহানের রওজা মোবারকের পশ্চিম পার্শ্বে তদীয় বন্ধু ও সহকারী শাসনকর্তা পীর আলী মোহাম্মদ তাহেরের সমাধি।" 'যশোহরের ইতিবৃত্ত' প্রণেতা জেমস ওয়েস্টল্যান্ড তাঁকে খান জাহানের দিওয়ান বা মন্ত্রী বলে উল্লেখ করেছেন। গৌরদাস বসাক বলেছেন, "পীর আলী মোহাম্মদ তাহের গোঁড়া মুসলমান

ছিলেন। তিনি অতীব নিষ্ঠার সহিত ইসলাম ধর্মের বিধানসমূহ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। সুশাসন ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ...খান জাহানের অতি আপন জন ছিলেন তিনি। পাশাপাশি উভয়ের এইরূপ সমাধি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচয় বহন করে।" পীর আলীর সমাধিগাত্র অর্ধগোলাকৃতি প্রস্তর দ্বারা আবৃতো। প্রস্তরের উপর লিখিত আছে "এ স্থান বেহেস্তের বাগিচার অংশ বিশেষ এবং ইহা জনৈক বন্ধুর সমাধি নাম মোহাম্মদ তাহের", তারিখ ৮৬৩ জিলহজ্জ।

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে খান জাহানের সমাধির মতো আলী তাহেরের কোনো সমাধি নির্মিত হয়নি। 'পীর আলী' নামে খ্যাত আলী মোহাম্মদ তাহেরের তিন স্তর-বিশিষ্ট এবং অপূর্ব নকশাকৃত শবাধার রয়েছে।

১৮। চিল্লাখানা মাজার

ইউ. এন. ডি. পি. পরিচালিত সার্ভের নেতৃত্বদানকারী প্রত্নতাত্ত্বিক জন স্যানডি বলেন, "চিল্লাখানা মাজার নামে যে স্থান রয়েছে তা মূলত একটি সমাধির ধ্বংসাবশেষ।"

১৯। খান জাহানের বসতবাড়ি এলাকা

বসতবাড়ি প্রসঙ্গে মোহাম্মদ যাকারিয়ার কথার সমর্থন পাওয়া যায় পূর্বে প্রকাশিত আবদুল জলীলের 'সুন্দরবনের ইতিহাসে'। তিনি বলেন, "ষাট গম্বুজ হইতে একটি খাঞ্জালী রাস্তা উত্তরমুখী হইয়া ভৈরব পর্যন্ত এবং অন্য রাস্তা পূর্ব দিকে বর্তমান বাগেরহাট শহর পর্যন্ত গিয়াছিল। তৃতীয় রাস্তা, দ্বিতীয় রাস্তা হইতে উত্তরমুখী হইয়া নদী তীর দিয়া প্রথম রাস্তার সহিত মিশিয়াছিল। এই শেয়োক রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে ভৈরবতীরে খান জাহানের গড়বেষ্টিত বাড়ি ছিল। গড়ের চিহ্ন বর্তমানে নাই বলিলেই চলে। এইখানে স্তূপের আশেপাশে কয়েকটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তম্ভ এখনও পড়িয়া আছে। এখানে সোনা মসজিদ নামে একটি মসজিদ ছিল।"

ইউ. এন. ডি. পি.-র সার্ভে রিপোর্টে খানজাহানের বসতবাড়ির খননের উল্লেখ করা হয়। যে ঢিবিটি বসতবাড়ি বলে চিহ্নিত হয়েছে তার পরিমাপ ৪৫.৭২ মিটার × ৩৬.৫৮ মিটার। সাধারণভাবে জনশ্রুতিতে এটি 'সোনা বিবির বাড়ি' নামে পরিচিত। এই ঢিবিটি পার্শ্ববর্তী নিম্নস্থান অপেক্ষা ১.৮৩ মিটার উঁচু।

বর্তমানে বাগেরহাট এবং খান জাহানের শহর নির্মাণের পরে হোসেনশাহী আমলে খলিফাতাবাদ নামীয় জনপদ খুবই বিস্তৃর্ণ এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠে। বিস্ময়ের কথা এই যে খান জাহানের সময়ে এই বিশাল নগরীর কি নাম ছিল তা জানা যায় না। আ. ক. ম. যাকারিয়া খান জাহানের শহরকে খলিফাতাবাদ বলেছেন তা সঠিকভাবে ধরে নেওয়া যায় না কারণ হোসেন শাহ নসরত শাহ এবং তৃতীয় মাহমুদ শাহ বর্তমাজার বাগেরহাট থেকে খলিফাতাবাদ নামে মুদ্রা ছাপান। যাহোক, খান জাহানের শহর সুলতানী আমলের কীর্তিতে সমুজ্জ্বল। আ. ক. ম. যাকারিয়ার ভাষায়, "প্রাচীন কীর্তিগুলো দেখে অতি সহজেই বোঝা যায় যে পূর্ব পশ্চিমে প্রায় ৫ মাইল ও উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৪ মাইল, এই

মোট প্রায় ২০ বর্গমাইল স্থান জুড়ে একটি বিরাট জনপদ গড়ে উঠেছিল খান-ই-জাহানের আমলে। প্রাচীন কীর্তিগুলির মধ্যে মসজিদ ও জলাশয়ের সংখ্যা খুব বেশি। আবাসবাটীর সংখ্যা নগণ্য বললেও চলে।"

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে সাইফুদ্দীন নামে একজন অতিউৎসাহী সমাজসেবী ও পুরাতত্ত্ববিদ স্বীয় উদ্যোগে এ স্থান অসংলগ্নভাবে খননকাজ পরিচালনা করেন। খননের ফলে তিনি খান জাহানের আমলের তৈজসপত্র, মিনাকরা টালি, পাথর, কাপ-পিরিচ, পাথরের বাটি প্রভৃতি উদ্ধার করেন। ভৈরব নদীর পাড়ে পূর্ব দিক থেকে খান জাহানের হাভেলিতে প্রবেশ করতে হয়। আবদুল জলীল বসতবাড়ির বিস্তারিত বিবরণ দেন : "খান জাহানের প্রাচীর বেষ্টিত বাড়ির দেওয়াল এগার হাত উঁচু ও সাত হাত প্রশস্ত ছিল। ইহা এক প্রকার দুর্ভেদ্য ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই প্রাচীরের বেষ্টন সর্বাপেক্ষা অধিক। কারণ এইখানেই খান জাহানের নিজস্ব বাড়ি এবং অস্ত্রাগার ছিল।"

২০। কোতওয়ালী চৌতারা

খান জাহানের হাভেলির ১৮৩ মিটার উত্তর-পশ্চিমে পুলিশের হেড কোয়াটার ছিল, যা কোতওয়ালী চৌতারা নামে পরিচিত ছিল। নগরীর শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এটি স্থাপিত হয়।

২১। জাহাজঘাটা বা নদীবন্দর

খান জাহান একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক ছিলেন। তাঁর রাজধানীকে অন্যান্য শহরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য শুধুমাত্র সড়কই নির্মাণ করেননি, জাহাজঘাট বা নদী-বন্দর স্থাপন করেন। ভৈরব নদীর উত্তর সীমানায় প্রায় ১০৩ মিটার দূরবর্তী স্থানে খান জাহান যে নদীবন্দর নির্মাণ করেন কয়েকটি স্তম্ভ ব্যতীত এর আর কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। নৌবাণিজ্য এবং যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে জাহাজঘাটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মোহাম্মদ যাকারিয়ার ভাষায়, "খান-ই-জাহানের আবাসবাড়ি থেকে প্রায় ২৫০ গজ উত্তরে ভৈরব নদীর প্রাচীন খাতের পশ্চিম তীরে ষাট গম্বুজ মোগরা রাস্তার পাশে পাথর বা জাহাজঘাটা নামে একটি স্থান আছে। এখানি নাকি বিভিন্ন স্থান থেকে পাথর এনে জড়ো করা হত। এখানে একটি প্রস্তরখণ্ডের আনুমানিক ৪$\frac{১}{২}$ ফুট মাত্র মাটির উপরে আছে। এই উপরের অংশের আটভুজা একটি মহিষমর্দিনী মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। নাজিমউদ্দীন আহমদ বলেন যে, এই সময়কালে (নবম অথবা দশম শতাব্দী) মুসলিম আমলের বহু ইমারতে প্রাক-মুসলিম যুগের স্থাপত্য সামগ্রী ব্যবহৃত হয়েছে, যা গৌড় ও হযরত পাণ্ডুয়ার ইমারতসমূহে দেখা যাবে।"

২২। অস্ত্রাগার/মানমন্দির

খান জাহানের বসতবাড়ি এলাকায় যে অস্ত্রাগার ছিল তা ধ্বংসস্তূপ দেখে বোঝা যায়, যদিও কোনো অস্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। এছাড়া মিঠাপুকুর এলাকায় একটি মান মন্দিরের ধ্বংশাবশেষ পাওয়া গেছে।

২৩। মুসাফিরখানা

খান জাহান তীর্থযাত্রী ও পরিদর্শকদের সুবিধার্থে বর্তমাজার বাগেরহাটে কয়েকটি সরাইখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি মুসাফিরখানা নামেও পরিচিত ছিল। এ সমস্ত

বিশ্রামাগারে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হত। ধারণা করা হয় যে, বর্তমান নূরুল আমীন হাইস্কুলের উত্তরে যে ধ্বংসস্তূপ আছে তা-ই সম্ভবত মুসাফির খানা ছিল এক সময়ে।

২৪। দিঘি

বর্তমাজার বাগেরহাটে মসজিদ এবং দিঘির সংখ্যা সর্বাধিক এবং নিঃসন্দেহে এগুলো খান জাহানের স্থাপত্যকলার প্রতি অনুরাগই প্রকাশ করে না বরঞ্চ জনমঙ্গলকর কাজের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ। আবদুল জলীল বলেন যে, তিনি ৩৬০টি দিঘি খনন করেন। তবে এতদসংখ্যক দিঘি খনন অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। ৩৬০টি দিঘি খননের তাৎপর্য এই যে ৩৬০ জন মুরিদের প্রত্যেকে এক একটি দিঘি খনন করেন পানির কষ্ট দূর করার জন্য। উল্লেখ্য যে, খননের ফলে যে মাটি বের হয়ে আসত তা দিয়ে ইট প্রস্তুত করা হত এবং তা পুড়িয়া ইমারত নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হত। বিশেষভাবে ঘোড়াদিঘি এবং খান জাহান দিঘি দু'টি সর্ববৃহৎ, যা এখনও বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

খান জাহানের খাঞ্জালি বা ঠাকুরদিঘি সম্বন্ধে মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেন, "খান-ই-জাহানের মাজারের দক্ষিণে অবস্থিত বেষ্টক প্রাচীরের প্রায় লাগ দক্ষিণে এই বিরাট জলাশয় অবস্থিত। অনুমানিক ২০০ বিঘা ভূমি জুড়ে এই বিরাট জলাশয়ের অবস্থান। অতি প্রশস্ত পাড়গুলি পাহাড়ের মতো উঁচু। প্রত্যেক পাড়ের মাঝখানে একটি করে পাকা ঘাট ছিল। সংস্কারের অভাবে ঘাটগুলি সব নষ্ট হয়ে গেছে। একমাত্র মাজারের সামনের ঘাটটি সংস্কারের ফলে এখনও ভাল অবস্থায় টিকে আছে। এ ঘাট প্রায় ৬০ ফুট প্রশস্ত এবং এতে ৩৮টি সিঁড়ি আছে। কিঞ্চিৎ উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ জলাশয়ের আয়তন প্রায় ২০০০ × ১৮০০ ফুট। যাকারিয়ার মতে, এ দিঘিটি ১৪৫০ খ্রীস্টাব্দে খনন করা হয়েছিল। জনশ্রুতি অনুযায়ী খননকালে মাটির নিচে থেকে একটি বুদ্ধমূর্তি উদ্ধার করা হয় বিধায় এটির নাম ঠাকুরদিঘি। ঠাকুরদিঘিতে একসময় অনেক কুমির ছিল। বিশেষ করে বিশালাকার যে দুটি কুমির ছিল তার নাম ধলাপাহাড় এবং কালাপাহাড়।"

ঠাকুরদিঘি ছাড়া অপর যে বিশালাকার দিঘি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা ঘোড়া দিঘি নামে পরিচিত। তথাকথিত ষাইট গম্বুজ মসজিদের লাগ পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি রাস্তা রয়েছে যার সন্নিকটে একটি জলাশয় খনন করা হয়। ঘোড়াদিঘি নামে এ জলাশয়টি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা, যা থেকে ধারণা করা হয় যে এটি মুসলিম আমলে খনন করা হয়। হিন্দু আমলে খননকৃত দিঘিগুলো উত্তর-দক্ষিণে লম্বা হয়ে থাকে। এর আয়তন ২০০০ × ১২০০ ফুট।

২৫। সড়কসমূহ

যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য খান জাহান বহু প্রশস্ত সড়ক নির্মাণ করেন। কথিত আছে যে, খান জাহান যখন যশোহর হয়ে খুলনার বাগেরহাট অঞ্চলে প্রবেশ করেন তখন বনজঙ্গল পরিষ্কার করে রাস্তা বানাতে বানাতে অগ্রসর হন। নাসিমউদ্দীন আহমদ বলেন, খুব প্রশস্ত ও মজবুত করে নির্মিত সড়কসমূহ খুলনা, যশোহর, চট্টগ্রাম এবং সুদূর

বাকেরগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃতো ছিল। খান জাহান কর্তৃক নির্মিত ইমারতগুলো এ সমস্ত রাস্তার পাশে স্থাপিত হয়। প্রাচীন ও বর্তমানে পরিত্যক্ত ভৈরব নদীর পাড়ে যে সড়ক রয়েছে তা ২.৫ মিটার প্রশস্ত ছিল। কথিত আছে যে, খান জাহান বাগেরহাট থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সুদীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ করেন।

আবদুল জলীল খান জাহান কর্তৃক অসংখ্য সড়ক নির্মাণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তাঁর ভাষায়, "জলাশয় খনন ও হর্ম্যরাজি নির্মাণের ন্যায় খান জাহান রাজপথ নির্মাণে যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন তাহা ইতিহাসে বিরল। তিনি জানিতেন যে সুন্দর রাজপথ ব্যতীত যাতায়াতের সুবিধা ও নগরের শোভা বর্ধিত হইতে পারে না। তজ্জন্য তিনি শহর ও শহরতলীর সর্বত্র পাকা রাস্তা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রথমে পার্শ্ববর্তী জমি হইতে আধুনিক ধরনের মাটি ফেলিয়া কাঁচা রাস্তা প্রস্তুত করা হইত। ঐ মাটি বসিয়া গেলে পরে ইটের উপর খোয়া ফেলিয়া রাস্তা করা হইত না। রাস্তা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য তিনি শুধু ইটাকে সাজাইয়া রাস্তা নির্মাণ করিতেন। ষাট গম্বুজের আট মাইল উত্তর-পূর্বে নদীতীরের রাস্তা ৫০০ বৎসর টিকিয়া আছে। বারবাজার হইতে আঁকিয়া বাঁকিয়া বাগেরহাট পর্যন্ত খান জাহানের দীর্ঘতম রাস্তা। এত দীর্ঘ ও প্রশস্ত রাস্তা সে যুগে আর ছিল না।"

বাগেরহাটের বাইরে

বাগেরহাট অথবা পূর্বের খলিফাতাবাদের বৃহত্তর এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মসজিদ স্থাপত্যকীর্তির ঐতিহ্যবাহী অসংখ্য ইমারত। অসমাপ্ত প্রত্নকীর্তি দেখা যাবে মসজিদকুড়, আমাদী, লাবশা, ঈশ্বরীপুর, পরবাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে।

২৬। মসজিদখুড়, মসজিদ, খ্রিঃ পঞ্চদশ শতাব্দী (১৭)

কপোতাক্ষ নদের তীরবর্তী চান্দখালী থেকে প্রায় ৬ মাইল দক্ষিণে একটি জনপদ রয়েছে। এ স্থানটি মসজিদখুড় নামে পরিচিত। খান জাহানের শাসনামলে এ অঞ্চল জনাকীর্ণ ও সমৃদ্ধ ছিল কিন্তু বর্তমানে এটি পরিত্যক্ত এবং জঙ্গলাকীর্ণ। বহুদিন পূর্বে স্থানীয় লোকজন এস্থানে জঙ্গলাবৃত ও ভগ্নপ্রাপ্ত একটি মসজিদ মাটি থেকে খুঁড়ে বের করে। এর ফলে স্থানটির নাম হয় মসজিদখুড় এবং এ থেকেই ইমারতটির নাম হয় মসজিদখুড়। বর্তমানে প্রত্নবিভাগ এই খানজাহানী আমলের এই অসাধারণ মসজিদটি সংরক্ষণ ও সংস্কার করেছে।

জেমস ওয়েস্টল্যান্ড তার যশোর জেলার রিপোর্টে মসজিদখুড় মসজিদ সম্বন্ধে বিষদ বিবরণ দেন। তাঁর ভাষায়, "একনজরে এ ইমারতটি দেখলে ধারণা হবে যে যারা ষাইট গম্বুজ তৈরি করেছে এটি তাদের কীর্তি। নির্মাণকৌশল একই রকমের, শুধুমাত্র পার্থক্য এই যে লম্বালম্বি এগার সারি এবং পাশাপাশি সাত সারি গম্বুজের স্থলে এখানে লম্বালম্বি ও পাশাপাশি তিনসারি অর্থাৎ নয় গম্বুজ রয়েছে।" যাহোক, উভয় ইমারতের দেওয়াল ৬ ফুট প্রান্তে মধ্যভাগের গম্বুজের বরাবর একটি বৃহদাকার প্রবেশপথ এবং এর দু'পাশে দু'টি ছোট দরজা রয়েছে। কিন্তু বিশালাকার ইমারতের তুলনায় প্রবেশপথগুলো খুব ছোট দেখায়। ষাইট গম্বুজের মতো এ মসজিদেও চারটি কৌণিক গোলাকৃতি বুরুজ

রয়েছে। এর কোনোটি দিয়ে উপরে ওঠা যায় না। দেওয়ালের অনেক স্থানে বাগেরহাটের অন্যান্য ইমারতের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকৃতি পোড়ামাটির অলঙ্করণ দেখা যাবে।

মসজিদখুড় মসজিদের সাথে বাগেরহাটের নয়গম্বুজ মসজিদের সাদৃশ্য রয়েছে। এ মসজিদে কোনো শিলালিপি না থাকলেও এটি যে খান জাহানের রীতিতে নির্মিত তা নির্মাণ-কৌশল দেখে প্রতীয়মান হয়। আ. ক. ম. যাকারিয়া এ মসজিদের বিবরণ দেন : "সুন্দরবন অঞ্চলের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি এই মসজিদ। বর্গাকারে নির্মিত এই ইমারতের প্রত্যেক বাহু বাইরের থেকে ৫৪ ফুট ও ভিতরের দিকে ৪০ ফুট লম্বা। দেওয়ালগুলো ইটের তৈরি এবং প্রায় ৭ ফুট চওড়া। মসজিদের দক্ষিণ, দক্ষিণ পূর্ব ও উত্তর দিকে আছে ৩টি করে প্রবেশপথ। প্রত্যেক দেয়ালের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ পাশের দুটি থেকে বড়। প্রবেশপথগুলি পত্রাকারের খিলানের সাহায্যে নির্মিত। বিরাট আকারের মসজিদের তুলনায় প্রবেশপথগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। ভিতরের পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি অলঙ্কৃত মিহরাব।"

বাগেরহাটের অন্যান্য ইমারতের মতো মসজিদখুড় মসজিদটি চারকোনায় চারটি বুরুজ দ্বারা সুগঠিত। বুরুজগুলো ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে। উপরের কোনো অংশ দেখা যাবে না। গোলাকৃতি বুরুজগুলো স্ফীতরেখা বা উদ্ধৃত ব্যান্ড দ্বারা অধিকৃত। মসজিদে বক্রাকার কার্নিশ এবং কৌণিক খিলানপথ দেখা যাবে। খিলানপথগুলোর উপরে ব্যন্ড রয়েছে। মসজিদের বাইরের দেয়ালে, বিশেষ করে উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্বদিকে পোড়া মাটির নকশা দেখা যাবে। খিলান ও কার্নিশের উপরও অনুরূপভাবে অলঙ্কৃত। এগুলোর মধ্যে পদ্মফুল, মালা, বিলম্বিত রজ্জু ও ঘণ্টা (hanging chain and bell motif) বিশেষভাবে আকর্ষণীয়।

মসজিদে প্রবেশের জন্য পূর্বদিকে তিনটি খিলানপথ ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। অভ্যন্তরে দুই সারিতে প্রতিটিতে দু'টি করে মোট ৪টি প্রস্তর স্তম্ভ রয়েছে। স্তম্ভগুলো থেকে সমান্তরালভাবে ৩টি খিলান নির্মিত হয়েছে এবং মসজিদটি নয়টি গম্বুজ দ্বারা আবৃতো।

২৭। আমাদী, বুড়া খান এবং ফতেহ খানের সমাধি, সপ্তদশ শতাব্দী

খান জাহানের শিষ্য ছিলেন বুড়া খান ও তাঁর পুত্র ফতেহ খান। বুড়া খান খান জাহানের সাথে যশোহর অঞ্চলে আসেন। কিংবদন্তি অনুযায়ী খান জাহান বারবাজার থেকে একদল মুরিদ নিয়ে বাগেরহাটের দিকে যান এবং তাঁর বিশ্বস্ত সহচর বুড়া খানের নেতৃত্বে আর এক দলকে মসজিদখুড় ও বেদকাশী প্রভৃতি অঞ্চলে প্রেরণ করেন। খান জাহানের নির্দেশে বুড়া খান এবং তাঁর ছেলে ফতেহ খান স্থানে স্থানে জলাশয় খনন এবং রাস্তা ও মসজিদ নির্মাণ করেন। বুড়া খান এবং ফতেহ খান বেদকাশী ও মসজিদখুড় অঞ্চলে আগমন করেছিলেন বলে বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা আমাদী গ্রামেই আস্তানা স্থাপন করেন এবং সেখানেই তাঁদের মৃত্যু হয়। এখানে তাঁদের সমাধি ছিল। বুড়া খানের সমাধি বহু পূর্বেই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তাঁর পুত্র ফতেহ

খানের সমাধিটি এখনও ভগ্নাবস্থায় রয়েছে। সমাধিটি ১৬ ফুট ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ আয়তকার ইমারত এবং উচ্চতা ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি। এটি সম্পূর্ণ মসৃণ জোড়া ইটের তৈরি যার পরিমাপ ছিল ৮ বর্গ ইঞ্চি এবং ১$\frac{১}{৫}$ ইঞ্চি মোটা।

'যশোহর খুলনার ইতিহাস' প্রণেতা সতীশচন্দ্র মিত্র বলেন "আমাদী গ্রামে পশ্চিম দিকে নদীর কূলে বুড়া খান ও ফতেহ খাঁ উভয়ের কবর ছিল। অল্পদিন হইল বুড়া খাঁর কবর ভাঙ্গিয়া নদীতে পড়িয়া গিয়াছে। এখনও একটি গোলকচাঁপা ফুলের গাছতলায় ফতেহ খাঁর সমাধির ভগ্নাবশেষ আছে। এখনও বহু হিন্দু-মুসলমানে এই সমাধি স্থানে মানত করে এবং তাহার চিহ্নস্বরূপ ফুলের গাছটির গাত্রে ইষ্টকখণ্ডসমূহ ঝুলাইয়া রাখিয়া যায়।

"বুড়া খান যে শুধু ধর্মপ্রচারের জন্য এখানে ছিলেন তাহা নহে। তাঁহার প্রধান কাজ ছিল রাজ্য শাসন ও জমিপত্তন। তাঁহার সমাধিস্থানের অনতিদূরে তাঁহার গড় বেষ্টিত কাছারি বাড়ি ছিল। এখন গড়ের এক বাড়ির ভগ্নাংশের নানা চিহ্ন আছে। দুই দিকে নদী ও অপর দুই দিকে খোদিত খাল পরিখার কাজ করিয়াছিল।

আ. ক. ম. যাকারিয়ার মতে, বুড়া খানের বসতবাটী বলে কথিত স্থানে কলিকা দিঘি নামে একটি অতি বিরাট জলাশয় ছিল। এর আয়তন প্রায় ১০০ বিঘা। একমতে এই জলাশয় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী নামক এক রাজার এবং অন্য মতে বুড়া খাঁ, ফতেহ খাঁর কীর্তি বলে ধরা হয়। শেষোক্ত মতোটিই সঠিক বলে মনে হয়।।

বুড়া খান ও ফতেহ খানের সমাধি দুটি 'List of Ancient Monuments' এর অন্তর্ভুক্ত। ওয়েস্টল্যান্ড তাঁর যশোহর জেলার রিপোর্টে দু'ফুট উঁচু ধূসর রঙের পাথরের একটি গোলাকার খণ্ড দেখতে পান আমাদীতে। এর চারদিকের বারটি পাশ খাঁজ কাটা এবং জনশ্রুতি অনুযায়ী এটি কোনো শিবমন্দিরের অংশবিশেষ। সম্ভবত ভগ্নপ্রাপ্ত পাথরখণ্ডটি আদিতে মন্দিরের হলেও মুসলিম আমলে মুসলিম ইমারতের প্রয়োজনে এ ধরনের স্থাপত্যিক উপকরণ ব্যবহার করা হত। বুড়া খান ও ফতেহ খানের সমাধি দুটি সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয় বলে মনে হয়।

২৮। মাই চাম্পার দরগা, সপ্তদশ শতাব্দী

নদীর তীরে সাতক্ষীরা থেকে দুই মাইল দূরে মাই চম্পার দরগা নামে একটি মাজার দেখা যাবে। এখন এটি খুবই আধুনিক এক গম্বুজবিশিষ্ট ইমারত। সতীশচন্দ্র মিত্র এই ইমারতটিকে মসজিদ বললেও আসলে এটি যে একটি মাজার এক নজরেই বোঝা যায়। মাই চাম্পা কে ছিলেন তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে ধারণা করা হয় ঢাকার বিবি চাম্পার মতো কোনো মহিলা আধ্যাত্মিক দিক থেকে খুবই কামেল ছিলেন এবং স্থানীয়ভাবে জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

২৯. গোপালপুরের মসজিদ ও মেহেরপুরের মাজার

সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড ৩২৬ পৃঃ) যশোহর খুলনা অঞ্চলের বিলুপ্ত প্রায় অসংখ্য পুরাকীর্তির উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষায়

"ত্রিমোহিনীর সন্নিকটে গোপালপুরে নদীর ধারে একটি সুন্দর খাঞ্জালী মসজিদ এখনও বর্তমান রহিয়াছে। এখানে নদীর পাড়ের উপর মাটি ফেলিয়া উচ্চ করিয়া তাহার উপর মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। গোপালপুর হইতে দক্ষিণ দিকে কপোতাক্ষের কূল দিয়া অগ্রসর হইলে মেহেরপুরে পীর মেদ্দিন বা মেহেরউদ্দিনের সমাধি মন্দির দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই মসজিদটি খুব ছোট বাহিরে ১৬′ × ৩″ × ১৬′ - ৩″ চারকোণে চারটি সংলগ্ন মিনার, একটি মাত্র দরজা (৫′ × ২′ - ২″)। উহার পার্শ্বে উপরিভাগে কারুকার্য করা ইষ্টক আছে। মসজিদের সম্মুখে একটি বেদী (মেহরাব)। এটির চারপাশে প্রাচীর বেষ্টিত।"

৩০। ঈশ্বরীপুর, ধূমঘাট

সাতক্ষীরা মহকুমার শ্যামনগর থানার অধীনে এবং থানা থেকে প্রায় ৫ মাইল দক্ষিণে যমুনা ও ইছামতোীর সঙ্গমস্থল কদমতোলী। এখানে নদী দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত ঈশ্বরীপুর-ধূমঘাট অঞ্চল তার পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে নদী অনেক দূরে সরে গেছে। সতীশচন্দ্র মিত্র বলেন, "যমুনা ও ইছামতোীর মধ্যস্থলে ১৬৫ নং লট ঘুমঘাট। ইহাতে ১০/১৫ মাইল ব্যাপিয়া সর্বত্র নানাবিধ কীর্তিকলাপের চিহ্ন আছে। ইহার উত্তর প্রান্তে যশোহর নগর, দুর্গ ও যশোরেশ্বরী মন্দির এবং দক্ষিণ প্রান্তে ধূমঘাট দুর্গ ছিল। মধ্যবর্তী সমস্ত ভূভাগে এক বিপুল নগরীর ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই রাজধানীর উপনগর পূর্ব দিকে বর্তমান তেরকাঠির জঙ্গল পর্যন্ত বিস্তৃতো ছিল।"

ঈশ্বরীপুরের ইতিহাস প্রসঙ্গের আ. ক. ম. যাকারিয়া বিস্তারিত বিবরণ দেন "বাঙলার শেষ স্বাধীন পাঠান সুলতান দাউদ কররাণীর একজন পদস্থ কর্মবীর ছিলেন শ্রীহরি নামক একজন কায়স্থ। দাউদ যখন মোঘল আক্রমণে বিপর্যস্ত সে সময় (১৫৭৫ খ্রীঃ) শ্রীহরি ও তাঁর ভ্রাতা বসন্তরায় তাদের নিজস্ব ও সুলতানের ধনরত্নসহ পালিয়ে এসে সুন্দরবনের এই দুর্গম ও গভীর জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য নামধারণ করেন এবং একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র প্রতাপাদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। অসংখ্য নদীনালা ও খালবিল পরিবেষ্টিত এবং সভ্য জগৎ থেকে বহু দূরে অবস্থিত এই জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে বিক্রামাদিত্য ও প্রতাপাদিত্য কিছুকাল নির্বিঘ্নেই রাজত্ব করেন। সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উত্তর দিকে বর্তমান যশোর অঞ্চলেও তাঁদের রাজ্যসীমা বর্ধিত হয়। কিন্তু কিছুকাল পরেই মোগল সম্রাট আকবরের সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের সংঘর্ষ বাধে। প্রতাপ নানা কৌশলে এসব সংঘর্ষ এড়িয়ে রাজত্ব করতে থাকেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের প্রথম দিকেই বিরোধ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। ইসলাম খান তখন বাঙলার সুবাদার। তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা এনায়েত খানের নেতৃত্বে ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দের দিকে প্রতাপের বিরুদ্ধে এক বিপুল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। প্রতাপের জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়াদিত্য ঈশ্বরীপুরের উত্তর-পূর্বদিকে সালকা নামক স্থানে এক

দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ কবে মোগলবাহিনীকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। ঈশ্বরীপুরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ধূমঘাটের দুর্ভেদ্য দুর্গে প্রতাপ নিজে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কয়েকজন পাঠান সেনাপতিও তাঁর অধীনে কার্যরত ছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে উদয় পালিয়ে যান। মোগলবাহিনী ধূমঘাট আক্রমণ করলে প্রতাপ আত্মসমর্পণ করেন। তাঁকে বন্দি করে ঢাকায় রাখা হয়। তাঁর শেষজীবন সম্বন্ধে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে জনশ্রুতিমূলে জানা যায় যে তাঁকে দিল্লি নিয়ে যাবার পথে তিনি বারানসীতে প্রাণত্যাগ করেন।

সমাধি

ধূমঘাট প্রতাপাদিত্যের রাজধানী হলেও ঈশ্বরীপুরে বহু মন্দির, দুর্গ ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। কথিত আছে যে, যে বারোজন পাঠান সেনাপতি মোঘলদের বিরুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের সাথে অস্ত্রধারণ করেন, সংঘর্ষে এই বারোজন সেনাপতি নিহত হন। ঈশ্বরীপুরে এই বারোজন সেনাপতির সমাধি রয়েছে। কথিত আছে যে, প্রতাপাদিত্য তাঁর সৈন্যদের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

টেঙ্গা মসজিদ

ঈশ্বরীপুরের সন্নিকটে টেঙ্গা নামক স্থানে প্রতাপাদিত্যের আমলে সপ্তদশ শতাব্দীতে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। আয়তকার পাঁচ গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি বাইরের দিকে ১৩৬′ × ৩৩′ এবং দেয়ালগুলো প্রায় ৭ ফুট প্রশস্ত। পূর্বদিক থেকে প্রবেশের জন্য পাঁচটি খিলানপথ রয়েছে। উত্তর এবং দক্ষিণদিকের দেয়ালে একটি প্রবেশপথ দেখা যাবে। পূর্বদিকের কৌণিক খিলানসম্বলিত প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত বড়—৭′ - ৩′ উঁচু এবং ৬′ - ৩′ প্রশস্ত ছিল।

টেঙ্গা মসজিদটি অলঙ্কারবিহীন হলেও বিশালাকার। অভ্যন্তর পাঁচ ভাগে বিভক্ত। মধ্যভাগের বর্গাকার অংশটি ২০′ - ৯′ বর্গফুট। বাকি চারটি চতুষ্কোণাকার অংশ দু'পাশে দু'টি করে নির্মিত হয়েছে। আয়তন ছিল ১৮′ - ৭′ বর্গ। টেঙ্গা মসজিদে পাঁচটি সুদৃশ্য গম্বুজ রয়েছে। গম্বুজগুলো খান জাহানী গম্বুজের অনুকরণে নির্মিত। গম্বুজের উপরে নকশাকৃতি চূড়া দেখা যাবে। মেঝে থেকে গম্বুজের উচ্চতা ৩৬ ফুট। বর্তমানে মসজিদটি মাটির নিচে ৩ ফুট দেবে গেছে। বর্তমানে মসজিদটি সংস্কার করা হয়েছে। আহমদ হাসান দানী তাঁর Muslim Architecture in Bengal'-এ মসজিদটিকে তিনগম্বুজবিশিষ্ট ইমারত বলে অভিহিত করেছেন যা সঠিক নয়, এটিতে পাঁচটি গম্বুজ রয়েছে এবং কেন্দ্রীয় গম্বুজটি বৃহদাকার। অবশ্য আবদুল জলীল এবং সতীশচন্দ্র মিত্র এটিকে ষাট গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ বলে অভিহিত করেন।

আটকোনাকার ইমারত বা বিবির আস্তানা

টেঙ্গা মসজিদেব সামান্য উত্তরে একটি আট কোনোকৃতি ছোট ইমারতের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ করা যায়। এই ইমারতটি এক গম্বুজবিশিষ্ট এবং এর সাথে নওগাঁয় নির্মিত আটকোনাকার ইমারতের তুলনা করা যায়। স্থানীয়ভাবে বিবির আস্তানা নামে

পরিচিত এই ইমারতটি মাজার ছিল না মসজিদ ছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে অষ্টকোণাকৃতি সাধারণত মাজার বা সমাধির নিদর্শন ইসলামি স্থাপত্যে দেখা যাবে, যেমন সুলতানিয়ার (ইরান) ওলজাইতুর সমাধি দিল্লির লোদী আমলে অষ্টকোণাকার সমাধিসমূহ।

হাম্মামখানা

হাম্মাম প্রসঙ্গে খোন্দকার আলমগীর 'বাংলাদেশের হাম্মাম স্থাপত্য ও লালবাগ দুর্গের হাম্মাম' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে বিষদ আলোচনা করেন। তাঁর ভাষায়, "পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গৌড় শহরে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের একটি হাম্মাম আছে। পরবর্তীকালে আরও কিছু হাম্মাম, বাংলায় দেখা যায়। এইগুলি হইতেছে ঈশ্বরীপুরের হাম্মাম শ্যামনগর, সাতক্ষীরা, মীর্জাপুর হাম্মাম, কেশবপুর, যশোর, জাহাজঘাটা হাম্মাম, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা, শাহসুজার তাহখানার সঙ্গে সংযুক্ত হাম্মাম, গৌড় চাপাইনবাবগঞ্জ, জিনজিরা হাম্মাম, ঢাকা এবং লালবাগ দুর্গের হাম্মাম, ঢাকা।"

হাম্মামের তাৎপর্য প্রসঙ্গে খোন্দকার আলমগীর বলেন, "হাম্মামের বিভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল। যেমন- ধর্মীয় সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কোরানে বর্ণিত ও'যু গোসলের ধারণার সহিত হাম্মাম সম্পর্কিত। তাই নামাজের পবিত্রতার জন্য মানুষ হাম্মামে যাইত। ইহা একটি সামাজিক কেন্দ্রও ছিল। কোনো মুসলমানী, বিবাহ এবং তাহাদের জীবনের অন্য দিনগুলিতে মানুষ সেখানে যাইত। হাম্মামের জটিল ব্যবস্থা রোগব্যাধির নিরাময়কারী ছিল। তাই স্বাস্থ্যগত কারণে অনেকে হাম্মামে যাইত। হাম্মামকে 'নীরব চিকিৎসক' বলা হইত।"

ঈশ্বরীপুরের হাম্মামখানা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তবে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা একটি ইমারত দেখে মনে হয় যে এখানে খুব সম্ভবত একটি হাম্মাম ছিল। এই ইমারতের সর্ব পশ্চিমের কক্ষটি ছিল বেশ বড়। এটি কি উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল তা বর্তমানে জানা যায় না। তবে এটি যে হাম্মামখানা ছিল তা পানি গরমের ব্যবস্থা থেকেই বোঝা যায়। আ. ক. ম. যাকারিয়ার মতে, "কেন্দ্রীয় কক্ষটিও অনুরূপ আয়তনের ছিল। এই কক্ষের কেন্দ্রস্থলে ছিল একটি বড় গম্বুজ। এই গম্বুজের চারকোণে ছিল ৪টি ছোট ছোট গম্বুজ। বড় গম্বুজের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে অর্ধগম্বুজাকারে নির্মিত ছাদ ছিল বলে জানা যায়। এতে দেখা যায় যে কক্ষটি ৯ ভাগে বিভক্ত। পশ্চিম দেয়ালের মধ্যভাগে ছিল প্রবেশ পথ।

মূল কক্ষের পূর্ব দিকের কক্ষের কেন্দ্রস্থলে পানি গরম করার ব্যবস্থা ছিল। পানি গরম করার জন্য পূর্বদিকে মাটির নিচ থেকে সুড়ঙ্গপথের অস্তিত্ব ছিল। এই কক্ষের দক্ষিণ দিকে আরও কিছু ইমারত ছিল যার বর্তমানে কোনো অস্তিত্ব নেই। সতীশচন্দ্র মিত্রের মতে, ইমারতটি দ্বিতলবিশিষ্ট ছিল। এর নিচে ছিল হাম্মামখানা এবং উপরে ছিল বাসগৃহ।

জাহাজঘাটা, হাম্মামখানা

ঈশ্বরীপুর থেকে প্রায় ৫ মাইল উত্তরে ইছামতী ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থলে কদমতোলী নদীর পূর্ব তীরে জাহাজঘাটা নামে একটি প্রাচীন জনপদ রয়েছে। এখানে

৪১০ × ২১০ ফুট পরিমাপের একটি স্থানে অনেক ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাবে। জাহাজঘাটা জাহাজ নির্মাণের কারখানা ছিল। বাগেরহাটেও এরূপ একটি জাহাজঘাটার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। জাহাজঘাটায় ঈশ্বরীপুরের হাম্মামখানার মতো একটি গোসলখানা নির্মিত হয়। এটি ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল। আ. ক. ম. যাকারিয়া এটি ভগ্নাবস্থায় দেখতে পান। তাঁর মতে, "এটি একটি বিচিত্র ইমারত এবং এ ধরনের ইমারত এ দেশে অতি অল্পই দেখা যায়। প্রায় ১০০ ফুট দীর্ঘ এবং মাত্র ২০′– ৬′ প্রস্থ ইমারতটিতে গোসলের ব্যবস্থা ছিল।" এ থেকে ধারণা করা যায় যে ইমারতটি গোসলখানা হিসাবে ব্যবহৃত হত।

মোহাম্মদ যাকারিয়া এর সঠিক বিবরণ দেন, "সার্বোত্তর কক্ষের আয়তন ২০ – ৬′ × ১৪′। এই কক্ষের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। এটি খুব সম্ভব আমলা-বিচারকদের ব্যবহারের জন্য নির্মিত হয়েছিল। উত্তরদিক থেকে দ্বিতীয় কক্ষের আয়তন ছিল ২০ – ৬″ × ১৪′। এর উপর ছিল ১টি গম্বুজ। এটি অফিস কক্ষ ছিল বলে ধারণা করা হয়। তৃতীয় কক্ষটি ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট। এর আয়তন ছিল ২০′ - ৬″ × ৯′ – ৬″। এর উপর ২টি গম্বুজ ছিল। এটি মালখানা (storeroom) ছিল বলে অনুমান করা হয়। এর পরের কক্ষটি ছিল বেশ বড়। ২০ - ৬″ × ১৯′ – ৬′ আয়তাকার এই কক্ষের উপর ১টি বড় গম্বুজ ছিল। এটি শয়ন কক্ষ ছিল বলে ধারণা করা হয়। এর পরের অর্থাৎ পঞ্চম কক্ষের আয়তন ছিল ২০′ – ৬′ × ১৬′। এই কক্ষের দু'ধারে ২টি বড় চৌবাচ্চা ছিল। অট্টালিকার দেয়াল সংলগ্ন প্রকাণ্ড ইন্দারা থেকে পানি তুলে চৌবাচ্চা পূর্ণ করা হত। এই কক্ষের উপরে ছিল একটি গম্বুজ। গম্বুজের উপরদেশে স্ফটিক বসানো ছিল যাতে কক্ষে আলো প্রবেশ করতে পারে। এই কক্ষতেই ছিল হাম্মামখানা বা স্নানাগার। এর পরের অর্থাৎ সর্ব দক্ষিণের কক্ষটিতে ছিল একটি বিরাট পাকা কুয়া।"

৩১। চাকশ্রী, মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দী

রামপাল থানার অধীন ও থানা থেকে ৬ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে এবং বাগেরহাট শহর কেন্দ্র থেকে প্রায় ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে চাকশ্রী নামে একটি জনপদ রয়েছে। চাকশ্রী গ্রামের প্রধান আকর্ষণ সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত একটি মসজিদ। একগম্বুজ-বিশিষ্ট বর্গাকার মসজিদটির উভয় বাহু ২২ ফুট। বাইরের দিকে এবং ভিতরের দিকে ১৫ ফুট। দেয়ালগুলো ৩′ – ৬″প্রশস্ত। এর চার কোনোয় চারটি বুরুজ দেখা যাবে। পূর্ব দিক থেকে তিনটি খিলানপথে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। উত্তর ও দক্ষিণদিকে ১টি করে প্রবেশপথ রয়েছে। খিলানপথগুলো বেশ উঁচু, ১৫ ফুট মধ্যবর্তী খিলান পার্শ্ববর্তী খিলান অপেক্ষা উঁচু। খাঁজকাটা অলঙ্করণ দ্বারা খিলানগুলো শোভিত। ইমারতটি মাত্র ১টি গম্বুজ দ্বারা আবৃতো। বর্তমানে এ মসজিদের কার্নিশ ও প্যারাপেট সমান্তরাল, বক্রাকার নয়। সম্মুখভাগ প্যানেল নকশা দ্বারা অলঙ্কৃত। অভ্যন্তরে তিনটি অবতলে মিহরাব দেখা যাবে। ধারণা করা হয় নবাব মুর্শিদ কুলি খানের শাসনামলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে জনৈক বদন হাওলাদারের পুত্র শেখ কানাই এ মসজিদটি নির্মাণ

করেন, যদিও কোনো শিলালিপি পাওয়া যায়নি। এক গম্বুজবিশিষ্ট চতুষ্কোণাকার ইমারত হিসাবে চাকশ্রীর মসজিদটির বগুড়ার শেরপুরের বিবির মসজিদ, দিনাজপুরের সুরা মসজিদ, গৌড়ের রাজবিবির মসজিদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।

৩২। মাতলা বা মাউতলা, দুর্গ ও মসজিদ

বাংলাদেশের সর্বত্র মুসলিম স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন রয়েছে। সাতক্ষীরার মাতলা বা মাওতলা নামক স্থানে একটি প্রাচীন দুর্গ ও মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাবে। দুর্গ নির্মাতা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না তবে ভগ্নাবস্থায় যে মসজিদটি রয়েছে সেটি চাকশ্রী মসজিদের অনুকরণে নির্মিত। দুর্গ এলাকার উত্তর-পূর্বকোণে এবং উত্তরদিকের পরিখার দক্ষিণ পাশে মুঘল আমলের একটি মসজিদ আছে। এর আয়তন ১৯′ – ২″ × ১৯′ – ২″। দেয়ালগুলো ৩′ – ৩′ প্রশস্ত। পূর্বদিক থেকে তিনটি খিলানপথ দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে প্রবেশপথ দেখা যাবে।

৩৩। ফকিরহাট, মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দী

সতীশচন্দ্র মিত্র ফকিরহাট থানার নিকট একটি অতি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পান। তাঁর ভাষায়, "ফকিরহাট থানার নিকটে একটি অতি পুরাতন মসজিদের ভগ্নাবশেষ আছে। এটিকে ফকির খাঁ জাহানের শিষ্য-আউলিয়া কর্তৃক রচয়িতা (নির্মাতা!) কিনা জানি না। পরপারে মূলঘর গ্রামের 'জেন্দার আলি' নামক খাল তাঁহার অনুচর জিন্দাপীরের নাম যুক্ত হইতে পারে। পার্শ্ববর্তী সৈয়দ মহল্লা ও কামটা গ্রামে খাঞ্জালী দিঘি আছে।"

৩৪। পয়োগ্রাম-কসবা, মসজিদ (ভগ্নাবশেষ)

বাগেরহাটের মতো পয়োগ্রাম কসবাতে খান জাহান একটি শহর প্রতিষ্ঠা করে নানা ধরনের ইমারত দ্বারা সমৃদ্ধ করেন।

যশোর শহর থেকে প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এ স্থানটি অবস্থিত। এখানে অবস্থিত জলাশয় সড়ক ও ইমারতেব ধ্বংসস্তূপ দেখে ধারণা করা যায় যে এগুলো খান জাহানের আমলে নির্মিত হয়। ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে সতীশচন্দ্র মিত্র বলেন, "(যশোর কসবা) রাস্তা নদীর নিকটবর্তী হইয়া সেখানে ঘুরিয়া পূর্বমুখে পয়োগ্রামের দিকে চলিয়া গিয়াছে। সেখানেই উহার বামভাগে নদীর খুব সন্নিকটে একটি প্রকাণ্ড উচ্চ ঢিপি কোনো পূরাকীর্তির সাক্ষীর মতো দাঁড়াইয়া আছে। টিপিটি ১০০′ × ১০০′ ফুট। উহা পার্শ্ববর্তী জমি হইতে ৮′ ফুট উচ্চ। এখানে বাগেরহাটের ষাট গম্বুজের মতো কোনো বৃহৎ নামাজের স্থান বা দরবার গৃহ ছিল। শুনিয়াছি নিকটবর্তী মধ্যপুর গ্রামে শ্রীধরপুরের ঈশ্বরচন্দ্র বসু মহাশয় নীলের কুঠি করিবার জন্য একটি বিরাট ভগ্নগৃহ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিলুপ্ত করিয়াছিলেন। এই ঢিবির উপর ৩২′ × ১৭′ স্থলে ১ ফুট উচ্চ করিয়া একটি পাকা বেদী করিয়া উহার পশ্চিম দিকে একটি আধুনিক ঈদগাহ স্থানীয় লোকেরা নির্মাণ করিয়া লইয়াছে। নিকটবর্তী বহু সংখ্যক লোকেরা প্রধান প্রধান উৎসবে এইস্থানে

উপাসনা করিয়া থাকেন। এই ঈদগার নিকটে একখানি অতি সুন্দর কষ্টি পাথর (slate) আছে। উহার পরিমাপ ৩′ × ১′ × ৮″। *টিবির নিম্নে আর একখানি রাজমহল বা* চট্টগ্রামের পাথর আছে। এই পাথর ঠিক গম্বুজের পাথরের মতো। এই পাথরখানি ১′ – ৮″ × ১′ × ৯′ ইঞ্চি। পয়োগ্রমে কসবা এক সময়ে সমৃদ্ধিশালী ছিল।"

৩৫। পরবাজপুর মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দী

মুরাদপুর থেকে প্রায় ২ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে যমুনা নদীর বামতৌীরে পরবাজপুর গ্রাম অবস্থিত। এখানে একটি বিশালকায় মসজিদ দেখা যাবে। এ মসজিদটির বিস্তারিত *বিবরণ গ্রন্থকারেব মূলগ্রন্থ* 'Muslim Monuments of Bangladesh'-*এ পাওয়া* যাবে। পোড়ামাটির নকশা ও মিনাকরা টালিসমৃদ্ধ সুউচ্চ এক গম্বুজবিশিষ্ট পরবাজপুরের মসজিদটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক আহমদ হাসান দানীর Muslim Architecture in Bengal-এ এ মসজিদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। যাহোক আ. ক. ম. যাকারিয়া তাঁর 'বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ' গ্রন্থে এ মসজিদেব বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

ষোড়শ শতাব্দীর একগম্বুজবিশিষ্ট চতুষ্কোণাকার পরবাজপুরের বারান্দাসহ মসজিদটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয়: ৫২′ – ৫′ × ৩৯′ – ৮″ পরিমাপের বিশালাকার গম্বুজবিশিষ্ট এবং সাধারণ মসজিদ অপেক্ষা উঁচু দেওয়ালবিশিষ্ট এই মসজিদটির দেয়ালগুলো ৫′ – ৯′ প্রশস্ত। মসজিদটি বারান্দাসম্বলিত। পূর্বদিকে অবস্থিত বারান্দা দিয়ে তিনটি খিলানপথে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। বারান্দার উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও দুটি করে খিলানপথ দেখা যাবে। মূল মসজিদের পরিমাপ ২৫′ – ৮′ × ৯′– ৬″ এবং এটি একটি বড় ধরনের গম্বুজ দ্বারা আবৃতো। সতীশচন্দ্র মিত্র বলেন যে, প্রধান গম্বুজটি ভূমি থেকে ৩০ ফুট উঁচু। এতে কোনো ড্রাম নেই এবং খান জাহানী গম্বুজের অনুকরণে নির্মিত। অবশ্য এটি বাগেরহাটের রণবিজয়পুর মসজিদের মতো বড় নয়। বারান্দায় তিনটি ক্ষুদ্রাকৃতি গম্বুজ রয়েছে। সমগ্র মসজিদটিতে ৬টি আট কোনোকৃতি বুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলো মৌল্ডিং বা বেড়ি দ্বারা কয়েকটি অংশে বিভক্ত ছিল। বুরুজগুলো ছাদ পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে।

পরবাজপুরের মসজিদে কোনো শিলালিপি না থাকলেও এটি খান জাহানী স্থাপত্যরীতির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গৌড়ের রাজবিবি এবং দিনাজপুরের মসজিদের সাথে এ মসজিদের সাদৃশ্য দেখা যাবে। প্যানেল নক্শা দ্বারা বাইরের দেওয়াল সমৃদ্ধ। কার্নিশ সামান্য বক্রাকার। গম্বুজের উপর কলসচূড়া শোভা পাচ্ছে। পরবাজপুর মসজিদের অভ্যন্তরে কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব রয়েছে। মধ্যবর্তী মিহরাবটি বড়। এগুলো আয়তকার ফ্রেমে আবদ্ধ। পরবাজপুর মসজিদের প্রধান আকর্ষণ মিনাকরা টালির অলঙ্করণ।

চট্টগ্রাম

২২°৩৫′ দক্ষিণ এবং ২২°৫৯′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°২৭′ পশ্চিম এবং ৯২° ২৩′ পূর্ব দক্ষিণাংশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত চট্টগ্রাম জেলা সর্বমোট ২৭৫০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত। এর উত্তরদিকে ফেনী নদী ত্রিপুরা ও পার্বত্য ত্রিপুরা থেকে চট্টগ্রামকে উত্তরদিকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। পশ্চিমে বঙ্গোসাগর এবং নোয়াখালী, উত্তর-পূর্বদিকে পার্বত্য ত্রিপুরা, পূর্বদিকে আসাম এবং বার্মা এবং দক্ষিণে বার্মার আকিয়ার জেলা।

সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় মনোরম ও নয়নাভিরাম জেলা হিসাবে চট্টগ্রামের সুখ্যাতি রয়েছে। সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী। চট্টগ্রামের আদি নাম চট্টল বা চাটিগাঁও। চাটি নামের অর্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ। এ সমস্ত প্রদীপ সাধকপুরুষ এবং চট্টগ্রামের মশহুর পীর বদর আলমের মাজারে জ্বালানো হয়। আরব সওদাগরগণ চট্টগ্রামকে 'সামান্দর' বলে অভিহিত করতেন, এর অর্থ সমুদ্রবন্দর। অপর একটি তথ্য থেকে জানা যায় যে, চাটগাঁর উৎপত্তি হয়েছে আরবি শব্দ 'সাতুল কং' (Shattul Kank) বা গঙ্গা নদীর অববাহিকা থেকে চট্টগ্রাম একসময়ে মহাজন বৌদ্ধগোষ্ঠীর আওতাধীন ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে চীনা পর্যটক চট্টগ্রামকে 'সি-টা-গং' (Tsit-ta-gong) বলে অভিহিত করেন। ইউরোপীয় বণিকগণ বাংলায় আসলে তারা চট্টগ্রামকে বলত, পোর্টোগ্রান্ডি (Porto-Grande) অর্থাৎ বৃহৎ সমুদ্রবন্দর।

প্রাক-মুসলিম যুগের চট্টগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, একমাত্র এ অঞ্চলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। এ অঞ্চলের বহু লোক বৌদ্ধধর্মের অনুসারী যদিও এ অঞ্চলে কোনো বৌদ্ধ স্তূপ, বিহার অথবা বৌদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়নি। তিব্বতীয় তথ্যাবলী প্রাক-মুসলিম যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোকপাত করে। শরৎচন্দ্র দাস কর্তৃক সংকলিত এ তথ্য, যা ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে 'এশিয়েটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের জার্নালে' প্রকাশিত হয়েছে, থেকে জানা যায় যে, ভিমলাচন্দ্রের পুত্র গোপীচন্দ্র পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করতেন। তিব্বতী সূত্র থেকে জানা যায় যে, এ অঞ্চলে অসংখ্য হিন্দু মন্দির, বৌদ্ধবিহার নির্মিত হয়। বৌদ্ধবিহারগুলো মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত। এ ছাড়া আরও জানা

যায় যে, রাম্মা নামে একটি সমৃদ্ধ দেশের রাজধানী ছিল চাটিগাঁ এবং নালন্দার পতনের পর পূর্ব ভারতে এ অঞ্চল বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণে পণ্ডিত বিহারের নাম উল্লেখ করতে হয়। পণ্ডিত শব্দটির উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে লামাদের ব্যবহৃত কৌণিক টুপি, যা তিব্বতী ভাষায় 'পাশবা' বা পণ্ডিতের টুপি নামে পরিচিত, থেকে গৃহীত। পণ্ডিতের টুপি পরিহিত বৌদ্ধ ধর্মগুরুরা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ধর্ম যুক্তি-তর্কে অংশগ্রহণ করত। দশম শতাব্দীতে তান্ত্রিক বৌদ্ধ যোগী তিলা যোগী চট্টগ্রামে বসবাস করতেন বলে ধারণা করা হয়। মনে করা হয়ে থাকে যে, বার্মার আরাকান থেকে চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়। আরাকান রাজা Tsandaya চট্টগ্রামে একটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন এবং চট্টগ্রাম জয় করে একটি স্মারকস্তম্ভ নির্মাণ করেন। এই বিজয়স্তম্ভ Tsit-ta-gong' শব্দটি উৎকীর্ণ রয়েছে যার অর্থ 'যুদ্ধ পরিচালিত হওয়া উচিত নয়'। হিউয়েন সাং এ শব্দটি উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, চট্টগ্রাম বা চাটি গাঁ 'কুয়াশা ও পানি থেকে জেগে ওঠা একটি ঘুমন্ত রাজকন্যা' ('sleeping beauty emerging from mists and water')। দশম শতাব্দীতে আরাকান রাজা কর্তৃক অধিকৃত হবার পূর্বে চট্টগ্রাম ছিল জেলেদের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। তখন এটি ত্রিপুরা রাজ্যের অংশ ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে এ অঞ্চলে মুসলিম বসতি শুরু হয়।

আল-বেরুনী কক্সবাজারের পূর্বে গঙ্গা সাগরে নির্মিত হিন্দু মন্দির প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের উল্লেখ করেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে আল-ইদ্রিসীর গ্রন্থে রামু বা ফার্সি শব্দ রাম্ভুর উল্লেখ পাওয়া যায়। চট্টগ্রামে ইসলামের প্রসার প্রসঙ্গে এস. এম. তাইফুর বলেন, "সমঝদারদের নিকট প্রতীয়মান হবে যে শারীরিক গঠন, ভাষা, চালচলনের দিক থেকে চট্টগ্রামের মুসলমানদের মধ্যে আরবীয় প্রভাব লক্ষণীয়। এ জেলার কোন কোন অঞ্চলে বাংলা সাহিত্য নাসখী লিপিতে আরবী হরফের চর্চা করা হত এবং চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় অসংখ্য আরবী শব্দ সংযোজিত হয়েছে।"

১২৭২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার গভর্নর তুগ্রীল খান ত্রিপুরায় অভিযান করেন এবং তখন চট্টগ্রাম ত্রিপুরের অধীনে ছিল। তিনি রাজা রত্নফাকে পরাজিত করেন এবং রত্নফা তুগ্রীলকে বহু উপঢৌকন পাঠান। তুগ্রীল রত্নফাকে 'মাণিক্য' উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্তীকালে দিল্লীর সুলতান বলবন তুগ্রীলকে পরাজিত ও নিহত করেন। ফকিরদ্দীন মোবারক শাহ, যিনি ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁয়ে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, সর্বপ্রথম চট্টগ্রামে অভিযান পরিচালনা করেন। ১৩৪৫-৪৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর দিয়ে প্রখ্যাত মুসলিম পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলাদেশে আসেন। মুবারক শাহ চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি দীর্ঘ সড়ক নির্মাণ করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের দরবারে আগত চীনা পর্যটকগণও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করেন। তাঁরা পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে আগমন করেন। ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের রাজা Men-Tsan-Twun- কে আভার রাজা তাঁর ভগ্নীকে অপহরণের জন্য তাঁর (আরাকান) রাজ্য থেকে বিতাড়িত করা হলে তিনি গৌড়ের সুলতান জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহের

দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুলতান জালালউদ্দীন আরাকান রাজার প্ররোচনায় আরাকানে অভিযান করে তাঁকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এ প্রচেষ্টায় চাকমা রাজারা সুলতানকে সাহায্য করেন। কৃতজ্ঞতার নির্দশনস্বরূপ আরাকানের রাজা আরবী ও স্থানীয় ভাষায় উৎকীর্ণ মুদ্রা ছাপান এবং কলিমা শাহ, সালিমা শাহ, হোসেন শাহ এবং সেকেন্দার শাহ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন। সুলতান জালালউদ্দীন চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রা ছাপান এবং রামু, কক্সবাজার, টেকনাফের চাকমা রাজাদের লাখেরাজ ভূমি দান করেন।

গৌড়ের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলতার সুযোগে ত্রিপুরা ও আরাকানের রাজাগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে আরাকান রাজা Bosaw-Pyu চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন এবং পরবর্তী পঞ্চাশ বছর চট্টগ্রাম আরাকান রাজাদের অধীন ছিল। যদিও সঠিকভাবে বলা যায় না যে সুলতান বরবক শাহের শাসনামলে চট্টগ্রাম মুসলিম রাজ্যভুক্ত হয়েছিল কি না, তবুও একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, শিলালিপি অনুযায়ী জনৈক রাস্তী খান হাটহাজারীতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। আব্দুল করীম বলেন যে, রাস্তী খানের সময় থেকেই চট্টগ্রাম পুনরায় মুসলিম রাজ্যভুক্ত হয় এবং তা হোসেন শাহী শাসন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

১৫১২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান হোসেন শাহকে দুটি যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়, একটি ত্রিপুরার এবং অপরটি আরাকানের রাজার বিরুদ্ধে। তিনি ত্রিপুরার রাজাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে চট্টগ্রামের দিকে অভিযান করেন। এ অভিযান নেতৃত্ব দেন হোসেন শাহের পুত্র নসরত শাহ। পরাগল খান নামের একটি অভিজ্ঞ সেনাপতির নেতৃত্বে মুসলিমবাহিনী অভিযান করে পরাগলপুরে ঘাঁটি স্থাপন করে। তাঁর সুযোগ্য পুত্র ছুটি খান আরাকানের রাজাকে বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন। পরাগলপুরের ছুটি খানের দিঘি এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত ছুটি খানের মসজিদটি এখনও ছুটি খানের কীর্তির স্বাক্ষর বহন করে রয়েছে। চট্টগ্রামের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ফতেহাবাদ এবং বর্তমানে যে স্থানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত সেখানে ফতেহাবাদ স্থাপিত হয়। এ স্থানটি চট্টগ্রাম শহরের দশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। হাটহাজারীতে নসরত বাদশার দিঘি, হোসেনশাহী আমলের কীর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ ছাড়া দিঘির পাড়ে নির্মিত নসরত শাহের প্রাসাদ ও মসজিদের কোনো চিহ্ন নেই। 'লাইলী মজনু' কাব্যের প্রণেতা বাহরাম খান বলেন যে, "ফতেহাবাদ ছিল একটি অনিন্দসুন্দর এবং প্রখ্যাত শহর, যা পর্যটকদের আকর্ষণ করে। এটি একটি অনন্ত শহর, যেখানে অসংখ্য লোক বসবাস করত।"

উল্লেখ্য যে, পরাগল খান এবং তাঁর পুত্র ছুটি খান হোসেন শাহী আমলে চট্টগ্রামের গভর্নর ছিলেন। তাঁরা প্রশাসনিক কার্যের পাশাপাশি সাহিত্য ও স্থাপত্যকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। পরাগল খান চট্টগ্রামের কবি রবীন্দ্র পরমেশ্বরকে সংস্কৃত থেকে বাংলায় 'মহাভারত' অনুবাদের নির্দেশ দেন।

বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন সুলতান তৃতীয় মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে চট্টগ্রামে পর্তুগীজদের আগমন হয়। পর্তুগীজগণ চট্টগ্রাম দখলের চেষ্টা করে কিন্তু মার্টিন-আল-

ফোনসো দ্যা-মোলোর নেতৃত্বে তাদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরবর্তী পর্যায়ে গোয়ার গভর্নর এন্থনিও সিলভার মেনজেসের নেতৃত্বে আরেকটি বাহিনী পাঠানো হয়। মেনজেস চট্টগ্রাম শাহরে আক্রমণ চালান ও শহরটি ক্ষতিগ্রস্ত করেন। শের শাহ্ শূরীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকায় তৃতীয় মাহমুদ শাহ পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেননি। এর ফলে পর্তুগীজগণ চট্টগ্রামে তাদের কারখানা এবং দুর্গ নির্মাণ করে। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার স্বাধীন সালতানাতের পতনের পর চট্টগ্রাম পর্তুগীজদের দখলে চলে যায়, যদিও কিছু কিছু অংশ মুসলমান ও আরাকানীদের দখলে থাকে। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলতার সুযোগে ত্রিপুরার বিজয়মাণিক্য চট্টগ্রামে অভিযান করে শহরটি দখল করেন। পরবর্তী পর্যায়ে সোলায়মান কররানী ক্ষমতা দখল করলে তিনি বিজয়মাণিক্যকে চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করেন। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে সোলায়মান কররানীর পুত্র দাউদ খান কররানী মুঘলদের নিকট পরাজিত হলে চট্টগ্রাম মুঘলদের দখলে আসে। কিন্তু মুঘল আধিপত্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি কারণ আরাকানের রাজা ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে অভিযান করে শহরটি দখল করেন। আরাকানীগণ উত্তরে মেঘনা নদীর সীমানা পর্যন্ত তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে আরাকানী এবং ত্রিপুরার রাজার মধ্যে সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। ইত্যবসরে ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজগণ পুনরায় চট্টগ্রাম দখল করে। আরাকানীগণ তাদের বিতাড়িত করে কিন্তু দুর্ধর্ষ পর্তুগীজগণ দিয়াং নামক স্থানে একটি ঘাঁটি স্থাপন করতে সক্ষম হয়। এ অঞ্চলটি সমুদ্র থেকে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরের তিন মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আরাকানী ও পর্তুগীজদের মধ্যে বহুদিন সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। পর্তুগীজগণ ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে সন্দীপ দখল করে। পর্তুগীজ জলদস্যুদের উৎপীড়ন মাত্রাধিকভাবে বৃদ্ধি পেলে ঢাকার মুঘল গভর্নর বা সুবাদার তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য ও নৌবাহিনী পাঠান।

ঐতিহাসিক শিহাবউদ্দীন তালিশ তাঁর 'ফতেয়া-ই-ইব্রিয়া'-তে পর্তুগীজ জলদস্যুদের নির্মম অত্যাচার ও ধ্বংসলীলার বিস্তারিত বিবরণ দেন। কথিত আছে যে, জলদস্যুগণ জনসাধারণকে অপহরণ করে তাদের হাতের তালু ছিদ্র করে দিত, হত্যা করে জাহাজের ডেকে স্তূপ করে রাখত এবং মোরগ-মুরগিকে যেভাবে চাল খেতে দেওয়া হয় সেভাবে চাল খেতে দিত। তাদের অত্যাচারের সীমা এরূপ বৃদ্ধি পায় যে তারা শাহজাহানের স্ত্রী মমতাজ বেগমের দুজন দাসীকে অপহরণ করে। এসময় মগ-আরাকানী ও ফিরিঙ্গি পর্তুগীজদের উৎপীড়নে বাংলার নদীর পাশ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ ও চট্টগ্রামে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চলতে থাকে। সুবাদার দ্বিতীয় ইসলাম খান আরাকানীদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং তাদের বিতাড়িত করেন। তিনি চট্টগ্রাম দখল করলে সাময়িকভাবে মগ ও ফিরিঙ্গিদের অত্যাচার ও ধ্বংসলীলা বন্ধ হয়।

১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে উত্তরাধিকার সূত্রে সংঘটিত যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের নিকট পরাজিত হয়ে শাহ সুজা চট্টগ্রাম হয়ে আরাকান রাজার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুঘল সেনাপতি ও সুবাদার মীর জুমলা শাহ সুজাকে আরাকান সড়ক ধরে অনুসরণ করে আরাকানে বিতাড়িত করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে শাহ সুজা আরকানীদের আশ্রয়ে থাকাকালীন নিহত হন। মীর জুমলার উত্তরাধিকারী বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খান মগ ও ফিরিঙ্গিদের

বিরুদ্ধে একটি সংঘবদ্ধ অভিযান পরিচালনা করেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র বুজুর্গ উমিদ খান এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন। তিনি আরকানীদের বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম দখল করেন এবং এর নাম পরিবর্তন করে ইসলামাবাদ নামে অভিহিত করেন। শিহাবুদ্দীন তালিশ বলেন, "বাংলা সংলগ্ন (দক্ষিণাঞ্চলে) চট্টগ্রাম একটি বিশাল অঞ্চল। জাগদীয়া, যেখানে মুঘলদের একটি ঘাঁটি ছিল, সেখান থেকে চাটগাঁও পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল মগ-আরাকানী ও ফিরিঙ্গিদের ধ্বংসযজ্ঞের ফলে বিধ্বস্ত হয়। পাহাড়ের পাশে জঙ্গল রয়েছে যেখানে কোনো লোকবসতি নেই। ত্রিপুরার পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে ফেনী নদী জাগদিয়া হয়ে সমুদ্রে পড়েছে। ফেনী এবং চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী অঞ্চলে শুকনার মৌসুমেও নিরানব্বইটি নালা দিয়ে জলস্রোত প্রবাহিত হত। শায়েস্তা খানের শাসনামলে চট্টগ্রাম একটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হয়। সেখানে সড়ক, পুল, মসজিদ ও অন্যান্য ইমারত নির্মিত হয়। নালাগুলোর উপর ব্রিজ তৈরি করা হয়। ১৬৬৬ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রাম মুঘল শাসনাধীন ছিল। এর পর নবাব মীর কাসেম খান চট্টগ্রামকে ব্রিটিশদের হাতে অর্পণ করতে বাধ্য হন।

১। জবরা, মীরের সরাই, রাস্তী খানের মসজিদ, ১৪৭৪ খ্রিঃ (ধ্বংসপ্রাপ্ত)

যদিও সুলতান মাহমুদ শাহের (১৪৩৭-৫৯ খ্রিঃ) আমলের কোনো শিলালিপি চট্টগ্রামে পাওয়া যায়নি, এতদসত্ত্বেও একথা নিশ্চিত যে, গৌড় সুলতানের শাসনামলে চট্টগ্রামে মুসলিম আধিপত্য কায়েম ছিল। তাঁদের সময়েই চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর দিয়ে চীনা পর্যটকগণ বাংলাদেশে আগমন করেন। সুলতান মাহমুদ শাহের পুত্র বরবক শাহের শাসনামলে চট্টগ্রামে মসজিদসহ বিভিন্ন ইমারত নির্মিত হয়। রাস্তীখান নামে তাঁর একজন সেনাপতি মীরের সরাই থানাধীন জবরা নামে একটি গ্রামে একটি অতি আকর্ষণীয় মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদের একটি শিলালিপি আর. ডি. ব্যানার্জী উদ্ধার করেন। এ শিলালিপিটি একটি ভগ্নপ্রাপ্ত মসজিদের মিহরাবের উপরে প্রোথিত ছিল। বর্তমানে এটি একটি আধুনিক মসজিদে গাঁথা আছে। জরবা চট্টগ্রাম শহর থেকে ২০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এ শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, রাস্তী খান সুলতান বরবক শাহের আমলে হিঃ ৮৭৮/ ই ১৪৭৪ সনের ২৫শে রমজান একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। সামসুদ্দীন আহমদ তাঁর Inscriptions of Bengal-এ শিলালিপির উল্লেখ করেন। স্থপতি রাস্তী খান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে ধারণা করা হয় যে বাংলার প্রখ্যাত কবি আলওলের তিনি পূর্বপুরুষ ছিলেন। মসজিদটি বহুপূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এর কিবলা প্রাচীনকালের স্বাক্ষর বহন করছে। এতে একটি মিহরাব দেখা যাবে।

২। হাটহাজারী, মসজিদ, পঞ্চদশ শতাব্দী (১৮)

চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি সড়কে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে অবস্থিত হাটহাজারী মুঘল আমলের একটি প্রাচীন শহর। হাজারী শব্দ থেকে প্রতীয়মান হয় যে এক হাজারী অবসরপ্রাপ্ত কোনো উচ্চপদস্থ মুঘল কর্মকর্তা এখানে বসবাস করতেন। রাস্তী খানের মসজিদের ২ মাইল উত্তরে হাটহাজারীতে একটি প্রাচীন মসজিদ দেখা

যাবে, যা প্রাক-মুঘল যুগের বলে ধারণা করা হয়। "আহদীদ আল খাওয়ানীন"-এর প্রণেতা হামিদ আলী খান বলেন যে হাটহাজারীতে একটি অতি প্রাচীন মসজিদ রয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে মুঘল-পূর্ব যুগে হাটহাজারী একটি সমৃদ্ধ এলাকা ছিল। মসজিদে কষ্টিপাথরে খোদাই করা একটি শিলালিপি রয়েছে। এটি প্রধান প্রবেশপথের উপরে গাঁথা আছে। ৪ - ৩″ × ১′ - ৬′ পরিমাপের এই শিলালিপিটি তুঘরা রীতিতে আরবি হরফে উৎকীর্ণ এবং এটি ভগ্নপ্রাপ্ত হওয়ায় এর সমস্ত অক্ষরগুলো স্পষ্ট নয়। কেবলমাত্র 'সুলতান শামসউদ-দুনিয়া, ওয়াল-দীন আবু মুজাফফর ইউসুফ শাহ বিন বররক শাহ'। নাম পাঠোদ্বার করা সম্ভবপর হয়েছে। তিনি ১৪৭৪ থেকে ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

হাটহাজারী মসজিদটি বহুদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে বন-জঙ্গলে ঢাকা ছিল। এখানে পীর-ফকিরদের আস্তানা ছিল। এ কারণে এখানকার মসজিদটি ফকিরের মসজিদ নামে পরিচিত ছিল। কথিত আছে যে, মসজিদের পাশে একজন ফকিরের সমাধি রয়েছে। বর্তমানের হাটহাজারী মসজিদটির সংস্কার করা হয়েছে।

মসজিদটি ছয় গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার এবং রামপালের বাবা আদমের মসজিদের সাথে এর সাদৃশ্য রয়েছে। বাইরের দিকে ৪৮′–৩৫′ পরিমাপের এই মসজিদটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। অভ্যন্তরে এর পরিমাপ ৩৮–৩′ × ২৪′–৯′। এই মসজিদের চারকোনায় চারটি গোলাকার টাওয়ার রয়েছে যার উপরে টারেট দেখা যাবে। পূর্বদিকে তিনটি খিলানপথ রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত সম্মুখভাবে একটি বারান্দা নির্মাণ করে মসজিদের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য বিঘ্নিত করা হয়েছে। আবদুল করীম হাটহাজারী মসজিদের বর্ণনা দেন, "সম্মুখভাগের দরজার পাশে খাঁজকাটা কুলুঙ্গী রয়েছে। ইমারতের উপরিভাগে প্যারাপেটের গোলাকার খাঁজকাটা টারেট (মিনার) মসজিদের শোভা বৃদ্ধি করছে। খাঁজকাটা টারেট বাংলার বাঁশের তৈরী ঘরের অলঙ্করণে নির্মিত। কোনার টাওয়ারগুলো গোলাকার এবং প্রত্যেকটি সমান্তরাল ব্যান্ড-এর সাহায্যে কয়েকটি অংশে বিভক্ত। লক্ষণীয় যে ছাদ পর্যন্ত গোলাকার হলেও ছাদের উপরের অংশ অষ্টভূজাকৃতি এবং এর চূড়ায় ক্ষুদ্রাকৃতি কুপোলা রয়েছে। ছাদের উপরিভাগে মালল বা বেষ্টনী দেখা যাবে।"

হাটহাজারী মসজিদের অভ্যন্তর দুটি পাথরের স্তম্ভের সাহায্যে দু'টি আইলে বিভক্ত। পশ্চিমদিকে তিনটি মিহরাব রয়েছে। মধ্যবর্তী মিহরাবটি পাথরের তৈরি এবং পার্শ্ববর্তী মিহরাব অপেক্ষা আকারে বড়। মিহরাবটি বহু খাঁজবিশিষ্ট এবং কৌণিক। চারিপাশের আয়তকার ফ্রেমে কুর'আনের আয়াত উৎকীর্ণ রয়েছে। খিলানের উভয় পাশে ত্রিকোণাকার বা স্পণ্ড্রিলে গোলাপ ফুলের নকশা দেখা যাবে। খিলানের উপরে সমান্তরাল মোল্ডিং-এর নকশা এবং তার উপর মার্লন রয়েছে। অবতলাকার মিহরাবে ঝুলন্ত চেন ও ঘণ্টা (chain and bell) খোদিত রয়েছে। ঘণ্টাটি আয়তকার সুলতানী আমলের অন্যান্য ঘণ্টার মতো গোলাকৃতি নয়। মসজিদটি ছয়টি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। গম্বুজগুলো

স্কুইঞ্চ খিলান দ্বারা নির্মিত। গম্বুজের উপরিভাগ কলসচূড়া দ্বারা শোভিত। সংস্কার করা হলেও হাটহাজারী মসজিদটিতে সুলতানী আমলের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য দেখা যাবে।

৩। পরাগলপুর, ছুটিখানের মসজিদ, ষষ্ঠদশ শতাব্দী (ধ্বংসপ্রাপ্ত)

সুলতান হোসেন শাহের শাসনামলে চট্টগ্রাম পরাগলখান নামে একজন যোগ্য সামরিক কর্মকর্তার প্রশাসনাধীন ছিল। পরবর্তীকালে পরাগল খানের সুযোগ্য পুত্র ছুটি খান প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করেন। মীরের সরাই থানাধীন পরাগলপুর একটি সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল ছিল, যার প্রমাণ পাওয়া যায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রত্নকীর্তিসমূহে; যা গ্রন্থকার বহু পূর্বে দেখেছেন। এখানে বহু প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ মৃৎপাত্র, ইটের ভগ্নাংশ, উঁচু ঢিপি দেখা যাবে। পরাগল খান এবং রাস্তী খানের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। মাহবুবুল আলম তাঁর 'চট্টগ্রামের ইতিহাসে' পরাগল খানকে রাস্তী খানের পুত্র বলে অভিহিত করেছেন। তিনি জবরা গ্রামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। পরাগল খান এবং তার পুত্র ছুটি খান হোসেন শাহ এবং তাঁর উত্তরাধিকারী নসরত শাহের শাসনামলে স্থানীয় প্রশাসক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। পরাগলপুরে একটি বিশাল দিঘি রয়েছে, যা পরাগল দিঘি নামে পরিচিত। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে অবস্থিত পবাগলপুল এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এটি একসময়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা ছিল। পরাগল দিঘির পাড়ে পরাগল খানের বসতবাড়ি নির্মিত হয়, যার কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। যাহোক, মহাসড়কের পাশে একটি ভগ্নপ্রায় মসজিদ দেখা যাবে, যার ছাদ বহু পূর্বে পড়ে গেছে। এটি ছুটি খানের মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদের কিবলাপ্রাচীর অক্ষত অবস্থায় রয়েছে এবং এখানে তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব দেখা যাবে। সুলতানী আমলের এই মসজিদটি আয়তকার এবং তিন গম্বুজবিশিষ্ট ছিল। এখানে বিক্ষিপ্তভাবে অনেক পোড়ামাটির ফলক, মৃৎপাত্রের অংশ, কষ্টিপাথরের স্তম্ভ দেখা যাবে। বহু ধ্বংসাবশেষ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। ছুটি খানের মসজিদটি ষষ্ঠদশ শতাব্দীর একটি অনন্য স্থাপত্যকীর্তি বলে ধারণা করা হয়।

৪। ফতেহাবাদ, প্রাচীন কীর্তিসমূহ, ষষ্ঠদশ শতাব্দী

সুলতান নসরত শাহের আমলে আরাকানীদের বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম বিজিত হলে নবগঠিত পরগনার প্রশাসনিক কেন্দ্র ফতেহাবাদে বা ফাতেহবাদে প্রতিষ্ঠিত হয়। হাটহাজারী থানার অধীন ফতেহাবাদ একটি সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল ছিল। হামিদউল্লাহ খান তাঁর 'আহাদীস আল-খাওয়ানীন' গ্রন্থে ফতেহাবাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও স্থাপত্যিক নিদর্শন সম্বন্ধে সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮১০ থেকে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লিখিত এই গ্রন্থে হামিদউল্লাহ বলেন যে, চট্টগ্রাম বিজয়ের পর চট্টগ্রামের নাম পরিবর্তন করে ফতেহাবাদ রাখা হয়। সুলতান নসরত শাহ এখানে একটি বিশাল দিঘি নির্মাণ করেন, যা বর্তমান চট্টগ্রাম শহরের ৮ মাইল উত্তরে অবস্থিত। তিনি বলেন যে দৈর্ঘ্য ৭০০ কদম হবে। হামিদউল্লাহর মতে ফতেহাবাদে নসরত শাহ একটি প্রাসাদ ও একটি

মসজিদ নির্মাণ করেন। অবশ্য এ সমস্ত ইমারত বহুপূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। কথিত আছে যে, হামিদউল্লাহ খান বাল্যকালে এখানে মৃৎপাত্র, মিনাকরা টালি, নকশা করা ইট বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দেখতে পান। তিনি বলেন যে, তাঁর জন্মের পূর্বে সাপের অসংখ্য গর্ত থাকায় স্থানীয় লোকেরা প্রাসাদটি ভেঙে ফেলে। যাহোক, তিনি একটি ভগ্নপ্রায় মসজিদ দেখতে পান।

বাহরাম খান তাঁর 'লাইলী মজনু' উপখ্যানে ফতেহাবাদ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

নগর ফতেয়াবাদ দেখিতে পুরত্র সাধ
চাটিগ্রাম সুনাম প্রকাশ
মনোরম মনোরম অপর নগর সম
শতে শতে অনেক নিবাস।।

৫। কুমিরার নিকট মসজিদ্দা, হাম্মাদের মসজিদ, ষষ্ঠদশ শতাব্দী (১৯)

ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে চট্টগ্রাম শহর থেকে ১২ মাইল উত্তরে কুমিরা নামক স্থানে একটি মসজিদ দেখা যাবে। স্থানীয়ভাবে এটি হাম্মাদের মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদ থেকে সম্ভবত মসজিদ্দা শব্দটির উৎপত্তি। মসজিদের সংলগ্ন একটি দীঘি রয়েছে। মসজিদ ও দিঘি জনৈক হাম্মাদের স্মৃতি বহন করছে। হাম্মাদের প্রকৃত নাম জানা যায় না তবে তিনি হামিদ খান নামে পরিচিত। বাহরাম খান তাঁর 'লাইলী মজনু' উপন্যাসে হামিদ খানের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন "প্রাচীনকালে হোসেন শাহ নামে একজন গৌড়ের সুলতান ছিলেন, তাঁর প্রধানমন্ত্রীর নাম হামিদ খান। উল্লিখিত হামিদ খান অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, সরাইখানা নির্মাণ করেন এবং দিঘি খনন করেন।" তিনি হোসেন শাহের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কি না জানা যায় না। তবে ধারণা করা হয় যে, হোসেন শাহ তাঁকে চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। তিনি হোসেন শাহের বংশধর তৃতীয় মাহমুদ শাহের আমলেও প্রশাসনিক কার্যনির্বাহ করেন কারণ হাম্মাদের মসজিদের শিলালিপিতে তৃতীয় গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। শিলালিপিটি তুঘরা রীতিতে আরবি হরফে উৎকীর্ণ। ২′ ৪″ × ১′ ২″ পরিমাপের এই শিলালিপি কষ্টিপাথরে দুই লাইনে উৎকীর্ণ রয়েছে। ভগ্নপ্রাপ্ত হওয়ায় এর পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কেবলমাত্র "আদ-দুনিয়া-ওয়াদ-দীন' আবদুল মুজাফফর মাহমুদ সুলতানের পুত্র'—আবদুল করীম পাঠ করতে সক্ষম হন। গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ ১৫৩৩ থেকে ১৫৩৮ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। স্বাধীন বাংলার সর্বশেষ সুলতান বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদ নির্মাণ করেন। এ সমস্ত ধর্মীয় ইমারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হচ্ছে মসজিদ্দায় নির্মিত হাম্মাদের মসজিদ।

হাম্মাদের মসজিদ একগম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার ইমারত। বাইরের দিক থেকে ১০ ফুট ১১ ইঞ্চি এবং ভেতরের দিক থেকে ১৪ ফুট পরিমাপের এই মসজিদটির চার কোনায় চারটি গোলাকার টাওয়ার রয়েছে। সমান্তরাল মৌল্ডিং বা বেড়ি দিয়ে তিন ভাগে বিভক্ত

এই টাওয়ারগুলো নিচে থেকে উপরের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। ছাদের উপরের অংশে গোলাকার কিউপোলা দ্বারা এ সমস্ত টাওয়ার আবৃত। কিউপোলার উপরে কলস-চূড়া শোভা পাচ্ছে। নিমাংশের পরিমাপ ৯′ ২ ইঞ্চি। হাম্মাদের মসজিদের অন্যতম আকর্ষণ সুউচ্চ গম্বুজ, যা আয়তনে খুব বড়। পশ্চিমদিকে মিহরাবের পিছনে একটি বড় ধরনের বেস বা বাটরেস নির্মিত হয়েছে যা আকৃতিতে কোনার টাওয়ারের মতো গোলাকার। ডঃ আবদুল করীম হাম্মাদ মসজিদের বিষদ বিবরণ দেন। প্যারাপেট এবং কার্নিশ বক্রাকার যা কোনার টাওয়ার থেকে অপর টাওয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত। দেওয়ালে কোনো পলেস্তারা ছিল না কিন্তু বর্তমানে চুনকাম করা হয়েছে। পূর্বদিকে তিনটি খিলানপথ রয়েছে। মধ্যবর্তী পথটি অপেক্ষাকৃত বড়। উল্লেখ্য যে, খিলানপথগুলো খুবই নিচু। এগুলোতে অন্যান্য মসজিদের মতো আয়তকার ফ্রেম দেখা যাবে না এবং অলঙ্করণবিহীন। যদিও কোনো অলঙ্করণ থাকত, তা হলে তা বহু পূর্বেই নষ্ট হয়ে গেছে। খিলানগুলো কৌণিক। উত্তর ও দক্ষিণদিকে প্রবেশপথের আকারে কুলুঙ্গি আছে এবং তা জাল দিয়ে ঘেরা রয়েছে। এই কুলুঙ্গির দু'পাশে বাতি রাখার জন্য ছোট কুলুঙ্গি নির্মিত আছে। পশ্চিমদিকে তিনটি মিহরাব রয়েছে। মধ্যবর্তী মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং এটি হাটহাজারী মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাবের মতো পাথরের তৈরি। হাম্মাদী মসজিদের গম্বুজটি স্কুইঞ্চের সাহায্যে নির্মিত হয়েছে এবং এর কলসচূড়া পদ্ম পাতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বক্রাকার কার্নিশ, গোলাকার কৌণিক টাওয়ার, ড্রামবিহীন গম্বুজ দেখে মসজিদটিকে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর ইমারত হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এর ভিত থেকে চূড়া পর্যন্ত ক্রমশ সরু বুরুজগুলো বাগেরহাটের মসজিদগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

চট্টগ্রাম শহর

৬। আন্দারকিল্লাহ অথবা দুর্গ (অধুনালুপ্ত)

শিহাবউদ্দীন তালিশ বলেন, "কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী উঁচু ও নিচু অনেকগুলো পাহাড় রয়েছে। ছোট ছোট পাহাড়গুলো মাটির ঢিপির মতো এবং বড়গুলোও মাটির এবং বেশ উঁচু। এর একটিতে আন্দারকিল্লা নামে একটি দুর্গ নির্মিত হয়। এটি আলেকজান্ডারের দুর্গপ্রাচীরের মতো খুবই সুরক্ষিত এবং এর বুরুজ বা টাওয়ারগুলো 'ফলক-আল বুরুজের' মতো উঁচু। বর্তমানে আন্দারকিল্লা দুর্গের কোনো চিহ্ন নেই। আন্দারকিল্লার অর্থ অভ্যন্তরীণ দুর্গ যা সম্ভবত মুঘলদের সময়ে নির্মিত হয় এবং মগ-ফিরিঙ্গি হার্মাদদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বর্তমানে আন্দারকিল্লায় আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের একটি মসজিদ রয়েছে।

৭। আন্দারকিল্লা, জামে মসজিদ, ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দ

সুউচ্চ পাহাড়ের উপর নির্মিত চট্টগ্রামে মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে সম্ভবত সর্বপ্রাচীন স্থাপত্যিক নির্দশন হচ্ছে আন্দারকিল্লার মসজিদ। নবাব শায়েস্তা খানের আমলে তাঁর পুত্র বুজুর্গ উমিদ খান চট্টগ্রাম জয় করেন। আরাকানদের উপর মুঘল সামরিক বিজয়কে চিরস্মরণীয় করার জন্য তিনি এই মসজিদ নির্মাণ করেন।

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম বিজিত হলে এর নামাকরণ হয় ইসলামাবাদ। ডঃ আহমদ হাসান দানী বলেন যে, "১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত জামী মসজিদটি তিন 'বে' বা লম্বালম্বি সারি এবং একটি আইলবিশিষ্ট চিরাচরিত মুঘলরীতিতে নির্মিত। মধ্যবর্তী স্থলে একটি গম্বুজ এবং দু'পাশে ক্রস ভল্টের দ্বারা আবৃত। উমিদ খান চট্টগ্রাম থেকে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর নায়েব ও কর্মচারীগণের উদাসীনতার জন্য মসজিদটি অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। ইংরেজ আমলে আন্দারকিল্লার মসজিদটি অস্ত্রাগার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ মৌলভী হামিদউল্লাহ্ খানের নেতৃত্বে সরকারের নিকট মসজিদটি সংস্কারের জন্য আবেদন করেন। দীর্ঘ দু'বছর পর ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটি পুনঃনির্মাণ ও সংস্কারের অনুমতি দেওয়া হয়। এর পর থেকে আন্দারকেল্লায় মসজিদটি 'নামাজ গাহ' হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পুনঃনির্মাণের সময় আদি মসজিদের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ নষ্ট হয়ে যায়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতার পর মসজিদটি সম্প্রসারণ করে নতুনভাবে পুনঃনির্মিত হয়।

৮। কদম মোবারকের মসজিদ, ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দ

চট্টগ্রাম শহরের রহমতগঞ্জ এলাকায় কদম মুবারকের সমাধিসংলগ্ন একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ইয়াসিন কর্তৃক নির্মিত এই মসজিদটি আয়তকার তিনগম্বুজবিশিষ্ট। এই মসজিদটির উত্তর ও দক্ষিণদিকে কুঠরি রয়েছে। উত্তরদিকের কুঠরিতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর এবং দক্ষিণদিকের কুঠরিতে গাউস পাক হযরত আবদুল কাদের জিলানীর কদর মোবারক রয়েছে। আহমদ হাসান দানী কদম মোবারক মসজিদের বিষদ বর্ণনা দেন, "মসজিদটি মুঘল স্থাপত্যের শেষ পর্বের ঐতিহ্য বহন করছে। আয়তাকার এই মসজিদটির চার কোনায় চারটি আটভুজাকৃতি বুরুজ রয়েছে, যা প্যারাপেটের বা ছাদের উপর দিয়ে উপরে উঠে গেছে। পূর্ব দিকে তিনটি খিলানপথ রয়েছে কেন্দ্রীয় পথটি প্রশস্ত। খিলানগুলো খাঁজকাটা-খিলানগুলোর দুই পাশে অবস্থিত ঢেউকাটা স্তম্ভের উপর থেকে নির্মিত হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রবেশপথ আয়তকার ফ্রেমে আবদ্ধ, ছাদে প্যারাপেট রয়েছে। কার্নিশ বক্রাকার নয় সমান্তরাল যা মুঘল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। তিনটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত কদম মোবারক মসজিদটি খুবই আকর্ষণীয়। মধ্যবর্তী গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত বড়।"

৯। হামজা খানের মসজিদ, ১৭১৯ খ্রিষ্টাব্দ

চট্টগ্রামের বাইরে বাগ-ই-হামজা নামে একটি বাগিচা রয়েছে। এখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দে হামজা খান এই ধর্মীয় ইমারতটি নির্মাণ করেন এবং তাঁর নামানুসারে মসজিদটি হামজা খানের মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদের প্রাচীনত্ব বিশেষ দেখা যায় না, কারণ এটি বহুবার সংস্কার করা হয়েছে।

১০। ওয়ালী খানের মসজিদ, ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ

চট্টগ্রামের চৌমুহনী মহল্লায় ওয়ালী খানের মসজিদ অবস্থিত। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এই মসজিদটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে নির্মিত হলেও সংস্কারের ফলে এটি বর্তমানে আধুনিক রূপ নিয়েছে।

১১। মসজিদ্দা, নয় দরজাবিশিষ্ট মসজিদ, মুঘল আমলের শেষার্ধ

কুমিরার নিকট মসজিদ্দায় যেখানে হাম্মাদের মসজিদ রয়েছে। একটি নয় দরজা-বিশিষ্ট মসজিদ দেখা যাবে। এটি একগম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকৃতি মসজিদ এবং পশ্চিমদিক ব্যতীত অপর তিনদিকে অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্বদিকে তিনটি করে মোট নয়টি খিলানপথ রয়েছে। এটি যে মুঘল আমলে নির্মিত হয় তাতে সন্দেহ নেই।

১২। অপরাপর মসজিদসমূহ, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দী

বৃহত্তর চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়েছে। সমগ্র জেলায় মুঘল আমলে বিশেষ করে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহু মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। সীতাকুণ্ড থানাধীন মুরাদপুরে একগম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার মসজিদ নির্মিত হয়েছে। স্থানীয়ভাবে এটি সাধু সন্তানের মসজিদ নামে পরিচিত। একই গ্রামে অপর একটি এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ দেখা যাবে, অবশ্য এর দু'পাশে দুটি কৃত্রিম গম্বুজ শোভা পাচ্ছে। ফৌজদারহাট মৌলা সাহেবের মসজিদ, ঘোরামারার সাদেক আলী মুন্সীর মসজিদ, ছলিমপুরে দেওয়ানের মসজিদ অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্থাপিত হয়। কাট্টালী মালখানায় নাসতালিক কীর্তির উৎকীর্ণ একটি ফার্সি শিলালিপি পাওয়া গেছে। স্থানীয় ঐতিহাসিক মাহবুবুল আলম তাঁর চট্টগ্রামের ইতিহাস গ্রন্থে যে কয়েকটি মসজিদের উল্লেখ করেন তার মধ্যে বোয়ালখালী থানাধীন হুসায়েনের নির্মিত প্রাচীন মসজিদ। এটি স্থানীয়ভাবে মুসা খানের মসজিদ নামে পরিচিত। পুটিয়া থানাধীন হারিয়া খ্যায়েন নামক স্থানে যে মসজিদ অবস্থিত তা কুরাকাটানী মসজিদ নামে পরিচিত। এটির নির্মাণকাল ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দ। এ ছাড়া সাতকানিয়া থানাধীন মল্লিক সোয়াং নামক স্থানে মুহম্মদ খানের মসজিদ দেখা যাবে।

১৩। বদর আলমের দরগা (মোকাম), অষ্টাদশ শতাব্দী

চট্টগ্রামকে বারো আওলিয়ার দেশ বলা হয়ে থাকে, এর মূল কারণ এ অঞ্চলে বারোজন পীর দরবেশ আওলিয়া ইসলাম প্রচারের জন্য এসে আস্তানা স্থাপন করেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন পীর বদর আলম বা মোকাম। চট্টগ্রামের নামের উৎপত্তি হয়েছে সম্ভবত 'চাটি' বা প্রদীপ থেকে। সেদিক থেকে, প্রদীপের নগরী নামের চাটিগ্রাম খ্যাতি অর্জন করেছে। কথিত আছে যে, পীর বদর আলম অসংখ্য 'বাটি' বা প্রদীপ জ্বালিয়ে বন-পরী তাড়াতেন। তিনি শুধুমাত্র সাধকই ছিলেন না, তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ছিল প্রখর এবং চট্টগ্রাম থেকে ভূত-প্রেত বিতাড়িত করতে সক্ষম হন। তাঁর প্রভাবে স্থানীয় লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। চাটি পাহাড়ে পীর বদর আলমের একটি দরগা আছে। এখানে তাঁর সমাধিও রয়েছে। পীর বদর আলম মাঝি-মাল্লাদের পীর হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন এবং সমুদ্রাভিযানের পূর্বে তারা পীর বদরকে স্মরণ করেন।

পীর বদর আলমের সমাধির স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সুলতানী স্থাপত্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এটি এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার সমাধি। চারপাশে বেষ্টনিপ্রাচীর রয়েছে।

একসময়ে এই বেষ্টনিপ্রাচীরের চারদিক থেকে চারটি খিলানপথে ভিতর দিয়ে আসতে হত। শিহাবুদ্দীন তালিকায় উল্লেখ করেন যে, পাহাড়ে নির্মিত একটি দুর্গের অভ্যন্তরে সমাধিটি অবস্থিত, যা পীর বদরের আস্তানা নামে পরিচিত। তালিকায় যে দুর্গের কথা বলেছেন তা আন্দারকিল্লা এবং এর ভিতরে বদরপট্টি বা চটি পাহাড় অবস্থিত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে তালিশ যখন সমাধিটি দেখেন তখন এটি অক্ষত অবস্থায় ছিল। সমাধির পাশে তিনি কষ্টিপাথরের একটি দণ্ড দেখতে পান।

এইচ. ই. হার্ভে বলেন যে, আসাম এবং মালয়ের (বর্তমান মালয়েশিয়া) মধ্যবর্তী সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে বদর মোকাম নামে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর ইমারত রয়েছে। এনামুল হক এবং আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ বুদের মোকাম নামীয় যে ইমারতসমূহের উল্লেখ করেন তা আরাকানে নবম ও দশম শতাব্দীতে ইসলামি প্রভাবের প্রতীক বলে ধারণা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত গ্রন্থাগারিক মোঃ সিদ্দিক খান অকিয়ারে বদর মোকাম দেখতে পান। এই বদর মোকামে দু'টি অংশ ছিল। একটি সুউচ্চ মিনার এবং অপরটি একটি গুহা। এগুলো সম্ভবত ১৭৩৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে স্থাপিত হয়। ফলে মাঝি-মাল্লার পীর নামে খ্যাত পীর বদর আলমের খ্যাতি চট্টগ্রাম থেকে সুদূর মালয় পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। তিনি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন, যেমন পীর বদর, শাহ্ বদর, বদর-ই-আলম, পীর বদরউদ্দীন, শেখ বদর উল ইসলাম ইত্যাদি। চট্টগ্রাম ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান ও কালনা, পশ্চিম দিনাজপুরের হেমতাবাদ এবং দিনাজপুরে পীর বদরের নাম বিজড়িত সমাধি রয়েছে, যা symbolic বা প্রতীকধর্মী। বৃহত্তর চট্টগ্রামে রওজান, রাঙ্গুনিয়া, পটিয়া, বোয়ালখালীতেও পীর বদরের ছটি আস্তানা দেখা যাবে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পীর বদরের অসামান্য প্রভাব ছিল। তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে ধারণা করা হয় যে তিনি সম্ভবত পাঞ্জাব অথবা মীরাট থেকে এ অঞ্চলে আসেন। তিনি শেখ শরফউদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরীর বংশের ছিলেন। সম্ভবত তাঁকে ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দে বিহারের ছোট দরগায় সমাহিত করা হয়। ডঃ আবদুল করিমের মতে তিনি ১৫০ বছর জীবিত ছিলেন এবং বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। যে যে স্থানে তিনি যান, সে সে স্থানে তাঁর 'চটি' বা 'মোকাম' নির্মিত হয়েছে।

১৪। বায়াজিদ বোস্তামীর দরগা এবং সংলগ্ন মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দী (২০)

নাসিরাবাদ এলাকায় অবস্থিত চট্টগ্রামের সর্বাপেক্ষা পবিত্রতম স্থান হচ্ছে হযরত বায়াজিদ বোস্তামীর মাজার বা দরগা। বায়াজিদ বোস্তামী ইরানের একজন সুপরিচিত সাধকপুরুষ ছিলেন যিনি ইসলামের সেবায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন। কিন্তু চট্টগ্রামে তিনি কখনোই আসেননি এবং তার জীবনের কর্মকাণ্ড চট্টগ্রামের সাথে জড়িত নয়। তাঁর সমাধিও চট্টগ্রামে দেখা যাবে না কারণ তাঁর সমাধি ইরানে দেখা যাবে। বর্তমানের বায়জিদ বোস্তামীর দরগাটি তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত একটি স্মৃতিস্তম্ভ বা memorial। কিন্তু স্থানীয় অশিক্ষিত ও সরলপ্রাণ মুসলমানগণ এটিকে প্রকৃত কবর বলে মনে করেন। এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি মুকীমের কাব্যে এ ধরনের আভাস পাওয়া যায়। যাহোক, জনসাধারণ এটিকে বায়জিদ বোস্তামীর মাজার বা দরগা বলে মনে করে থাকে।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মাজার প্রাঙ্গণে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাহাড়ের তলায় তিন গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদটি স্থাপিত হয়। মুঘল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এটিতে শায়েস্তা খান রীতির প্রভাব দেখা যাবে। আওরঙ্গজেবের মসজিদ নামে পরিচিত এই ইমারতটি পূর্বদিকে অলঙ্কৃত। আহমদ হাসান দানী বলেন, পূর্বদিকের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি ঢেউকাটা টারেট এবং ঈষৎ উদ্গাত প্যারাপেট দিয়ে শোভিত। পূর্বদিকের প্রবেশপথগুলো আয়তকারে ফ্রেমে আবদ্ধ এবং খাঁজকাটা খিলান দ্বারা অলঙ্কৃত। খিলানগুলো উভয় পাশে প্রোথিত দুটি স্তম্ভ থেকে উঠে গেছে এবং স্তম্ভগুলো নিচ থেকে উপরের দিকে সরু হয়ে গেছে। প্যারাপেটে দুই সারি খাঁজকাটা অলঙ্করণ দেখা যাবে।

১৫। শেখ ফরিদের ঝরনা বা চশমে, অষ্টাদশ শতাব্দী

চট্টগ্রাম শহরের এক মাইল উত্তরে একটি চশমে বা ঝরনা রয়েছে। এটি একটি প্রাকৃতিক বিস্ময়। কিন্তু স্থানীয় কিংবদন্তি অনুযায়ী সাধকপুরুষ শেখ ফরিদ মাজারের উপর দাঁড়িয়ে সাধনা করার সময় তাঁর চোখ থেকে পানি বের হয়ে এই ঝরনার সৃষ্টি হয়েছে। এই কিংবদন্তি কতটুকু সত্য তা বলা দুষ্কর।

১৬। সুফী আমানত শাহের দরগাহ, উনবিংশ শতাব্দী

কেন্দ্রীয় কারাগারের উত্তরে এবং লালদিঘি ময়দানের পূর্বে হযরত শাহ সুফী আমানত শাহের দরগাহ অবস্থিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আমানত শাহ জীবিত ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। আমানত শাহের পূর্বসূরি ছিলেন ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের হযরত শাহ সুফী মোহাম্মদ এবং উত্তরসূরি ছিলেন আযিমপুরের দায়েরা শরীফের হযরত শাহ সুফী মুহম্মদ দায়েম। আমানত শাহের আধ্যাত্মিক গুণাবলী বহুদিন অজ্ঞাত ছিল এবং বহু দিন জজকোর্টের পিওনের চাকরি করে তিনি আত্মগোপন করেন। তিনি বর্তমানে যেখানে দরগা রয়েছে সেখানে একটি পর্ণকুটিরে বসবাস করতেন। বর্তমানে এই দরগায় বহু ভক্তের সমাগম হয়।

১৭। চট্টগ্রাম শহরের আশেপাশে অবস্থিত দরগাসমূহ

চট্টগ্রামকে বারো আওলিয়ার দেশ বলা হয়ে থাকে। এঁদের মধ্যে আটজন স্বনামধন্য আওলিয়ার নাম জানা যায়। যথা 'বদর আলম, হাজী খলিল, শাহ মসনদ আওলিয়া, শাহ কাত্তাল, শাহ ওমর, শাহ বাদল, শাহ চাঁদ আওলিয়া, শাহ শরিফউদ্দীন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত সাধকপুরুষের মাজার কুমিরায় দেখা যাবে। আনওয়ারা থানার বাট্টালী নামক স্থানে শাহ মোহসিন আওলিয়ার সমাধি রয়েছে। স্থানীয় জনশ্রুতী থেকে ধারণা করা হয় যে, প্রথমে তাকে ঝিওরী নামক স্থানে সমাহিত করা হয় কিন্তু দৈবযোগে তাঁর কবর বাট্টালীতে স্থানান্তরিত হয়। এরূপ অলৌকিক ঘটনা কতটুকু সত্য তা বলা দুষ্কর। বারো আওলিয়ার সমাধি কুমিরায় অবস্থিত বলে অনেকে মন্তব্য করলেও বৃহত্তর চট্টগ্রামে তাদের অনেকে সমাহিত। যেমন শ্রীমতী নদীর পাশে পটিয়ায় শাহ চাঁদ আওলিয়ার সমাধি, চকোরিয়া থানায় শাহ উমর, কাত্তালগঞ্জে শাহ

কাট্টালীর সমাধি রয়েছে। উল্লেখ্য যে, সীতাকুণ্ডু থানার খাদেমপুর গ্রামে শাহজাহানের দরগা নামে একটি শবাধার দেখা যাবে। তিনি সম্ভবত চট্টগ্রামের প্রখ্যাত বারো আওলিয়ার অন্যতম ছিলেন বলে ধারণা করা হয়।

১৮। ইলিশা, বখশী হামিদের মসজিদ, সপ্তদশ শতাব্দী

চট্টগ্রামের জেলা গেজেটিয়ারে বাঁশখালী থানাধীন ইলিশা নামক গ্রামে একটি মসজিদ স্থাপিত হয়। এটি তিনগম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদ। পূর্বদিক থেকে তিনটি খিলানপথে এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে খিলানপথ রয়েছে। খিলানপথটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং কিছুটা উদ্গাত। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অর্ধগোলাকৃতি অবতল মিহরাব রয়েছে।। ছাদে তিনটি গম্বুজ দেখা যাবে, যার মাঝেরটি অপেক্ষাকৃত বড়। উপরে কলসচূড়া দিয়ে গম্বুজ তিনটি শোভিত। পদ্মপাতার ভিতরে উপর থেকে চূড়াগুলো উঠে গেছে।

পূর্বদিকে প্লাস্টারে কুলুঙ্গি দ্বারা বৈপরীত্য সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রাচীর কেটে নানাধরনের নকশা করা হয়েছে।

ইলিশার মসজিদটি হিঃ ৯৭৫/ইং ১৫৬৮ সনে বকশী হামিদ কর্তৃক নির্মিত। পূর্বদিকের প্রধান দরজার উপরে প্রোথিত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, সুলতান আল-আযম সুলায়মানের (১৫৬৪-১৫৭২ খ্রিঃ) শাসনামলে এই মসজিদটি নির্মিত। সুলাইমান একজন প্রতাপশালী কররানী শাসক ছিলেন। বক্শী হামিদের মসজিদটি হিঃ ১১০৪/ ইং ১৬৯২ খ্রিস্টাব্দে পুনঃনির্মিত হয়। এটিতে মুঘল স্থাপত্যের কীর্তির প্রতিফলন ঘটেছে।

১৯। সন্দীপ, দুর্গ ও মসজিদ, সপ্তদশ শতাব্দী

দেলওয়ার খান নামের সুবাদার ইসলাম খানের আমলেও একজন সেনাপতি সন্দীপ থেকে পর্তুগীজ জলদস্যুদের বিতাড়িত করেন। ধারণা করা হয় যে, ফিরিঙ্গিদের উৎপীড়ন ও অত্যাচার বন্ধ করার জন্য তিনি সন্দীপে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। শিহাবুদ্দীন তালিশ বলেন যে, ফুল বিবি শাহেবান এখানে সপ্তদশ শতাব্দীতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট মুঘল আমলের চিরাচরিত রীতিতে নির্মিত আয়তাকার মসজিদ। এতে চারকোনায় চারটি বুরুজ রয়েছে এবং এর পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ২৬′ এবং প্রস্থে ২৬′।

ঢাকা

২৩°৪৩ দক্ষিণ এবং ২৪° ৪৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°.৫৮ পশ্চিম এবং ৯১° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ঢাকা জেলার উত্তরে ময়মনসিংহ, পূর্বে কুমিল্লা, পশ্চিমে বুড়িগঙ্গা, যা ফরিদপুর এবং পাবনা থেকে এ জেলাকে পৃথক করেছে এবং দক্ষিণে ফরিদপুর ও কুমিল্লা জেলা। মূলত গঙ্গার মোহনা থেকে ১০০ মাইল উজানে নদীবিধৌত অঞ্চলে ঢাকা অবস্থান। এ জেলার সাথে সমস্ত জেলার নদীপথে সংযোগ রয়েছে। এ অঞ্চলে মেঘনা, ধলেশ্বরী, লক্ষ্যা এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর সঙ্গমস্থান হওয়াতে ঢাকার গুরুত্ব অনেক বেড়েছে। বর্তমান মহানগরী ঢাকা একসময়ে বুড়িগঙ্গার তীরবর্তী ক্রমবর্ধমান নগরী ছিল এবং এ থেকে বেরিয়ে আসা বিখ্যাত ধোলাই খাল, যা বন্ধ করা হয়েছে বা হচ্ছে, শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত আঁকাবাকা (Criss-cross) ভাবে। আধুনিক মহানগরী (Mega city) বর্তমানে উত্তরে টঙ্গী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে।

প্রাক-মুসলিম যুগের ঢাকার ইতিহাস ধূম্রজালে আবৃত। ঢাকার নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের সূচনা হয় মুসলিম আমলে। প্রাক-মুসলিম যুগের তেমন কোনো ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় না। শুধুমাত্র কিংবদন্তিতেই এর স্থান। প্রাক-মুসলিম যুগের কতিপয় গুপ্ত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে, তাকে imitation coin বলা হয়। এ ছাড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর কয়েকটি প্রস্তরমূর্তি, যা পাথরে লিখিত। প্রাক-মুসলিম আমলের বৌদ্ধ ও হিন্দু শাসকদের কোনো ঐতিহাসিক সম্পদ ঢাকা জেলায় দেখা যাবে না, যদিও বিক্ষিপ্তভাবে হিন্দু মন্দিরের অংশবিশেষ খোদিত কষ্ঠিপাথর, কখনো কখনো শিবলিঙ্গ, বাসুদেবের মূর্তি (চুড়িহাটা মসজিদে প্রাপ্ত তথাকথিত বাসুদেবের মূর্তি প্রসঙ্গে মতভেদ রয়েছে) ইত্যাদি পাওয়া গেছে। বুড়িগঙ্গার মতো ধলেশ্বরী নদী ঢাকা জেলার ভৌগোলিক বিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। কামরূপ রাজ্যের দক্ষিণ্ন সীমানা থেকে ধলেশ্বরী নদীর উৎপত্তি, যার পশ্চিম সীমানা হচ্ছে করতোয়া নদী। সাভারে রাজা হরিশচন্দ্রের ভিটা নামে খ্যাত একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান রয়েছে। এখানে ইদানীং সম্ভোগ রাজ্য নামে এক রাজ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। সম্ভবত সপ্তম ও অষ্টম শব্দাব্দীতে সম্ভোগ রাজ্যের রাজধানী ছিল সাভারে, যা

ঢাকা মহানগরীর উত্তরে। সাভারের ১৫ মাইল উত্তরে রাজাসন নামে আর একটি ঐতিহাসিক স্থানের হদিস পাওয়া গেছে। এখানে একসময় একটি দুর্গ ও প্রাসাদ ছিল। ঢাকা থেকে উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত রাজাসন একটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল। সাভারের প্রখ্যাত রাজা ছিলেন শিশু পাল। এ ক্ষুদ্র পালবংশের সঙ্গে গৌড়ের ক্ষমতাশালী পালবংশের সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয়। নবম শতাব্দীতে বৌদ্ধ পালবংশের দোর্দণ্ডপ্রতাপ ছিল বাংলায়।

ধলেশ্বরীর দক্ষিণে বিক্রমপুর পরগনা। বিক্রমাদিত্যের সাথে বিক্রমপুরের যোগসূত্র রয়েছে। ঢাকার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত বিক্রমপুর পদ্মা এবং মেঘনা নদী দ্বারা বিধৌত। বিক্রমপুর মুসলিম বাংলার সর্বপ্রাচীন ঐতিহাসিক জনপদ। বিক্রমপুরের নামকরণ হয়েছে ধর্মপাল দেবের নাম থেকে যিনি বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করেন। এ সময়ে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যের রাজধানী ছিল রামপাল। মুসলমানদের পূর্ব পর্যন্ত রামপাল রাজধানী ছিল। রামপালের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বহু মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বহু দিঘি, ভগ্নাবশেষ, ঢিপি। বল্লাল সেন যাঁর সময়ে বাংলায় কুলীন (ব্রাহ্মণ) প্রথার প্রবর্তন হয়, বাংলার হিন্দু রাজাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন এবং রামপালে তাঁর প্রাসাদ ছিল। বিক্রমপুর সাভার ছাড়াও ঢাকা জেলার হিন্দুঅধ্যুষিত বলতে বোঝায় ঢাকা শহরের ২০ মাইল উত্তরে অবস্থিত ধামরাই। বংশী নদীর তীরে অবস্থিত ধামরাই কথাটি এসেছে ধর্মরাজিকা থেকে। ধর্মরাজিকা নামে একটি বৌদ্ধ স্তূপ ছিল।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির নদীয়া তথা বাংলা বিজয় থেকে বাংলার প্রকৃত তথ্যনির্ভর ইতিহাসের সূচনা হয়।

১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি নদীয়া বিজয় করেন। এর পর থেকে ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত বাংলাদেশ গভর্নরশাসিত ছিল। ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ দিল্লির তোগলক শাসনামলে বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। এ সময়ে তাঁর রাজধানী ছিল সোনারগাঁও। তিনি ১৩৩৮ থেকে ১৩৪৯-৫০ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত স্বাধীনভাবে সোনারগাঁও-এ শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দে হযরত পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থাপন করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত। ইলিয়াস শাহী বংশের পর ১৩৪১-১৪১৪ খ্রিঃ রাজা গণেশের বংশ (১৪১৪-৩৭ খ্রিঃ), তারপর দ্বিতীয় ইলিয়াস শাহী বংশ (১৪৩৭–৮৬ খ্রিঃ)। আবিসিনিয়া শাসন (১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রিঃ) এবং সর্বশেষে হোসেন শাহী শাসন (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রিঃ) বলবৎ ছিল। এ সময়ে ঢাকায় কতিপয় ইমারত প্রতিষ্ঠিত হয়, বিশেষ করে দ্বিতীয় ইলিয়াস শাহী আমলে সুলতান প্রথম মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে।

ঢাকার ইতিহাসের সূচনা হয় মুঘল যুগে। সম্রাট জাহাঙ্গীর ইসলাম খানকে বাংলায় সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠান এবং তিনি ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী রাজমহল বা আকবরের থেকে ঢাকায় বা জাহাঙ্গীরনগরে স্থানান্তরিত করেন। এর পর থেকে ১৭০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ঢাকা মুঘল বাংলার রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী

খান রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদ বা মুকসুদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। রাজধানীর মর্যাদা হারিয়ে ঢাকা নায়েব নাজিমদের প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হল। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানী লাভ করে এবং এর পর থেকে ইউরোপীয় বণিকদের সমাগম হলে ইউরোপীয় ভাবধারা প্রবর্তিত হয়। কোম্পানির শাসনে ঢাকা বিশেষ ভূমিকা পালন করে যদিও কলকাতা রাজধানী ছিল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জন ঢাকায় আসেন বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামকে নিয়ে যে নূতন প্রদেশ গঠিত হয় তার রাজধানী হয় ঢাকা; কিন্তু ঢাকার এ মর্যাদা বেশিদিন টেকেনি। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বাতিল হলে পুনরায় ঢাকা তার হৃত গৌরব হারিয়ে ফেলে। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর পাকিস্তান আন্দোলন এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে গেলে পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টি পৃথক ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কায়েম হয়। পাকিস্তান দু'টি অংশে বিভক্ত ছিল—পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের রাজধানী ছিল ঢাকা। এর পর ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় এবং ফলে পূর্ববঙ্গ বাংলাদেশ নামকরণে একটি স্বাধীন দেশে রূপান্তরিত হয় এবং এর রাজধানী হয় ঢাকা।

ঢাকার নামাকরণ

ঢাকার নামাকরণ প্রসঙ্গে নানাবিধ মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। ঢাকা শব্দটির 'রুট' বা আদি রূপ কি তা বলা দুষ্কর। তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এগুলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে 'ঢাক' যা একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। রহমান আলী তায়েশ তাঁর 'তারিখ-ই-ঢাকা'য় বলেন যে, মুঘল সুবাদার ইসলাম খান যখন ঢাকায় আসেন ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে বজরায় তখন তিনি এ অঞ্চলে রাজধানী স্থাপনের জন্য উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করছিলেন। বজরা যখন বর্তমান বুড়িগঙ্গা তীরবর্তী স্থানে এসে পৌঁছালে তখন তার স্থানটি পছন্দ হয় এবং বজরা থেকে তিনি যে স্থানে নামেন সেটি ইসলামপুর নামে পরিচিত। বস্তুত তাঁর নাম থেকেই ইসলামপুর নাম হয়েছে এবং এ স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান ও গুরুত্ব দেখে এখানে তাঁর রাজধানী স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তিনি এক অভিনব উপায়ে এর সীমানা নির্ধারণ করেন। এ সময়ে তিনি একদল হিন্দুকে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পূজা পার্বণ পালন করতে দেখেন। এ সময় ইসলাম খানের মাথায় একটি বুদ্ধি আসে এবং তিনি বাদকদের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে বিকট শব্দে ঢাক বাজাতে বলেন। অতঃপর তিনি তাঁর তিনজন অনুচরকে তিনটি ফ্ল্যাগসহ উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমদিকে যতদূর পর্যন্ত ঢাকের শব্দ শোনা যায় ততদূর যেতে বলেন। অতঃপর ঢাকার নামকরণ হয় ঢাক থেকে যার সীমানা নির্ধারিত হয় ঢাকের আওয়াজ দ্বারা। চতুর্দিকে পিলার গেঁথে সীমানা নির্ধারিত হল। বুড়িগঙ্গা ঢাকার দক্ষিণ সীমানা রইল। সাঈদ আওলাদ হাসান তাঁর 'Notes on the Antiquities of Dacca' গ্রন্থে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেন।

দ্বিতীয় প্রচলিত মতবাদ হচ্ছে যে 'ঢাক' নামক একপ্রকার বৃক্ষ থেকে ঢাকা নামের উৎপত্তি হয়েছে যা বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা হয় butea frondosa. জেমস টেলরস এবং Eastern Bengal District Gazetteer-এ উল্লেখ আছে যে, ঢাকায় ঢাক নামক একপ্রকার বৃক্ষ জন্মাত। যদিও মির্জা নাথান তাঁর 'বাহারিস্তান-ই-গায়েবী'তে ঢাকা

নামক বৃক্ষের উল্লেখ করেন যে, তিনি কেবল পাকুড় যেমন পাকুড়তলী এবং সেগুন বা সেগুনবাগিচা বৃক্ষের উল্লেখ করেন। তৃতীয় মতটি আরও বিভ্রান্তিকর। টেলর তাঁর "Topography of Dacca" গ্রন্থে যে মত প্রকাশ করেছেন তা হচ্ছে যে, বল্লাল সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঢাকেশ্বরী মন্দিরের বিগ্রহটি জঙ্গলে ঢাকা ছিল এবং পরে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ থেকে ঢাকার নাম হয়। Eastern Bengal District Gazetteer-এও এ ধরনের মতবাদ পাওয়া যায়। চতুর্থত, জনশ্রুতি বা লোকগাথা অনুসারে বলা হয়েছে যে, ইসলাম খানের শাসনামলে মগ ও ফিরিঙ্গিদের মারাত্মক উৎপাত ছিল এবং তারা আক্রমণ করলে ঢাক পিটিয়ে জনসাধারণদের সাবধান করে দেওয়া হত।

ঢাকার নামাকরণ ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে অথবা মানসিংহ কর্তৃক জনাকীর্ণ এলাকায় লুক্কায়িত ঢাকা বা ঢাকেশ্বরী মূর্তি জনসমক্ষে আনা বিগ্রহ থেকে করা হয়েছে, তা সঠিক নয়। প্রথমত, দানী বলেন, "বল্লাল সেনের সময় (এ বল্লাল সেন স্থানীয় জমিদার, সেন বংশের বংশধর নন)। বিক্রমপুর ঢাকার তুলনায় অনেক সমৃদ্ধ ও সুপরিচিত ছিল এবং ঢাকেশ্বরী মন্দিরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ রয়েছে। ইসলাম খান ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগর প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঢাকেশ্বরী মন্দির সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়।" উপরন্তু, দানী বলেন যে, বর্তমানের ঢাকেশ্বরী মন্দিরের প্রকৃত নির্মাণ তারিখ জানা যায় না। এ প্রসঙ্গে ব্রাডলি বার্ড বলেন, "বর্তমানের মন্দিরটি দু'শ বছরের পুরাতন (সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ) এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন হিন্দু কর্মচারী দ্বারা নির্মিত হয়।" '(Romance of an Eastern Capital)।' মানসিংহ ঢাকেশ্বরী মন্দিরের নির্মাতা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, মানসিংহ কেদার রায়কে পরাজিত ও নিহত করেন। তিনি তাঁর পারিবারিক বিগ্রহটি ঢাকায় আনেন এবং পরবর্তীকালে জয়পুরে নিয়ে যান; কিন্তু তিনি নাকি ঢাকেশ্বরী নামে অনুরূপ একটি বিগ্রহ রেখে যান। কিন্তু এখানে ঐতিহাসিক ক্রমন্বয় বিচার করলে দেখা যাবে যে মানসিংহ, যিনি ঈশা খানের সাথে দ্বন্দযুদ্ধে অবতীর্ণ হন, বাংলাদেশে আকবরের রাজত্বকালে ষোড়শ শতাব্দীতে আসেন অর্থাৎ ঢাকেশ্বরী মন্দির প্রতিষ্ঠার অনেক আগে, সুতরাং বল্লাল সেন অথবা মানসিংহের ঢাকেশ্বরী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার প্রশ্নই আসে না। এ প্রসঙ্গে দানী অপর একটি যুক্তি দেখিয়েছেন। তিনি বলেন, "এ কিংবদন্তি বিশ্বাসযোগ্য নয় কারণ সাধারণত শহর থেকেই বিগ্রহের নামকরণ হয়ে থাকে, বিগ্রহ থেকে শহরের নামাকরণ বিরল ঘটনা।" এন. কে. ভট্টশালী Bengal Past and Present (1927)-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলেন, "একথা বলতে আমার কোনো সংশয় নেই যে ঢাকা শহরের নামকরণে ঢাক অথবা ঢাকেশ্বরী বিগ্রহের যে ভূমিকা তা মুখরোচক গল্প মাত্র। এতে কোনো বাস্তবতা নেই। প্রত্নতাত্ত্বিক জ্ঞানসম্পন্ন যে-কোনো ব্যক্তি ঢাকেশ্বরী মন্দিরের বিগ্রহ দেখে নিশ্চিত করে বলতে পারবে যে এটি বল্লাল সেনের সমসাময়িক নয়।"

দ্বিতীয় প্রস্তাবনা যে, ঢাকার নামের উৎপত্তি হয়েছে 'ঢাক' নামক এক উদ্ভিজ্জ থেকে তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। তৃতীয় প্রস্তাবনা যে 'ঢাক' পিটিয়ে ইসলাম খান ঢাকার সীমানা নির্ধারণ করেন তাও গ্রহণযোগ্য নয় একারণে যে অসংখ্য ঢাকের শব্দ এক মাইল

পর্যন্ত বড় জোর শোনা যাবে, কিন্তু প্রাক-মুঘল যুগে-দানীর মতে ঢাকা পাঁচ মাইল বিস্তৃত ছিল। সুতরাং এ তথ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। চতুর্থত, 'ঢাক বাজিয়ে মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুদের আগমন সম্বন্ধে ঢাকাবাসীদের অবগত করা হত, একথাও ঠিক নয়। কারণ হার্মাদদের উৎপীড়ন ছিল ক্ষণস্থায়ী। পঞ্চমত, ঢাকেশ্বরী নামে যে বিগ্রহ থেকে ঢাকা নামের উৎপত্তি হয়েছে তা আগেই খণ্ডন করা হয়েছে। ষষ্ঠত, ডি. সি. সরকার কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী'র উল্লেখ করে বলেন যে, ঢাকা নামে একটি সতর্ক করার টাওয়ার (watch tower) ছিল, যেখান থেকে মগ ফিরিঙ্গিদের আক্রমণের সময় অধিবাসীদের সাবধান করে দেওয়া হত। জলদুর্গগুলো তৈরি করা হয়েছিল তাদের ধ্বংস করার জন্য অথবা বার ভুঁইয়াদের বিরুদ্ধে কামান দাগার জন্য। এ যুক্তিটিও যে সঠিক নয় তা পূর্বে বলা হয়েছে। ঢাকা একসময় সোনা-রূপার জালির কাজের জন্য খুব বিখ্যাত ছিল। এ ধরনের শিল্পকর্মের নিদর্শন ঢাকা জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা যে ঢাক নামে একধরনের সূক্ষ্ম জালির কাজের নাম থেকে ঢাকা নামের উৎপত্তি। যাহোক, আহমদ হাসান দানী বলেন, "It must, therefore, be admitted that no satisfactory explanation of the origin of the name is so far available. The name is no doubt, a survival of some pre-historic period and in it is concealed some hitherto unknown history of the people who developed this commercial centre on the bank of the Buriganga." বঙ্গানুবাদ, "ঢাকা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু নামটি যে অতি প্রাচীন সে ব্যাপারেও কোনো সন্দেহ নেই এবং এর নামের মধ্যে একটি প্রাচীন জাতির ইতিহাস লুক্কায়িত রয়েছে, যারা বুড়িগঙ্গার অপর পাড়ে একটি ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল।"

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে প্রতীয়মান হবে যে, জাহাঙ্গীরের সময়ে ঢাকার সমৃদ্ধি, গৌরব, জৌলুস শুরু হয়। জেমস ওয়াইজ, স্টিউওয়ার্ট এবং সৃয়ুদ হোসেন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন যে, ইসলাম খান ঢাকা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা এবং এর নামকরণ করা হয় জাহাঙ্গীরের নাম থেকে জাহাঙ্গীরনগর। স্টিউয়ার্ট বলেন, যেহেতু আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরি'তে ঢাকার উল্লেখ নেই সেহেতু এটি খুব প্রাচীন নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এটি প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য আবুল ফজল আকবরের রাজত্বব্যবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে সপ্তম সরকার হিসাবে ঢাকা বাজুর (Dukha Bazoo) কথা বলেছেন। ঢাকা যে মুঘল নগরী সেকথা অস্বীকার করা যাবে না কিন্তু প্রাক-মুঘল যুগে ঢাকার যে অস্তিত্ব ছিল তা ঐতিহাসিকভাবে এবং স্থাপত্যিক নিদর্শনাদির মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়। ঢাকা শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় 'আকবরনামা', 'তুযুখ-ই-জাহাঙ্গীরি', 'বাহারিস্তান-ই-গায়েবী'তে। এমনকি ষোড়শ শতাব্দীতে আব্দুল লতিফ নামে একজন পর্যটক বাংলা মুলুকে আসেন এবং ঢাকায় অবস্থান করেন। ঢাকা প্রাক-মুঘল যুগে বিশেষভাবে যে সুপরিচিত নগরী ছিল তা বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন। রাজধানী প্রতিষ্ঠার পূর্বে ঢাকায় একটি সামরিক ছাউনি ছিল এবং একটি থানা হিসাবে সুপরিচিত ছিল। এ. এম. চৌধুরী ও সাবনাম ফারুকী বলেন, "The pre-Mughal city of Dhaka was turned into a

thana during military operation in the reign of Akbar. The needs of the garrison stationed there gave Dhaka a new breadth of life. But it rose to prominence only after the transfer of the capital of the Subah by Islam Khan Chishti in 1610 when it was named Jahanginagar."

বঙ্গানুবাদ ঃ আকবরের রাজত্বকালে সামরিক অভিযান পরিচালনার সময় ঢাকাকে একটি থানা বা সামরিক ছাউনিতে পরিণত করা হয়। এর সাথে ঢাকা নূতন জীবন লাভ করে। কিন্তু ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা জাহাঙ্গীরনগর নামে নূতন (সুবা-ই-বাংলা) রাজধানীতে পরিণত হল যখন ইসলাম খান রাজমহল থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন।"

এ প্রসঙ্গে এস.এম.তাইফুর বলেন, "In 1602 Raja (Mansingh) shifted his headquarters from Bhawal to Dhaka in order to deal more effectively with the Pathans. At that time Raja's headquarters was at the western part of the city roundabout the Dhakeswari temples which were then the palladium of the city. A pre-Mughal strong fort had already existed in Dhaka in the present central Jail compound which was further strengthened and renovated by the Raja and his successor. His headquarter thus formed a nucleus for the Mughal city of Dhaka, He continued to stay here till 1604.

বঙ্গানুবাদ ঃ 'রাজা (মানসিংহ) ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে ভাওয়াল থেকে সামরিক কার্যালয় ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন যাতে তিনি বিদ্রোহী পাঠানদের সমুচিত শিক্ষা দিতে পারেন। সে সময় রাজার কার্যালয় শহরের পশ্চিমাঞ্চলে যেখানে ঢাকেশ্বরী মন্দির রয়েছে, সেখানে ছিল। কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে প্রাক-মুঘল আমলের একটি দুর্গ ছিল, যা রাজা সংস্কার করে সুরক্ষিত করেন। এভাবে সামরিক ছাউনি বা থানা হিসাবে ঢাকার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তিনি (রাজা মানসিংহ) ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করেন।"

ঢাকা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে যেমন মতবিরোধ রয়েছে অনুরূপ মতানৈক্য দেখা যাবে কত খ্রিস্টাব্দে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয় তা নিয়ে। গ্লাডউইন বলেন যে, ইসলাম খান ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে আফগান দলপতি ওসমান খানকে পরাজিত করে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। টেলর, হান্টার, আওলাদ হাসান, রাইট (Wright), এস এন ব্যানার্জী গ্লাডউইনের মন্তব্যকে সঠিক হিসাবে ধরে নিয়েছেন। অন্যদিকে 'বাহারিস্তান-ই-গায়েবী'র প্রণেতা মির্জা নাথান বলেন যে, "ইসলাম খান ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাকে রাজধানীর মর্যাদা দেন।" পর্যটক আবদুল লতিফ বলেন যে, জাহাঙ্গীর ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দের ২০শে মার্চ তারিখে ইসলাম খানকে বাংলায় সুবাদার নিযুক্ত করেন এবং তিনি এ বছরের ৭ই ডিসেম্বর রাজমহল থেকে ঢাকার দিকে রওয়ানা হন। ৮ই ডিসেম্বর তিনি ঢাকায় পৌঁছান। ইসলাম খান ১৬০৮ থেকে ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সুবাদার ছিলেন। ১৬১০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে মির্জা নাথান জাহাঙ্গীরনগরের উল্লেখ করেননি, কেবল ঢাকার কথা বলেন। প্রতীয়মান হয় যে ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দ ঢাকার নাম পরিবর্তন করে জাহাঙ্গীরনগর রাখা হয়। এস. এম. তৈফুরের মতে, ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর এক

বছর পূর্বে ইসলাম খান ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার নাম পরিবর্তন করে জাহাঙ্গীরনগর রাখেন। রহমান আলী তায়েশ 'তাওয়ারিখ-ই-ঢাকা' এবং আহমদ হাসান দানী তাঁদের গ্রন্থে (Dhaka) ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী স্থানান্তর করে জাহাঙ্গীরনগর নামকরণ করার উল্লেখ করেন।

তিলোত্তমা ও গৌরবমণ্ডিত ঢাকা নগরীর ঐতিহ্য ও জৌলুস, সান-সওকাত কিরূপ ছিল তা কয়েকজন পর্যটক ও ঐতিহাসিকের ভাষ্যে দেখা যায়। আপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত, অখ্যাত ও অল্প পরিসরসম্বলিত একটি মুঘল সামরিক ছাউনি থেকে সুবা-ই-বাংলার রাজধানী হিসাবে ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগরের রূপান্তর যেন অলৌকিক ঘটনা। আলাউদ্দীনের চিরাগের মতো এটি হঠাৎ করে যেমন সৌন্দর্যমহিমা, গৌরব ও স্থাপত্যকীর্তিতে ভরপুর একটি অবিশ্বাস্য নগরীতে পরিণত হল। ইসলাম খান যখন বজরায় চড়ে এ শহরে অবতরণ করেন তখন এটি ছিল ঘুমন্ত। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাজধানীর মর্যাদা পেয়ে ঢাকা যেন জেগে উঠল। সামাজিক বিবরণ, আচার-অনুষ্ঠানের আধিক্য ও জৌলুস, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রচারের ফলে জাহাঙ্গীরনগর 'প্রাচ্যের নগরীগুলোর রানী' ('Queen of the cities of the East') হিসাবে পরিগণিত হলো। ভট্টশালী বলেন, "মির্জা নাথানের ইতিহাস গ্রন্থের পাতা থেকে ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঢাকা নগরীতে প্রবেশের জন্য নদীপথে সম্পর্কে জানতে পারা যায়।" ইসলাম খান প্রায় ৫০,০০০ সৈন্য নিয়ে ঢাকায় আসেন। এর মধ্যে অবশ্য মাঝি, মাল্লা, কারিগরও ছিল। ক্রমশ এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১ লক্ষে দাঁড়ায়। এর ফলে সীমান্ত শহর (out post) হিসাবে ঢাকা রাতারাতি একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরীতে পরিণত হলো। জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পেলে তাদের বাসস্থানের জন্য গৃহ-নির্মাণ হতে থাকে এবং অচিরেই জাহাঙ্গীরনগর দিল্লি, আগ্রা ও লাহোরের প্রতিদ্বন্দ্বী নগরী হয়ে উঠল।

'বাহারিস্তান-ই-গায়েবী'তে মির্জা নাথান ঢাকা নগরীর যে বিবরণ দেন এন. কে. ভট্টশালী তাঁর নিখুঁত বর্ণনা দেন : "যে স্থানে ধোলাইখাল (মাটি ফেলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে) দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে ডোমরার দিকে ধাবিত হয়েছে এর উভয় প্রান্তে বেগ মুরাদ খানের দু'টি দুর্গ রয়েছে। ইসলাম খান এর একটির দায়িত্ব অর্পণ করেন ইতিমাদ খানের উপর এবং অপরটি নাথানের দায়িত্বে রাখা হল। নাথান পশ্চিম দিকে অবস্থিত দুর্গের সংস্কার করে বাসস্থান নির্মাণ করেন। ধোলাই খালের এই শাখাটি ঢাকা শহরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ খাল দিয়ে তিনি ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম খানের বাসভবন যাবার পথে ঢাকার অপূর্ব দৃশ্য দেখেন। ধোলাই খালের মুখে নির্মিত দুর্গ থেকে মির্জা নাথান বের হয় বজরায় একটি পাকুড় (পাকুড়তলী) গাছের কাছে আসেন। মির্জা নাথান বলেন যে, এই পাকুড় গাছটি ঢাকাকে পুরাতন ও নতুন ঢাকায় বিভক্ত করেছে এবং সেই সাথে তাঁর বাসস্থান এবং ইসলাম খানের বাসভবনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত রাস্তায় উপর পাকুড়তলী নামে একটি মহাল্লা রয়েছে।"

মুঘল শাসনামলে সুবাদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকা নগরীর বিবর্তন হতে থাকে। আহমদ হাসান দানী বলেন, বাংলায় মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক অমূলে পরিবর্তন লক্ষ করা যায় এবং এ শহরের সংস্কৃতিতে সেনাবাহিনী এবং তাদের সদস্যদের প্রভাব বেশি ছিল। নূতন জনগোষ্ঠী আগমনের ফলে প্রাক-মুঘল যুগের আচার-অনুষ্ঠান, হাবভাবের গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং নূতন রাজকীয় মুঘল যা দিল্লি, আগ্রা, লাহোরে দেখা যাবে, পরিবেশ ও সুচারুতা পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে, বাংলার সাথে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ ঘটে, যার ফলে সমাজ-সংস্কৃতি, স্থাপত্য ও শিল্পকলার প্রভূত প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রাক-মুঘল স্থাপত্যরীতিকে মুঘল স্থাপত্যকলার প্রভাবে স্তিমিত হয়ে পড়ে, যা গম্বুজ, খিলান, ভল্ট-এ দেখা যাবে।

ইসলাম খান ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় সুবাদারী শুরু করেন এবং তাঁর আমল থেকে ১৭১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত মুর্শিদকুলী খানের শাসনামল পর্যন্ত মুঘল আধিপত্য বাংলায় অক্ষুণ্ন ছিল। এ সময়ের মধ্যে ১৬০৮ থেকে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খানের সুবাদার নিযুক্তির পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা বাংলার রাজধানী ছিল। কিন্তু মুর্শিদকুলী ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন। অবশ্য ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা নায়েব নাযিম দ্বারা শাসিত হতে থাকে তার কারণ মুর্শিদকুলী দেওয়ানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। এ ছাড়া ১৬৩৯ থেকে ১৬৫৯ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজনৈতিক কারণে শাহ সুজা রাজমহলে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে উত্তরাধিকার সূত্রে যুদ্ধ পরিচালনার পরিকল্পনা করেন। ইসলাম খানই ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে রাজমহল থেকে রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান যুবরাজ থাকাকালীন ঢাকায় আসেন এবং ইব্রাহিম খানের প্রাসাদে বসবাস করেন। ইসলাম খানের যে প্রাচীন দুর্গ ছিল তা এখন দেখা যাবে না। শুধুমাত্র 'পূর্বের দরজা' (দরওয়াজা) এবং পশ্চিম দরজা বা (পশ্চিম দরওয়াজা) নামে দু'টি ফটকের নাম শোনা যায়। এ ছাড়া শাহী মসজিদ (চকবাজর), বাদশাহী বাজার (চকবাজার), জীমখানা (হাতি রাখার জায়গা), আতিশখানা (গোলবারুদ রাখার জায়গা বা অস্ত্রাগার), মাহুতটুলী (মাহুত বা হস্তীচালকদের মহল্লা) নামে অনেক স্থান মুঘলদের অস্তিত্বের পরিচয় বহন করে।

শাহ সুজার আমলে রাজধানী ঢাকা থেকে রাজমহলে স্থানান্তরিত হয়েও এ সময়ে ঢাকায় কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ইমারত নির্মিত হয়, যেমন ইদগাহ্, বড় কাটরা, চুড়িহাট্টা মসজিদ। মীরজুমলার সময়ে ইদরাকপুর দুর্গ (মুনসীগঞ্জ) নির্মিত হয়। যাহোক, ঢাকার ইতিহাসের গৌরবমণ্ডিত অধ্যায়ের সূচনা হয় দুই দফায় শায়েস্তা খানের সুবাদারীর সময়। যুবরাজ আযমের স্বল্পকাল অবস্থানকালে ঢাকায় বিশেষ কোন ইমারত নির্মিত হয়নি। কেবলমাত্র তিনি লালবাগ বা আওরঙ্গাবাদ দুর্গের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে সক্ষম হন। যাহোক, সৃযূদ হোসেনের ভাষায়, "ঢাকার ইতিহাস সুবাদার শায়েস্তা খানের শাসনামলে শুধুমাত্র দীর্ঘতমই ছিল না, সবদিক থেকে স্মরণীয় ছিল, কারণ এ সময়ে এখানে অসংখ্য মসজিদ এবং অন্যান্য ইমরাত (ছোটকাটরা), মাজার, স্মৃতিসৌধ নির্মিত

হয়।" তাঁর সময়ের স্থাপত্যকলা এমন একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রূপ গ্রহণ করে যে তা শায়েস্তাখানী নামে পরিচিত হয়, যা বর্তমান ঢাকার প্রাচীন মুঘল ইমারতসমূহে লক্ষণীয়। দানী শায়েস্তাখানী রীতি প্রসঙ্গে তাঁর Muslim Architecture in Bengal-এ বিষদ আলোচনা করেন। ব্রাডলি বার্ডের ভাষায়, "তাঁর (শায়েস্তা খান) শাসনামলে ঢাকার সর্বোচ্চ সমৃদ্ধি দেখা যায়। নূতন পরিকল্পনায় অসংখ্য ইমারত নির্মিত হতে থাকে, যাতে মুসলিম শিল্প সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটে। ঢাকার অপর কোনো সুবাদার স্থাপত্যরীতি দ্বারা অবিস্মরণীয় হতে পারেননি। বস্তুত, ঢাকা শায়েস্তা খানের মহনগরী ছিল। শায়েস্তা খান যখন পশ্চিম দরজা দিয়ে ঢাকা ত্যাগ করেন তখন একটি শিলা ফলক গেঁথে দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হয়। শিলালিপিতে বলা হয় "যতদিন পর্যন্ত পুনরায় চাল ১ টাকায় ৮ মণ বা ৩২০ সের না পাওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ দরজা খোলা হবে না।" এস. এম. তাইফুর বলেন যে, ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে চালের দাম বেড়ে যায় এবং ১ টাকায় ১৬ সের হিসাবে বিক্রি হতে থাকে। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে নবাবদের চেষ্টায় পুনরায় চাল টাকায় আট মণ বিক্রি হতে থাকে।

দ্বিতীয় ইব্রাহিমের (১৬৮৯-৯৭) সুবাদারীর সময় বুড়িগঙ্গার অপর পাড়ে জিঞ্জিরায় একটি প্রাসাদ নির্মিত হয়।

জনশ্রুতি অনুযায়ী সিরাজউদ্দৌলার পতন হলে, দানীর মতে, তাঁর স্ত্রী এবং খালা ঘসেটী বেগম এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জিঞ্জিরা প্রাসাদ এখনও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। আওরঙ্গজেবের পৌত্র আযিমুসসান ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় ইব্রাহিমের স্থলাভিসিক্ত হলে তিনি পোস্তায় একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। আযিমুসসানের প্রত্যাগমন এবং মুর্শিদকুলী খানের শাসনামলে রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হলে ঢাকার গৌরব হ্রাস পেতে থাকে। ঢাকার রাজনৈতিক গুরুত্ব কমে যায় কারণ এটি ডেপুটি গভর্নর বা নায়েব-নাযিম দ্বারা শাসিত হতে থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীর (১৮০৮) গোড়ার দিকে চার্লস ডি' ওয়েলি নামে একজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকায় বসবাস করতেন। তিনি একজন প্রতিভাবান চিত্রকরও ছিলেন। তিনি স্বচক্ষে ঢাকার ধ্বংসাবস্থায় অথবা অক্ষত অবস্থায় বহু ইমারত দেখেন এবং জলরং দিয়ে স্কেচ করেন। তাঁর চিত্রগুলো ছিল অসাধারণ কারণ এগুলো দেখে অধুনালুপ্ত বহু ইমারত সম্বন্ধে ধারণা করা যায়, যেমন লাডলি বেগমের সমাধি, নহবতখানা ইত্যাদি। নাজমা খান মজলিস তাঁর "Dhaka in early Nineteenth century Paintings"-এ ডি' ওয়েলির চিত্রকর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং 'Antiqoities of Dhaka'. শীর্ষক তাঁর স্কচ বই-এ অসংখ্য মসজিদ, সমাধি, সৌধ, ফটক, সেতু, দুর্গ, বাসস্থান এবং বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত নাগরিকদের চিত্র অঙ্কনে সক্ষম হন। এ গ্রন্থটি ১৮২৪ থেকে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের এক প্রকাশক প্রকাশ করেন। ২৯টি জলরঙের চিত্র ছিল তাঁর গ্রন্থে, এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য টঙ্গী সেতুর ধ্বংসাবশেষ, লালবাগ দুর্গের বহিঃপ্রাচীর, বড় কাটরা, ছোট কাটরা, শাহী মসজিদ, তাঁতবুননরত তাঁতি।

চার্লস ডি' ওয়েলি ব্যতীত তাঁর সাথী জর্জ চেনারী (George Chinnery) ও চিত্রকর ছিলেন এবং ঢাকার প্রাচীন ইমারতের কয়েকটি চিত্র অঙ্কন করেন। চালর্স ডি' ওয়েলির সাথে ঢাকার নায়েব নাযিম নবাব নসরত জঙ্গের বন্ধুত্ব ছিল এবং ডি', ওয়েলি নুসরত জঙ্গের প্রাসাদ সম্বন্ধে বলেন যে, "তিনি অপূর্ব নকশা খোচিত অনিন্দসুন্দর প্রাসাদে বসবাস করতেন। তাঁর চালচলন ছিল অভিজাত্যপূর্ণ এবং তাঁর দরবার হল ইংরেজি প্রিন্ট বা চিত্র এবং তৈলচিত্র দ্বারা সুসজ্জিত ছিল।"

১৮৪০-এ জেমস টেলর ঢাকায় সিভিল সার্জেন ছিলেন এবং তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'Topography and Statistics of Dacca'-তে তিনি ঢাকার ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন। তিনি ঢাকাকে 'বাহান্ন বাজার' এবং 'তেপ্পান্ন গলির' শহর বলে অভিহিত করেন। ঢাকায় যে মিছিল বের হত তা ছিলে খুবই আকর্ষণীয়। ডি' ওয়েলির চিত্রে মুহররম ও ঈদের মিছিলের চিত্র দেখা যায়। টেলরও নানাধরনের কুচকাওয়াজ ও উৎসবের উল্লেখ করেন। এ ছাড়া শায়েস্তা খানী সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে, "সে সময়ে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্ভাব ছিল এবং তাদের মধ্যে দাঙ্গা বাধত না।"

সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঢাকা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ তথা স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হলে ঢাকার সিপাহীগণ অংশগ্রহণ করে। কথিত আছে যে, বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্কে অনেক সিপাহীকে হত্যা করা হয়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা পুনঃজন্ম লাভ করে যখন নবগঠিত আসাম ও পূর্ববঙ্গ নিয়ে বঙ্গভঙ্গের পর নূতন প্রদেশের রাজধানী হল। এর সাথে এতদঅঞ্চলের মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্টিত হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থা বেশি দিন স্থায়ী ছিল না, কারণ কট্টরপন্থী হিন্দু বেনিয়াদের ষড়যন্ত্রে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রোধ হয় এবং রাজধানী হিসাবে ঢাকা তার অতীত গৌরব ও মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। এ প্রসঙ্গে ব্রাডলী বার্টের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "Today (A.D 1906) Dacca stands at the parting of ways. Behind it, cities of the past, with its three centuries of memories that crowd close round its crumbling mosques and places. Before it, at the beginning of the twentieth century there has suddenly dawned a new future, fraught with great possibilities to the capital of a newly created province under the British rule. Raised suddenly to eminence by Islam Khan, it held almost for a century its proud position as capital of Bengal. Then suffering eclipse as suddenly as it had raisen to fame for the two centuries (A.D 1717 to 1905) it lay part from the stress and hurry of great events, its splendid tradition neglected and forgotten. In later years under the British rule it has occupied but a humble place as the headquarter of one of the many districts of Eastern Bengal. Now after its long sleep, there has come a re-awakening due to partition of Bengal and once more the name of Dacca figures among the capitals of the East."

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ হলে ঢাকার মর্যাদা সাময়িকভাবে পুনরায় ফিরে আসে কিন্তু ৬ বছর পরে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তা পুনরায় লোপ পায়। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার নবাব সলিমউল্লাহর পৃষ্টপোষকতায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গভঙ্গ রোধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পূর্ববঙ্গ আসামের মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্য ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শের-এ বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের ভাষায়, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ছিল একপ্রকার কনসেসন্স।" ("a concession to the Muhammadan sentiment against the injustice done to the Community by the annulment of the partition of Bengal.")

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে স্বাধীন পাকিস্তানের জন্ম। তখন থেকে ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। এ অবস্থা ১৯৭১ খ্রিঃ পর্যন্ত চলতে থাকে। অতঃপর আর্থিক বৈষম্যের ফলে পাকিস্তানের শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রথমে স্বাধিকার এবং পরে স্বাধীনতা আন্দোলন সুরু হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং বাংলাদেশ হিসাবে একটি নূতন স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম হয়। ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে।

কলকাতার মত ঢাকার জৌলুস নেই. কারণ কলকাতা ইংরেজ শাসকদের সৃষ্ট আধুনিক নগর এবং ঢাকা মুঘল সুবাদারদের শাসিত ঐতিহাবাহী নগরী। এতদসত্ত্বেও বহু পর্যটক ঢাকা পরিভ্রমণ করে ঢাকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন। জাহাঙ্গীরের দরবারে আগত থমাস রো বলেন যে, বাংলার দুটি শহর খুবই সুপরিচিত—রাজমহল এবং ঢাকা (Dhaka)। ১৬১৬-১৯ খ্রিস্টাব্দে এডওয়ার্ড টেরি ঢাকার মুঘল স্থাপত্য-কীর্তিগুলোর বিবরণ দেন, তিনি বলেন, "Their (Mughal) buildings are generally base except it be their cities wherein I have observed many faire piles, many of their houses built high and flat on the toppe from where in cool seasons of the day they take in fresh ayre; materials of the best buildings are bricks or stone, well squared and composed. The Mahomedans have faire Churches (mosques) which they call mosquits, built of stone." টেরির মন্তব্য যে ইমারতগুলো পাথরের তৈরি তা সত্য নয়। মূলত ইমারতগুলো ইটের তৈরি এবং এগুলো সংরক্ষণ করার জন্য পাথরের আচ্ছাদন দেওয়া হত, অবশ্য দূর থেকে দেখলে, যেমন ছোট সোনা মসজিদ, কুসম্ভা মসজিদ, পাথরের তৈরি বলে মনে হবে। সম্ভবত লালবাগ দুর্গের অভ্যন্তরে বিবি পরির সমাধিসৌধ ব্যতীত অপর কোনো ইমারত পাথরের তৈরি নয়।

শাহ সুজার শাসনামলে প্রখ্যাত পর্তুগীজ পর্যটক ম্যানরিক ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় আসেন। তিনি মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত ঢাকাবাসীর দুর্দশার কথা লিখে গেছেন। তিনি উল্লেখ করেন মগ রাজা তিন দিন নগরী আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করেন, যার ফলে বাসিন্দাদের দুর্দশার সীমা ছিল না। শহরের কয়েকটি স্থানে আগুন জ্বালিয়ে, নবাবের প্রাসাদ আক্রমণ করে ক্ষতিসাধন করেন। নৌবাহিনীর প্রস্তুতি শুনে মগরাজা তড়িঘড়ি করে সুন্দর নগরীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে বজরায় পলায়ন করেন।

ম্যানরিক আরও বলেন যে, "এটি (ঢাকা) বাংলার প্রধান নগরী এবং নবাব বা ভাইসরয়ের প্রধান কার্যালয়। নবাব সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং সম্রাটের পুত্র অথবা কোনো নিকট আত্মীয়কে সুবাদার হিসাবে পাঠানো হত। এ নগরী গঙ্গার (বুড়িগঙ্গা) তীরে বিশাল সমতলভূমি নিয়ে গঠিত এবং নদী বরাবর $১\frac{১}{২}$ লীগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। একদিকে মানশ্বর অন্য দিকে নারানদিয়া (নারিন্দা) এবং ফুলগাড়ি (ফুলবাড়ি) পর্যন্ত শহরে লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত।" ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গে ম্যানরিক বলেন, "ব্যবসা-বাণিজ্য এত সম্প্রসারিত ছিল যে বছরে ১০০টি পণ্যদ্রব্যসম্ভারে নৌকা বা বজরা সাজানো হত। এ সমস্ত পণ্যদ্রব্যের মধ্যে বিশেষভাবে চাল, চিনি, মোম এবং অনুরূপ দ্রব্যসামগ্রী থাকত। বেশির ভাগ কাপড়ই ছিল সুতির এবং এগুলো এত সূক্ষ্ম ও নিখুঁতভাবে তৈরি করা হত, যা তুলনাবিহীন। সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং মূল্যবান মসলিন তৈরি হত এদেশে। এ সমস্ত মসলিন ৫০ থেকে ৬০ গজ লম্বা এবং ৭ থেকে ৮ হস্তমাপ প্রস্থ। বর্ডারগুলো সোনালি অথবা রূপালি সুতা দিয়ে অলঙ্কৃত থাকত। এ সমস্ত মসলিন এত সূক্ষ্ম ও সুন্দর ছিল যে বণিকেরা দু'বিঘত একটি ফাঁপা বাঁশের মধ্যে এগুলো রাখতে পারত এবং খোরাসান, পারস্য, তুরস্ক এবং অন্যান্য দেশে রপ্তানি করত। জিনিসপত্র খুব সস্তা ছিল।" শাহ সুজার আমলে ম্যানরিক উল্লেখ করেণ যে, "এ সময় ঢাকায় এত অর্থের সমাগম হয় যে সেগুলো না গুনে ওজনে ব্যবহৃত হত। খাদ্যদ্রব্য, জিনিসপত্র, পাখি, জীব-জন্তু খুবই সস্তা ছিল। চার আনায় ২০টি ঘুঘু পাওয়া যেত।"

সপ্তদশ শতাব্দীতে ঢাকায় বেশ কয়েকজন বিদেশী পর্যটকের আর্বিভাব হয়। এঁদের মধ্যে পিটার মান্দি অন্যতম। ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকাকে 'Dhaccas' বলেছেন। তিনি পাটনা পর্যন্ত আসেন, ঢাকায় আসতে পারেননি। ম্যানডেলসলো ঢাকাকে Daka বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, "প্রায় সমস্ত ঘরবাড়ি বাঁশ দিয়ে তৈরি করে ছাদ কাদা দিয়ে লেপা থাকত।" অপর একজন পর্যটক থিবিনট দোচালা ও চৌচালা ছাদবিশিষ্ট ইমারতের উল্লেখ করেন। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে শায়েস্তা খানের প্রথম দফার সুবাদারীর সময় এদেশে আসেন প্রখ্যাত পর্যটক ট্যাভারনিয়ার। তিনি বলেন, "আমি যখন ঢাকায় আসি তখন সুবাদার নবাব শায়েস্তা খান (Cha-est-Kan) আরাকানের মগদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেরত ছিলেন।" সপ্তদশ শতাব্দীতে শায়েস্তা খানের আমলে ঢাকায় নির্মিত স্থাপত্যকীর্তি সম্বন্ধে ট্যাভারনিয়ার বলেন, "ঢাকা একটি অনিন্দ্যসুন্দর শহর, যা লম্বালম্বিভাবে প্রসারিত। এখানে নদীতীরে গৃহনির্মাণের প্রতিযোগিতা হত। গভর্নরের ভবন ইটের তৈরি হত এবং সাধারণ লোকের ঘরবাড়ি খড়, কাঠ ও বাঁশ দিয়ে তৈরি হত। থমাস বাউরি নামে অপর একজন ইউরোপীয় পর্যটক ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খানের আমলে ঢাকায় আসেন। তিনি বর্ণনা দেন এভাবে, "Dhaka is an admirable city for its greatness, for its maginficence building and multitude of inhabitants. A very great and potent army is kept here in constant sallary and in readiness as also, many large, strong stately elephants, trained up for a warlike service which are kept continually near the Pallace. This is a source of military strength to the kingdom

for nobody can ride in state unless they can keep 500 horses ready for princes' service."

ঢাকার স্বর্ণযুগ বলতে শায়েস্তা খানের সুবাদারীকে বোঝায়। তিনি প্রথমে ১৬৬৪ থেকে ১৬৭৭ এবং পরে ১৬৭৯ থেকে ১৬৮৮ পর্যন্ত দ্বিতীয় দফায় শাসনকাল পরিচালনা করেন। তাঁর দ্বিতীয় দফার সুবাদারীর সময় প্রখ্যাত ইউরোপীয় পর্যটক উইলিয়াম হেজেস ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ঢাকায় আসেন। তিনি নবাব শায়েস্তা খানের সাথে সাক্ষাতের যে বিবরণ দেন তা এরূপ : "সকাল নটায় আমি নবাবের সাথে সাক্ষাতের জন্য রওয়ানা হয়, তিনি আধ ঘণ্টা পরে একজন পরিচারকের মাধ্যমে আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এক মখমলের চান্দোয়া দিয়ে ঘেরা একটি ক্যানোপি বা প্যাভেলিওনের উপর উপর্বিষ্ট ছিলেন। চান্দোয়াটি সোনা ও রূপার ভেলভেট দিয়ে তৈরি। প্যাভেলিয়নটি চারটি বাঁশের খুঁটির উপর নির্মিত। বাঁশের দণ্ডগুলো সোনালি জরি দিয়ে অলঙ্কৃত।"

১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে বিশপ রেজিনাল্ড হেবার ঢাকায় আসেন। তখন ঢাকার খুবই দুর্দিন। রেনেলের আঁকা নদীটি অনেক দূরে সরে গেছে এবং ক্ষীণ হয়েছে। দুর্দশার বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "Dacca, Mr Master says, is, as I supposed, merely the wreck of its ancient grandeur. Its trade is reduced to the sixtieth part of what was and all its splendid buildings, the castles of its founder Shah Jahanguire, the noble mosque he built, the palaces of the ancient Nawabs, the factories and churches of the Dutch, the French and the Portuguese nations are all sank into ruins and overgrown with jungles: the Hindoo and Mohammadan population, Mr Master still, rates at 300,000, certainly no immoderate calculation, as he says, he has ascertained that there are 90,000 houses and huts."

বিশপ হেবার ঢাকার স্থাপত্যকীর্তির বিবরণ রেখে গেছেন। তাঁর ভাষায়, 'দুর্গটি লালবাগ। আমি লক্ষ করি এবং দেখি যে ইটের তৈরি যাতে প্রাচীরের কিছু নমুনা এখনও রয়েছে। স্থাপত্যকলা দেখে মস্কোর (ক্রেমলিনের) কথা মনে পড়ে। গ্রিসিয়ান ধরনের বাড়িঘরগুলো প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অনেকগুলো নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তিলোত্তমা ঢাকা মহানগরীর ক্রমবিকাশ হয়েছে চারশত বছর ধরে (১৬০৮-২০০০)। খালিদ বাঙ্গালী নামে এক কবি ঢাকার এরূপে বর্ণনা দেন :

"Charming is thy glory and attractive thy demeanour.
Thou art the epitome of the prosperous life of Mughal day.
Thy outward behaviour is different from what thou concealed
In thy acts are hidden the cultures of Asia
Of Dhaka, the Garden city, the Queen (of the cites) of the East."

১। লালবাগ দুর্গ ঃ (ফোর্ট আওরঙ্গাবাদ), ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দ (২১)

বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর বিভাগের প্রাক্তন পরিচালক নাযিমউদদীন আহমদ প্রখ্যাত স্থাপত্যিক আকর্ষণ (landmark) লালবাগ দুর্গ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "But the most imposing but unfortunately incomplete monument of this period is the Lalbagh Fort or Fort Aurangabad, situated in the old part of the city overlooking the Buriganga river on the south." অর্থাৎ যদিও অসম্পূর্ণ তবুও এ যুগের (শায়েস্তা খান) সর্বাপেক্ষা বৃহদাকার ও আকর্ষণীয় ইমারত হচ্ছে লালবাগ দুর্গ অথবা ফোর্ট আওরঙ্গাবাদ যেটি দক্ষিণে বুড়িগঙ্গার তীরে পুরাতন শহরে অবস্থিত। ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব তৃতীয় পুত্র শাহজাদা মোহাম্মদ আযমকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠান এবং ঢাকায় এসে তিনি লালবাগ অঞ্চলে একটি দুর্গ প্রাসাদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কাজের কিছুদূর অগ্রগতি হবার পর, বিশেষ করে প্রাচীরবেষ্টনি ও দক্ষিণ দিকের তোরণ নির্মাণের পর আকস্মিকভাবে আওরঙ্গজেব মোহম্মদ আযমকে দিল্লিতে ডেকে পাঠান এবং মারাঠাদের বিরুদ্ধে সমরাভিযানে অংশ নিতে বলেন। রাজাদেশ পেয়ে শাহাজাদা আযম দুর্গের কাজ অসমাপ্ত রেখে দিল্লি ফিরে যান। যাবার পর পরবর্তী গভর্নর এবং তাঁর শ্বশুর শায়েস্তা খানের উপর নির্মাণকাজের দায়িত্ব অর্পণ করে যান। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে সুবাদার শায়েস্তা খান লালবাগ দুর্গের নির্মাণকাজ সমাপ্ত করতে পারেননি। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, শাহজাদা আযমের সাথে তাঁর কন্যা বিবি পরির বিবাহ হয় কিন্তু আকস্মিকভাব তাঁর কন্যার মৃত্যু হলে তিনি দুর্গের কাজ অসমাপ্ত রাখেন। অবশ্য একথা নিশ্চিত যে শাহজাদা আযম এবং নবাব শায়েস্তা খান লালবাগ দুর্গে বসবাস করতেন।

পুরাতত্ত্ববিদ মোহাম্মদ যাকারিয়া লালবাগ দুর্গের বিস্তারিত বিবরণ দেন : "পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এ দুর্গের আয়তন ২০০০ × ৮০০ ফুট। চারদিকে ইষ্ট নির্মিত উঁচু প্রাচীরবেষ্টিত ছিল এই দুর্গ। প্রায় ৩′–৯″ ইঞ্চি পুরু দেয়ালাগুলির উচ্চতা উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম দিকের কিছু অংশে প্রায় ১৫ ফুট, দক্ষিণ দিকের দেয়ালে বেশ বৈচিত্র্য আছে। দক্ষিণ দেয়ালের পূর্বভাগে দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের কাছে প্রধান তোরণ অবস্থিত। দক্ষিণ দেয়ালে দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ পর্যন্ত পরপর ৫টি প্রায় আট কোনাকার বুরুজ (bastion) ছিল। কামান রাখা ও দাগার সুবিধার জন্য বুরুজগুলি নির্মিত হয়েছিল। পাশের সমতলভূমি থেকে দক্ষিণ-প্রাচীরের উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট। দেয়ালে উপরের ৪ ফুট অংশ বাইরের দিকে আস্তরের উপর মার্লন (merlon) নকশায় অলঙ্কৃত ছিল। এই ২০ ফুট উঁচু প্রাচীরের ৪ ফুট পিছনে ৩$\frac{১}{২}$ ফুট পুরু ও ১২ ফুট উঁচু আর একটি প্রাচীর ছিল। সেই প্রাচীরের কিছু অংশ দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এখনও টিকে আছে। কোনো কোনো স্থানে যেমন দক্ষিণ দেয়ালের পূর্বাংশে ও পশ্চিম দেয়ালের পশ্চিমাংশে এই অতিরিক্ত ১২ ফুট উঁচু দেয়াল মূল প্রাচীর থেকেই সোজা উপরে উঠে

আছে। কামান বসানোর জন্য যে বুরুজগুলি নির্মিত হয়েছিল সেগুলির নিচের অংশ প্রতিরক্ষা দেয়াল পর্যন্ত মাটি দিয়ে ভরাট করে দেওয়া হয়েছিল।"

দিল্লি, আগ্রা, লাহোরে নির্মিত মুঘল দুর্গ স্থাপত্যরীতির অনুকরণে ঢাকায় যে প্রাসাদ দুর্গের নির্মাণকাজ শুরু হয় তা অসমাপ্ত থেকে যায়। দুর্গপ্রাচীরের দক্ষিণদিকে যে প্রতিরক্ষা দেয়াল ছিল তাকে অবলম্বন করে দুর্গের দক্ষিণ ভাগে বুরুজের নিচে ও অন্যান্য অংশে অনেকগুলো কক্ষ নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু সংস্কারের অভাবে এ সমস্ত কক্ষ নষ্ট হয়ে যায় এবং ইংরেজ আমলে এগুলো মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়। পশ্চিমদিকের বুরুজের কাছে মাটির নিচে অপর একটি কক্ষ আবিস্কৃত হয়েছে। কক্ষটি বৈচিত্র্যপূর্ণ। এ কারণ এ থেকে গোপন সুড়ঙ্গপথে বাইরে নদীতীরে যাওয়া যায়। এ পথটি মাটি দিয়ে বন্ধ করা ছিল, বর্তমানে সুড়ঙ্গ দেখা যায়।

লালবাগ দুর্গের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ দক্ষিণদিকের তোরণ। আহমদ হাসান দানী বলেন, "The principal architectural feature of the Lalbagh fort is the South Gate, which, though incomplete, appeals for its grace are chaste beauty." অর্থাৎ লালবাগ দুর্গের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনতলাবিশিষ্ট দক্ষিণ তোরণ, যেটি অসম্পূর্ণ হলেও সৌকর্য ও অনুপম সৌন্দর্যের জন্য আকর্ষণ করে।" এ. কে. এম. শামসুল আলম দক্ষিণ তোরনের বর্ণনা দিয়েছেন : "এর সম্মুখভাগের সুউচ্চ দুইদিক দুটি সরু মিনার দ্বারা সুশোভিত। নিচের তলার তোরণ-পথের ছাদ আস্তরে তৈরি প্যানেল শোভিত একটি বৃহৎ গম্বুজ তোরণের সম্মুখের দুই পার্শ্বে তিন ধাপে উপরে উঠেছে। প্রথম ধাপ একটি অন্য গম্বুজ ছাদবিশিষ্ট আস্তরে তৈরি প্যানেল অলঙ্কৃত কুলুঙ্গির মতো। পরবর্তী দু'টি ধাপ বাহিরের দিকে প্রসারিত ত্রি-কোণ জানালার মতো। পরবর্তী নিচের অর্ধগম্বুজ থেকে উদ্গত অংশের উপর ভিত্তি করে তিনটি সরু পাথরের থাম সোজা উপরে প্রথম দ্বিতল ও পরবর্তী পর্যায়ে ত্রিতল পর্যন্ত উঠেছে। থামের উপর পাথরের ব্রাকেট সংস্থাপন করে দোতলায় সমতল ছাদ করা হয়েছে। কিন্তু তিনতলা অর্ধগম্বুজাকার এবং এর প্রান্তগুলি বাইরের দিকে প্রক্ষিপ্ত। ফটকের সম্মুখ ও প্রবেশকক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে আসল তোরণটি পাথরের খিলনের উপর তৈরি। ছাদ চারিদিক থেকে গম্বুজের মতো উপরে উন্নীত হলেও কেন্দ্রস্থল আয়তকার। পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ প্রবেশ কক্ষের দুই দিকে দু'টি অর্ধগম্বুজকে ভিত্তি করে প্রবেশকক্ষের গম্বুজাকৃতি ছাদ তৈরি কাজ হয়েছিল। 'গালিবকারী' গম্বুজ নামে পরিচিত এই ছাদও সুন্দরভাবে প্যানেল দ্বারা অলঙ্কৃত। প্রবেশকক্ষের উত্তরের দুই পার্শ্বও তোরণের সম্মুখেভাগের মতো সুউচ্চ ও অনুরূপ অংশে উদ্গত জানালা (Oriel window) ও মিনার (টারেট) সংযোজন করা হয়। তবে এর দুই পার্শ্ব খোলা মণ্ডপের মতো আরও উপরে বর্ধিত হয়ে গম্বুজ দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে।"

দক্ষিণদিকের তোরণ ছাড়াও বরাবর উত্তরে দেওয়াল ঘেঁষে একটি তোরণ দেখা যাবে। এটি অপেক্ষাকৃত ছোট। এর নির্মাণকৌশল ও আকৃতি দক্ষিণ তোরণকে অনুকরণ করে করা হয়েছে। এর কাজও অসমাপ্ত। এ উত্তরের তোরণ থেকে প্রায় ৭৫০ ফুট পশ্চিমে আরও একটি তোরণ দেখা যায়। এটিও অসমাপ্তভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে।

লালবাগ দুর্গের অভ্যন্তরে দক্ষিণ ও উত্তর দেয়ালের মাঝামাঝি অংশে দুর্গের পূর্ব দিক ঘেঁষে একটি দিঘি দেখা যাবে। বর্গাকারে নির্মিত এই জলাশয়টির প্রতিটি বাহু ২৩৫ ফুট দীর্ঘ এবং ঘাটগুলো বাঁধানো।

ঢাকার ঐতিহাসিকগণ যেমন সৈয়দ আওলাদ হোসেন, ব্রাডলি বার্ট ও রহমান আলী তায়েশ. এস. এম. তৈফুর এবং আহমদ হাসান দানী লালবার্গ দুর্গের স্থাপত্যরীতির ভূয়সী প্রশংসা করেন; কিন্তু একমাত্র ইউরোপীয় চিত্রকর ডি' ওয়েলী যিনি ঢাকার কালেক্টরও ছিলেন, লালবাগ দুর্গের যে চিত্র অঙ্কন করেন (১৮২৪-৩০) তাতে জঙ্গলাকীর্ণ বহিঃপ্রাচীর ও বুরুজের অংশবিশেষ দেখা যায়।

২। বিবি পরীর সমাধি, ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দ (২২)

বাংলাদেশের স্থাপত্যকলার আকর্ষণীয় এবং ব্যতিক্রমধর্মী নিদর্শন হচ্ছে লালবাগ দুর্গের অভ্যন্তরে নির্মিত বিবি পরির সমাধি। কে এই পরিবিবি তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে। বিবি পরীর প্রকৃত পরিচয় এখনও ধূম্রজালে আবৃত। ঢাকার প্রত্নতত্ত্বের বিবরণ প্রদানকারী এস. এম. তৈফুর তাঁর 'Glimpses of Old Dhaka' গ্রন্থে বিবি পরীর সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী মন্তব্য করেন। এক স্থানে তিনি বলেন যে বাংলার সুবাদার নবাব শায়েস্তা খানের কন্যা বিবি পরীর সাথে আওরঙ্গজেবের পুত্র মুহাম্মদ আযমের, যখন তিনি বাংলার সুবাদার ছিলেন, বিবাহ সম্পন্ন হয়। কিন্তু আকস্মিকভাবে বিবি পরীর মৃত্যু হলে শায়েস্তা খান অসম্পূর্ণ লালবাগ দুর্গটির কাজ স্থগিত রাখেন। উল্লেখ্য, আযম পিতার নামানুসারে ঢাকার লালবাগ অঞ্চলে আওরঙ্গবাদ দুর্গ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অন্য এক স্থানে তৈফুর বলেন যে, ইরান দুখত বা ইরানী কন্যা নামে খ্যাত বিবি পরী শায়েস্তা খানের এক উপ-পত্নীর কন্যা ছিলেন। অপর এক স্থানে ফুটনোটে তিনি বলেন, যুবরাজ আযমের একজন অসমীয় স্ত্রী ছিলেন এবং তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় রুমানা বানু। অন্যদিকে আহমদ হাসান দানী, ব্রাডলি বার্ট, জেমস টেলর, আওলাদ হাসান, মুন্সী রহমান আলী তায়েশ বলেন যে, বিবি পরী প্রকৃতপক্ষে ইরানী বংশোদ্ভূত শায়েস্তা খানের কন্যা ছিলেন। ব্রাডলি বার্ট বলেন, "তাঁর (শায়েস্তা খান) শাসনামলে ঢাকার সর্বাধিক সমৃদ্ধি দেখা যায়। মুসলিম স্থাপত্যকলার ঐতিহ্যবাহী অসংখ্য অনিন্দ্যসুন্দর ইমারতসমূহ নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। মার্বেলের শবাধার এবং অতুলনীয় যে সমাধিটি শায়েস্তা খান তাঁর কন্যার শবদেহের উপর নির্মাণ করেন অদ্যাবধি পূর্ববাংলায় এই অপূর্ব ইমারত অতুলনীয় নিদর্শন হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।"

বিবি পরীর সমধিটি লালবাগ দুর্গের মধ্যভাগে ৬০ ফুট বাহুবিশিষ্ট বর্গাকারে নির্মিত ও পাথরে বাঁধানো একটি অনুচ্চ বেদির (platform) উপরে স্থাপিত। এই ইমরাতটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইটের পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের পাথরের ব্যবহার। ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এই আকর্ষণীয় সমাধিটি রাজমহল থেকে কষ্টিপাথর, চুনার থেকে বেলেপাথর এবং জয়পুর থেকে মার্বেল সংগ্রহ করে নির্মিত হয়। সমাধিটির

চার কোনায় চারটি অষ্টকোণাকৃতি বুরুজ (turret) রয়েছে। এ সমস্ত বুরুজ নিচ থেকে উপরের দিকে সরু হয়ে উঠে গেছে এবং বিভিন্ন ধরনের প্যানেল দ্বারা অলঙ্কৃত। বুরুজের শীর্ষদেশে কুপোলা বা গোলাকার নিরেট ছাদ এবং চূড়া দেখা যাবে।

বিবি পরীর শবাধারে প্রবেশ করার জন্য চারদিকে তিনটি করে দরজা রয়েছে। কেন্দ্রীয় দরজাটি আলকোভ বা অর্ধগম্বুজের নিচে নির্মিত। অর্ধগম্বুজটি আকারে চার কেন্দ্রীয় খিলানের আকারে নির্মিত। প্রবেশপথের উভয় পাশে সরু অর্ধগোলাকার টারেট দ্বারা সমৃদ্ধ। বর্তমান টারেটগুলো ছাদে শেষ হয়েছে। প্রবেশপথের উপর জানালা দেখা যাবে। চারদিকের সম্মুখভাগ (facade) আয়তকার প্যানেল দ্বারা অলঙ্কৃত। প্রবেশপথে কালো পাথরের চৌকাঠ রয়েছে।

ভূমি-পরিকল্পনার দিক থেকে বিবি পরীর সমাধিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দিল্লির হুমায়ুনের সমাধি এবং আগ্রার ইতিমদউল্লাহর সমাধির অভ্যন্তরে যেভাবে বিন্যাস করা হয়েছে, সেভাবে বিবি পরীর সমাধিটি কয়েকটি কক্ষে বিভক্ত। কেন্দ্রীয় কক্ষটিতে যে বিবি পরীর শবাধার রয়েছে তা কষ্টিপাথরে আবৃত। অবশ্য এ শবাধারটির নিচে ভূমিতে মরদেহ রয়েছে। কেন্দ্রীয় কক্ষটির প্রতিটি বাহু ১৯-২″ লম্বা। এর চার কোণে যে বর্গাকৃতি চারটি কক্ষ রয়েছে এগুলোর প্রত্যেকটির বাহু ১০′ − ৩$\frac{১}{২}$″ লম্বা। মধ্যবর্তী অংশে আয়তকার স্থানে যে চারটি কক্ষ আছে তার প্রত্যকটির আয়তন ২৪′ ৮$\frac{১}{২}$″ × ১০-৮$\frac{১}{১}$″।

বিবি পরীর সমাধিতে প্রবেশের জন্য চারদিকে চারটি কেন্দ্রীয় দরজা ব্যবহৃত হত। কিন্তু পরবর্তী পর্যায় উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমদিকের প্রবেশপথগুলো সাদা মার্বেল পাথরের জালি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং এখনও সেই অবস্থায় আছে। বর্তমানে কেবলমাত্র দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথটি খোলা আছে। এ দরজাতে চন্দনকাঠের পাল্লা রয়েছে। বিবি পরীর কেন্দ্রীয় কক্ষের দেয়ালগুলো ছাদ পর্যন্ত সাদা পাথর দিয়ে আবৃত এবং মেঝে কালো পাথরের উপর সাদা পাথরের ফুল ও লতাপাতার নকশা দ্বারা অলঙ্কৃত। মূল শবাধারটি তিনটি ধাপে নির্মিত এবং মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। সাদা পাথরে নির্মিত শবাধারটির প্রত্যেক ধাপ ৯$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি করে উঁচু। প্রত্যেক ধাপের পার্শ্বদেশ লতাপাতা ও ফুলের প্রতিকৃতি দ্বারা শোভিত। নিচের ধাপের আয়তন ৭′ ৩$\frac{১}{২}$ × ৫′ − ৪″ এবং সর্বোচ্চ ধাপের আয়তন ৩′-৬$\frac{১}{২}$ × ১ = ৭′।

বিবি পরীর সমাধির অন্যতম বৈশিষ্ট্য মুসলিম ও হিন্দু স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ। এ ইমারতের ছাদের নির্মাণকৌশল বৈচিত্র্যপূর্ণ। হিন্দু মন্দিরস্থাপত্যের অনুকরণে এক স্তর পাথরের উপর অপর এক স্তর পাথর বসিয়ে করবেল পদ্ধতিতে সর্বমোট ১৩টি স্তরে কেন্দ্রীয় কক্ষটির ছাদ নির্মিত হয়েছে। এর উপরে আছে আট কোনাকার পিরামিড আকারের ড্রামের উপর নির্মিত একটি তামার কৃত্রিম গম্বুজ। আদিতে এই গম্বুজটি সোনালি রঙের ছিল। পাশের কক্ষগুলোর ছাদও অনুরূপ উপায়ে নির্মিত হয়। তবে সেগুলোতে ৭টি স্তর ব্যবহার করা হয়েছে এবং ছাদ সমান্তরাল।

বিবি পরীর সমাধিসৌধের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের কক্ষের সাদা পাথরের তৈরি অপেক্ষাকৃত একটু ছোট যে কবর রয়েছে তা নবাব শায়েস্তা খানের অপর এক কন্যা শামসাদ বেগমের কবর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ কক্ষসহ কেন্দ্রীয় কক্ষের চার-পাশের কক্ষগুলোর ছাদ করবেল পদ্ধতিতে নির্মিত। আহমদ হাসান দানী এ সমাধি-সৌধের উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেন। তাঁর মতে, "এর ভূমি-নকশা বৈচিত্র্যময় এবং অতীব যত্ন সহকারে ইমারতটি নির্মিত।" তিনি বলেন, "This complicated plan is a new introduction in Bengal and is ultimately derived from the Persian elements borrowed during the Mughal period in the building at Agra and Delhi. অর্থাৎ, "এ জটিল ভূমি-নকশা বাংলায় প্রথম প্রচলিত হয় এবং আগ্রা এবং দিল্লিতে নির্মিত মুঘল ইমারতে ব্যবহৃত পারস্য কৌশল থেকে এটি গ্রহণ করা হয়েছে।" আসমা সিরাজুদ্দীনও একথার প্রতিধ্বনি করে বলেন যে আগ্রায় নির্মিত ইতিমদদ্দৌল্লাহর সমাধি থেকে বিবি পরীর সমাধির নকশা অনুকরণ করা হয়েছে।

৩। লালবাগ দুর্গের মসজিদ, ১৬৭৮-৭৯ খ্রিস্টাব্দ (২৩)

লালবাগ দুর্গের অভ্যন্তরে বিবি পরীর সমাধি থেকে ১৩০ ফুট পশ্চিমে একটি মসজিদ অবস্থিত। মসজিদটি আয়তাকার, যার পরিমাপ ৬৫×৩২½ ফুট। মসজিদটি একটি উঁচু ভিতের উপর নির্মিত। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ মসজিদের নির্মাতা ছিলেন যুবরাজ মোহাম্মদ আযম। মসজিদের চার কোনায় ক্ষুদ্রাকৃতি চারটি কোনাকারে বুরুজ রয়েছে, যা ছাদ অতিক্রম করে উপরে উঠে গেছে। বুরুজের শীর্ষদেশে নিরেট ইটের গম্বুজ বা কুউপোলা দেখা যাবে। বুরুজের গা মনোরম প্যানেল দ্বারা অলঙ্কৃত। পূর্বদিক থেকে তিনটি অর্ধগম্বুজাকৃতি খাঁজকাটা খিলানের মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং এর দুপাশে কিছুটা বাইরের দিকে উদ্গত ট্যারেট দ্বারা বেষ্টিত। চারকেন্দ্রিক খিলান মুঘলরীতির পরিচায়ক। পাশের প্রবেশপথটি ছোট হলেও একই পদ্ধতিতে নির্মিত। মসজিদের সম্মুখভাগ আয়তাকার প্যানেল দ্বারা সুশোভিত। ছাদের চারপাশে রয়েছে প্যারাপেট। লালবাগ দুর্গ মসজিদটির অভ্যন্তরে নামাজঘর, যা তিনটি খাঁজকাটা গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। গম্বুজ তিনটি ড্রামের সাহায্যে নির্মিত। গম্বুজের আকৃতি সনাতনী মুঘল বাল্বের আকৃতিতে (bulbous) নির্মিত। গম্বুজের উপরে চূড়া রয়েছে। মধ্যবর্তী গম্বুজটি পার্শ্ববর্তী গম্বুজ দুটি অপেক্ষা আয়তনে বড়। ড্রাম পদ্মপাতা নকশা দ্বারা অলঙ্কৃত। মসজিদের অভ্যন্তরে তিনভাগ সম পরিমাপে বিভক্ত। স্কুইঞ্চ খিলানের সাহায্যে গম্বুজ নির্মিত। পশ্চিম প্রাচীরে তিনটি অবতল মিহরাব দেখা যাবে।

লালবাগের দুর্গ মসজিদটি আয়তাকার তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ, যার ভূমি-পরিকল্পনা শায়েস্তা খানের আমলে নির্মিত অন্যান্য মসজিদে দেখা যাবে, যেমন খাজা আম্বরের মসজিদ, তেজগাঁ, মুসা খানের মসজিদ, ফজলুল হলের সন্নিকটে সাত গম্বুজ মসজিদ, মুহাম্মদপুর। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Romance of an Eastern

Capital'-এ ব্রডলি বার্ট লালবাগ দুর্গ সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি এবং পরবর্তীকালে আহমদ হাসান দানী তাঁর 'Dacca' শীর্ষক গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলেন যে এ মসজিদটির নির্মাতা যুবরাজ আযম।

৪। লালবাগ দুর্গ, হাম্মাম এবং দরবারকক্ষ, ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দ (২৪)

লালবাগ দুর্গের অভ্যন্তরে যে ইমারতটি দর্শকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে তা হচ্ছে দ্বিতল ঢালু ছাদবিশিষ্ট হাম্মামখানা এবং দরবারকক্ষ। হাম্মাম বা বাথ রোমানদের আবিষ্কার হলেও মধ্যযুগে ইউরোপে এর কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। মুসলিম শাসনামলে সূচিতার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয় এবং কুর'আন এবং হাদিসে সূচিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বলা হয়েছে, "পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ"। যাহোক, সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের মুসলিম আমলে হাম্মাম বা গোসলখানা নির্মিত হয়। মুঘল আমলে বিশেষ করে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বাংলায় যখন তাঁর পুত্র যুবরাজ আজম সুবেদার ছিলেন তখন লালবাগ দুর্গের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় কিন্তু তাঁকে অন্যত্র বদলি করায় এ দুর্গের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পরবর্তী সুবেদার এবং যুবরাজ আজমের শ্বশুর নবাব শায়েস্তা খান দুর্গটির নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে তাঁর প্রিয় কন্যা ইরান দুখত বিবি পরী, যিনি যুবরাজ আযমের পত্নী ছিলেন, মৃত্যু হলে দুর্গের কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। হাম্মাম প্রসঙ্গে খোন্দকার আলমগীর বলেন, "হাম্মামের আকার এবং প্রকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম ছিল। কোনো হাম্মাম মসজিদের সহিত, আবার কোনো হাম্মাম সরাইখানার সহিত সংযুক্ত ছিল। কোনো কোনো হাম্মাম মাজারের মধ্যেও স্থাপিত ছিল। কোনো হাম্মাম রাজ-পুরুষদের জন্য নির্ধারিত ছিল। ব্যক্তি মালিকানাধীনে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত। কোনো হাম্মাম আবার সাধারণ লোকজন ব্যবহার করত। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক হাম্মাম ছিল অথবা একই হাম্মাম ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পুরুষ এবং মহিলাদের দ্বারা ব্যবহৃত হত। পুরুষদের গোসলের সময় পুরুষ পরিচারিকা এবং মহিলাদের গোসলের সময়ে মহিলা পরিচারিকা নিয়োজিত থাকত। মুসলিম নাগরিক জীবনে হাম্মাম স্থাপত্য একটি আবশ্যিক বিষয় ছিল।"

লালবাগ দুর্গে নির্মিত হাম্মামখানাটি দুর্গের পূর্বাংশের উত্তর-দক্ষিণে লম্বা দ্বিতল অংশটি দরবারকক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হত। বর্তমানে এটি দুর্গ জাদুঘরে রূপান্তরিত। এ ইমারতটি বাইরের দিক থেকে পরিমান ১০৭′–৩½″ উত্তর-দক্ষিণে × ২৬′ ৯″ পূর্ব-পশ্চিম। এর নিচের তলায় তিনটি কক্ষ আছে এবং দ্বিতলে অনুরূপ তিনটি কক্ষ আছে। মূল হাম্মামটি সম্বন্ধে খন্দকার আলমগীর সঠিক বর্ণনা দিয়েছেন। হাম্মামটির বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে এর আসল রূপ সম্বন্ধে ধারণা করা খুবই কষ্টকর। এর দক্ষিণদিকের কিছু অংশ বিলুপ্ত হয়েছে। পশ্চিমদিকের দেওয়ালের বহির্গাত্রে অনেকগুলো প্যানেলদৃষ্টে অনুমিত হয় যে, এইদিকে সমতল ছাদবিশিষ্ট একটি বারান্দা ছিল। এই বারান্দাটিও বর্তমানে বিলুপ্ত। এই ইমারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের দেওয়ালগাত্রে অনেক প্যানেল

দ্বারা শোভিত হওয়ায় অনুমিত হয় যে, এদিকে আরও কক্ষ ছিল। মূল হাম্মামটির পশ্চিমদিকে দু'টি এবং দক্ষিণদিকে দু'টি দরজা ছিল।

মূল হাম্মামের মধ্যবর্তী অংশ সম্ভবত ঈষদুষ্ণ কক্ষ ছিল যা গোসলের কাজে ব্যবহৃত হত। এখানে বসার জন্য একটি পাথরখণ্ড বা slab আছে। স্ল্যাবটির উত্তরে মেঝের মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট ও সিঁড়িযুক্ত একটি জলাধার আছে। ঈষদুষ্ণ কক্ষের পশ্চিমদিকে দেওয়ালের সঙ্গেও একটি জলাধার আছে। দক্ষিণ-পশ্চিমদিকের কক্ষটিতে পায়খানা ছিল। উত্তরদিকের কক্ষ দু'টির উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে এর একটিতে হাইপেকাস্ট বা পানি গরম করার ব্যবস্থা থাকায় ধারণা করা যায় যে, এটি তাপব্যবস্থার জন্য নির্মিত হয়। কেন্দ্রীয় কক্ষটি অভ্যন্তরভাগে একটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত এবং এর চতুর্দিকে অর্ধগম্বুজ এবং অর্ধগম্বুজের অভ্যন্তরে জ্যামিতিক নকশা রয়েছে। অর্ধগম্বুজের নিচে অনেক প্যানেল রয়েছে। উত্তর-পশ্চিম কক্ষটির নিচে হাইপোকস্ট নির্মিত হয়। হাইপোকস্টের অভ্যন্তরে অনেকগুলো পিপা বা স্তম্ভ রয়েছে। কিছুদিন পূর্বে লালবাগ দুর্গে খননকাজ পরিচালনা করে পোড়া মাটির পাইপ আবিস্কৃত হয়েছে। এ সমস্ত পাইপ হাইপোকস্টের দেওয়ালসংলগ্ন যাতে পানি সরবরাহ করা সহজতর হয়। এ অংশটি ল্যাট্রিনের নিচের অংশের সাথে একটি টানেল দ্বারা সংযুক্ত। এই কক্ষটির ১৩ ফুট উত্তরে আরেকটি পৃথক কক্ষ আছে। এটি একটি ছিদ্রযুক্ত গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। এর নিচেও পূর্বোক্ত কক্ষের মতো হাইপোকস্টের ব্যবস্থা আছে। পূর্বোক্ত কক্ষের ন্যায় এর মেঝেতেও একটি বড় ছিদ্র আছে। এতে চিমনি বা বড় কড়াই স্থাপিত হয়। পরস্পরমুখি স্থাপিত এ কক্ষ দুটিতে খিলানযুক্ত প্রবেশপথ আছে। এগুলো দ্বারা জ্বালানি সরবরাহ করা হত। একটি পৃথক সিঁড়ির সাহায্যে মূল হাম্মামের ছাদে যাওয়া যায়।

লক্ষণীয় যে, হাম্মামখানা বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের একটি বিশেষ নিদর্শন এবং সুলতানী এবং মুঘল আমলে বাংলার বিভিন্ন স্থানে হাম্মাম নির্মিত হয়। অবশ্য হাম্মাম-স্থাপত্য বাংলার বাইরে দিল্লিতে ফিরোজ শাহের আমলে দেখা যাবে, যা বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত। সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের রাজত্বে রাজধানী গৌড়ে হাম্মামখানা নির্মিত হয়। বাংলায় যে সমস্ত হাম্মাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে ঈশ্বরীপুরের হাম্মাম (সাতক্ষীরা), মীর্জানগরের হাম্মাম (যশোর), জাহাজঘাটা হাম্মাম (সাতক্ষীরা), শাহ সুজার হাম্মাম (গৌড়), জিনজিরার হাম্মাম (ঢাকা) এবং লালাবাগের হাম্মামখানা (ঢাকা)। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, লালবাগ দুর্গের হাম্মামখানাটি দু'টি অংশে বিভক্ত (ক) নিচে গোসলখানা, (খ) উপরে দরবারকক্ষ। দ্বিতলেব মধ্যবর্তী কক্ষের উপর ঢালু ছাদ রয়েছে। মধ্যবর্তী কক্ষটি বড় এবং এর পূর্বদিকে তিনটি খিলানপথ রয়েছে। মধ্যবর্তী কক্ষটি উত্তর ও দক্ষিণদিকের কক্ষ দু'টির সাথে সংযুক্ত এবং পশ্চিমদিকের মূল হাম্মামের সঙ্গেও সংযুক্ত। এর মধ্যবর্তী অংশে একটি পুরাতন ঝর্না দেখা যাবে। দরবার হলেও দু'দিকে দ্বিতলে উঠবার জন্য দু'টি সিঁড়ি আছে। পূর্বদিকের খিলানগুলো চতুর্কেন্দ্রিক। এগুলো আবার আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ।

দ্বিতলে ওঠার সিঁড়ির দরজাসহ পূর্বদিকে সর্বমোট সাতটি দরজা আছে। নিচতলার হলঘরের উপর এবং দক্ষিণের কক্ষে অনেকগুলো কুলুঙ্গি আছে। মধ্যবর্তী বৃহত্তর কক্ষটির পশ্চিমদিকে দু'টি এলাকা আছে।

ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে হাম্মামখানা ও দরবারকক্ষ যুবরাজ আজম কর্তৃক ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়।

দুর্গ এলাকার বাইরে

৫। ফারুখ শিয়ারের মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দী

লালবাগ দুর্গের দক্ষিণ তোরণ থেকে কিছু দক্ষিণের লালবাগ শাহী মসজিদ নামে বর্তমানে যে বিশালাকার মসজিদটি এলাকাবাসীদের নামাজ পড়ার জন্য ব্যবহৃত হয় তা বাংলার সুবাদার শাহজাদা আজিম-উস-শানের পুত্র শাহজাদা (পরে সম্রাট) ফররুখসিয়ার কর্তৃক নির্মিত হয়। বর্তমানে সংস্কারের ফলে এর মূল স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য বহু পূর্বেই নষ্ট হয়ে গেছে। আহমদ হাসান দানী তাঁর Dacca গ্রন্থে বলেন, "মসজিদটি ১৬৪′ × ৫৪′ ফুট বিশিষ্ট আয়তকার একটি বিশালাকার ইমারত, যা ঢাকার বৃহত্তম মসজিদগুলোর অন্যতম। কিন্তু এর কোনো স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য নেই। (সংস্কারের ফলে)"

আদি মসজিদটি কাঠ এবং তক্তা দিয়ে আচ্ছাদিত ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু ছাদ ভেঙে গেলে ঢাকার নবাব স্যার আবদুল গনী এটি পুনঃনির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে এখানে আযানের জন্য একটি মিনার নির্মিত হয়। এই মিনারটি বিশেষ ধরনের ঐতিহ্যবাহী, যা ঢাকার অন্যান্য মিনারেও দেখা যাবে।"

৬। খান মুহম্মদ মৃধার মসজিদ ও মাদ্রাসা, ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দ (২৫)

লালবাগ দুর্গের পশ্চিমদিকে আতিসখানা বা বারুদগাহ মহল্লা অবস্থিত। এ স্থানে উঁচু বেদির (platform) উপর স্থাপিত হয়েছে একটি মসজিদ। খান মুহম্মদ মৃধা এই মসজিদটির নির্মাতা। যে বিশালকাল ভিত্তির (tahkhana) উপর প্রতিষ্ঠিত তার আয়তন ১২৫ × ১০০ ফুট এবং উচ্চতা ১৬$\frac{১}{২}$ ফুট। এই ভিত্তিগুলোতে অসংখ্য ভল্ট-সম্বলিত কক্ষ রয়েছে। এ সমস্ত কক্ষ কি উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে বিশেষজ্ঞগণ ধারণা করেন যে, এগুলো হয় দোকানপাট, যেমন বেগম বাজারের দ্বিতল কারতালাব খানের মসজিদের নিচতলার মতো, হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আবার অনেকে মনে করেন যে, এ মসজিদে যে মাদ্রাসা ছিল সেই মাদ্রাসার ছাত্রদের বাসস্থান ছিল। যাহোক, খান মুহম্মদ মৃধার মসজিদটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

আহমদ হাসান দানীর ভাষায় "The mosque illustrates the elaborate style of the Post Shaista Khani period" অর্থাৎ "এ মসজিদটি প্রাক-শায়েস্তা খানী আমলের একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ নিদর্শন।" মৃধার মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এবং আয়তন ৪৮ × ২৪ ফুট। মসজিদের চারকোনায় চারটি অষ্টকোণাকৃতি এবং ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়া বুরুজ নির্মিত হয়। এ সমস্ত বুরুজ ছাদের উপরে উঠে গিয়েছে ফলে এগুলোকে টারেটও বলা হয়। এর উপরে চুন সুরকির তৈরি নিরেট ছোট গম্বুজ বা

খাঁজকরা কুউপোলা দ্বারা আচ্ছাদিত। পূর্বদিকের দেওয়ালে তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে। প্রবেশপথের উভয় পাশে দু'টি করে সরু টারেট দেখা যাবে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। এগুলোর উভয় পাশেও অনুরূপ টারেট নির্মিত হয়। লালবাগ দুর্গ মসজিদের সাথে খান মুহম্মদ মৃধা মসজিদের সাদৃশ্য রয়েছে। ড্রামের উপর স্থাপিত বাল্ব আকৃতির গম্বুজ, চারকেন্দ্রিক অর্ধগুম্বুজাকৃতি আলকভ খিলানের আকৃতি, প্লাস্টার অলঙ্করণ, কৌণিক খিলান, তিনটি প্রবেশপথ, পশ্চিম প্রাচীরে তিনটি অবতল মিহরাব ইত্যাদি। মিহরাবগুলো অলঙ্কৃত। বাইরের দেওয়াল বা সম্মুখভাগ প্যানেল দ্বারা সুশোভিত। কেন্দ্রীয় গম্বুজের দুই পাশে ছোট দুটি গম্বুজ রয়েছে এবং গম্বুজগুলোর ড্রাম মার্লন দ্বারা অলঙ্কৃত।

খান মুহম্মদ মৃধার মসজিদের উত্তর-পূর্ব দিকে একই ভিত্তিবেদির উপরে দক্ষিণমুখী একটি ছোট ইমারত আছে, এতে তিনটি কক্ষ আছে। কেন্দ্রীয় কক্ষটি অপেক্ষাকৃত বড়। খিলানের সাহায্যে এর ছাদ নির্মিত হয়। এ ইমারতটি কি উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় তা সঠিকভাব বলা যায় না। তবে বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করেন যে, সম্ভবত ইরান ও ভারতীয় মসজিদসংলগ্ন মাদ্রাসার অনুকরণে এটি একটি মাদ্রাসা ছিল। আহমদ হাসান দানী বলেন, "The building follows the qua plan of the MKUsim Madrassa, which was so extensively used in Egypt during the Ayyubi and Mamluk period (11th to 15th centuries A.D.)." অর্থাৎ "এ ইমারতটি মুসলিম মাদ্রাসা কোয়া নকশার ভিত্তিতে নির্মিত, যা আয়্যুবি এবং মামলুক আমলে (১১ থেকে ১৫ শতাব্দী) দেখা যাবে।"

খান মুহাম্মদ মৃধার মসজিদের প্রধান প্রবেশ পথের উপরে যে শিলালিপি আছে তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, প্রধান কাজী ইবাদউল্লাহর ইচ্ছার ভিত্তিতে খান মুহম্মদ মৃধা হিজরী ১১১৬ মতান্তরে ১১১৭/১৭০৪-৫ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে এ মসজিদটি নির্মিত হয়।

৭। আজিমুশশানের প্রাসাদ, সপ্তদশ শতাব্দী

১৬৯৭ থেকে ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত আজিমুশশান বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন। ঢাকায় অবস্থান কালে তিনি পোস্তায় একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। বুড়িগঙ্গার নদীর তীরে এ প্রাসাদটি স্থাপিত হয়। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে বিশপ হেবার যখন বাংলা মুলুকে আসেন তখনও এ প্রাসাদটি অক্ষত অবস্থায় ছিল। তাঁর ভাষায় "যে দুর্গটি প্রাসাদ হিসাবে ব্যবহৃত হয় তা ইটের তৈরি ছিল এবং পলেস্টারা দ্বারা অলঙ্কৃত করা হয়। এর স্থাপত্যকলা মস্কোর ক্রেমলিনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। জেমস টেলর বলেন যে, আজিমুশশান যে প্রাসাদটি বুড়িগঙ্গার তীরে পোস্তায় নির্মাণ করেন তা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। টেলর ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর গ্রন্থে ('Topography and Statistics of Dacca, Dacca, 1840') একথা উল্লেখ করেন।

৮। কামরাঙ্গীর চর, মসজিদ

লালবাগ দুর্গের অপরদিকে বুড়িগঙ্গা নদীর বক্ষে কামরাঙ্গীর চর রয়েছে। এখানে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে একটি আকর্ষণীয় তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ নির্মিত হয়। মসজিদটি চারকোনায় চারটি কৌণিক বুরুজ দ্বারা সুরক্ষিত। বুরুজগুলো অষ্টকোণাকার এবং নিচ থেকে উপরের দিকে ঢালু হয়ে গেছে এবং বুরুজের উপরে নিরেট কুউপোলা দ্বারা আচ্ছাদিত। তিনটি গম্বুজ ড্রামের উপর থেকে উপরে উঠে গেছে এবং শায়েস্তা খানের আমলে যে ধরনের কলসচূড়া ব্যবহৃত হয়েছিল সেরকম চূড়া দেখা যায়।

(খ) চক গ্রুপ

মুগল আমলে বিশেষ করে নবাব শায়েস্তা খানের শাসনামলে চকবাজার রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র ছিল। চকবাজার ছিল প্রধান বিপণিকেন্দ্র এবং এর আশেপাশে গড়ে ওঠে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন সংস্থা। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে ডি'ওয়েলি শুধু ঢাকার বিবরণই দেননি, অসংখ্য তৈলচিত্রও অঙ্কন করেন। তাঁর ভাষায় "it (Chawk bazar) was a very ancient and is situated in that quarter of the city which is now known by the name of the old Nekaus. It was founded by Moorshed Ally (Kuli) Khan and forms a square of about two hundred where fruit yards, vegetables, trinkets, toys, sweet meats etc. are daily exposed for sale. At sunset the inhabit-tants assembled here in crowds." অর্থাৎ "চকবাজার খুবই পুরাতন স্থান এবং এটি সে অঞ্চলে অবস্থিত ছিল যা পুরাতন নেকুস নামে পরিচিত ছিল। মুর্শিদ কুলী খান এটি স্থাপন করেন এবং আদিতে দুইশত বর্গগজ পরিমাপ এলাকা জুড়ে জমজমাট থাকত। এখানে নানা ধরনের শাক-সবজি, দ্রব্যাদি, পণ্য, খেলনা, মিষ্টান্ন দৈনিক বিক্রি হত। সন্ধ্যার পর স্থানীয় বাসিন্দাগণ একত্রে সমবেত হয়ে আনন্দ করত।" জেমস টেলর ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে চকবাজার প্রসঙ্গে বলেন, "এটি বিশালাকার চতুষ্কোণাকৃতি একটি চত্বর এবং এর চারপাশে মসজিদ ও দোকানপাট রয়েছে। খোলা চত্বরটি দেওয়ালঘেরা ছিল এবং মধ্য দিয়ে ঘোড়ায় টানা একটি রাস্তা ছিল। এর মধ্যভাগে একটি বিশালাকার কামান রাখা হয় যেটি নদীর তীরে অযত্নে বহুদিন পড়ে ছিল।" আহমদ হাসান দানী বলেন যে, "মুর্শিদকুলী খান ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে চকবাজার নির্মাণ করেন কিন্তু তিনি প্রথমে দেওয়ানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করলে এবং পরে সেখানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করলে চকবাজারের তথা ঢাকার গুরুত্ব কমে যায়। একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, চকবাজারের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা নবাব শায়েস্তা খান যাঁর আমলে চকবাজারের শাহী মসজিদ এবং ছোট কাটরা নির্মিত হয়। বর্তমানের চকবাজার পুনর্নির্মিত হয় ব্রিটিশ আমলে।" দানীর মতে, "ঢাকার কালেক্টর ওয়াল্টার সাহেব বর্তমান জনবহুল এবং বিপণিসমৃদ্ধ চকবাজার প্রতিষ্ঠা করেন।"

হাকিম হাবিবুর রহমান তাঁর 'আসুদে গানে ঢাকা' গ্রন্থে বলেন, "চকবাজার ৬নং ওয়ার্ডে অবস্থিত, যা ১১১৪ হিজরীতে নওয়াব মুর্শিদকুলী খান নির্মাণ করেছিলেন, যার শিলালিপি আজো কোলকাতা যাদুঘরে সংরক্ষিত এবং অতি সুন্দর অক্ষরে লিখিত। এ

পাথরটি ঢাকা থেকে কোলকাতা নেয়ার পর গভর্নমেন্ট এর নকল তৈরি করে দেন। এরপর কয়েক যুগ অতিবাহিত হয়ে যায়। এই চকবাজারকে পুনঃনির্মাণ করেন মিঃ ওয়ালটার। ঢাকায় প্রচলিত আছে যে, নতুন বর যখন বিয়ে করতে পাত্রীর বাড়িতে আগমন করত তখন সম্পূর্ণ বর যাত্রীটি একবার হলেও এই চক প্রদক্ষিণ করতো। বর যেখানেরই হোক না কেন তাদের এক চক্কর প্রদক্ষিণ অনিবার্য।"

৯। নাসওয়াল্লাহ গলির মসজিদ এবং ফটক (অধুনালুপ্ত), পঞ্চদশ শতাব্দী

বর্তমান ঢাকা মুঘল সুবাদারদের সৃষ্টি এবং অধিকাংশ ইমারতই মুঘল আমলে নির্মিত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রাক-মুঘল যুগের ইমারত দেখা যাবে। যেমন নারিন্দার বিনত বিবির মসজিদ, চকবাজারের অধুনালুপ্ত নাসওয়াল্লাহ গলির মসজিদ ও ফটক। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এ সমস্ত প্রত্নকীর্তি নির্মিত হয়। মির্জা নাথান তাঁর 'বাহারিস্তান-ই-গায়েবী'তে বলেন যে, ঢাকায় প্রাক-মুঘল যুগের একটি সুরক্ষিত দুর্গ ছিল, যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। বর্তমান কেন্দ্রীয় কারাগারের পশ্চিম দিকে চক এলাকায় নাসওয়াল্লাহ গলিতে সুলতানী আমলের একটি মসজিদ এবং তৎসংলগ্ন ফটক নির্মিত হয়, যা অধুনালুপ্ত। শাহবাগের অবস্থিত জাতীয় জাদুঘরে যে শিললিপি সংরক্ষিত রয়েছে সামসুদ্দীন আহমদ তা পাঠোদ্ধার করেন।

১০। প্রাচীন দুর্গ, কেন্দ্রীয় কারাগার, ১৬০৬-১৩ খ্রিস্টাব্দ (অধুনালুপ্ত)

প্রাক-মুঘল যুগে ঢাকায় যে কয়েকটি ইমারত নির্মিত হয় তার মধ্যে নারিন্দার বিনত বিবির মসজিদ (সম্পূর্ণরূপে পুনঃনির্মিত) ছাড়া অপর কোনো স্থাপত্যকীর্তি অবশিষ্ট নেই। ঢাকার চকবাজার এলাকায় স্থাপিত কেন্দ্রীয় কারাগারটি যেখানে অবস্থিত সেখানে সুলতানী আমলে একটি দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয় বলে প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষকরা মন্তব্য করেন। বিশেষ করে 'বাহারিস্তান-ই-গায়েবী'র প্রণেতা মির্জা নাথান এ প্রাচীন দুর্গের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, "১৬০২ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সেনাপতি রাজা মানসিংহ তাঁর সামরিক দফতর ভাওয়াল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন তখন তিনি শহরের পশ্চিমাঞ্চলে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের সন্নিকটে বর্তমান কেন্দ্রীয় কারাগারের চত্বরে প্রাক-মুঘল যুগের একটি ভগ্নপ্রাপ্ত দুর্গ সংস্কার করে বসবাস শুরু করেন। রাজা মানসিংহ এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণ এ দুর্গের সংস্কার করে বাসোপযোগী করেন। এর ফলে মানসিংহের সময় থেকে ঢাকার গুরুত্ব বাড়তে থাকে এবং চকবাজার এলাকা মুঘল নগরী ঢাকার মূল প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হল। সম্রাট আকবরের পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীর সিংহাসনে বসলে ইসলাম খানকে সুবাদার হিসাবে ঢাকায় প্রেরণ করা হয় এবং তিনি ঢাকার নাম পরিবর্তন করে জাহাঙ্গীরের নামানুসারে শহরের নামকরণ করেন 'জাহাঙ্গীরনগর'। ইসলাম খান মানসিংহের ব্যবহৃত প্রাক-মুঘল দুর্গটিকে পুনঃনির্মাণ করে সেখানে বসবাস সুরু করেন। ইসলাম খান ১৬০৬ থেকে ১৬১৬ পর্যন্ত এ দুর্গ সংস্কারে করে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্গটি মুঘলদের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। এর মধ্যে একটি মুদ্রাগার (mint) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখান থেকে সোনা ও রূপার মুদ্রা ছাপানো হয়।"

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন দুর্গের কোনো চিহ্ন দেখা যাবে না। তবে একসময়ে এটি ছিল খুবই বৃহদাকার ও আকর্ষণীয়। কিংবদন্তিতে এটি এখনও ভাস্বর। এ দুর্গে পশ্চিম দরওয়াজা এবং পূর্ব দরওয়াজা নামে দুটি অতুলনীয় ফটক ছিল। এ দুর্গকে কেন্দ্র করে আশেপাশে ঘনবসতিপূর্ণ মহল্লার সৃষ্টি হয় মুঘল যুগে, যেমন বাদশাহী বা চক বাজার, উর্দু বাজার বা সামরিক ছাউনি, আতিশখানা বা অস্ত্রাগার, দেওয়ান বাজার বা প্রধান কার্যালয়। গিরদি কেল্লা অর্থাৎ কিল্লার সন্নিকটে বা বেষ্টনিতে সৃষ্ট মহল্লা। আমীর ওমরাহগণ কেল্লার সন্নিকটে বসতি শুরু করেন। এই প্রাচীন দুর্গটি ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অক্ষত ছিল এবং বলা হয়ে থাকে যে, ঢাকার প্রথম নায়েব নাযিম নবাব জসরত খান এখানে শেষবারের মতো বসবাস করেন। এর পর এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

১১। তাঁতিবাজার মসজিদ ও সমাধি, ১৬০৮-১৩ খ্রিস্টাব্দ

ঢাকার ইসলামপুর এলাকার নামকরণ হয়েছে সুবাদার ইসলাম খানের নামানুসারে। এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল তাঁতিবাজার নামে পরিচিত এবং এখানে সম্ভবত তাঁতিদের বসবাস ছিল। তাদের নাম থেকেই এ মহল্লার নামাকরণ হয়েছে তাঁতিবাজার। এস. এম. তৈফুর তাঁর 'Glimpses of Old Dhaka' গ্রন্থে লিখেছেন, "On this road in a bye lane now called Tantibazar there is a flat roofed mosque and mausoleum constructed in about Islam Khan's time. There are also some tombs and a mosque of Shah Jahan's time round about this Palace." অর্থাৎ এই সড়কের (ইসলামপুর রোড) একটি গলিতে তাঁতি বাজার নামক স্থানে সমান্তরাল ছাদবিশিষ্ট একটি মসজিদ ও সমাধি নির্মিত হয়। ইসলাম খানের আমলে এর সন্নিকটে শাহজাহানের সময়ে কতিপয় সমাধি এবং মসজিদও স্থাপিত হয়।"

১২। বড় কাটরা, ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ (২৬)

চকবাজার ও বুড়িগঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত মুঘল স্থাপত্যের ঐতিহ্যবাহী বড় কাটরা বা Caravanserai-এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হয়ে এখনও টিকে আছে। এককালে বুড়িগঙ্গার পানি কাটরার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হত; বর্তমানে তা সরে গিয়েছে। এস. এম. তৈফুর যথার্থই বলেছে যে, ডি' ওয়েলি তাঁর 'Antiquities of Dacca' গ্রন্থে জলরঙের যে সমস্ত চিত্র অঙ্কন করেন তার মধ্যে বড় কাটরা ও ছোট কাটরা অন্তর্ভুক্ত। চিত্রে যদিও বড় কাটরা জঙ্গলাকীর্ণ দেখা যায় তবুও স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

যদিও শাহ সুজা রাজনৈতিক কারণে ঢাকা থেকে রাজধানী রাজমহলে স্থানান্তর করেন তবুও ঢাকা প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। তিনি এ শহরের বহু ইমারত নির্মাণ করেন যার মধ্যে বড় কাটরা অন্যতম। উত্তরদিকের ফটকে প্রোথিত একটি অপূর্ব সুন্দরভাবে খোদাইকৃত শিলালিপি পাঠোদ্ধারে জানা যায় যে, শাহ সুজার আমলে প্রধান স্থাপতি মীর আবুল কাশেম আল-হুসাইন-আল-তাবেতাবায়ী আস-সিনানী হিজরী ১০৫২ সনে, ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে বড় কাটরা নির্মাণ করেন। শাহ সুজা এবং পরবর্তীকালে মীর জুমলা এখানে বসবাস করতেন। আওলাদ হোসেন তাঁর "Notes on the Antiquities

of Dhaka' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে সুলতান শাহ সুজা বাহাদুর বিভিন্ন ধরনের জনহিতকর কাজ করেন এবং তাঁর ভৃত্য আস-সিমনানী এই পবিত্র (?) ইমারতটি নির্মাণ করেন যাতে ২২টি দোকান ছিল। নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সে দোকান থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে বড় কাটরা সংস্কার ও সংরক্ষণ করতে হবে। এটাও নিশ্চিত করে দেওয়া হয় যে যদি কোনো গরিব মুশাফির এই সরাইখানায় অবস্থান করে তা হলে তার কাছ থেকে কোনো অর্থ গ্রহণ করা হবে না। ফরাসি ভাষায় এ অপূর্ব শিলালিপিটি উৎকীর্ণ করেন প্রখ্যাত শিল্পী সাদউদ্দীন মোহম্মদ সিরাজী।

ইসলামী স্থাপত্যরীতির ধারা বজায় রেখে সরাইখানাটি নির্মিত হয়। মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চলে ইরাক, ইরান ও মধ্য-এশিয়ায় এ ধরনের অসংখ্য সরাইখানা নির্মিত হয়েছে যেখানে পর্যটক মুসাফির এবং ব্যবসায়ীগণ অবস্থান করতেন। আহমদ হাসান দানী বলেন, "It is a magnificent building of grand scale and is one of the most important remains of the Mughal period in Dhaka. It is of the type of Katra building (enclosed quadrangle) with a gigantic frontage towards the rivers. It serves the purpose of a caravanserai." অর্থাৎ "এটি বিশালাকার এবং অনিন্দ্যসুন্দর ইমারত এবং ঢাকার মুঘল আমলে নির্মিত স্থাপত্যকীর্তির মধ্যে খুবই আকর্ষণীয় নিদর্শন হিসাবে পরিগণিত, যার সম্মুখভাগ বুড়িগঙ্গা নদীর দিকে রয়েছে। এটি সরাইখানা হিসাবে ব্যবহৃত হত।" আবুল কাশেম আস-সিমনানী প্রধান স্থপতি হলেও তিনি শাহজাহানের আমলে একজন সেনাপতি ছিলেন এবং ইসলাম খানের সাথে আসাম অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে, তৈফুরের মতে, তিনি শাহ সুজার শাসনামলে রাজকীয় ইঞ্জিনিয়ার বাহিনীর প্রধান ছিলেন এবং বড় কাটরা নির্মাণে নেতৃত্ব দেন। জরাজীর্ণ অবস্থায় বহু দিন থাকার পর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এটির সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অবাঞ্ছিত লোকদের সমাগমে ইমারতটির অনেক ক্ষতি সাধিত হয়। এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেন, "শুধু বাইরে নয় কাটরার ভিতরেও অসংখ্য ছোট বড় অবাঞ্ছিত ইমারত গজিয়ে উঠেছে। আদিতে একটি চকমিলানো ইমারত হিসাবে নির্মিত এই কাটরার বর্তমান অবস্থা দেখে এর আদিরূপ সম্পর্কে কোনো ধারণা করা কঠিন। উত্তর ব্লক সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সেখানে গড়ে উঠেছে নূতন নূতন ইমারত। পূর্ব ও পশ্চিম ব্লকে নূতন ও পুরাতন ইমারতের সংমিশ্রণ এমনভাবে হয়েছে যে সেখানে কোনটা নূতন কোনটা পুরাতন তা নির্ধারণ করা কঠিন। ভিতরের যে বিরাট উন্মুক্ত আঙিনা ছিল, তাতে গজিয়ে উঠেছে কাঁচা-পাকা ছোট-বড় সংখ্যাহীন গৃহ। কারখানা থেকে আরম্ভ করে দোকানদারি পর্যন্ত এমন কোনো কাজ নেই যে বর্তমানে বড় কাটরাতে না হয়। তবে দক্ষিণদিকের ব্লকে একটি মাদ্রাসা (বড় কাটরা মাদ্রাসা পরবর্তীকালে নির্মিত) থাকায়, সে স্থানটি অনধিকার প্রবেশকারীদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে কোনোরকমে এবং মাদ্রাসার অধীনে বলে অট্টালিকার এ অংশটি আজও জীর্ণ অবস্থায় টিকে আছে।" এ প্রসঙ্গে এস. এম. তৈফুর বলেন, "The palace is now in ruins and was at one time a favourite haunt for beggars, vagabonds and cut-throats.

যদিও ভগ্নদশা, তবুও আহমদ হাসান দানী বলেন যে, "রেনেলের মানচিত্র থেকে বড় কাটরার ভূমি-নকশা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পাওয়া যাবে। বাংলাদেশে যতগুলো কাটরা বা সরাইখানা নির্মিত হয়েছে তার মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা আকর্ষনীয় ছিল বড় কাটরা।" আহমদ হাসান দানী এবং তাঁর অনুসরণে মোহাম্মদ যাকারিয়া বড় কাটরার স্থাপত্যিক বিবরণ দিয়েছেন। যদিও এখন জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে তবুও এর লুপ্তগৌরব ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে সকল সচেতন ও শিল্পমনা ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারবেন। মোহাম্মদ যাকারিয়া এটির বিষদ বিবরণ দেন, "আয়তাকারে নির্মিত এই চকমিলানো অট্টালিকার দক্ষিণবাহু ছিল ২২৩ ফুট দীর্ঘ। উত্তর বাহুও একই মাপের ছিল ধারণা করা যায়। পূর্ব ও পশ্চিম বাহুর দৈর্ঘ্য এরূপ নিরূপণ করা দুঃসাধ্য হলেও আদিতে ২৩০ ফুট করে ছিল বলে জানা যায়। মাঝখানে ছিল এক বিরাট উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ (Courtyard) .... দক্ষিণ ব্লকের কেন্দ্রস্থল ছিল কাটরায় প্রধান প্রবেশপথ। বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত তিনতলাবিশিষ্ট সদর তোরণ ছিল অতি মনোমুগ্ধকর। অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে নির্মিত ও শাহী জাঁকজমকপূর্ণ এই তোরণ দক্ষিণে নদীর দিকে প্রায় ২৫ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৪০ ফুট প্রসারিত ছিল। এই প্রসারিত অংশে প্রবেশপথের দু'পাশে ছিল দু'টি প্রহরী কক্ষ। প্রহরীকক্ষ দু'টির মধ্যবর্তী প্রবেশপক্ষের আয়তন ছিল (পূর্ব-পশ্চিম লম্বা) ১৮′–১০″ × ৯′–৬″। এই প্রবেশপথের পরে ছিল পরপর তিনটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তনের প্রবেশপথ। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এগুলির আয়তন ছিল যথাক্রমে ৯′ × ৩′, ১১′ × ৬′৩″ ও ৯′ × ৬′। এগুলির প্রত্যেকটি খিলানের সাহায্যে নির্মিত ছিল। কেন্দ্রীয়টির দু'পাশে ছিল খিলানযুক্ত অতি ক্ষুদ্র দু'টি কক্ষ। উপরের বর্ণিত ৪টি প্রবেশপথের পরেই ছিল অষ্টকোণাকৃতি একটি হল কামরা। এই কামরার ব্যাস ২৭′–৩″। এর উপরের ছাদে গম্বুজাকৃতির এবং তাতে অলঙ্করণ, উপরে লতাপাতা ইত্যাদির পরিচ্ছন্ন অলংকার ছিল। এ হলকামরার মাঝামাঝি অংশের সোজা পূর্ব ও পশ্চিমদিকে ছিল পরপর ২টি করে কামরা এবং এ দু'টি কামরার মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী দরজা ছিল। এগুলির দক্ষিণদিকে আড়াআড়িভাবে নির্মিত প্রত্যেক দিকে ২টি করে কামরা ছিল। তবে উত্তরদিকের শেষ কামরা দু'টি ছিল ত্রিভুজাকারে নির্মিত। হলকামরার দু'পাশের কামরাগুলির বিপরীত দিকের কামরার সঙ্গে জ্যামিতিক মাপে আড়াআড়িভাবে নির্মিত ছিল। হলঘরের পরে (উত্তরদিকে) ছিল ৯′ × ৬′ – ২″ আয়তনের (পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা) একটি প্রবেশপথ এবং এর পরেই ছিল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার সর্বশেষ প্রবেশপথ এবং পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা। এই প্রবেশপথের আয়তন ছিল ১৮′–১০″ × ৯′–৩″। এর দু'পাশে খিলানযুক্ত ২টি কক্ষ ছিল। এই প্রবেশপথের দু'পাশে কাটরার ভিতর দিক থেকে দোতলা ও তিনতলায় ওঠার সিঁড়ি আছে। ... দক্ষিণদিকের প্রসারিত অংশ ছাড়া কাটরার এই অংশের আয়তন ছিল প্রায় ৬০′ × ৪৪′। উপরের দোতলায় এবং তিনতলায় নির্মিত ছিল বসবাসের কক্ষ। শুধুমাত্র প্রবেশপথের উপরের অংশই ছিল তিনতলাবিশিষ্ট। কাটরার বাকি অংশ ছিল দ্বিতীয় ... প্রবেশপথ এলাকায় দু'পাশে নিচতলার প্রত্যেক ভাগে ৫টি করে বিরাট

আকারের কক্ষ আছে। প্রত্যেক দিকের শেষ দু'টি কক্ষ থেকে উত্তরভাগে কিছু অংশ কেটে নিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ১টি করে আলাদা কক্ষ নির্মাণ করার হয়েছে। দোতলায় নিচতলার মতোই কক্ষ নির্মিত হয়েছিল এবং এগুলির সামনে আছে টানা বারান্দা। দক্ষিণ ব্লকের দুই কোণে ২টি বিরাট টাওয়ার (tower) আছে। আট কোনাকারে নির্মিত এগুলির ভিতরদেশ ফাঁপা এবং ব্যাস ১০′–১০′। এখন মাদ্রাসার ছাত্রদের বসবাসের জন্য এই টাওয়ার দু'টি ব্যবহৃত হচ্ছে। ... কাটরার উত্তর ব্লকের মাঝামাঝি প্রায় অনুরূপ একটি প্রবেশপথ ছিল। কিন্তু সেটি এত জাঁকজমকপূর্ণ ও এতবড় ছিল বলে মনে হয় না। সেই তোরণটির কিছু অংশ অতি জীর্ণ অবস্থায় এখনও কোনোরকমে টিকে আছে। কাটরায় পশ্চিম ও পূর্ব ব্লকের মাঝখানেও ১টি করে তোরণ ছিল বলে সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর বলেছেন। কিন্তু সেগুলি বের করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। একমাত্র দক্ষিণদিকের প্রবেশপথ ছাড়া কাটরার বাকি অংশ ছিল দ্বিতল এবং সেখানে উপরে ও নিচে ছিল অসংখ্য বাসগৃহ।"

বড় কাটরার গঠনশৈলী খুবই আকর্ষণীয়, প্লাস্টারে কাটা কিছু কিছু নকশা দেখা গেলেও তার সংখ্যা খুব কম। সাদামাটা প্লাস্টারই শোভা পাচ্ছে। খিলানগুলো মুঘল রীতিতে চার বিন্দু থেকে সৃষ্ট কৌণিক (four-centred)।

মানুষ মরণশীল, কিন্তু মানুষের সৃষ্ট কীর্তিসমূহ বহুদিন কালের স্বাক্ষর বহন করে থাকে। একথা স্মরণ করেই সম্ভবত দ্বিতীয় শিলালিপিটি উৎকীর্ণ করা হয়, যাতে বলা হয়েছে যে শাহ সুজা বাসস্থানের জন্য হিজরী ১০৫২ খ্রিস্টীয় ১৬৪৩–৪৪ সনে এ ইমারতটি নির্মাণ করেন। দানী এ লিপির ইংরেজি অনুবাদ করেন :

'To this lofly building which proppeth high heaven by this slave Abul Kasim foundation was given. What a building! It putteth high heaven to shame. A copy of Paradise ye might it name."

বঙ্গানুবাদ ঃ "এটি সুউচ্চ গগনে উঠে যাওয়া সেই ইমারত যা দাস আবুল কাশেম চমৎকার দালান নির্মাণ করেন। এটি স্বর্গকেও হার মানায়। স্বর্গের একটি নকল বলে অভিহিত করা যায়।"

১০। চুড়িহাট্টা, মসজিদ, ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দ

শাহ সুজার শাসনামলের অপর একটি কীর্তি হচ্ছে চকবাজারের জামে মসজিদের উত্তর লাগ চুড়িহাট্টা মহল্লার একটি ব্যতিক্রমধর্মী মসজিদ। জেমস ওয়াইজ ১৮৮৪ সনে এক প্রতিবেদনে বলেন যে, মুসলিম চুড়ি প্রস্তুতকারকগণ বিভিন্ন রঙের ব্যবহারে ও ফয়েলের সাহায্যে কাঁচের হরেক রকম চুড়ি প্রস্তুত করতে পারতেন, কিন্তু তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু কারিগরেরা কেবলমাত্র লাক্ষ্যা দিয়ে চুড়ি বানাতে পারত। ওয়াইজ বলেন, "Glass in crude lumps (thakka) is imported from Cawnpore. various tints are given to it by the Churiallah. By mixing tin and lead a yellow is obtained ... with sulphate of copper a deep green a skilful worker turns out over 1000 braclets a day.... " অর্থাৎ কানপুর থেকে কাঁচের দলা নিয়ে

এসে তাতে চুড়িওয়ালা টিন এবং সিসা মিশ্রিত করে কাঁচকে হলুদ রঙে রূপান্তরিত করতে পারত এবং কখনো কখনো গন্ধক তামা দিয়ে সবুজ রং করে সুন্দর সুন্দর বালা তৈরি করতে পারত। একজন দক্ষ কারিগর দিনে ১০০০ বালা তৈরি করতে পারত।" চুড়িওয়ালাদের চুড়ির হাট থেকে মহল্লার নামাকরণ হয়েছে চুড়িহাট্টা। এখানে শাহ সুজার আমলে ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে মুঘল রাজকর্মচারী মোহাম্মদ বেগ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

মসজিদের আদিরূপ সম্বন্ধে নানাবিধ মত রয়েছে। ঢাকার ঐতিহাসিকগণ—ব্রাডলি বার্ট, আওলাদ হাসান, মোহাম্মদ তৈফুর এবং আহমদ হাসান দানী চুড়িহাট্টা মসজিদটি পূর্বে একটি মন্দির ছিল বলে উল্লেখ করেন। ব্রাডলি বার্টের ভাষায়, "চুড়িহাট্টা মসজিদ প্রসঙ্গে একটি অবিশ্বাস্য কিংবদন্তি প্রচলিত আছে যা সুলতান শাহ সুজার সময়ের অপর একটি মূল্যবান কীর্তি হিসাবে কালের স্বাক্ষর বহন করে রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, আদিতে এটি মন্দির হিসাবে নির্মিত হয়, যা ভল্টের ছাদ (?) এবং সাধারণ আকৃতি দেখে সহজে নিশ্চিত করা যায়। কিংবদন্তি অনুযায়ী মুঘল সরকারের একজন হিন্দু রাজকর্মচারীকে একটি মসজিদ নির্মাণ করতে বলা হয়েছিল কিন্তু ঢাকা থেকে সুবাদার এবং উচ্চপদস্থ রাজার কর্মচারীদের অবর্তমানে যখন ঢাকা রাজধানীর মর্যাদা হারায় (রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তরিত হলে) তখন উক্ত কর্মচারী মসজিদের স্থলে একটি মন্দির নির্মাণ করেন এবং মন্দির নির্মাণ ও বিগ্রহ স্থাপন সম্পন্ন হবার পর সুবাদার জানতে পেরে এ ইমারতটি মসজিদ হিসাবে রূপান্তরিত করার নির্দেশ দেন। উপরোক্ত ঘটনার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয় যখন মসজিদের অভ্যন্তরে বাসুদেবের একটি পাথরের মূর্তি, যা পরবর্তীকালে শাহ সুজার নির্দেশে ঘৃণাভরে সরিয়ে ফেলা হয়।" যদি এ ঘটনাটি সত্য হয় তা হলে এটি খুবই ব্যতিক্রমধর্মী। আওলাদ হাসানের উদ্ধৃতি দিয়ে আহমদ হাসান দানী এ ঘটনাটি সত্য বলে উল্লেখ করেন। মোহম্মদ তৈফুর এবং তাঁর অনুসারী মোহাম্মদ যাকারিয়াও এই মতবাদ সমর্থন করে বলেন যে, হিন্দু মন্দির নির্মাণ ফারসি ভাষায় উৎকীর্ণ লিপি (Chronogram) সাক্ষ্য দেয়। তৈফুর আরও বলেন যে, বাসুদেবের মূর্তিটি ঢাকা কালেক্টরেটে সংরক্ষিত আছে।

যাহোক, নিরপেক্ষ বিচারে প্রতীয়মান হয় যে, চুড়িহাট্টা মসজিদটি পূর্বে কোনো হিন্দু-বিগ্রহসম্বলিত মন্দির ছিল না। এ মতের সমর্থনে কয়েকটি যুক্তি দেওয়া যায়। প্রথমত, বর্তমাজার ইমারতটিকে হিন্দুমন্দির বলা মারাত্মক ভুল হবে কারণ এটি মসজিদের ভূমি-নকশায় নির্মিত; দ্বিতীয়ত, যদি মন্দিরকে ভেঙেও মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়ে থাকে তা হলে তাও সম্ভব নয়। কারণ মন্দিরে যে গর্ভগৃহ এবং বেদি বা কুলুঙ্গি (niche) থাকে তা দেখা যায় না। তৃতীয়ত, যে বাসুদেবের মূর্তির কথা বলা হয়েছে এবং যার উল্লেখ ব্রাডলি বার্ট ও মোহম্মদ তৈফুর করেছেন, তা যে চুড়িহাট্টা মসজিদের বা মতান্তরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল এমন কথা নিশ্চিত করে কখনোই বলা যাবে না। চতুর্থত, হিন্দু স্থপতি কর্তৃক মসজিদ নির্মাণ খুবই অস্বাভাবিক, বিশেষ করে যখন শাহ সুজার শাসনামলে বড় কাটরার নির্মাতা আবুল কাশেম এবং চুড়িহাট্টা মসজিদের নির্মাতা

মোহাম্মদ বেগের মতো প্রথিতযশা স্থাপতি নির্মাণকাজে রত ছিলেন; পঞ্চমত, ঢাকার ইমারত নির্মাণে অংশগ্রহণকারী স্থপতিদের তালিকায় হিন্দু ওস্তাগার বা কারিগরের নাম পাওয়া যায় না। ষষ্ঠত, ব্রাডলী বার্টের মন্তব্য যে, ভল্টের ব্যবহার ও ইমারতের আকৃতি দেখে হিন্দুমন্দির প্রমান করা বাতুলতা মাত্র, কারণ সকল ঐতিহাসিকই বলেছেন যে এটির ছাদ সমান্তরাল ছিল, গম্বুজ ছিল না। গম্বুজ না থাকলে মসজিদ হবে না, তা বলা যায় না। তা ছাড়া ফ্লাট ছাদ ছিল না বরং চালাঘরের সদৃশ ছাদ ছিল, যা আহমদ হাসান দানী দৃঢ়তার সাথে বলেছেন। সুতরাং মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। এ প্রসঙ্গে দানীর মন্তব্য, "But the present building was decidedly not a temple as the rumour goes. It is out and out a mosque." অর্থাৎ বর্তমান ইমারতটি সুনিশ্চিতভাবে মন্দির ছিল না, যা জনশ্রুতিতে বহুল প্রচারিত। এটিকে সর্বোতভাবে মসজিদ বলা যায়।

বর্তমানের চুড়িহাট্টা মসজিদটি গম্বুজবিহীন আয়তাকার ইমারত। আহমদ হাসান দানীর ভাষায়, "The mosque is rectangular in plan with towers at the four corners. The eastern side has three door ways, each of which opens through two successive arches. The facade is marked with numerous square and rectangular panels and the cornice which is straight, is faced with blind merlons. The interior hall is covered with an interesting vaulted roof the line of intersection is curved and so is the central ridge. But this vaulted roof is a development from the North Indian pyramidal type. It has no long drawn eves, as found in the Bengali type." বঙ্গানুবাদ ঃ "আয়তাকার মসজিদটির চার কোনায় চারটি টারেট রয়েছে। পূর্বদিকে তিনটি দরজা এবং প্রতিটি দু'টি খিলানরাজি দ্বারা সমৃদ্ধ। সম্মুখভাগ (facade) চতুষ্কোণাকার এবং আয়তাকার প্যানেল নকশা দ্বারা অলঙ্কৃত। কার্নিশ সমান্তরাল (বক্রাকার নয়) এবং নিরেট মার্লন নকশা দ্বারা শোভিত। অভ্যন্তর চালা-ঘরের মতো ভল্টদ্বারা নির্মিত (কোনো গম্বুজ দেখা যাবে না), যা ভারতীয় হিন্দু ইমারতের পিরামিড রীতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বাংলার ইমারতে সচরাচর যে বক্রাকার eve (ধনুকাকার) দেখা যায় তা এখানে দেখা যাবে না।"

১৪। মুকীম কাটরা, ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দ (অধুনালুপ্ত)

মুঘল আমলে ঢাকায় তিনটি সরাইখানা বা কাটরা নির্মিত হয়-বড় কাটরা, মুকীম কাটরা এবং ছোট কাটরা। এ তিনটির মধ্যে দুটি–যথা বড় কাটরা ও ছোট কাটরা অক্ষত অবস্থায় আছে। কিন্তু মুকীম কাটরা বহু পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। কাটরা স্থাপত্য প্রসঙ্গে বাংলার নির্মিত দৃষ্টান্তের মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত পুরাতন মালদার কাটরা এবং মুর্শিদকুলী খানের আমলে নির্মিত মুর্শিদাবাদের কাটরার (অষ্টাদশ শতাব্দী) উল্লেখ করা যায়।

১৬৩০ থেকে ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত মীর জুমলা যখন বাংলায় সুবাদার ছিলেন তখন ঢাকায় কতিপয় ইমারত নির্মিত হয়। এ সময়ে ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে মীর মোহাম্মদ

মুকীম ঢাকায় একটি ক্ষুদ্রাকৃতি কাটরা তৈরি করেন। এটি চকবাজার সড়কের দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ মুকীমের নাম থেকে এটি মুকীম কাটরা নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং চকবাজার এলাকায় শুধুমাত্র নামটি প্রচলিত আছে। ঢাকার কালেক্টরেট সংরক্ষিত রেকর্ড থেকে জানা যায় যে, বড় কাটরার অনুকরণে নির্মিত এবং ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসাবে পরিচিত মুকীম কাটরা ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় ছিল। পরে মিউনিসিপ্যালিটি জননিরাপত্তার ওজুহাতে এই জরাজীর্ণ ইমারতটি ধ্বংস করে দেয়। চক এলাকায় নবাব কাটরা ও মায়া কাটরা নামে দু'টি মহল্লা রয়েছে, যা কাটরা বা সরাইখানাকে ইঙ্গিত করে।

১৫। ছোট কাটরা, ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ (২৭)

বড় কাটরা থেকে প্রায় ২০০ গজ পূর্বদিকে হাকিম হাবিবুর রহমান লেনে বড় কাটরার অনুকরণে ছোট কাটরা নির্মিত হয়। ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে নবাব শায়েস্তা খানের আমলে এটি স্থাপিত হয়। ধারণা করা হয় যে, স্বীয় পরিবার-পরিজনসহ বসবাসের জন্য ক্ষুদ্রাকার কাটরাটি নির্মিত হয়, তবে পরিবারের সকল সদস্য এখানে থাকতেন কি না সঠিকভাবে বলা যায় না। কারণ মিটফোর্ডে বর্তমানে যেখানে ফিমেল ওয়ার্ড তার সন্নিকটে বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষে পাকুড়তলীতে শায়েস্তা খান আর একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। আবার অনেকে বলেন যে, তিনি লালবাগ দুর্গেও বসবাস করতেন। এস. এম. তৈফুর বলেন, "The Palace of Chhota Kattra was built in 1671 linked and in line with Bara Kattra. The object was to accomodate some offices of the Nawab and also a part of his expanding family." অর্থাৎ "ছোট কাটরা প্রাসাদটি বড় কাটরার অনুকরণে ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয় এবং এর উদ্দেশ্য ছিল সরকারি দফতর স্থাপন এবং তার ক্রমবর্ধমান পরিবারের সদস্যদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।" দানী অবশ্য তৈফুরের মতবাদকে খণ্ডন করে বলেন যে, সুবাদার শায়েস্তা খান ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে ছোট কাটরা নির্মাণ করেন এবং তিনি প্রাসাদ, মসজিদ, বুড়িগঙ্গা নদীর বন্দর বা পোস্তাসহ একটি বিরাট ইমারত কমপ্লেক্স স্থাপনের প্রয়াস পান, যা লালবাগ থেকে মিটফোর্ড পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

স্থাপত্যশৈলীর দিক থেকে ছোট কাটরা বড় কাটরার হুবহু নকল। আহমদ হাসান দানী তাঁর 'Muslim Architecture in Bengal' গ্রন্থে বলেন, "ক্ষুদ্রাকার হলেও বড় কাটরার সাথে ছোট কাটরার ভূমি-নকশা এবং স্থাপত্যকলায় সাদৃশ্য রয়েছে। এ ইমারতের উত্তর ও দক্ষিণদিকের ফটক এখনও বিদ্যমান রয়েছে, যদিও অনেক সংস্কারের ফলে এর মৌলিকত্ব নষ্ট হয়ে গেছে।" ছোট কাটরা প্রসঙ্গে মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেন, "দুর্গাকারে নির্মিত এই ইমারতের দক্ষিণ বাহু ছিল প্রায় নদীর তীর ঘেঁষে। এখন নদী ও ছোট কাটরার মাঝখানে বেশ কায়েকটি ইমারত গড়ে ওঠার ফলে কাটরার আগের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ব্যাহত হয়েছে। দক্ষিণ বাহুর কেন্দ্রস্থলে ছিল এর প্রধান প্রধান প্রবেশপথ। প্রায় বড় কাটরার মতো করেই এই প্রবেশদ্বার নির্মিত হয়েছিল। বিরাট আকারের প্রবেশদ্বারের উপরের অংশ ছিল তিনতলাবিশিষ্ট। দক্ষিণ

বাহুর বাকি অংশ ছিল দ্বিতল। তোরণদ্বারের উপরের অংশে পরবর্তীকালে নূতনভাবে সংস্কার করার ফলে মুঘল স্থাপত্য নিদর্শন অধিকাংশ তিরোহিত হয়েছে। উত্তরদিকের তোরণটি ছিল দ্বিতল। এটি বর্তমানে অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় টিকে আছে। উত্তর তোরণে পূর্বদিকের অংশ ও পূর্ব বাহুর সম্পূর্ণ অংশ এবং দক্ষিণ বাহুর পূর্বাংশ অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় টিকে আছে। উত্তর ও পূর্ব বাহু খুব সম্ভব একতলবিশিষ্ট ছিল। সেখানে একতলার ছাদের উপর দ্বিতল নির্মিত হয়েছিল এমন কোনো চিহ্ন বর্তমানে পাওয়া যায় না। সংযোজিত নূতন অংশ ইউরোপীয় ধাঁচে পুনঃনির্মিত। বর্তমানে ছোট কাটরার আশেপাশে বেআইনিভাবে অনেক দোকানপাট ও ঘরবাড়ি নির্মিত হয়েছে। ছোট কাটরায় নবাবের পরিবারের কতিপয় সদস্যের বাসস্থান ছিল। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, শায়েস্তা খানের কনিষ্ঠ পুত্র, যার সমাধি বিবি পরীর মাজারের বাইরে দেখা যাবে, খোদাদাদ খান, এখানে বসবাস করতেন।

১৬। নভরায় লেনের মসজিদ, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে

পুরাতন ঢাকার ইসলামপুর এলাকায় নভরায় লেনে একটি মুঘল আমলের ক্ষদ্রাকৃতি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। গ্রন্থকার Dhaka Past Present Future গ্রন্থে প্রকাশিত MKUsim Monuments of Dhaka শীর্ষক প্রবন্ধে নভরায় লেনের মসজিদ সম্বন্ধে বলেছেন যে, এটি একটি গম্বুজাকৃতি বর্গাকার ইমারত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে অর্থাৎ নবাব শায়েস্তা খানের দ্বিতীয় দফার সুবাদারীর সময় (১৬৮০-৮৮) এ মসজিদটি স্থাপিত হয়। মুঘলরীতির পরিচায়ক এ মসজিদটির পূর্বদিকে কেন্দ্রীয় খিলানপথ এবং এর দু'পাশে দু'টি খিলানপথ দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। কেন্দ্রীয় খিলান দু'টি বহু খাঁজবিশিষ্ট এবং পার্শ্ববর্তী খিলান দু'টি তিন খাঁজবিশিষ্ট। অভ্যন্তরে কিবলার দিকে তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব দেখা যাবে। মিহরাবগুলো আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ এবং প্যানেল নকশা দ্বারা সমৃদ্ধ। সম্প্রতি পূর্বদিকে একটি বারান্দা সংযোজিত হয়েছে যার সাথে মূল নকশার কোনো সামঞ্জস্য নেই।

১৭। ইসলাম খানের মসজিদ, সপ্তদশ শতাব্দী

ঢাকা শহরের অন্যতম প্রাচীন মসজিদসমূহের মধ্যে ইসলামপুর রোডের সন্নিকটে নবাব ইসলাম খান প্রতিষ্ঠিত মসজিদটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। মসজিদটি আশিক জমাদার বা বর্তমানে সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেনে অবস্থিত। নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এটি শায়েস্তা খানের পূর্বে নির্মিত হয় যখন ইসলাম খান ঢাকাকে মুঘল রাজধানীতে পরিণত করে নামাকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। আহমদ হাসান দানী এ মসজিদ প্রসঙ্গে বলেন, "নগরী (ঢাকা) যেখানে জনসংখ্যা ও ভাবধারায় হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল অপরিসীম, সেখানে ইসলাম খান রাজধানী প্রতিষ্ঠা করলে সমাজ ও সংস্কৃতির ধারার আমূল পরিবর্তন দেখা দেয় এবং মুঘল সেনা ছাউনী প্রতিষ্ঠিত হয়ে মুসলিম জনসমাগম হতে থাকে। এর ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটপ্রেক্ষিত পরিবর্তীত হতে থাকে। পারস্য ঐতিহ্য এবং আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত মুঘলগণ পুরাতন ঐতিহ্য ও ছোট ছোট গলিসমৃদ্ধ ঢাকার ব্যপক পরিবর্তন সাধন করেন। ইসলাম খান ঢাকায় বসবাস শুরু করে

নূতন শহরের গোড়াপত্তন করলেন, পুরাতন কেল্লাকে সুরক্ষিত ও সম্প্রসারিতই করলেন না; নূতন নূতন মহল্লা সৃষ্টি করলেন এবং প্রশস্ত সড়ক স্থাপন করলেন, যেমন সদরঘাট থেকে বাবুবাজার পর্যন্ত ইসলামপুর রোড। তিনি নূতন বসতি এলাকা সৃষ্টি করেন যাতে ঘরবাড়িসহ মসজিদও নির্মিত হয়। এ ধরনের একটি মসজিদ ইসলাম খান-কি মসজিদ নামে পরিচিত।"

ইসলাম খানের মসজিদটি সম্বন্ধে মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেন, "তিন গম্বুজবিশিষ্ট এ মসজিদের কেন্দ্রীয় গম্বুজটি পাশের দু'টি গম্বুজ থেকে অনেক বড়। সাদাসিধাভাবে নির্মিত এই মসজিদের ভিতর ও বাইরের দিকে কোনো অলঙ্করণ নেই। হাল আমলে এ মসজিদের আমূল সংস্কার করা হয়েছে। স্থানীয় জনপ্রবাদ মতে, ঢাকার প্রথম মোঘল সুবাদার ইসলাম খান এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, মসজিদের গঠনপ্রণালী এবং স্থাপত্যকৌশলও তা প্রমানিত করে।"

১৮। বিবি চম্পার সমাধি, সপ্তদশ শতাব্দী

সৈয়দ মুহম্মদ তাইফুর বিবি চম্পার সমাধিসৌধ সম্বন্ধে বলেন, "শায়েস্তা খানের দ্বিতীয় দফার সুবাদারীকালে বিবি চম্পা নামে একজন মহিলার একটি সুন্দর সমাধিসৌধ নির্মিত হয় এবং এই বিবি চম্পার নামানুসারে এলাকাটির নাম হয় চম্পাতলী। তিনি সম্ভবত শায়েস্তা খানের বাঙালি স্ত্রী অথবা উপপত্নি ছিলেন এবং লেখকের ধারণা যে, তিনি শায়েস্তা খানের কনিষ্ঠ পুত্র খোদাবান্দা খানের মাতা ছিলেন। মাসির-উল-উমরায় বলা হয়েছে যে, নবাবের প্রথম এবং আদি স্ত্রী ছিলেন আবদুর রহমান খান-ই-খানানের পুত্র শাহনাওয়াজ খানের কন্যা এবং তাঁর অপর সমস্ত স্ত্রীগণ সকলেই উপপত্নী ছিলেন। জাহাঙ্গীর শায়েস্তা খানের সঙ্গে শাহনাওয়াজ খানের কন্যার বিবাহের আয়োজন করেন।"

অন্যদিকে 'আসুদগান-ই-ঢাকা'র প্রণেতা হাকিম হাবিবুর রহমান বলেন, "ছোট কাটরায় একটি চতুষ্কোণবিশিষ্ট ইমারত পরিলক্ষিত হয়। উহার প্রতিটি অংশই একতালা এবং উহাতে বেশ কয়েকটি প্রকোষ্ঠ আছে। উহার একটি দরজা নদীর দিকে এবং অপরটি শহরের দিকে। উভয় দরজাই দ্বিতল। মাঝের ময়দানে একটি গম্বুজ আছে, যার ভিতরে ছিল একটি কবর। জনৈক খ্রিস্টান ব্যক্তি উক্ত জায়গাটি ক্রয় করে নেন। ঐ কবর থেকে হাড় গোড় বের করে উহার ওপর নির্মাণ করেন একটি পাকা কবর। ১৫১৫ ইংরেজী সালে অতুল বোস নামে এক হিন্দু ভদ্রলোকে এখানে থাকতো। সে এখানে একটি লোহার কারখানা খুলেছিল। তিনি উক্ত আঙ্গিনায় একটি কবর বানিয়েছিলেন। .... মোট কথা এ স্থানকে ছোট কাটরা এ জন্য বলা হয় যে, উহা বড় কাটরা অপেক্ষা ছোট। বিবি চম্পা কে ছিল ? এলাকার সকলেই বলল তিনি ছিলেন শায়েস্তা খানের মেয়ে। মিঃ রেঙ্কিন লিখেছেন চম্পা ছিল শায়েস্তা খানেরই একজন কন্যা। মিস্টার রেঙ্কিন খুব সরল লোক ছিলেন। তিনি লোকের কথায় বেশি বিশ্বাস করতেন। তিনি জানতেন না যে চম্পা ও গোলাপ বেগমের নাম একই মহিলার হতে পারে না। বরং এধরনের নাম

সাধারণ বেগমের বাদীদের। মিস্টার রেঙ্কিন এ কথা বলেছেন যে, ঢাকার একটি পরিবার রয়েছে যারা শায়েস্তা খানের বংশধর বলে দাবি করে এবং তাদের কাছে শায়েস্তা খানের একটি উইল বা অছিয়তনামা রয়েছে। ...মোট কথা কিছু লোকের স্বভাব এমন রয়েছে যারা প্রতিটি প্রাচীন প্রাসাদকে শায়েস্তা খানের আমলের বলে থাকে এবং প্রতিটি গম্বুজ বিশিষ্ট মাজারকে কোন কন্যার মাজার বলে থাকে।"

ঢাকার প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের মধ্যে ব্রাডলি বার্ট অন্যতম। তিনি বিবি চম্পা সম্বন্ধে বলেন, "Overlooking the Buriganga, only a hundred yards away us stream from the Bara Katra, it is a beautiful building, well-proportioned, with massive walls that have stoutly with, stood the ravages of time. But later years have treated it with-scant respect and put it to base uses; making of it as a store house for coal and lime. Within the court a small circular mausoleum once covered the grave of Bibi Champa who gives her name to this quarter of the city Champatoli. Of the lady herself nothing is known with certainty but it is probable that he was one of the daughters of Shaista Khan. Over the door of the mausoleum, it is said, there was once a tablet bearing an inscription, but if such existed, it has long since disappeared and nothing remains to tell the story of Bibi Champa. As so often in Dacca, only the name survives. All else is dead."

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা যাচ্ছে যে, এস. এম. তৈফুর বিবি চম্পাকে শায়েস্তা খানের উপপত্নী বলেছেন। তাঁর প্রকৃত নাম কি ছিল তা বলা যায় না। একথার সমর্থন পাওয়া যায় তৈফুরের অনেক পূর্বে রচিত হাবিবুর রহমানের 'আসুদগান-ই-ঢাকায়। তিনি নামের ধরন, যেমন গোলাপ বেগম, চম্পা বেগম ইত্যাদি দেখে উপপত্নী বলেছেন, আবার অন্যস্থানে তাঁর কন্যার মাজায় বলেছেন, যা র‍্যাঙ্কিনের গ্রন্থে উল্লেখ আছে। ব্রাডলি বার্টও মনে করেন যে, বিবি চম্পা শায়েস্তা খানের কন্যা ছিলেন। মুঘল রাজপরিবারে উপপত্নী রাখার যে প্রথা ছিল শায়েস্তা খানের সময়ে তা বলবৎ ছিল এবং ছদ্মনাম থাকায় ধারণা করা যায় যে, চম্পা বা চম্পাবতী নিঃসন্দেহে সুবাদারের উপপত্নী ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি ছোট কাটরা প্রাঙ্গণে সমাহিত ছিলেন, কন্যা হলে তাঁকে সম্মানের সাথে দুর্গে বা প্রাচীরবেষ্টিত এলাকায় সমাহিত করা হত; কিন্তু তাঁকে তা করা হয়নি। তৃতীয়ত, শায়েস্তা খানের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তাঁর কন্যা হিসাবে যাঁদের নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে চম্পাবিবির নাম নেই। বিশেষভাবে 'মাসির-উল-উমরাহে', যেমন ইরানদুখত বিবি পরী, তুরানদুখত বিবি মরিয়ম, শাহজাদী বেগম, লাডলী বেগম ইত্যাদি। উপরন্তু, চম্পা বিবির পুত্রের নাম পাওয়া যায় খোদাবান্দা খান, যিনি লালবাগ দুর্গের পরীবিবির সমাধির বাইরে খোলা চত্বরে সমাহিত। আ. ক. ম. যাকারিয়া বলেন, "১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খান তাঁর বসবাসের জন্য এই ইমারত নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি এ অট্টালিকায় বাস করেছিলেন কিনা তা জানা

যায়নি। তবে তাঁর ক্রমবর্ধমান পরিবারের সদস্যগণ এবং বিশেষ করে বিবি চম্পা নামক তাঁর এক স্ত্রী বা উপ-পত্নী এখানে বাস করতেন বলে জানা যায়। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র খোদাবান্দে খান ওরফে মীর্জা বাঙ্গালী এখানে বসবাস করতেন এবং তাঁর বংশধরেরা বহুকাল ধরে এখানে ছিলেন বলে জানা যায়।"

শায়েস্তা খানের আমলে এক গম্বুজ দ্বারা আবৃত বর্গাকার ইমারতের অনুকরণে বিবি চম্পার সমাধিটি নির্মিত। এর প্রতি বাহু ২৪ ফুট বাইরের দিকে এবং চার কোনায় চারটি বুরুজ রয়েছে, চারদিকের প্রাচীরে চারটি খিলানপথ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রবেশপথের উভয়দিকে ক্ষুদ্রাকৃতি টারেট রয়েছে, যা উল্টা করে সৃষ্ট ভাণ্ডের (Inverted jar) ওপর থেকে উপরে উঠে গেছে। চতুষ্কোণাকার এ সমাধিসৌধটি এক সময় গম্বুজ দ্বারা আবৃত ছিল কারণ অভ্যন্তরে স্কুইঞ্চের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু ডি'ওয়েলি ছোট কাটরার যে জলরং চিত্র অঙ্কিত করেন তাতে প্যাভিলিয়ন ছাদ দেখা যাবে। সম্ভবত এ কারণেই প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ভুলবশত পুনর্নির্মাণের সময় এটি প্যাভিলিয়ন ছাদ সৃষ্টি করেন। অনুরূপ স্থাপত্যিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল মুহম্মদপুরে অবস্থিত অজানা সমাধিতে। মূলত সেটিতেও গম্বুজের ব্যবহার ছিল কিন্তু প্যাভেলিয়ন বা ক্যানোপি দিয়ে আবৃত করা হয়, যা চিস্তিবিহিস্তিতে দেখা যাবে।

১৯। লাডলী বেগমের সমাধি, সপ্তদশ শতাব্দী (অধুনালুপ্ত)

ডি' ওয়েলী তাঁর ৬ নম্বর জলরং চিত্রটিতে, যা নাজমা খান মজলিস Dhaka in Early Nineteenth century paintings-এ প্রকাশিত করেছেন দুটি ইমারতের দৃশ্য অঙ্কন করেন। ডাইনে যে ইমারতটি দেখানো হয়েছে তা নওবতখানা বা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের ঘর (Music hall) হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এর পাশে দু'টি সেতু দেখা যাবে, দক্ষিণ দিকেরটি বাবুবাজারের খালে প্রবেশপথে নির্মিত হয় এবং অপরটি এর সামান্য উত্তরে। নওবতখানার সামান্য দক্ষিণ-পূর্বে চিত্রে আর একটি ইমারত দেখা যাবে। এটিকে লাডলী খানমের সমাধিসৌধ বলে নাজমা খান মজলিস চিহ্নিত করেছেন। চিত্রে এটি খুবই জরাজীর্ণ অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। আসমা সিরাজুদ্দীন তাঁর "Mughal Tombs in Dhaka" শীর্ষক প্রবন্ধে এক স্থানে শাহজাদী খানম ওরফে লাডলী বেগমের কথা উল্লেখ করেন এবং তাঁর সমাধিসৌধটি এক গম্বুজবিশিষ্ট সমাধির অন্তর্ভুক্ত করেন। বর্তমান এর কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট নেই।

২০। শায়েস্তা খানের মসজিদ, সপ্তদশ শতাব্দী

বুড়িগঙ্গার তীরবর্তী মিটফোর্ড হাসপাতালের ফিমেল ওয়ার্ডের পিছনে শায়েস্তা খানের মসজিদ রয়েছে। এতে পূর্বে একটি শিলালিপি ছিল, বর্তমানে প্রধান প্রবেশপথের উপর যে স্থানে শিলালিপি ছিল, সে স্থানটি শূন্য রয়েছে। যাহোক, স্থাপত্যশৈলীর বিচারে এটিকে শায়েস্তা খানী কীর্তির প্রতিফলন বলা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, এর সন্নিকটে শায়েস্তা খান একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। আহমদ হাসান দানী এ মসজিদের নির্ভরযোগ্য বিবরণ দেন। বর্তমান মসজিদটি মূল ইমারত নয় কারণ আগুনে ধ্বংসপ্রাপ্ত

হলে ব্রিটিশ আমলে পুরাতন নকশা অনুযায়ী এটি পুনঃনির্মিত হয়। এর ফলে এর প্রাচীন সৌন্দর্য ও আকৃতি কিছুটা ব্যাহত হয়। এতদসত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, এটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদ এবং এর কোনায় চারটি ট্যারেট দেখা যাবে। গম্বুজগুলো ড্রাম থেকে উঠে গেছে এবং মার্লনের অলঙ্করণ শোভা পাচ্ছে। প্রবেশের জন্য পূর্বদিকে তিনটি খিলানপথ এবং অর্ধগম্বুজ বা alcove-এর মধ্য দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করা যায়, যা লালবাগ দুর্গ মসজিদে দেখা যাবে। এ মসজিদটি শায়েস্তা খানের প্রথম সুবেদারীর সময়কালে নির্মিত। যেহেতু পূর্ত বিভাগ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল এ কারণে মৌলিক স্থাপত্যিক উপাদান ব্যবহৃত হয়নি; যদি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এর পুনঃনির্মাণ করত তাহলে এর আদি বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পেত। কিবলায় তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব দেখা যাবে।

শায়েস্তা খানের মসজিদ প্রসঙ্গে ডি' ওয়েলির মন্তব্য করেন যে, "শাহজাহানের আমলে মোহন (মানসিংহ) শায়েস্তা খানের মসজিদকে মন্দির হিসাবে নির্মাণ শুরু করেন কিন্তু পরবর্তীকালে সায়েফ (শায়েস্তা) খান এটিকে মসজিদ হিসাবে নির্মাণ সম্পন্ন করেন। এর ভিতর ও বাহির কুর'আনের লিপিদ্বারা অলঙ্কৃত রঙিন টালি দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। স্থাপত্যের দিক থেকে এর প্যানেল নকশা, কৌণিক খিলান এবং ছয় পাশবিশিষ্ট মিনারেট (টারেট) সুসংহতভাবে সমন্বিত। অলঙ্করণের ব্যবহার করা হয়েছে অত্যন্ত সুচারুরূপে।

এটি মূলত তিনগম্বুজ দ্বারা আবৃত ছিল। ডি'ওয়েলি, মন্তব্য সঠিক নয়। প্রথমত, শায়েস্তা খানের মসজিদ শায়েস্তা খান শুরু ও শেষ করেন। দ্বিতীয়ত, কোনো মসজিদ মন্দির হিসাবে শুরু করা যায় না, যেখানে ভূমি-নকশার মধ্যে কোনোই মিল নেই। তৃতীয়ত, ডি' ওয়েলি যাকে 'সায়েফ খান' বলেছেন তিনি আসলে শায়েস্তা খান। চতুর্থত, ডি' ওয়েলি শায়েস্তা খানের মসজিদটিকে চুড়িহাট্টা মসজিদের সাথে গুলিয়ে দিয়েছেন, যার সম্বন্ধে জনশ্রুতিতে প্রচলিত ছিল যে এখানে প্রথমে একটি মন্দির নির্মিত হয় এবং এখানে বাসুদেবের বিগ্রহ (?) বসানো হয় (পূর্বে আলোচিত হয়েছে)।

২১। চকবাজারের শাহী মসজিদ (সংস্কারকৃত ও পুনঃনির্মিত), সপ্তদশ শতাব্দী (২৮)

মুঘল আমলে চকবাজার নিঃসন্দেহে প্রধান বিপণিকেন্দ্র ছিল। শায়েস্তা খানের আমলে এটি আওরঙ্গজেবের নামে পাদশাহী বাজার রাখা হয় এবং এর প্রধান আকর্ষণ ছিল দ্বিতলবিশিষ্ট মসজিদ। নিচের তলা বিপণি এবং দোতলায় নামাজ পড়ার ব্যবস্থা ছিল। এসময় সুবাদারের বাসস্থান ছিলে বর্তমান কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদ, এ জায়গাটি প্রথমে প্রতিষ্ঠা করেন রাজা মানসিংহ, যিনি ভাওয়াল থেকে ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় সামরিক দফতর স্থানান্তরিত করেন। মুর্শিদকুলী খান ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে বাজারটি সম্প্রসারণ করেন এবং তিনি সন্নিকটে বেগমবাজারে একটি সাত গম্বুজবিশিষ্ট (কারতালাব খানের) মসজিদ নির্মাণ করেন, পরবর্তী পর্যায়ে মুর্শিদকুলী খানের জামাতা

লুৎফুল ওরফে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খান ১৭৩৩-৩৪ খ্রিস্টাব্দে এ বাজারের সম্প্রসারণ করেন। ডি' ওয়েলি ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে এ বাজারের বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, "চকঢাকার অতি প্রাচীন বিপণিকেন্দ্র এবং পুরাতন নেকাউস বা নাক্কার নামক মহল্লায় অবস্থিত। আয়তনে এটি একটি বর্গাকার, যার প্রতি বাহু ২০০ গজ বিস্তৃত। এখানে প্রতিদিন ফল মিষ্টান্ন খেলনা ও হরেকরকম মনিহারী দ্রব্যাদি বিক্রয় হত। সূর্যাস্তের পর মহল্লার লোকজন দলে দলে এখানে সমবেত হত জিনিপত্র ক্রয়ের জন্য।"

জেমস টেলর ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে শাহী মসজিদটিকে যেভাবে দেখতে পান ঠিক সেভাবে এটি বর্ণনা করেন। তাঁর ভাষ্য, "এটি (চকবাজার) একটি সুন্দর ও পরিপাটি সহকারে নির্মিত চতুষ্কোণাকার বাজার এবং এর চারপাশে অসংখ্য মসজিদ ও বিপণি রয়েছে। বাজারের পশ্চিমদিকে জামে মসজিদ নির্মিত হয়েছে, যা বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে পুনঃনির্মিত। মসজিদের প্রধান প্রবেশপথের উপরে প্রোথিত শিলালিপি অনুযায়ী এটি ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে নবাব শায়েস্তা খান কতৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।"

শাহী মসজিদটি ১০ ফুট উঁচু প্লাটফর্মের উপর নির্মিত। আয়তাকারবিশিষ্ট এই মসজিদটি তিনটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। এ ধরনের ভূমি-নকশা ও তিনগম্বুজবিশিষ্ট ইমারত লালবাগ দুর্গ মসজিদ এবং খান মোহাম্মদ মৃধার মসজিদে দেখা যাবে। মূল মসজিদটির পরিমাপ ছিল ৫০′ × ২৬′; কিন্তু পরিবর্ধিত করে এটিকে করা হয় ৯৪′ × ৮০′। যদিও সংস্কার পুনঃনির্মাণ এবং যত্রতত্র সম্প্রসারণের ফলে আদি শাহী মসজিদটি এখন প্রায় বিলুপ্ত হলেও এতে একসময় ক্লাসিক্যাল মুঘল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদান ব্যবহৃত হয়েছিল। যেমন চারকেন্দ্রীক খিলান, বাল্বের আকৃতির গম্বুজ, চারকোনায় অষ্টকোনাকার বুরুজ যার শীর্ষে ছিল নিরেট কিউপোলা। সম্মুখভাগে প্যানেল অলঙ্করণ ইত্যাদি। কিবলা প্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব রয়েছে, যা বর্তমান মিনাকরা টালি দ্বারা আচ্ছাদিত। এ.এম. তাইফুর যথার্থই বলেন যে, মসজিদটির সম্মুখে বারান্দা নির্মিত হয়েছে যাতে অধিকসংখ্যক মুসল্লীর স্থান সঙ্কুলান হয়। নিচের তলার বিপণি থেকে যে আয় হয় তা মসজিদের সংরক্ষণকাজে ব্যয় হয়। একটি সুউচ্চ মিনার নির্মিত হয়েছে যেখান থেকে আজান দেওয়া হয়। পূর্বদিকের কূপ থেকে জল উত্তোলনের জন্য বাউলি ছিল। বর্তমানে এটি বন্ধ করা হয়েছে।

২২। বাবুবাজার ঘাট, মসজিদ, সপ্তদশ শতাব্দী

বাবুবাজার থেকে একটি রাস্তা বাদামতলী ঘাটের দিকে গেছে নদী বরাবর। এই রাস্তার উপর শায়েস্তা খানের আমলে একটি মসজিদ নির্মিত হয় যা বাবুবাজার ঘাট মসজিদ নামে পরিচিত। বর্তমানে মসজিদটি আধুনিকীকরণ হয়েছে। ডি' ওয়েলি ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে বাবুবাজার ঘাটের একটি জলরং চিত্র অঙ্কন করেন এবং এ চিত্রে পুল, বাবু-বাজারের ঘাট (landing ghat) যেখানে নৌকা করে বুড়িগঙ্গার পার থেকে সওয়ারী নামে, তার সাথে একটি নহবতখানা, সমাধি এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অক্ষত ছিল, যা জেমস টেলর দেখতে পান।

২৩। আহ্‌ল-ই হাদিস মসজিদ, বংশাল, অষ্টাদশ শতাব্দী

বংশালের চৌমাথায় একটি আকর্ষণীয় মসজিদ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মসজিদটি স্থানীয়ভাবে আহল-ই হাদিস মসজিদ নামে পরিচিত। আহল-ই হাদিস সম্প্রদায় এ মসজিদটি ব্যবহার করেন। মসজিদটি বিশালাকৃতির পরিমাপে ৭০০০ বর্গফুট। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত এই মসজিদের ভূমি-নকশা বৈচিত্র্যপূর্ণ।

২৪। কারতালাব খানের মসজিদ, বেগমবাজার, ১৭০০-১৭০৪ খ্রিস্টাব্দ (২৯)

মুর্শিদকুলী খান বাংলার সুবাদার ছিলেন এবং তাঁর অপর নাম ছিল কারতালাব খান। ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে দেওয়ানী স্থানান্তরের পূর্বে তিনি ঢাকার চকবাজার এলাকা সংলগ্ন বেগমবাজারে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৭০০-১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মসজিদটি তহখানার অথবা উঁচু প্লাটফর্মে স্থাপিত হয়। এজন্য খান মোহাম্মদ মৃধার মসজিদের সঙ্গে এটির সাদৃশ্য রয়েছে। দ্বিতলবিশিষ্ট এই মসজিদটির নিচের তলায় বিপণি এবং উপরে মসজিদে ওঠার জন্য সিঁড়ি রয়েছে।

তহখানাটি ভল্টের সাহায্যে নির্মিত হলেও মসজিদটি ৫টি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। গম্বুজগুলো ড্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত। ড্রামের উপরে মার্লনের অলঙ্করণ দেখা যাবে। গম্বুজ বাল্বের আকৃতির এবং শীর্ষদেশে কলসচূড়া দেখা যাবে। পূর্বদিক থেকে মসজিদটিতে প্রবেশ করতে হয় পাঁচটি খিলানপথ দিয়ে। খিলানপথের দু'পাশে ছোট ছোট টারেট বা pinnacle মসজিদের শোভা বৃদ্ধি করেছে। অনুরূপ pinnacle বা ক্ষুদ্রাকৃতি ট্যারেট মিহরাব প্রাচীরে দেখা যাবে। মসজিদের অভ্যন্তরে কিবলাপ্রাচীরে পাঁচটি মিহরাব দেখা যাবে। মসজিদটি প্লাস্টার দ্বারা আচ্ছাদিত, কোনোপ্রকার নকশা লক্ষ করা যায় না। এতদসত্ত্বেও মসজিদটি বাংলার মুঘল স্থাপত্যরীতিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, সচরাচর পাঁচ গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ খুবই বিরল, দ্বিতীয়ত, তাহখানার ব্যবহার; তৃতীয়ত, কূপ বা বাউলি, যা দানীর মতে, উত্তর ভারত থেকে, বিশেষ করে গুজরাটের চাম্পানীর থেকে অনুকরণ করে নির্মিত। চতুর্থত, এ মসজিদের উত্তর দিকে দোচালা ধরনের একটি সংলগ্ন ইমারত রয়েছে। আর. ডি ব্যানার্জী ভুলবশত এ ইমারতটিকে একটি সমাধি বলেছেন। অবশ্য গৌড়ে ফতেহ খানের সমাধিটি দোচালা ধরনের কিন্তু করতালাব খানের মসজিদে দোচালা গৃহটিতে কোনো শবাধার পাওয়া যায়নি। উপরন্তু, দ্বিতলে সমাধি স্থাপন অবাস্তব। এ কারণে এ গৃহটিকে ইমামের বাসস্থান বলে মনে করা হয়ে থাকে। দানী এ বাউলিকে বাংলাদেশে সিঁড়িবিশিষ্ট একমাত্র বাউলি বললেও এস. এম. তৈফুর চকবাজারের শাহী মসজিদে অপর একটি বাউলির কথা উল্লেখ করেন।

২৫। হোসেনী দালান, অষ্টাদশ শতাব্দী (৩০)

ঢাকার শিয়া সম্প্রদায়ের ইমামবাড়ি হিসাবে খ্যাত হোসেনী দালান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের পিছনে হোসেনী দালান রোড, নাজিমউদ্দীন রোড সংলগ্ন সড়কে অবস্থিত। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে জেমস টেলর বর্ণনা দেন এরূপ : "(ঢাকার) মুসলমানদের প্রধান নামাজ পড়ার স্থান ঈদগাহ এবং হোসেনী দালান। শেষোক্ত ইমারতটি মীর মুরাদ নামে এক

ব্যক্তি নির্মাণ করেন। তিনি নওয়ারা মহলের দারোগার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সুলতান মোহাম্মদ আযম-এর সময়ে পূর্ত বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। শেষোক্ত ইমারত (হোসেনী দাল্যান) নির্মাণ প্রসঙ্গে জনশ্রুতি, এ স্থানে একটি তাজিয়াখানা অথবা শোকাগাত্র (house of mourning) নির্মাণ করতে দেখেন এবং এর ফলে তিনি এখানে যে ইমারত নির্মাণ করেন তা তিনি হোসেনী দালান নামে অভিহিত করেন।" জেমস টেলরের মন্তব্য সঠিক নয়, কারণ হোসেনী দালান অষ্টাদশ শতাব্দীর ইমারত। এ কারণে আওরঙ্গজেবের পুত্র সুলতান শাহজাদা মোহাম্মদ আযমের সময়ে এটি নির্মিত হয়নি। কারণ তাঁর সময়কাল সপ্তদশ শতাব্দী।

হাকিম হাবিবুর রহমান তাঁর 'আসুদগান-ই-ঢাকা' গ্রন্থে হোসেনী দালানের নির্মাণকাল সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেন। তিনি বলেন, "কথিত আছে যে আমীর (মীর) মুরাদ নামক জনৈক সেনাপতি শহরে একটি হোসায়নিয়া আবাসিক এলাকা তৈরি করেছিলেন। উহা সত্য হোক কিংবা মিথ্যা হোক মনে হয় যে, কোনো একটি ছোট লোকালয়ে হয়তো এখানে কোথাও কোনো এক সময় নির্মিত হয়েছিল, যা কালের বিবর্তনে বিলুপ্ত হয়ে যায়। নওয়াব নুসরত জঙ্গ নিরিবিলি একটি বিশাল দোতালা ভবন নির্মাণ করেছিলেন। এর একাংশ সুন্নীদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন এবং উহাতে মীর মুরাদের নাম অঙ্কিত করেছিলেন। এ ভবনের ওপরের অংশ ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ধসে যায়। নওয়াব স্যার আহসানুল্লাহ নিরানব্বই হাজার টাকা ব্যয়ে এটি পুনঃনির্মাণ করেন। ফলকে এর স্থাপন সন ১০৫২ (হিঃ) লিখিত আছে। কিছু কিছু কারণে আমি হোসেনী দালনকে একটি অতি প্রাচীন স্থাপত্য বলে মেনে নিতে পারি না। কারণগুলো নিম্নরূপ :

(১) ভূমিকম্পে পূর্বেকার যেটুকু ভবন অবশিষ্ট আছে উহা কাঠের বর্গা দ্বারা নির্মিত। ঐ যুগের বা তার একশ বছর পরের কোনো ভবন ঢাকায় এখন নেই যা কাঠের বর্গা দ্বারা ছাদ নির্মিত এবং ঢালাই করা। ঐ যুগের একটি বড় ভবন হল বড় কাটরা কিন্তু এই ভবনটির কোথাও কাঠ ব্যবহৃত হয়নি। কাঠের বর্গা দ্বারা নির্মিত ভবন এত পুরাতন হতে পারে না।

(২) নামফলক হিসেবে যে পাথর রয়েছে তাও জাল। কেননা সেই আমলের অনেক পরে পর্যন্তও কোনো ভবনে এরূপ নিকৃষ্ট পাথর ব্যবহৃত হয়নি। কেননা উহা মির্জাপুরের মামুলী বালুয়া পাথর। তাছাড়া উহাতে তারিখ লেখা আছে। উহার চার পাশের অঙ্কিত দৃশ্যটি হস্তশিল্প হিসেবে নেহায়েতই নিম্নমানের। পাথরটি আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। সেকালে এত বড় ভবনের জন্য এরূপ ক্ষুদ্র পাথর ব্যবহার করা রীতিমতো অসম্ভব। সে আমলের যত ইমারত আছে তার সব কটিতেই কালো পাথরের ফলক ব্যবহৃত হয়েছে।

(৩) বারান্দার দিকে যে স্তম্ভগুলো রয়েছে উহা লোকেরা ভূমিকম্পের আগে দেখেছে। ভূমিকম্পের পরে ঠিক একই নমুনার স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। উহা রোমান স্থাপত্য শিল্পের অনুকরণে তৈরি। মোঘল আমলের কোন ভবনে কোথাও এরূপ স্তম্ভ দেখা যায় না। ওটা সুস্পষ্টরূপে বিদেশী স্থাপত্যকৌশল এবং শাহজাহান বা আওরঙ্গজেবের শাসনামল পর্যন্ত এই কৌশল এখানে এসে পৌঁছেনি। ....

এই ইমারত সাধারণভাবে আওরঙ্গজেবের আমলে নির্মিত বলে ধারণা করা হয়। উহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা, কেননা আওরঙ্গজেব ১১৬৮ হিজরীতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। অথচ ফলকে লেখা আছে "স্বনামধন্য মহীয়ান সম্রাটের আমলে সাইয়েদ মুরাদ এ লোকালয়ে ১০৫২ হিজরীতে নির্মাণ করেছেন।" স্থানীয় জনশ্রুতি রয়েছে যে, এই ভবনটি নওয়াব নসরত জঙ্গ নির্মাণ করেন। যেহেতু এ অঞ্চলে কোনো এক সময় মীর মুরাদের কবর ছিল তাই এ ভবনটি অনায়াসেই তাঁর নির্মিত বলে শোনা যায়। মনে হয় এই নকল ভবনের নির্মাতাদের সমসাময়িক সম্রাটের নাম সম্পর্কেও সংশয় ছিল। অথবা তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই ধোকা দিতে চাইত। স্মরণ রাখা দরকারে যে, এ যুগটি সম্রাট শাহজাহানের এবং ঢাকার সুলতান মুহম্মদ সুজা স্বীয় পিতার প্রতিনিধিত্বকারী গভর্নর। বড় কাটরার বিশাল ভবন, চুড়িহাট্টার মসজিদ এবং ঈদগাহ এ আমলের স্থাপত্যকীর্তি। সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ রইল না যে হোসেনী দালান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে নির্মিত। এর কোনো অংশই আওরঙ্গজেবের আমলে নির্মিত নয়।"

আহমদ হাসান দানী, হাকিম হাবিবুর রহমানের যুক্তির সমর্থন করে তাঁর মতবাদ গ্রহণ করেছেন। হোসেনী দালান নবাব নসরত জঙ্গ (যিনি ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন), বর্তমান দালানটি নির্মাণ করেন বলে হাকিম হাবিবুর রহমান মন্তব্য করেন। তিনি নিজে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং হোসেনী দালানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। পরবর্তীকালে নবাব স্যার আহসানউল্লাহ ইমারতটি ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে পুনর্নির্মাণ করেন। কিন্তু আহমদ হাসান দানী হাকিম হাবিবুর রহমাজার মন্তব্য যে এটি নসরত জঙ্গ নির্মাণ করেন, সমর্থন করেননি এবং যুক্তি দিয়ে বলেন যে তাহলে ডি' ওয়েলি এবং জেমস টেলর সেকথা উল্লেখ করতেন। এ প্রসঙ্গে ডি' ওয়েলির ভাষ্য প্রণিধানযোগ্য : বিপনির পিছনে যে অনিন্দ্যসুন্দর মসজিদ রয়েছে তা বর্তমান নবাবের (নসরত জঙ্গ যার সমসাময়িক ছিলেন—ডি' ওয়েলি) প্রধান নামাজঘর, যিনি খুবই ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। এটি ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয় এবং এটি হোসেনী দালান নামে অভিহিত হয়। ডি' ওয়েলি ভ্রান্ত মন্তব্য সহজেই ধরা পড়ে কারণ হোসেনী দালান সপ্তদশ শতাব্দীর ইমারত নয় যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, দানী যথার্থই বলেন, "Here D' Oyly has decidedly mistaken the Chauk Mosque for Husaini Dalan, the picture of the latter he has not given at all." অর্থাৎ "যে চিত্র অঙ্কন করে ডি' ওয়েলি হোসেনী দালান নামে অভিহিত করেন তা প্রকৃতপক্ষে চকবাজারের শাহী মসজিদ, হোসেনী দালান নয়। উপরন্তু, তিনি হোসেনী দালানের কোনো চিত্রই অঙ্কন করেননি।" এ প্রসঙ্গে Dhaka Past Present Future-এ প্রকাশিত নাজমা খান বলেন, 'Dhaka in Early Nineteenth century painings' শিরোনামে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার অষ্টম নম্বর জলরং চিত্রটিকে Chauk and the Hussainey Dalan বলা হয়েছে। নাজমা খান মজলিসের সংশোধন করে বলা উচিত ছিল যে অঙ্কিত ইমারতটি হোসেনী দালানের নয়,

চকবাজারের শাহী মসজিদের। মসজিদের প্রাঙ্গণে গরুর শকট ও হাতির সমাগম দেখে এটি যে বাজার তা সহজেই বোঝা যায়, অথচ নাজমা খান মজলিস ডি' ওয়েলিকে সমর্থন করে বলেন, "During D' Oyly's time there was hardly any superstructure to bar the view of the Chouk from the Hussiney Dalan." বর্তমান হোসেনী দালানের সাথে ডি' ওয়েলির চিত্রের কোন মিল দেখা যায় না।

আহমদ হাসান দানী বলেন যে, বর্তমান হোসেনী দালান মীর মুরাদ কর্তৃক শুরু হয়েছিল যদিও সঠিক নির্মাণ তারিখ বলা যায় না। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীকে নির্মাণকাল ধরা হয়। অবশ্য মীর মুরাদের মৃত্যুর তারিখ লেখা হয়েছে হিঃ ১১৩৯/১৭২৬-২৭ খ্রিঃ। নবাব নসরত জঙ্গ (১৭৯৬-১৮২৩) যিনি ডি' ওয়েলির সমসাময়িক ছিলেন এ ইমারতের পুনঃনির্মান করেন। সৈয়দ মুহম্মদ তাইফুর বলেন, "Nawab Nusrat Jung died in Dhaka of Dysentry in 1823 and was buried in the mausoleum of Husainy Dalan." অর্থাৎ "নবাব নুসরত জঙ্গ উদরাময় রোগে ঢাকায় ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁকে হোসেনী দালানে সমাহিত করা হয়।"

বর্তমান হোসেনী দালানটির স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য আহমদ হাসান দানী বর্ণনা করেন। তাঁর ভাষায়, "একটি উঁচু প্লাটফর্মের উপর বর্তমান দালানটি স্থাপিত এবং এর নিচে অনেকগুলো কুঠরি দেখা যাবে, যেখানে বহু ব্যক্তিকে সমাহিত করা হয়েছে। পূর্বদিক থেকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে দোতলায় উঠতে হয়। উপরের প্রধান অংশ আয়তাকার হল; সম্মুখভাগে একটি পুকুর আছে। দুপাশে অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণদিকে বারান্দা দেখা যাবে। পূর্ব ও পশ্চিমদিকে তিনটি করে কক্ষ। উত্তরদিকের কক্ষ ব্যতীত পার্শ্ববর্তী কক্ষগুলোতে দ্বিতল গ্যালারি রয়েছে। উত্তরদিকে একটি নূতন বারান্দা নির্মিত হয়েছে। দক্ষিণদিকের সম্মুখভাগ সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়। একসময় এখানে খিলানশ্রেণী শোভা পেত, বর্তমানে স্তম্ভ ও বিমের ব্যবহার দেখা যায়। দু'পাশে অষ্টকোণাকার বুরুজ যা কয়েকটি অংশে বিভক্ত। দক্ষিণদিকের সম্মুখভাগের চার কোনায় স্তম্ভের উপর নির্মিত কিস্ক রয়েছে, যা ফাঁপা। দেয়ালের উপরে কার্নিশে মার্লন শোভা পাচ্ছে।

২৬। আর্মানিটোলার মসজিদসমূহ, অষ্টাদশ শতাব্দী

বেগমবাজারের মুর্শিদ কুলী খানের মসজিদটি সম্ভবত ঢাকায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত প্রথম ইমারত। এর পরে সম্ভবত আর্মানিটোলায় শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী লেনে যে দ্বিতীয় মসজিদটি নির্মিত হয় তার সন-তারিখ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। দানী বলেন যে, শিলালিপি অনুযায়ী ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দে খান জানীর স্ত্রী আর্মানিটোলার মসজিদ নির্মাণ করেন। কিন্তু Dhaka Past Present Future গ্রন্থে মোহাম্মদ আবদুল বারী 'Mughal Mosques of Dhaka : 'A Typological study' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে আর্মানিটোলা মসজিদ নির্মাণের তারিখ ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দ বলে উল্লেখ করেন। এ মসজিদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দানী অবশ্য সঠিকভাবে বলেন, এটি একটি বাংলা ধরনের অর্থাৎ চৌচালা ছাদ

দ্বারা আবৃত ছিল, যা পূর্বে চুড়িহাট্টা মসজিদে (১৬৫০ খ্রিঃ) ব্যবহৃত হয়েছে। দানীর ভাষায়, "The Mosque is covered by the North Indian type of Bungalow roof." অর্থাৎ "মসজিদটি উত্তর ভারতের বাংলা ধরনের ছাদ দ্বারা আবৃত।" এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, বাংলার ধরনের অর্থাৎ গ্রামবাংলার দো-চালা এবং চারচালা পর্ণকুটিরের অনুকরণে ছাদ নির্মিত হয়েছে, যা পরবর্তীকালে লাহোর, দিল্লি ও আগ্রায়, যেমন লাহোরের নৌলক্ষ্য ইমারত, দিল্লির লালকিল্লার মতি মসজিদ এবং আগ্রা দুর্গের বাংলা মহলে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে দানী সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলেছেন। এ মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় মির্জা নাথান রচিত 'বাহারিস্তান-ই-গায়েবী' এবং আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'-তে। 'বাহারিস্তান-ই-গায়েবী'-তে উল্লেখ আছে যে, মুঘলগণ বাংলায় ধর্মীয় ও জাগতিক (Secular) ইমারত তৈরি করেন যা দোচালা অথবা চৌচালা ভল্ট দ্বারা আবৃত ছিল।

আর্মানিটোলা মসজিদ ছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে খাঁজকাটা (fluted) তিনটি গম্বুজ-বিশিষ্ট একটি আয়তাকার মসজিদ ইংলিশ রোড ধরে আর্মানিটোলার দিকে অগ্রসর হলে নজরে পড়ে। গম্বুজটি তরমুজাকৃতি এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নির্মিত। শীর্ষদেশে কলসচূড়া শোভা পাচ্ছে। ছাদের চার কোনায় কিস্কর ছাড়াও আর্মানিটোলার তারা মসজিদে ব্যবহৃত ক্ষুদ্রাকৃতি সরু টারেট বা pinnacle দেখা যাবে।

২৭। আমিরুদ্দীনের সমাধি ও মসজিদ, ঊনবিংশ শতাব্দী

বাবুবাজার পুলের (অবলুপ্ত) পূর্বে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে বাদামতলী ঘাটের নিকট আমিরুদ্দীনের সমাধি ও একটি মসজিদ দেখা যাবে। কে এই আমিরুদ্দীন তা সঠিকভাবে বলা যায় না। এস. এম. তাইফুরের মতে তিনি একজন দারোগা ছিলেন এবং ত্রিপুরার রতনপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাইফুর বলেন, "জন কোম্পানির অধীনে তিনি পুলিশ ইনস্‌পেক্টর ছিলেন এবং চাকরিতে থাকাকালীন অনেক অর্থ উপার্জন করেন যা দ্বারা তিনি একখণ্ড জমি ক্রয় করে তার উপর বসতবাড়ি ও মসজিদ নির্মাণ করেন। আমিরুদ্দীনের মসজিদটি শায়েস্তা খানী তিনগম্বুজ আয়তাকার মসজিদের হুবহু নকল। এ ধরনের মসজিদ লালবাগ দুর্গের অভ্যন্তরে একটি মসজিদে দেখা যাবে। মসজিদের পাশে তাঁর সমাধি রয়েছে। সমাধিটি এক গম্বুজবিশিষ্ট ইমারত।

২৮। কশাইটুলী মসজিদ, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ (৩১)

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে কয়েকটি মসজিদ সুচারুরূপে নির্মিত হয় তার মধ্যে কশাইটুলী মসজিদটি সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়। আর্মানিটোলা থেকে একটি রাস্তা কশাইটুলী অর্থাৎ কশাইদের বসতি এলাকার দিকে চলে গেছে। একটু এগুলে ছোট গলির পাশে চাকচিক্য ও অসাধারণভাবে অলঙ্কৃত তিন গম্বুজবিশিষ্ট একটি মসজিদ নজরে পড়ে। এটি স্থানীয় একজন ব্যবসায়ী নির্মাণ করেন বলে ধারণা করা হয়। তাঁর নাম আব্দুল বারী বেপারী। তিনি ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৪৫ এবং তার অনেক পরে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে এটি সম্পূর্ণরূপে সংস্কার

করা হয় এবং সেইসাথে অলঙ্করণও করা হয়। আয়তাকারে তিন গম্বুজবিশিষ্ট কশাইটুলী মসজিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য মিনাকরা টালির ব্যবহার, খাঁজকাটা গম্বুজ সরুসরু টারেটের ব্যবহার এবং লতাপাতা, ফুল, জ্যামিতিক নকশা শিলালিপি দ্বারা অলঙ্করণ ও আকর্ষণীয় প্যারাপেট। অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয় পূর্বদিকের তিনটি খিলানপথ দিয়ে। কিবলা-প্রাচীরে রঞ্জিত টালির সাহায্যে অলঙ্কৃত তিনটি মিহরাব দেখা যাবে। গম্বুজগুলো স্ফীত এবং ড্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত। ড্রামের চারপাশে অপূর্ব মার্লন শোভা পাচ্ছে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ঢাকায় একধরনের স্থাপত্যিক অলঙ্করণ ব্যবহৃত হত যা 'চিনি টিকরী' নামে পরিচিত। 'চিনি টিকরী' অর্থাৎ রঞ্জিত মৃৎপাত্রের টুকরোগুলো শৈল্পিক চাতুর্যে এমনভাবে সাজানো হত যে তা এক-একটি অপূর্ব মোটিভে রূপান্তরিত হত। এ ধরনের অলঙ্করণে নীল রঙের প্রাধান্য বেশি দেখা যায়। কশাইটুলী মসজিদটির ভিতর ও বাহির চিনি টিকরীর সাহায্যে এমনভাবে আচ্ছাদিত যে এটিকে সর্বাধিক অলঙ্কৃত ইমারত (ornate monument) বলে অভিহিত করা হয়। গম্বুজে চাঁদ-তারা, শীর্ষদেশে সারি সারি কলসাকৃতি চূড়া, যা পদ্মপাতার মূল ভিত (base) থেকে উপরে উঠে গেছে, ড্রামে নকশাকৃত মার্লন ছাদের চারপাশে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। নিচে থেকে উপরে সরু ট্যারেট যাতে কলসাকৃতি চূড়া ব্যবহার করা হয়েছে, আট কোনাকার সংলগ্ন জোড়া পিলাস্টার, মিহরাবের বাইরে শোভা পাচ্ছে। যে সমস্ত মোটিভ প্রাধান্য পেয়েছে তার মধ্যে লিপিশৈলী বা ক্ষুদ্রাকৃতি গোলাপ, লজেন্স, আঙুরের থোকা, ক্যালিগ্রাফি বা আরবি লিপিশৈলী, লতাপাতা, প্রলম্বিত লতা (creeper), জ্যামিতিক নকশা, টবের ফুল ইত্যাদি। আর্মানিটোলার তারা মসজিদ ব্যতীত অপর কোনো ইমারতে এ ধরনের অলঙ্করণ দেখা যায় না।

২৯। তারা মসজিদ, আর্মানিটোলা, অষ্টাদশ, বিংশ শতাব্দী (৩২)

মোহাম্মদ যাকারিয়া তারা মসজিদ প্রসঙ্গে বলেন, "আর্মানিটোলা হাইস্কুলের কাছে অবস্থিত 'তারা' বা সিতারা মসজিদ ঢাকা শহরের মসজিদগুলির মধ্যে সবচেয়ে কারুকার্যময়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মীর্জা গোলাম পীর নামক ঢাকার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের দক্ষিণদিকে একটি ছোট গোরস্থান এবং পশ্চিমদিকে ছিল লঙ্গরখানা।

আর্মানিটোলার আবুল খয়রাত রোডে অবস্থিত তারা মসজিদটি চিরাচরিত মুঘল স্থাপত্যের ধাঁচে নির্মিত অর্থাৎ আয়তাকার তিন গম্বুজবিশিষ্ট। জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করার পর তিনি এ ঐতিহ্যবাহী তিনগম্বুজ মসজিদকে সাত গম্বুজে রূপান্তরিত করেন, যার ফলে এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যায়। মীর্জা গোলাম পীর যে ইমারতটি নির্মাণ করেন বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় আলী জান বেপারী তা পুনর্নির্মাণ করে মূল ইমারতের স্থাপত্যিক সৌষ্ঠব বিনষ্ট করেন। মসজিদটির বর্তমান আয়তন ৩০ × ১২ ফুট। এর চারকোনায় চারটি বুরুজ দেখা যাবে এবং বুরুজগুলো টারেটের আকারে ছাদের উপরে উঠে গেছে। টারেটগুলো নিরেট কিউপোলা দ্বারা আবৃত এবং শীর্ষদেশে কলসচূড়া শোভা পাচ্ছে। ছাদের কার্নিশ সমান্তরাল এবং প্যারাপেট দ্বারা অলঙ্কৃত। তারা

মসজিদটির মূল নামাজকক্ষের সম্মুখে পূর্বদিকে একটি বারান্দা রয়েছে এবং বারান্দার দু'পাশে দুটি বুরুজ দেখা যাবে। ছাদের চারদিকে ছোট ছোট pinnacle বা নিরেট টারেট রয়েছে যা স্থাপত্যিক ভারসাম্য রক্ষা করছে। ছাদের তিনটি গম্বুজের মধ্যে মধ্যবর্তী গম্বুজটি বড়। গম্বুজগুলো স্ফীত বাল্বের আকৃতি যা মুঘল স্থাপত্যরীতির পরিচায়ক। গম্বুজগুলো ড্রামের উপর থেকে নির্মিত এবং ড্রামগুলো অষ্টকোণাকার এবং মার্লন দ্বারা শোভিত। অভ্যন্তরে কিবলার দিকে তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব রয়েছে।

কশাইটুলী মসজিদের মতো তারা মসজিদের প্রধান গুরুত্ব হচ্ছে 'চিনি টিকরী'র ব্যবহার। অলঙ্করণ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেন, "মসজিদের ভিতর ও বাইরের দিক অলঙ্কৃত করার জন্য ব্রিটেন এবং জাপান (ফুজিয়ামা মোটিভ) থেকে অসংখ্য অলঙ্কৃত চীনামাটির টালি আমদানি করে মসজিদে লাগানো হয়েছে। গম্বুজ ও বাইরের দেয়ালে নানা বর্ণের চীনামাটির টুকরা সাদা পলেস্তারার উপর বসিয়ে সুশোভিত করা হয়েছে এবং অসংখ্য তারার প্রতিকৃতি সেখানে ফুটে উঠেছে। পূর্ব দেয়ালের উপরে কেন্দ্রস্থলে একটি অর্ধচন্দ্র ও তারার প্রতিকৃতি (নকশা) রংবেরঙের চীনামাটির টুকরার সাহায্যে নির্মিত হয়েছে। মিহরাব ও দরজার পার্শ্ববর্তী স্থানগুলি বিশেষভাবে অলঙ্কৃত। নবনির্মিত বারান্দার অভ্যন্তরভাগও মসজিদের অভ্যন্তরভাগের ন্যায় এখন অলঙ্কৃত। মেঝেতে অতি সুন্দর মোজাইকের কাজ করা হয়েছে। মসজিদের ভিতর ও বাইরে যে অলঙ্করণের কাজ হয়েছে তা সত্যই আকর্ষণীয়।"

৩০। দেওয়ানবাজার মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দী

নাযিমউদ্দীন রোড বরাবর গেলে দেওয়ানবাজার নামে এক মহল্লায় যাওয়া যায়। এখানে মুঘল স্থাপত্যরীতিতে বিশেষ করে তাহখানার উপর আয়তাকারে তিন গম্বুজ-বিশিষ্ট একটি বড় ধরনের মসজিদ রয়েছে। আতিশখানার খান মুহাম্মদ মৃধার অনুকরণে নির্মিত দেওয়ানবাগের মসজিদটি খুব উঁচু প্লাটফর্মের (plinth) উপর স্থাপিত, যা দূর থেকে খুবই চমৎকার দেখায়। তাহখানাটি ভল্ট দ্বারা নির্মিত এবং মসজিদে ব্যবহৃত এ ধরনের তাহখানা মৃধার মসজিদ, মুসা খানের এবং করতলব খানের মসজিদে দেখা যাবে। তাহখানাটি খুবই মজবুত করে নির্মাণ করা হয় এবং চারকোনায় ছোট আকারের বুরুজ ছাড়াও দুর্গে ব্যবহৃত বেস (bastion) ব্যবহৃত হয়েছে। সাদামাটা প্লাস্টার করা এ তাহখানাটির অভ্যন্তরে কক্ষ রয়েছে এবং আয়তাকার দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। দেওয়ালের উপরে বেড়ি ও প্যারাপেটের নকশা শোভা পাচ্ছে। তাহখানার প্রথম প্রয়োগ হয় দিল্লির ফিরোজ কোটলায়। সুলতান ফিরোজ তুঘলক এখানে তাহখানা নির্মাণ করেন। উল্লেখ্য যে, মুঘল যুগের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ইমারতগুলোও তাহখানার উপর নির্মিত, যেমন লাহোরে জাহাঙ্গীরের সমাধি, দিল্লির হুমায়ুনের সমাধি এবং আগ্রার তাজমহল। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাটি থেকে উঁচু করে দৃশ্যমান করা। মূল মসজিদটি তাহখানার মধ্যভাগে অবস্থিত। তিনগম্বুজবিশিষ্ট এ মসজিদটির বহিঃপ্রাচীর প্লাস্টার দ্বারা আবৃত। পূর্বদিক দিয়ে তিনটি খিলান পথ রয়েছে; প্রধান খিলানপথটি অপেক্ষাকৃত

বড়। খিলানগুলো খাঁজকাটা এবং চারবিন্দুকেন্দ্রিক। তিনটি প্রবেশপথই আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ। প্রবেশপথের উভয় দিকে সরু pinnacle বা টারেট রয়েছে, যা ছাদের উপর সম্প্রসারিত। পাশে আয়তাকার প্যানেল দ্বারা অলঙ্কৃত। প্রবেশপথের উপরে আয়তাকার প্যানেল বেড়ি ও প্যারাপেট দেখা যাবে। প্রধান প্রবেশপথের উপরে একটি ফাঁকা আয়তাকার স্থান রয়েছে। সম্ভবত কোনো এক সময়ে এখানে একটি শিলালিপি ছিল। বর্তমাজা এটি খোয়া গেছে। ইমারতের বিশালতার তুলনায় ইমারতের চার কোনায় সরু বুরুজ রয়েছে, যা ছাদের উপরে উঠে গেছে। নিরেট টারেটের উপরে কলসচূড়া শোভা পাচ্ছে। কার্নিশ রয়েছে, তবে বক্রাকার নয়, সমান্তরাল।

দেওয়ানবাজার মসজিদটিতে তিনটি বাল্বের আকৃতিতে (bulbous) নির্মিত গম্বুজ দেখা যাবে; মধ্যবর্তী গম্বুজটি অনেক বড়। গম্বুজগুলো ড্রামের উপর স্থাপিত এবং ড্রাম অষ্টকোণাকার। ড্রামে মার্লন দেখা যাবে। শীর্ষদেশে কলসচূড়া শোভা পাচ্ছে। অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে নামাজগাহ যা তিন অংশে বিভক্ত। সম্ভবত পেনডেনটিভের সাহায্যে গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃত মিহরাব রয়েছে। মধ্যবর্তী মিহরাবটি বড় খিলানে অলকভ বা অর্ধগম্বুজাকৃতি অংশ দেখা যায় যা লালবাগ মসজিদে ব্যবহৃত হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। উত্তরদিকে একটি ঘর দেখা যায়, যা সম্ভবত ইমামের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মসজিদ প্রাঙ্গণে কয়েকটি শবাধার দেখা যাবে। স্থাপত্যিক রীতির বিচারে এ মসজিদটি অষ্টাদশ শতাব্দীর কীর্তি বলে ধারণা করা যায়।

খ. নতুন ঢাকা গ্রুপ

৩১। হাজী খাওয়াজা শাহবাজের মসজিদ, সমাধি ও শাহ-ই-দেউড়ি (ফটক), রমনা, সপ্তদশ শতাব্দী (৩৩)

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দক্ষিণ-পশ্চিমে তিন নেতার মাজারের সন্নিকটে এবং বর্তমান শিশু একাডেমীর লাগ উত্তরে একটি মসজিদ, মাজার ও ফটক কমপ্লেক্স রয়েছে, যা রমনার অতি আকর্ষণীয় প্রাচীন দর্শনীয় স্থাপত্যকীর্তি। একসময় এগুলো প্রাচীর বেষ্টিত ছিল যার কিছু অংশ বর্তমাজা হাইকোর্টের দিকে দেখা যাবে। হাজী খাওয়াজা শাহবাজ কে ছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তিনি কি শায়েস্তা খানের অমাত্য অথবা রাজকর্মচারী ছিলেন, না অতি নগণ্য ব্যক্তি ছিলেন? এস. এম. তৈফুর এ প্রসঙ্গে বলেন, "Haji Shahbaz was Malik-ul-Tujjar, merchant Prince and a Commercial Magnate of Dhaka" অর্থাৎ হাজী শাহবাজের উপাধি ছিল 'মালিক-উত-তুজ্জার' বা ব্যবসায়ীদের চূড়ামণি এবং ঢাকার সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী। তিনি প্রচুর অর্থব্যয়ে একটি মসজিদ, তৎসংলগ্ন তাঁর নিজস্ব মাজার এবং একটি তোরণ স্থাপন করেন।

মোহাম্মদ যাকারিয়া হাজী খাওয়াজা শাহবাজের মসজিদ প্রসঙ্গে বলেন "প্রাচীর-বেষ্টিত এই অঙ্গনের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি উঁচু ভূমির উপর মসজিদটি নির্মিত।

উত্তর-দক্ষিণ লম্বা এ মসজিদের আয়তন ৬৮ × ২৬ ফুট। মসজিদের চারকোণে ৪টি আটকোনাকৃতির মিনার বা টারেট আছে। এগুলি কার্নিশের অনেক উপরে উঠে নিরেট ছোট গম্বুজে শেষ হয়েছে। পূর্ব দেয়ালে ৩টি প্রবেশপথ। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ বাইরের দিকে উদ্গাতভাবে নির্মিত। পত্রাকারে নির্মিত খিলানে খাঁজকাটা আছে। দু'পাশে দু'টি সরু মিনার কার্নিশের সামান্য উপরে উঠে শেষ হয়েছে। সামনের দেয়ালে কুলুঙ্গির মতো করে নির্মিত স্থানে আগে সুন্দর প্যানেলিং-এর কাজ ছিল; এখন নেই। পাশের দুটি প্রবেশপথে অলঙ্করণের কাজ অত্যন্ত সীমিত। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার চৌকাঠ কালো পাথরে নির্মিত। দরজাগুলির ভিতরের দিকে মেঝের কিছু অংশে কালো পাথর বসানো আছে। সামনের ভিত্তি দেয়ালের নিচের অংশে প্রায় ৪ ইঞ্চি পুরু অলঙ্কৃত কালো পাথর বসান আছে। সামনের দুই কোণের মিনারের তলদেশ পর্যন্ত সেই কালো পাথর বসানো আছে। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে ৩টি আকর্ষণীয় মিহরাব আছে; কেন্দ্রীয় মিহরাবের অলঙ্করণ অত্যন্ত মনোরম। মসজিদের অভ্যন্তরভাগ তিন অংশে অতি সুন্দরভাবে বিভক্ত। এই তিনভাগের উপরে আছে ৩টি মনোরম গম্বুজ।

স্থাপত্যকৌশলের দিক থেকে হাজী খাওয়াজা শাহবাজ কর্তৃক নির্মিত মসজিদটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। লালবাগ দুর্গ মসজিদ, খান মুহম্মদ মৃধার মসজিদের মতো এটিও আয়তাকার তিনগম্বুজবিশিষ্ট এবং মুঘল স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ, যেমন বাল্বের আকৃতিতে গম্বুজ, নকশাকৃত ড্রামের উপর স্থাপিত গম্বুজ, কলসচূড়া, আটকোনার বুরুজ, কাঙ্গুরা বা প্যারাপেট, মিহরাবের বাইরে উদ্গাত প্রাচীর এবং এর দু'পাশে টারেটের ব্যবহার, সমান্তরাল কার্নিশ, সম্মুখভাগে প্লাস্টারে কাটা সাদামাটা অলঙ্করণ ও প্যানেল ডিজাইন। চার কোনাকৃতি খিলানপথ, অভ্যন্তরে খাঁজকাটা, স্কুইঞ্চের ব্যবহারে গম্বুজ নির্মাণকৌশল এবং কিবলাপ্রাচীরে নকশাকৃত অবতলাকৃতি তিনটি মিহরাব, যা খোদাইকৃত স্তম্ভ থেকে উঠে গেছে, স্বভাবতই মসজিদকে অসাধারণ মর্যাদা দিয়েছে।

হাজী খাওয়াজা শাহবাজের সমাধি (৩৪)

হাজী খাওয়াজা শাহবাজের মসজিদ প্রাঙ্গণ এবং মসজিদ থেকে প্রায় ৫০ ফুট উত্তর-পূর্ব দিকে একখণ্ড উঁচুভূমির উপর এক গম্বুজবিশিষ্ট চতুষ্কোণাকার সমাধি দেখা যাবে। স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সমাধিটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ প্রথমত বাংলাদেশের সমাধিস্থাপত্যের ইতিহাসে মাত্র দু'টি সমাধিতে বারান্দা আছে। একটি দারা বেগমের সমাধি, যা লালমাটিয়ায় অবস্থিত এবং অপরটি খাওয়াজা শাহবাজের সমাধি। দ্বিতীয়ত শেষোক্ত সমাধিটিতে যে বারান্দা রয়েছে তা দোচালা ধরনের। এ ধরনের দোচালা গৌড়ের ফতেহ খানের সমাধিতে এবং করতলব খানের মসজিদ-সংলগ্ন ইমামের বাসস্থানে দেখা যাবে।

মূল সমাধিটি বর্গাকার, যার প্রতি বাহু ২৬ ফুট লম্বা। এর চার কোনায় আটকোনাকৃতি বুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলো সমান্তরাল বেডি দ্বারা কয়েকটি অংশে

বিভক্ত। প্রতি অংশ প্যানেল নকশা দ্বারা শোভিত। বুরুজগুলো উপরের দিকে নিরেট কিউপলা আকারে উঠে গেছে এবং শীর্ষক্ষেত্রে কলসচূড়া দেখা যাবে। এ সমাধিতে প্রবেশ করতে হয় দক্ষিণ দেয়ালের তিনটি খিলানপথ দিয়ে; কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি বাইরের দিকে উদ্গত। উত্তর ও পশ্চিম দেয়ালেও একটি করে খিলানপথ আছে; তা এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রবেশপথের বাইরের দেয়ালে উভয় পাশে টারেট বা pinnacle রয়েছে, যা খাঁজকাটা (twisted)। এগুলো ছাদের উপরে উঠে গেছে। খিলানপথের উপরে তিনটি আয়তাকার প্যানেল দেখা যাবে। সমাধিটি একটি বিশালাকার বাল্বের আকৃতিতে নির্মিত গম্বুজ দ্বারা আবৃত। গম্বুজটি ড্রামের উপর স্থাপিত এবং অষ্টকোণাকার ড্রামের চারদিকে মার্লনের নকশা রয়েছে।

শাহবাজের সমাধিটির অভ্যন্তরে উত্তরদিকে দেওয়ালে একটি মিহরাব স্থাপিত হয়েছে এবং গম্বুজ স্কুইনেঞ্চের সাহায্যে নির্মিত। মধ্যভাগে শাহবাজের তিনধাপবিশিষ্ট শবাধারটি রয়েছে। সমাধির অভ্যন্তরে সুন্দর প্যানেলিং-এর অলঙ্করণ খুবই আকর্ষণীয়। শাহবাজের সমাধির প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে দক্ষিণ দিকের ১১′ – ২″ চওড়া একটি বারান্দা। পূর্বে এটি ভগ্নাবস্থায় ছিল। এখন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এটিকে সংস্কার করেছে। দোচালা এ বারান্দাটি বাংলাদেশের দোচালা কুঁড়েঘরের সদৃশ। দক্ষিণদিকের একটি দরজা দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। এর দুপাশ খিলানের প্যানেল দ্বারা অলঙ্কৃত। বারান্দার পূর্ব ও পশ্চিমদিকে পরপর দুটি খিলান জানালা রয়েছে।

হাজী খাওয়াজা শাহবাজের মসজিদ প্রাঙ্গণের পূর্বদিকে একটি ভগ্নপ্রাপ্ত ইমারত দেখা যাবে। ধারণা করা হয়ে থাকে যে, সমগ্র কমপ্লেক্সটি যখন প্রাচীরবেষ্টিত ছিল তখন পূর্বদিকে এটি তোরণ হিসাবে ব্যবহৃত হত। 'শাহ-কি-দেউড়ি' নামে পরিচিত এই ইমারতটিতে তিনটি প্রবেশপথ দেখা যাবে, মধ্যবর্তী পথটি অপেক্ষাকৃত বড়। প্রবেশপথের উপরে প্যানেল নকশা এবং দেয়ালের উপর মার্লন দ্বারা শোভিত। এ তোরণের দক্ষিণদিকে সিঁড়ি নির্মিত হয়েছে এবং এর সাহায্যে ছাদে যাওয়া যায়। পশ্চিমদিকের অংশে কষ্টিপাথরের চৌকাঠ দেখা যায়।

৩২। চিশতী বিহিস্তীর সমাধি, সপ্তদশ শতাব্দী

মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেন, "পুরাতন হাইকোর্ট ইমারতের সামান্য পূর্ব দিকে অবস্থিত এই মাজার বর্তমাজা চিশতী বিহিস্তীর মাজার নামে পরিচিত। এখানে প্রতিদিন বিশেষ করে বৃহস্পতিবারে হাজার হাজার লোকের ভিড় হয়। একখণ্ড উঁচু ভূমির উপর অবস্থিত বর্গাকারের এই ছোট মাজার ইমারত অত্যন্ত সাধাসিধাভাবে নির্মিত ছিল। দক্ষিণ দেয়ালে ছিল এর প্রধান প্রবেশপথ। পূর্ব ও দক্ষিণ দেয়ালেও ছিল ১টি করে প্রবেশপথ। উত্তর দিকের কথা এখন সঠিকভাবে বলা যায় না। উপবে ছিল উত্তর ভারতীয় স্থাপত্যের অনুসরণে এবং অনেকটা বাংলাদেশের চৌচালা ঘরের চালের মতো করে নির্মিত। কিন্তু উপরের অংশে কিছুটা চ্যাপটা ছাদ। (domical canopy of the North Indian type) "

চিশতী বিহিস্তী প্রসঙ্গে নানা কিংবদন্তি রয়েছে। হাকিম হাবিবুর রহমান তাঁর "আসূদগানে ঢাকা'য় (১৯৪৬) বলেন, "উক্ত মাজারটি বর্তমান ইন্টারমিডিয়েট কলেজ বিল্ডিং এর দিকে জঙ্গলার ভিতর একটি গম্বুজের মধ্যে অবস্থিত। যখন আসাম ও বাংলায় মিলে আলাদা প্রদেশ হয় তখন উক্ত বিল্ডিংটি নির্মিত হয় লেঃ গভর্নর-এর জন্য। কিন্তু তিনি এটি পছন্দ না করায় উহা প্রাদেশিক কাউন্সিল অধিবেশনাদির জন্য নির্ধারিত হয়। কিছুদিন পর যখন বঙ্গ ভঙ্গ রহিত হয় তখন ঢাকাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং উক্ত বাড়িটি হয় ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। উক্ত বিরাট ইমারতটি নির্মাণকালে সরকারের প্রস্তাব ছিল তার গম্বুজটি ভেঙে দেয়ার পক্ষে। কিন্তু মরহুম কাজী রফিকউদ্দীন আহম্মদের নেতৃত্বে মুসলমানরা একত্রিত হয়ে উহা না ভাঙার জন্য আন্দোলন করে এবং উহাকে ভাঙা থেকে এই শর্তে রক্ষা করা হল যে, মুসলমানরা জেয়ারতের জন্য বিশেষ বিশেষ দিনে আসতে পারবেন। কিন্তু উক্ত গম্বুজের মেরামত করার কোনো অধিকার তাদের থাকবে না। এরপর সরকারের পক্ষ থেকে গম্বুজটির চারদিকে বৃক্ষ রোপণ করে এমনভাবে চেষ্টা করা হল যে উহার উপর সূর্যের আলো পর্যন্ত যেন পড়তে না পারে এবং বৃষ্টির পানি জমে যেন গম্বুজটি নিজে নিজেই ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে এত সব করার পরও আজও মাজারটি ঐভাবেই বিদ্যমান রয়েছে। পূর্বে এ মহল্লাটি চিশতিয়া মহল্লা নামে পরিচিত ছিল। তখন এখানে মুসলমানদের খুব ঘনবসতি ছিল। পরে নয়া রমনা গড়ে উঠলে উক্ত মহল্লাটি এবং তার পাশের আরো কয়েকটি মহল্লা যথা শাহজাদপুর ইত্যাদি উচ্ছেদ করে দেয়া হল। তথাপি হাজী শাহবাজের মসজিদের আশেপাশে মুষ্টিমেয় কয়েকটি মুসলমানদের ঘর রয়ে গেল। প্রায় ৬০ বছর আগে এ মাজারটিকে ঢাকার বিখ্যাত জমিদার মহিনীবাবু সংস্কার করেছিলেন। কিন্তু বর্তমাজা উহা বিনা তত্ত্বাবআজা পড়ে রয়েছে। এখানে সমাহিত বুজুর্গগণের সম্পর্কে কিছু জানা যায় নি। কিন্তু আমার মনে হয় তিনি নবাব আলাউদ্দীন ইসলাম খান চিশতীরই নিকটতম বা তাঁর সমসাময়িক ছিলেন। কারণ সে আমলে গম্বুজের প্রচলন ছিল বাংলার ন্যায়। তাছাড়া এটাই ছিল দালান তৈরির প্রাচীন পদ্ধতি।"

ঢাকার ঐতিহাসিক এস. এম. তৈফুর হাইকোর্ট মাজার অঞ্চলকে বাগ-ই-বাদশাহ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন যে, বর্তমান রমনা ঘোড়দৌড়ের (অবলুপ্ত) মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব পাশের যে বিরাট অঞ্চল দিয়ে বাগ-ই- বাদশাহ ছিল বর্তমাজা সেখানে হাইকোর্ট বিল্ডিং এবং বাগান রয়েছে। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি মনোরম ও সুউচ্চ ফটকের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পান। এটি বঙ্গভঙ্গের পর ১৯০৪-৫ খ্রিস্টাব্দে ভেঙে দেওয়া হয়। এ অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ চিশতিয়া মহল্লা নামে পরিচিত। এখানে চিশতিয়া পরিবারের কয়েকজন সদস্য বসবাস করত এবং পরবর্তীকালে তাদের এখানে সমাহিত করা হয়। এ মহল্লা পরবর্তীকালে পুরাতন নাক্কাসা বা পুরাতন দাস বিক্রয়ের বাজার ছিল বলে মনে হয়। পরবর্তীকালে চিশতীয়া গণকবরস্থানে পরিণত হয়। এ সমগ্র অঞ্চলটি সুজাত খান চিশতিয়ার নামানুসারে মৌজা সুজাতপুর নামে পরিচিত হয়। তিনি সম্ভবত

ইসলাম খান চিশতীর (ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা) ভাই ছিলেন। তিনি মৃত্যুবরণ করলে তাঁকেও এখানে সমাহিত করা হয়। বঙ্গভঙ্গের পর ঢাকা নতুন রাজধানী হলে এখানকার অনেক পুরাতন ইমারত, সমাধি, শবাধার এবং আরও অনেক পুরাকীর্তি জনসাধারণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিনষ্ট করা হয়, যেকথা হাকিম হাবিবুর রহমান বলেছেন। ঢাকার নবাব স্যার সলিমউল্লাহর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে কতিপয় সমাধি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। ইতিপূর্বে এ অঞ্চলের অনেক মসজিদ এবং চিশতিয়া সমাধি ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার কালেক্টার ডাওয়েস কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

হাইকোর্ট মাজার প্রাঙ্গণে যে সমাধিটি রয়েছে তা মূল ইমারত নয়। এটি সম্পূর্ণরূপে পূনঃনির্মিত। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় পূর্বেই যে চিত্র আ. ক. ম. যাকারিয়া তাঁর 'বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ' শীর্ষক গ্রন্থে প্রকাশ করেন তার সাথে বর্তমান আধুনিক গম্বুজবিশিষ্ট ইমারতের কোনো সাদৃশ্য দেখা যায় না। পূর্বের ইমারতটি চারচালা বা প্যাভেলিয়ন ধরনের ছিল তাতে সন্দেহ নেই, যা পূর্বে বলা হয়েছে। উল্লিখিত মাজারটি কার এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

সম্প্রতি মোঃ গোলাম মোস্তফা মোল্যা নামের জনৈক লেখক 'হযরত খাজা শরফউদ্দিন চিশতী (রাঃ)' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। খাজা শরফউদ্দিন চিশতীর সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না, যদিও গোলাম মোস্তফা বলেন, "কথিত মতে, বিখ্যাত ওলী হযরত খাজা শরফউদ্দিন চিশতী (রাঃ) ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আজমীর হতে এদেশে আগমন করেন এবং বর্তমান হাইকোর্ট এলাকায় অবস্থান করেন। নির্জনে বসে সাধনা করার জন্য তিনি এ জায়গাটি পছন্দ করেছিলেন এবং এখানে বসে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর এবাদত বন্দেগী করতেন। এখানে হযরত খাজা শরফউদ্দিন চিশতী (রাঃ)-এর আগমন ও অবস্থানের ফলে আশেপাশের এলাকাসহ সমগ্র এলাকায় তাঁর শিষ্য বা অনুসারীগণ বসতি স্থাপন করেন এবং তাঁদের চিশতীয়া বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। তাই এ এলাকাকে মহল্লায়ে চিশতীয়া বলা হতো। তাদের ইন্তেকাল হলে এ এলাকায় দাফন করা হতো। ফলে আশেপাশের এলাকাসহ এ এলাকাটি একটি কবরস্থান গড়ে ওঠে। হযরত খাজা শরফউদ্দিন চিশতী (রঃ)-এর ইন্তেকাল হলে তাঁর দাফন এখানে সম্পন্ন করা হয়।"

উপরোক্ত ভাষ্যে গোলাম মোস্তফা তথাকথিত ওলী শরফউদ্দিন চিশতীর কোনো সিলসিলা বা বাংলা লতিকা দেননি। এ কারণে তাঁর নাম-ধামও নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। উপরন্তু, তিনি নিজেই সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন যে তিনি হয়তো (আন্দাজে) হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রাঃ) এর ভাগিনা, যদিও মঈনুদ্দিন চিশতীর কোনো ভগ্নী বা ভাগিনা আদৌ ছিল কি না তা সঠিকভাবে জানা যায় না। গোলাম মোস্তফা তাঁকে খাজা বাবার বংশের (কোনো সূত্রে) অভিহিত করলেও প্রমাণ দিতে পারেননি। আবার তিনি অন্য এক স্থানে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, তিনি জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলায় নিযুক্ত এবং ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগরের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন ইসলাম

খানের বংশধর ছিলেন; শুধু একটিমাত্র প্রমাণ যে ইসলাম খান 'চিশতী বেহেস্তী' অর্থাৎ 'মহান চিশতী' নামে পরিচিত ছিলেন। প্রসঙ্গত আহমদ হাসান দানী তাঁর 'Dacca' গ্রন্থে বাংলায় "The famous Bagh-i-Badshah which included Mahalla Chistia was most probably founded by the first Mughal Governor of Dacca Islam Khan Chishti himself. It is in the mahalla that the first resting place of Islam Khan, Modern darga of Chishti Behishti in the present High court compound, is situated." অর্থাৎ "বাগ-ই-বাদশাহের অন্তর্ভুক্ত চিশতী বিহিস্তী মহল্লা ঢাকার প্রথম সুবাদার ইসলাম খান চিশতী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মহল্লায় ইসলাম খানকে প্রথম সমাধিস্থ করা হয়। এটিকে বর্তমানে হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে একটি আধুনিক দরগায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। মাদানী শরফউদ্দিন চিশতীর কোনো উল্লেখ করেননি, যা গোলাম মোস্তফার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।

আব্দুল মান্নান তালিব কিছু আজগুবি কথা বলে আরও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর 'বাংলাদেশে ইসলাম' গ্রন্থে বলেন, "ঢাকা সুপ্রীম কোর্টের পূর্ব পাশে হযরত খাজা শরফউদ্দিন ওরফে খাজা চিশতী বেহেস্তীর মাজার অবস্থিত। বাদশাহ্ আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫) তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ঢাকায় আগমন করেন। এতদঞ্চলে তিনি দীর্ঘ দিন ধরে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। অনেকে তাঁকে নওয়াব আলাউদ্দীন ইসলাম খান চিশতীর উত্তরপুরুষ বলে মনে করেন। হিজরী ৯৯৮ সনে (১৫৮৯ খ্রিঃ) তিনি ইন্তেকাল করেন বলে জানা যায়।" আব্দুল মান্নান তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কোনো তথ্য-প্রমাণ দেবার প্রয়োজন মনে করেননি। তাঁর উদ্ভট ও অবাস্তব মতবাদের প্রধান প্রমাণ এই যে, তিনি যেই হন আকবরের শাসনামলে কোনো চিশতীয়া পরিবারের সদস্য বাংলায় আসেননি কারণ ইসলাম খান চিশতী প্রথম চিশতীয়া পরিবারের সদস্য ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর প্রদত্ত সন-তারিখ (১৫৮৯) মনগড়া, কারণ ইসলাম খানের শাসনামলেই ঢাকা মুঘল নগরীতে পরিণত হয় সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে। তিনি কোনো শিলালিপির উল্লেখ করেননি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, হাকিম হাবিবুর রহমান মনে করেন যে, চিশতী বিহিস্তীতে ইসলাম খানের কোন নিকট আত্মীয় সমাহিত রয়েছেন। অন্যদিকে এস. এম. তাইফুরের ধারণা যে, ইসলাম খান ফতেহপুর সিক্রির জামি মসজিদের প্রাঙ্গণে শায়িত সাধক সেলিম চিশতীর নাতি ছিলেন। অপরদিকে আবদুল হাকিম প্রণীত 'বাংলা বিশ্বকোষ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, 'চিশতী' বিহেস্তী হযরত-এর কবর নির্মাণকাল ঢাকা অঞ্চলে হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে উচ্চ ভিতের উপর বর্গাকৃতি সমাধিভবন। অনুমিত হয় বাংলার প্রথম মুঘল সুবাদার ইসলাম খানের মৃতদেহ ফতেহপুর সিক্রিতে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বে এখানে সমাহিত হয়েছিল।" আবদুল হাকিমের মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায় 'মাসির-উল-উমারা'য়। আবদুল হাকিম ইসলাম খানকে শেখ সলিম চিশতীর পৌত্র (মেয়ের ছেলে-তৈফুর) বলে অভিহিত করেছেন।

গোলাম মোস্তফা স্থানীয় লিজেন্ডের উপর ভিত্তি করে শরফউদ্দিন সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত, তিনি যে মাজারফলকের ভিত্তিতে শরফউদ্দিন চিশতীর মৃত্যুকাল ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দ বলেছেন তা

'fake' অর্থাৎ জাল। পরবর্তীকালে মাজারের মতোওয়াল্লীগন স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে প্রাচীনত্ব প্রমাণের জন্য এটি খোদাই করিয়ে বসিয়েছেন কারণ ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে আকবরের রাজত্বকালে বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হবার দু'বছর পরে কোথা থেকে আকস্মিকভাবে খাজা শরফউদ্দিন হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে ইসলাম প্রচার করতে আসলেন এবং ওখানে ইন্তেকাল করলেন তা সত্যই বিভ্রান্তিকর। এ ছাড়া আবদুল মান্নান তাঁর মৃত্যুর তারিখ ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দ বলেছেন। উপরন্তু, ইসলাম খান ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দের রাজধানী হিসেবে ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগর প্রতিষ্ঠা করেন এবং সম্ভবত ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে ২১শে আগস্ট ইন্তেকাল করেন এবং প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁকে এ স্থানে দাফন করা হয়। অবশ্য পরবর্তীকালে জাহাঙ্গীরের নির্দেশে তাঁর মরদেহ ফতেহপুর সিক্রিতে স্থানান্তরিত করা হয়। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে ইসলাম খানের মৃত্যুর ৩০/৩২ বছর পূর্বে শরফউদ্দিন ঢাকায় আসেন। সুতরাং গোলাম মোস্তফার মতবাদ অনুযায়ী বর্তমান হাইকোর্ট মাজারের যিনিই শায়িত থাকেন তিনি শরফউদ্দিন নন।

.এস. এম. তাইফুর মাজার প্রসঙ্গে যা মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "জাহাঙ্গীরের আত্মচরিতে (তুযুখ-ই-জাহাঙ্গীরী) উল্লেখ আছে যে, ফতেহপুর সিক্রিতে ইসলাম খান চিশতীর শবাধারের উপর একটি সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। বাহারিস্তানের গ্রন্থকার (মির্জা নাথান) বলেন যে, তিনি স্বচক্ষে ইসলাম খানের ভাওয়ালের মৃত্যু হলে তাঁর মৃতদেহ জাহাঙ্গীরনগরের বাগ-ই-বাদশাহে স্থানান্তর করে দাফন করতে দেখেন। এটি সম্ভবত ইসলাম খানের পুত্র হুসাঙ্গ পিতার মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরের সঙ্গে দেখা করেন এবং (সম্রাটের নির্দেশে) পিতার শবাধার কবর থেকে তুলে ফতেহপুর সিক্রিতে নিয়ে আসেন। এ কারণে লেখক মনে করেন যে, হাইকোর্ট বিল্ডিং-এর পূর্ব প্রাঙ্গণে চিশতী বিহিস্তী নামে যে মাজারটি জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত তা মূলত ইসলাম খান চিশতীর সমাধিসৌধ ছিল। লোকে এটিকে চিশতী বিহিস্তী বলত এ কারণে যে তিনি প্রখ্যাত সুফী সাধক ও চিশতীয়াদের গুরু চিশতীর পৌত্র ছিলেন এবং একারণে তাঁর স্থান বেহেস্তে। লেখক সমাধিতে অতি সম্প্রতি এই মাজারটি পুনঃনির্মাণ পুণর্গঠন ও সংস্কার দেখে সম্ভিত হয়ে গেছেন যা অসৎ উদ্দেশ্যে কোনো চালাক ব্যক্তি করে থাকবেন।"

চিশতী বিহিস্তী সমাধিটি ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে যখন তৈফুর দেখেন তখন এটি জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল এবং বর্গাকৃতি এই ইমারতটি চারচালা অথবা প্যাভেলিয়ন ধরনের ছাদ দ্বারা আবৃত ছিল, যাকে তৈফুর বলেছেন, "The flat and vaulted roof"। বর্তমাজা এটির উপর গম্বুজ নির্মিত হয়েছে এবং আয়তন বৃদ্ধি করে বারান্দা সংযোজিত হয়েছে। বর্তমাজা এটি একটি পীরের মাজার হিসাবে পরিগণিত হয়ে অর্থসমাগমের উৎসে পরিণত হয়েছে। অভ্যন্তরে শবাধারটি চান্দোয়া দ্বারা আবৃত এবং প্রাচীনত্ব প্রমাণের জন্য একটি অবিন্যস্তভাবে পাথরে উৎকীর্ণ শিলালিপি সংযোজিত হয়েছে, যাতে হিজরী ৯৯৮/১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দ উল্লেখ আছে। বর্তমাজার মাজারটি অত্যাধুনিক কিন্তু মূল সমাধিটি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইসলাম খানের প্রথম সমাধি হিসেবে নির্মিত হয়। মোহাম্মদ যাকারিয়ার গ্রন্থে যে চিত্র প্রকাশিত হয়েছে তা দেখে ধারণা করা হয় যে, আগ্রার

ইতিমদ-উদ-দৌল্লাহর সমাধির মতো এটির ছাদ প্যাভেলিয়ন ধরনের অর্থাৎ চারচালা ভল্টের সাহায্যে নির্মিত। চারকোনায় ক্ষুদ্রাকৃতি বুরুজ যা ছাদের উপরে টারেট হিসাবে উঠে গেছে। কার্নিশ সমান্তরাল। সম্ভবত পূর্বদিকে প্রবেশপথ ছিল। অপর তিনদিক বড় ধরনের খিলান প্যানেল দ্বারা নকশাকৃত। কোনো অলঙ্করণ ব্যবহৃত হয়নি। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের অপর কোনো ইমারতে উত্তর ভারতে মুঘল আমলে নির্মিত প্যাভেলিয়ন দেখা যায় না।

৩৩। দোচালা দালান, পীলখানা, সপ্তদশ শতাব্দী (সংস্কারকৃত)

আহমদ হাসান দানী নিউ মার্কেটের অদূরে পীলখানায় বর্তমাজা বাংলাদেশ রাইফেলস্ হেড কোয়ার্টারের অভ্যন্তরে একটি দোচালা ইমারতের বর্ণনা দেন। প্লাস্টার করা সাদামাটা এ ইমারতটি আয়তাকারে এবং দোচালা ছাদ দ্বারা আবৃত। সাধারণত এ ধরনের ছাদকে pentroof বলা হয়। ধনুকাকৃতির ছাদ (drooping eves)। কি উদ্দেশ্যে এটি নির্মিত তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে এটি সংস্কার করা হলেও ধারণা করা যায় যে ইমারতটি সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল।

৩৪। ঈদগাহ, ধানমণ্ডি, ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দ

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ব্রাডলি বার্ট ঈদগাহের বর্ণনা দেন : "(তৎকালীন) ঢাকা শহরের সীমানা পেরিয়ে এক মাইল অগ্রসর হলে ঈদগাহের ভগ্নাবশেষ দেখা যাবে, যা একসময় খুব সুন্দর নামাজগাহ হিসাবে ব্যবহৃত হত। পুরাতনকালে শহরের ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ ঈদের দিনে এখানে সমবেত হয়ে একত্রে নামাজ পড়তেন। এখন মাত্র একটি (কিবলা) প্রাচীর ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। এটি মনোমুগ্ধকর নকশা দ্বারা অলঙ্কৃত, যা ইদানীং সংস্কার করা হয়েছে। কোনো একসময় ঢাকা শহরের বিস্তৃতি চারদিকে ছিল। সম্ভবত কোনো একসময়ে ব্যস্তসমস্ত বিপণিগুলোর এবং সেনাছাউনির প্রধান প্রাণকেন্দ্র ছিল এই ঈদগাহ। শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে সাদা পোশাক পরিহিত মুসল্লীগণ যখন রমজানের রোজা শেষে এখানে একত্রে সমবেত হত ঈদের নামাজ পড়ার জন্য তখন এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হত।"

ধানমণ্ডির নূতন ৮ নম্বর এবং পুরাতন ১৫ নং সড়কের, যা সাতগম্বুজ সড়ক নামে পরিচিত, পাশে ঈদগাহ অবস্থিত। এটি বর্তমাজা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত।

ঈদগাহের প্রধান বা কেন্দ্রীয় মিহরাবের উপর যে শিলালিপি আছে তা পাঠোদ্ধার করে জানা যায় যে, শাহজাদা শাহ সুজার আমলে তাঁর দেওয়ান মীর আবুল কাশেম হিজরী ১০৫০/১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে ঈদগাহটি নির্মাণ করেন। উল্লেখ্য যে, মীর কাশেম শাহ সুজার আমলে স্থাপিত বড় কাটরারও নির্মাতা। বহুদিন ভগ্নাবস্থায় থাকার পর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে এটি সংরক্ষিত ইমারতের তালিকাভুক্ত করে এবং এটির মূল নকশা অনুযায়ী চারদিকের দেয়ালে ও আনুষঙ্গিক মেরামতের কাজ সুরু করে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের স্থাপত্যের ইতিহাসে ঈদগাহের সংখ্যা খুব কম যদিও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম আমলে অনেক ঈদগাহ নির্মিত হয়েছিল। সংস্কার এবং সংরক্ষিত

হবার পূর্বাবস্থার ঈদগাহ সম্পর্কে আওলাদ হাসান, রহমান আলী তায়েশ, আহমদ হাসান দানী এবং আ. ক. ম. যাকারিয়া বিস্তারিত বিবরণ দেন। মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেন, "পার্শ্ববর্তী ভূমি থেকে প্রায় ৪ ফুট উঁচু এই ঈদগাহর আদি আয়তন ছিল ২৪৫ × ১৩৭ ফুট। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণদিকের প্রাচীর ছিল ৬ ফুট উঁচু। সেসব প্রাচীরের সামান্য ধ্বংসাবশেষ এখনও টিকে আছে। পশ্চিমদিকের দেয়াল ছিল ১৫ ফুট উঁচু। সেই দেয়ালের বেশকিছু অংশ (প্রায় ৩০ ফুট) এখনও বিদ্যমান। সেই দেয়ালের কেন্দ্রস্থলে ছিল খিলানের সাহায্যে নির্মিত একটি সুগভীর মিহরাব। এই মিহরাবের উভয় পার্শ্ব ছিল খাঁজকাটা ও ধনুকাকৃতির প্যানেল। এগুলির পরে ছিল উত্তর দিকে ৩টা করে ছোট ও অগভীর মিহরাব। এই মিহরাবগুলির পরে প্রাচীরের অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। এই প্রাচীন ঈদগাহ এখন ঈদের নামাজের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।"

আব্দুল কাদের এ ঈদগাহ সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তরফ থেকে। তিনি বর্তমান আয়তন ২৫০´ × ১৪২´ উল্লেখ করেন অর্থাৎ পূর্বের আয়তন ২৪৫ × ১৩৭ ফুট (যাকারিয়া) থেকে। কাদের যথাযথই বলেছেন যে, শিলালিপিতে ইমারতের কথা বলা হলেও আসলে এখানে ছাদবিশিষ্ট কোনো ইমারত নির্মিত হয়নি। এটি ঈদগাহ হওয়ায় স্বাভাবিকভাগে দেয়ালঘেরা নামাজগাহ, যার পশ্চিম দিকে মিহরাব এবং মিম্বরসহ একটি কিবলা প্রাচীর থাকে। সন তারিখ হিজরী ১০৫০ অর্থাৎ ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে এবং সময়কাল হচ্ছে সুবাদার শাহ সুজার। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নির্মাতা বা স্থপতি হচ্ছেন মীর আবুল কাশেম আল-হোসেনী আল-তাবাতাবায়ী।

৩৫। দারা বেগমের সমাধি, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ

ধানমণ্ডি ঈদগাহ থেকে প্রায় ১ মাইল উত্তরে মোহাম্মদপুর কলোনির কাছে বর্তমাজা লালমাটিয়া মহিলা কলেজসংলগ্ন একটি জলাশয়ের পূর্বতীরে এক গম্বুজবিশিষ্ট একটি অনিন্দ্যসুন্দর ইমারত দেখা যাবে। ভিত্তিভূমি বেশ উঁচু এবং এ ইমারতটি দুই অংশে বিভক্ত (ক) মূল কক্ষ (খ) পূর্বদিকের বারান্দা। উত্তরদিকে অবস্থিত ও বর্গাকারে নির্মিত প্রধান কক্ষের প্রতিটি বাহু ভিতরের দিকে ২৭´-৯´ লম্বা। ইমারতটি ২৫´ ফুটের ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। একগম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার অনেক মসজিদ বাগেরহাটে নির্মিত হয়েছে। এস. এম. তাইফুর এটিকে ঢাকায় নির্মিত সর্ববৃহৎ গম্বুজ বলে অভিহিত করেছেন (largest in Dhaka)। অবশ্য বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গম্বুজটি দেখা যাবে বাগেরহাটের তনবিজয়পুর মসজিদে যার ব্যাস ১৩ ফুট বেশি অর্থাৎ ৩৮ ফুট।

দারা বেগমের সমাধির নির্মাতা প্রসঙ্গে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে। দারা বেগমের সঠিক পরিচয় জানা যায় না। এস. এম. তাইফুরের মতে, "Local tradition attributes this mausoleum to be the tomb of one of the daughters of Nawab Shaesta Khan." অর্থাৎ "স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী এ সমাধিসৌধ শায়েস্তা খানের এক কন্যার শবদেহের উপর নির্মিত। আওলাদ হাসান ও মুন্সী রহমান আলী তায়েশের উদ্ধৃতি দিয়ে আহমদ হাসান দানী তাঁর 'Muslim Architecture in

Bengal' (১৯৬১) শীর্ষক গ্রন্থে এস. এম. তাইফুরকে সমর্থন করে বলেন যে, দারা বেগম শায়েস্তা খানের কন্যা ছিলেন এবং কন্যার মৃত্যুর পর তিনি বিবি পরীর মতো তাঁর শবদেহের উপর সমাধি নির্মাণ করেন। দানী তাঁর 'Dacca' (১৯৬২) শীর্ষক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "The date of this building is not definitely known: out the use of simple arched openings with no attempt to emphasise the central doorway and sparse decoration place it in the Shaista Khan Period" অর্থাৎ,"ইমারতের নির্মাণ তারিখ সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে মধ্যবর্তী খিলানপথটি বৃহদাকারে সৃষ্টি না করার প্রবণতা এবং সাদামাটা অলঙ্করণ দেখে এ ইমারতটিকে শায়েস্তাখানী-পূর্ব স্থাপত্যকীর্তি বলে ধারণা করা যায়।" সুতরাং দারা বেগমের মসজিদটি শায়েস্তা খানের সুবেদারীর পূর্বে নির্মিত হয়, সম্ভবত শাহ সুজার আমলে। কে এই দারা বেগম তা এ মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তবে ধারণা করা হয় যে ধানমণ্ডি অঞ্চলে শাহ সুজার আমলে ঈদগাহ ও পুরাতন ঢাকার চুড়িহাট্টা মহল্লায় মসজিদ নির্মিত হয়েছিল এবং এ সুবাদে দারা বেগম নামে শাহ সুজার শাসনামলের কোনো এক অমাত্যের স্ত্রী সম্ভবত এ সমাধি নির্মাণ করেন। অবশ্য শায়েস্তা খানের আমলে বেশ কয়েকটি সমাধিসৌধ তাঁর কন্যাদের শবদেহের উপর স্থাপিত হয়, যেমন লালবাগ দুর্গে বিবি পরীর সমাধি, বাবুবাজারের নিকট অধুনালুপ্ত লাডলী বেগমের সমাধি এবং নারায়ণগঞ্জের হাজিগঞ্জে বিবি মরিয়মের সমাধিসৌধ।

মূলত সমাধি হিসাবে নির্মিত হলেও বর্তমাজা অভ্যন্তরে কোনো শবাধার দেখা যায় না। স্থানীয় লোকেরা এটি সরিয়ে মসজিদের মিহরাব ও একটি মিম্বর স্থাপন করে মসজিদ হিসাবে ব্যবহার করেছে। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বারান্দাসহ প্রাচীন এক গম্বুজবিশিষ্ট এই ইমারতের কোনো চিহ্ন দেখা যাবে না উপর্যুপরি সংস্কার ও সংরক্ষণের ফলে। উল্লেখ্য যে, দারা বেগমের সমাধি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত নয়। পূর্বদিকে বারান্দায় তিনটি খাঁজকাটা খিলানপথ, যা দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়।

মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেন, "দক্ষিণ দিকের বারান্দাসহ এই ইমারতের বাইরের দিকের আয়তন ৬০′–১১′ × ৪২″ – ৩″, প্রধান কক্ষের প্রাচীরগুলি ৭′–২″ প্রশস্ত। বারান্দার দক্ষিণ প্রাচীর ৫′–৩″ এবং পূর্ব ও পশ্চিম প্রাচীরের প্রত্যেকটি ৪′–২″ চওড়া। বারান্দার অভ্যন্তরভাগের আয়তন (পূর্ব পশ্চিমে লম্বা) ৩৩′ × ১৩′–৭′। বারান্দার দক্ষিণ দেয়ালে ৩টি এবং পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে ১টি করে দরজা আছে। প্রধান কক্ষের পূর্ব ও উত্তর দেয়ালের একটি করে দরজা আছে। বারান্দা ও প্রধান কক্ষের মধ্যবর্তী দেয়ালের ১টি দরজা আছে। প্রধান কক্ষের পশ্চিম দেয়ালে আছে একটি মিহরাব। মিহরাবের পেছনের ১৩′ – ১০″ পরিমিত দেয়াল বাইরের দিকে সামান্য উদ্গাত।"

মিহরাবটি অবতলাকৃতি এবং অর্ধ অষ্টকোনা। গম্বুজ স্কুইঞ্চের সাহায্যে নির্মিত এবং অষ্টকোণাকার ড্রামের উপর স্থাপিত। গম্বুজটি কয়েকটি স্তরে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বাল্বের আকৃতি, যা মুঘল স্থাপত্যের পরিচায়ক। গম্বুজের শীর্ষে কলসচূড়া দেখা যাবে। প্রাচীন চিত্রে দারা বেগমের সমাধিতে কি ধরনের কার্নিশ ছিল বোঝা যায় না, তবে সম্ভবত সমান্তরাল ছিল, বক্রাকার নয়।

দারা বেগমের সমাধিটির চার কোনায় এবং বারান্দার দুই কোণে দুটি মোট ছয়টি বুরুজ ছিল যার ভগ্নাংশ কিছুটা দেখা যাবে। প্রবেশপথ খাঁজকাটা খিলান দিয়ে সৃষ্ট এবং এটি আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ ছিল। দক্ষিণদিকের বারান্দায় ও বাহির দিকে তিনটি এবং পূর্ব-পশ্চিমে দু'টি খাঁজকাটা খিলানসমৃদ্ধ প্রবেশপথ দেখা যাবে। বারান্দাটি ভল্টের আকৃতিতে নির্মিত। দারা বেগমের সমাধি ছাড়াও হাজী খাওয়াজা শাহবাজের সমাধিতে যে বারান্দা রয়েছে তা দোচালাকৃতি। মিহরাব প্রসঙ্গে দানীর মন্তব্য সঠিক নয়। তিনি বলেন, "The existence of a mihrab raises doubt on its being a tomb, because in Bengal we never see a mihrab inside a tomb as we get in Northern India." অর্থাৎ "অভ্যন্তরে মিহরাব থাকায় এটি যে একটি সমাধি ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না, কারণ উত্তর ভারতের মতো বাংলায় সমাধিতে মিহরাব দেখা যাবে না।" প্রসঙ্গত তিনি গৌড়ের শাহ্ নিয়ামতউল্লাহ্র মাজারে মিহরাবের ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "There were originally three doorways that led into the tomb chamber, one on each side except on the west where we find a mihrab but now only the southern one is open" অর্থাৎ "মূল নকশা অনুযায়ী তিনটি দরজা দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। পশ্চিমদিকে একটি মিহরাব দেখা যাবে, এ ছাড়া প্রত্যেক দিকে একটি করে দরজা আছে।"

বর্তমাজা দারা বেগমের সমাধি তথা মসজিদটি এমনভাবে পুনঃনির্মিত হয়েছে যে এর মূল অংশটি খুঁজে পাওয়া যাবে না। আসমা সিরাজউদ্দীন তাঁর 'Mughal Tombs in Dhaka' শীর্ষক প্রবন্ধে যা Dhaka Past Present and Future গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল, দারা বেগমের সমাধি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁর মতে, ঢাকায় দু'ধরনের সমাধি নির্মিত হয়। প্রথমত, 'কুববাত' বা গম্বুজবিশিষ্ট যাতে বারান্দা দেখা যাবে না এবং দ্বিতীয়ত, বারান্দাসম্বলিত এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার সমাধি। প্রথমটিতে যে সমস্ত ইমারত বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত তা হচ্ছে বিবি চম্পা, লাডো বেগম, সাত গম্বুজের সন্নিকটে একগম্বুজবিশিষ্ট অজানাসমাধি। দ্বিতীয় গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে হাজী খাওয়াজা শাহবাজের সমাধি এবং দারা বেগমের সমাধি। দ্বিতীয়ত, তিনি ভুলবশত লাডো বিবি এবং বিবি চম্পার সমাধিকে প্যাভেলিয়ন বা ক্যানোপি (Canopy) ভল্টসম্বলিত ছাদবিশিষ্ট বলেছেন, কিন্তু তা সঠিক নয়। অবশ্য চিশতী বিহিস্তী সমাধিকে ক্যানোপি ধরনের ইমারত বলা যায়।

৩৬। আল্লাহখুড়ি মসজিদ, মোহাম্মদপুর, সপ্তদশ শতাব্দী

দারা বেগমের সমাধি থেকে প্রায় আধ মাইল উত্তরে এবং সাত মসজিদ থেকে সামান্য উত্তর-পূর্বে রাস্তার দক্ষিণ পাশে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি অথচ খুবই আকর্ষণীয় মসজিদ দেখা যাবে। এটি পূর্বে কাটাজোর এলাকা নামে পরিচিত ছিল। একটু উঁচু ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত খান জাহানী কীর্তিতে একগম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার মসজিদ নির্মিত হয়। দক্ষিণদিকে একটি ছোট কুয়া রয়েছে। দানীর মতে, এ ইমারতের প্রতি বাহু ১২$\frac{১}{২}$ ফুট, প্রতি কোনায় একটি করে অষ্টকোণাকৃতির বুরুজ দেখা যাবে এবং এ বুরুজগুলো ছাদের অনেক উপরে উঠে গেছে। শীর্ষদেশে কিউপোলা ও চূড়া শোভা পাচ্ছে। মসজিদটি ভগ্নাবস্থায় ছিল কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এটির সংস্কার করে সংরক্ষণ করেছে।

বুরুজগুলোকে সমান্তরাল বেড়ি বা মৌল্ডিং দিয়ে বিভক্ত করা হয়েছে। পূর্বদিকে একটি প্রবেশপথ খিলানের সাহায্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। খিলান খাঁজকাটা এবং উপরে এলকভ বা অর্ধগম্বুজাকৃতি অংশ দেখা যাবে। খিলানপথের দু'ধারে সরু টারেট ছাদের উপর দিয়ে উঠে গিয়ে শোভা বৃদ্ধি করেছে। সম্মুখভাগ বা facadeটি বিভিন্ন ধরনের প্যানেল নকশা দ্বারা অলঙ্কৃত। প্রধান প্রবেশপথের উপরে একটি ফাঁকা স্থান দেখা যাবে। সম্ভবত এখানে একটি শিলালিপি ছিল, যা বর্তমাজা খোয়া গেছে। দানীর মতে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শিলালিপিটি ভাওয়ালের জমিদার কর্তৃক স্থানান্তরিত হয়েছিল বলে জানা যায়। আল্লাহখুড়ি নামাকরণ খুবই বিচিত্র–এর অর্থ হতে পারে যে জঙ্গলাকীর্ণ মহল্লা থেকে আল্লাহর কৃপায় মাটি খুঁড়ে বা কুড়ে ইমারতটি উদ্ধার করা হয়। এজন্য সম্ভবত আল্লাহখুড়ি নাম হয়েছিল। মসজিদের কার্নিশ সমান্তরাল ছিল এবং প্যারাপেট দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। কৌণিক বুরুজগুলো দেখতে খুবই সুন্দর এবং Jar pedestal বা ভাণ্ড আকৃতির ভিত্তি থেকে সামান্য সরু হয়ে উপরে উঠে গেছে। পূর্বদিকের মতো অনুরূপ খাঁজকাটা খিলানসম্বলিত প্রবেশপথ উত্তর ও দক্ষিণদিকে দেখা যাবে। অভ্যন্তরে কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব রয়েছে; কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত অধিক অলঙ্কৃত। পোড়ামাটির অলঙ্করণ বেশি দেখা না গেলেও প্লাস্টারে কাটা বিভিন্ন মোটিভ দেখা যাবে। স্কুইঞ্চের সাহায্যে গম্বুজটি নির্মিত। অষ্টকোণাকার ড্রামের উপর গম্বুজটি স্থাপিত। ড্রামের চারপাশে মার্লনের অলঙ্করণ রয়েছে। গম্বুজের শীর্ষদেশে কলসচূড়া ছিল। গঠনশৈলী ও অলঙ্করণ দেখে আল্লাহখুড়ি মসজিদকে সপ্তদশ শতাব্দীর শায়েস্তা খানী রীতিতে নির্মিত ইমারত হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। আল্লাহকখুড়ী নামের সাথে খুলনার মসজিদকুড়ী নামের সাদৃশ্য দেখা যায়।

৩৭। সাতগম্বুজ মসজিদ, মোহাম্মদপুর, সপ্তদশ শতাব্দী (৩৫)

আল্লাহখুড়ি মসজিদ থেকে সামান্য উত্তর-পশ্চিমে রাস্তার পশ্চিম পাশে একটি জলাশয় দেখা যাবে যা কোনো একসময় বুড়িগঙ্গার অংশ ছিল বলে মনে হয়। এই বিলের পূর্ব পাড়ে একটি বিশালাকার তথাকথিত সাত গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ নজরে পড়ে। শায়েস্তা খানের আমলে যে কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হয় তার মধ্যে নিঃসন্দেহে এ মসজিদটি সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়। এটি সাতগম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ বললেও আসলে মূল মসজিদ তিন গম্বুজবিশিষ্ট এবং এর চার কোনায় বাগেরহাটের তথাকথিত ষাইট গম্বুজ মসজিদের সামনে কোনায় ফাঁপা বুরুজের মতো চারটি বুরুজ থাকায় সংখ্যায় সাত গম্বুজ বলে মনে হয়। এর কারণ হচ্ছে বুরুজগুলোর শীর্ষদেশ এমনভাবে তৈরি যে দেখে মনে হবে এগুলো এক-একটি গম্বুজ।

মোহাম্মদ আলমগীর 'ঐতিহাসিক সাত মসজিদ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে যা 'ইতিহাস' পত্রিকায় (১-৩য় সংখ্যা, চতুবিংশ বর্ষ, ১৩৯৭) প্রকাশিত হয়, এ ইমারতের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে গুরুত্ব নিরূপণের চেষ্টা করেন। তার বহুপূর্বে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রাডলি বার্ট এ মসজিদের উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেন- "It is a picturesque building, standing alone on the bank and framed against the low marshland. Its seven

exquisitely proportioned domes outlined against the sky. On the centre are the three large domes, flanked at the four corners of the mosque by the four smaller ones, each crowning an octagonal tower." "একটি জলাশয়ের পাশে নিঃসঙ্গভাবে প্রতিবিম্ব হয়ে এই অনিন্দ্যসুন্দর ইমারতটি দাঁড়িয়ে আছে এবং এর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সাতটি গম্বুজ আকাশের সাথে দিগন্ত প্রসারিত হয়ে উপরে উঠে গেছে। মধ্যভাগে বৃহত্তর গম্বুজবিশিষ্ট মূল তিনটি গম্বুজ এবং এর চার কোনায় আটকোনাকার একই ধরনের চারটি ক্ষুদ্রাকৃতি গম্বুজ দেখা যাবে।" আলমগীর এ মসজিদটির উপর যে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ রচনা করেন তা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যায়, "মসজিদ এলাকা সংলগ্ন পূর্বদিকের রাস্তা ও তৎপার্শ্ববর্তী উচ্চভূমি থেকে প্রায় ৭/৮ ফুট নিম্নে ঢালু এলাকায় অবস্থিত হলেও আশেপাশের নিম্নভূমি থেকে মসজিদের ভিত সম্বলিত প্লাটফরম বেদীটি প্রায় ৮/১০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট। উত্তোলিত এই মঞ্চের উপর উত্তর-দক্ষিণে লম্বা আয়তাকার মসজিদটির বহির্দিকের দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ৫৭ ফুট এবং পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিটি দেয়ালের মাঝখানে সরু অংশের বেধ (ব্যাস) ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি এবং উত্তর-দক্ষিণের প্রতিটি দেয়ালের বেধ ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি। এর ফলে অভ্যন্তরীণভাবে নামাজগৃহের পরিমাপ দাঁড়িয়েছে ৪৭ ফুট ৬ ইঞ্চি × ১৬ ফুট ৬ ইঞ্চি। মসজিদের চার কোনায় চারটি অষ্টকোণাকার টাওয়ার আছে। ১২ ফুট ৪ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট টাওয়ারগুলির অভ্যন্তরভাগ ফাঁপা ও দ্বিতল কক্ষবিশিষ্ট। পূর্ব দেয়ালের তিনটি প্রবেশদ্বার বরাবরে পশ্চিম দেয়ালে তিনটি অবতল মিহরাব রয়েছে। মুঘল বাংলার প্রচলিত স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মসজিদটির নামাজগৃহ তিনটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত এবং মাঝের গম্বুজটা আনুপাতিকহারে উভয় পার্শ্বের গম্বুজ দু'টির চেয়ে বড়। উল্লেখ্য যে, মসজিদের চারকোনায় অবস্থিত চারটি ফাঁপা দ্বিতল টাওয়ারের উপর আরও চারটি চিত্তাকর্ষক গম্বুজ রয়েছে এবং সেগুলো নামাজগৃহের উপরকার গম্বুজগুলির সাথে সুসমন্বয়সাধন করেছে। এখানে সুদৃশ্য গম্বুজের এক সমারোহ সৃষ্টি করেছে। নামাজগৃহের উপর তিনটি এবং টাওয়ারগুলির উপর চারটি মিলে সর্বমোট সাতটি গম্বুজের কারণে মসজিদটির নামাকরণ হয়েছে সাতগম্বুজ মসজিদ।"

তথাকথিত সাত গম্বুজ মসজিদটির সম্মুখে চত্বর দেখা যাবে এবং চত্বরে পূর্বদিকে প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে কয়েকটি ধাপবিশিষ্ট উঁচু প্লাটফর্ম নির্মিত হচ্ছে। এটি অনেকটা মিমবারের মতো। উঁচু প্লাটফর্মটি সম্বন্ধে মোহাম্মদ আলমগীর বলেন যে, "খাঁজকাটা খিলানসমৃদ্ধ এই প্লাটফর্মটি পরে নির্মিত হয়েছে যা সঠিক। কারণ এর সাথে মূল মসজিদ স্থাপত্যরীতির সামঞ্জস্য নেই। সম্ভবত এটি আজান দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য যে, বাগেরহাটের তথাকথিত ষাইট গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের পূর্বদিকের ফাঁপা কৌণিক টাওয়ার থেকে আজান দেওয়া হত।" আলমগীর টাওয়ারগুলোকে মিনার বলে অভিহিত করলেও মিনার বলতে আমরা যা বুঝি সে অর্থে এটিকে মিনার বলা যাবে না। কারণ কুতুব মিনার, ফিরোজা মিনার বা গজনীর মিনারের মতো সুউচ্চ, নিচু থেকে উপরের

দিকে সরু হয়ে গঠিত আজান প্রদানের স্থান এটি ছিল না। মূলত বাংলার স্থাপত্যকলায় মিনারের ব্যবহার খুবই বিরল। গৌড়ের ফিরোজা মিনার এবং ছোট পাণ্ডুয়ার মিনার বাদে অপর কোনো মিনার বাংলায় সুলতানী অথবা মুঘল আমলে নির্মিত হয়নি। তথাকথিত সাত গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদেব কৌণিক বুরুজগুলো খুবই বড় আকারের। মোহাম্মদ আলমগীরের ভাষায়, "সাত মসজিদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর চারকোনায় চারটি সুদৃশ্য টাওয়ারের ব্যবস্থাপনা। অভ্যন্তরীণভাবে ফাঁপা দ্বিতল গম্বুজ আচ্ছাদিত ও অষ্টকোণাকার টাওয়ার। সমসাময়িক বাংলার মুঘল স্থাপত্যে তো দূরের কথা সুলতানী আমলেও এদেশে খুঁজে পাওয়া যায় না।" মোহাম্মদ আলমগীর অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু বাগেরহাটের তথাকথিত ষাইট গম্বুজের কৌণিক টাওয়ারের সাথে ঢাকার তথাকথিত সাত গম্বুজের যে সাদৃশ্য রয়েছে সেকথা এড়িয়ে গেছেন। দৃশ্যত উভয় ক্ষেত্রে টাওয়ার দ্বিতল, মৌল্ডিং দ্বারা বিভক্ত, ফাঁপা শীর্ষদেশ গম্বুজাকৃতির ও খিলানসমৃদ্ধ। উভয় ক্ষেত্রে সিঁড়ি রয়েছে যার সাহায্যে দ্বিতলে যাওয়া যায়। শুধুমাত্র প্রভেদ এখানে যে বাগেরহাটের দৃষ্টান্তে প্রথম তলায় কোনো খিলান বা জানালা নেই। ঢাকার দৃষ্টান্তে খিলান জানালা দেখা যাবে। দ্বিতীয় প্রভেদ বাগেরহাটের দৃষ্টান্তে টাওয়ার গোলাকার এবং ঢাকারগুলো আটকোনাকৃতি।

পূর্ব দেয়ালে যে তিনটি খাঁজকাটা খিলান রয়েছে তার মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। মধ্যভাগের প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং সামনের দিকে সামান্য উদ্গত। এর দুই পাশ সরু pinnacle শোভা পাচ্ছে, যা ছাদ অতিক্রম করে উপরে উঠে গেছে। পুরু দেয়ালের মধ্যে চৌকেন্দ্রিক পত্রাকার ছুঁচাল খিলান সহযোগে প্রবেশদ্বারগুলো তৈরি। ভিতরের দরজার ফ্রেম বা চৌকাঠের উপর থেকে খিলানের ভিতরের অংশ ঢালুভাবে দরজার দিকে পূরণ হয়ে এসে যেখানে অর্ধগম্বুজাকৃতির রূপ নিয়েছে। পূর্বদিকের ফাসাদ বা সম্মুখভাগ নামকরণ প্যানেল ও কুলুঙ্গি নকশা দ্বারা অলঙ্কৃত। উপরিভাগে কার্নিশ ও প্যারাপেট দেখা যাবে, যা সমান্তরাল বক্রাকার নয়। উল্লেখ্য যে, এখানে সুলতানী আমলের অলঙ্করণ কীর্তি অর্থাৎ পোড়ামাটি নকশা ব্যবহৃত হয়নি। প্লাস্টার কেটে মোটিভ তৈরি করা হয়েছে।

খিলানপথ দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মিহরাবের দিকে যাওয়া যায়। এখানে এক অপূর্ব স্থাপত্যশৈলী দেখা যাবে। নামাজকক্ষটির আয়তন ৪৭′ – ৬″ × ১৬′ – ১৬′। অভ্যন্তরে পূর্ব দেয়াল থেকে পশ্চিম দেয়াল পর্যন্ত আড়াআড়িভাবে দু'টি খিলান তৈরি করা হয়েছে, যা কিবলাপ্রাচীরে শেষ হয়েছে। দু'টি খিলান অভ্যন্তরকে তিনটি অংশে বিভক্ত করেছে। মধ্যবর্তী অংশ পার্শ্ববর্তী অংশ দু'টি অপেক্ষা বড়। খিলানগুলো চৌকেন্দ্রিক ছুঁচাল বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এ ধরনের খিলানের প্রথম ব্যবহার (lateral arch) দেখা যায় হাজী খাওয়াজা শাহবাজের মসজিদে। কোনায় পানদানতিভের মাধ্যমে গম্বুজ

নির্মিত হয়েছে। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃত মিহরাব রয়েছে। ৫$\frac{১}{২}$ ফুট পুরু দেয়ালের মধ্যে চৌকেন্দ্রিক খিলান দিয়ে কুলুঙ্গির আকারে মিহরাবগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে। মধ্যবর্তী মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড়। মিহরাবের উপরিভাগে অর্ধগম্বুজাকৃতি (alcove) শোভা পাচ্ছে। মিহরাবগুলো আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ।

কিবলাপ্রাচীরে প্যানেল ও কুলুঙ্গি নকশা শোভা পাচ্ছে। তথাকথিত সাত গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের অভ্যন্তরে একটি মিমবার স্থাপন করা হয়, যা কেন্দ্রীয় মিহরাবের পাশে অবস্থিত। প্লাস্টার করা সাদামাটা মিহরাবটি ইট দিয়ে তৈরি যেমন সমগ্র ইমারতটি নির্মিত হয়েছে। মিমবারটি দুই ধাপবিশিষ্ট। এখানে দাঁড়িয়ে ইমাম খোদবা পাঠ করেন।

তথাকথিত সাত গম্বুজ মসজিদটির বহির্দিকে প্রধান আকর্ষণ তিনটি গম্বুজ যা মসজিদকে আচ্ছাদিত করেছে। কেন্দ্রীয় গম্বুজটি পার্শ্ববর্তী গম্বুজ দুটি অপেক্ষা বড় এবং তিনটি গম্বুজই বাল্বের আকৃতি, যা মুঘল রীতির পরিচায়ক। আটকোনাকার ড্রামের উপর স্থাপিত গম্বুজগুলোর শীর্ষে কলসাকৃতি চূড়া দেখা যাবে যা পদ্মপাতার ভিত (lotus petal base) থেকে উপরে উঠে গেছে। ড্রামগুলোতে মার্লন শোভা পাচ্ছে। বর্তমাজা মসজিদটিতে কোনো শিলালিপি না থাকলেও এটি যে শায়েস্তা খানের আমলের তিনগম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদ তা এক নজর দেখলেই বোঝা যায়। গঠনশৈলী ও সৌকর্য অতি সুচারুরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। লালবাগের দুর্গ মসজিদ, মিটফোর্ডে শায়েস্তা খানের তিনগম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ, চকবাজারের শাহী মসজিদের সঙ্গে মোহাম্মদপুরের এ মসজিদটি তুলনা করলে একথা প্রমাণিত হবে। নির্মাণকাল ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দ বলে দানী উল্লেখ করেন।

৩৮। অজানা ব্যক্তির সমাধি, মোহাম্মদপুর, সপ্তদশ শতাব্দী

তথাকথিত সাতগম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের প্রায় ১০০ গজ পূর্ব-উত্তর দিকে একটি সমাধি বহুদিন জরাজীর্ণ অবস্থায় কালের সাক্ষী হিসাবে দেখা যেত। বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এটিকে সংরক্ষিত ইমারতের তালিকাভুক্ত করেছে যা সংস্কার করে সংরক্ষিত। পার্শ্ববর্তী ভূমি থেকে বেশ উন্নত একটি ভূখণ্ডে অবস্থিত সৌধটির ছাদ বহু পূর্বে ধসে পড়ে। দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তর দেয়ালও অক্ষত ছিল না। যাহোক, ইমারতটি এমনভাবে সংস্কার করা হয়েছে যে এর মৌলিক উপাদানগুলো বিনষ্ট হয়েছে।

এ ইমারতটি যে সমাধি তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ অভ্যন্তরে শবাধার রয়েছে। সমাধিটির বর্ণনা দিতে গিয়ে মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেন, "উঁচু বর্গাকারে নির্মিত এই ইমারতের প্রত্যেক বাহু বাইরের দিকে ছিল ২৯$\frac{১}{২}$ ফুট লম্বা। দেয়ালগুলি ছিল বেশ পুরু। চার দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে অর্থাৎ দরজা ও মিহরাবের দু'পাশে দেয়ালের অংশবিশেষ ভিতর ও বাইরের দিকে জ্যামিতিক মাপে উদ্গাত (offset) ছিল। দক্ষিণ দেয়ালে ছিল মাজারের একমাত্র প্রবেশপথ। প্রবেশপথে কালো পাথরেব ফ্রেম (চৌকাঠ) ছিল বলে জানা গেছে। কিন্তু এখন সেগুলি নেই। ধনুকাকৃতির খিলানযুক্ত প্রবেশপথের

উপরিভাগ ছিল খাঁজকাটা। দরজার পার্শ্ববর্তী দেয়াল ছিল বর্গাকৃতির প্যানেল দ্বারা অত্যন্ত মনোরমভাবে অলঙ্কৃত। পূর্ব ও উত্তর দিকের প্রবেশপথ দু'টি সাদা মার্বেল পাথরের জালি দ্বারা বন্ধ ছিল। এখন সেগুলি নেই। পশ্চিম দেয়ালে যে একটি মিহরাব ছিল তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমারতের উপরে ছিল চৌচালা ঘরের চালের মধ্যে পাকা ছাদ, যা বর্তমাজা (১৯৭৩) নেই (পুনঃনির্মিত হয়েছে)। কেউ কেউ বলেন যে, উপরে গম্বুজ ছিল। কিন্তু ইমারতের ধ্বংসাবশেষটি ভাল করে নিরীক্ষণ করলে অতি সহজেই বোঝা যায় যে, সেখানে গম্বুজ নয়, চৌচালা ঘরের চালের মতো ছাদ ছিল।"

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মকর্তা আব্দুল কাদের একটি প্রবন্ধে "Conservation and Restoration : Historic Dhaka : its future proposals and limitations in 'Architectural conservation" Bangladesh : -এ বলেন, "This tomb structure long remained uncared for and became covered with jungle growth. It was in an advance stage of disintegration and it flat roof built on coping arches collapsed. It was protected recently in 1984 and was cleared of its tangled grass and vegetation : it collapsed roof and damaged parts have been repaired and restored, keeping in view the original feature of its decorations." বঙ্গানুবাদ ঃ "সমাধিসৌধটি বহুদিন অরক্ষিত ও অবহেলিত ছিল এবং জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। এটি ভেঙে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল এবং এতে খিলান দ্বারা নির্মিত সমান্তরাল ছাদটি বহু পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এটি ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে সংরক্ষিত ইমারতের তালিকাভুক্ত হয় এবং এ থেকে জঙ্গল, আগাছা ও গজিয়ে ওঠা ঘাস পরিষ্কার করা হয়। এর ধসে যাওয়া ছাদ এবং ভগ্নপ্রাপ্ত অংশগুলো মৌলিক উপাদানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংস্কার ও পুনঃনির্মিত হয়।"

অজানা ব্যক্তির সমাধি প্রসঙ্গে নানাবিধ মত প্রচলিত রয়েছে। আওলাদ হাসান বলেন যে, এখানে গুলজার বিবি ও বেগম বিবি নামে শায়েস্তা খানের দু'জন কন্যার সমাধি ছিল। তৈফুর বলেন, "A little off from the mosque (so called Sath Gumbad Mosque) there was a one domed Muqbera said to be that of Shaista Khan's daughter. Inside the muqbera there was marble 'Jelousi.' (seat surrounded by railings for prayers). The muqbera and jelousi have now disappered. Only the bare tomb remains on open ground". অর্থাৎ, "মসজিদের তথাকথিত সাত গম্বুজ অদূরে এক গম্বুজবিশিষ্ট মাকবরা দেখা যাবে যা, শায়েস্তা খানের কোনো এক কন্যার বলে মনে হয়। সমাধির অভ্যন্তরে মার্বেলের জালি শবাধারের চারিদিকে বেষ্টনির আকারে ছিল, যেখানে দাঁড়িয়ে দোয়া পড়া হত। মাকবরা এবং মার্বেল জালি বহুদিন পূর্বে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কেবলমাত্র খোলা মাঠে শবাধার রয়েছে।"

অজানা সমাধিটি কার তা সঠিক করে বলা না গেলেও সমসাময়িক লাডলী বেগম, বিবি পরী ও নারায়ণগঞ্জে বিবি মরিয়মের বলে আওলাদ হাসান মন্তব্য করেছেন।

তৈফুরও এ মতের সমর্থক। কিন্তু এক স্থানে দু'জনের শবাধার থাকা অস্বাভাবিক; তা ছাড়া গুলজার বিবি অথবা বেগম বিবি নামে শায়েস্তা খানের কোনো কন্যা ছিল কি না সঠিকভাবে জানা যায় না। ঢাকা অথবা পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে সমস্ত সমাধি শায়েস্তা খানের কন্যার বলে চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে বিবি পরী, বিবি মরিয়ম (নারায়ণগঞ্জ), লাডলী বেগম (অধুনালুপ্ত), শামসাদ বেগম (বিবি পরীর অভ্যন্তরে) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাহোক, অজানা সমাধিটি সম্ভবত তাঁর কোনো কন্যার হতে পারে বলে আবদুল কাদেরও মন্তব্য করেন, অপরদিকে আ. ক. ম. যাকারিয়া মত প্রকাশ করেন যে, সমাধিসৌধের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত পাকা কবরটি অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় এখনও টিকে আছে। কবরের উপরে আছে তার চেয়ে জীর্ণ একটি কাপড়ের গিলাপ। এগুলোর চেয়েও জীর্ণ অবস্থায় পশ্চিমদেশীয় একটি খাদেম পরিবার মাজারের তত্ত্বাবআজা এখনও (১৯৭৮ খ্রিঃ) নিয়োজিত আছেন। তাঁরা বলেন যে, এখানে এক বুজুর্গ পীরসাহেবের কবর আছে এবং তিনি জিন্দাপীর। অন্যদিকে তিনি ভিন্নমত পোষণ করে বলেন যে বাংলার সুবাদার নবাব শায়েস্তা খানের কোনো এক কন্যার মাজার এটি বলে পণ্ডিতদের অভিমত। এ মাজার যে সাত গম্বুজ মসজিদের প্রায় সমসাময়িক তাতে বোধহয় কোনো সন্দেহ নেই।

অজানা ব্যক্তির সমাধি কিভাবে আচ্ছাদিত ছিল তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ গবেষক—দানী, যাকারিয়া, কাদের, আসমা সিরাজউদ্দিন বলেন যে, এটিতে প্যাভেলিয়ন ধরনের ছাদ ছিল। আসমা সিরাজউদ্দিন (প্রাপ্তি) বলেন, "Among the Mughal tombs at Dhaka those belonging to the (Canopy) type are tombs of Bibi Champa, unknown Tomb near Satgumbad Masjid and Chishti Bihishti. The last two had segmented roofs and were not domed like the first two". অর্থাৎ "মুঘল সমাধি-সৌধের মধ্যে যেগুলো প্রথম শ্রেণীর (ক্যানোপি) অন্তর্ভূক্ত সেগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিবি (চম্পা), সাত মসজিদের সন্নিকটে অজানা সমাধি এবং চিশতী বিহিস্তী। শেষের দুটি ইমারতে ভল্টের মতো ভাঁজকরা ছাদ ছিল এবং প্রথম দুটির মতো গম্বুজ দ্বারা আবৃত ছিল না।" অন্য দিকে এস. এম. তৈফুর স্পষ্টভাবে বলেন, "A little off from the Mosque (so-called Sat Gumbad) there was a one-domed muqbera said to be that of Shaesta Khan's daughter" যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ভগ্নাবস্থায় যখন অজানা সমাধির নকশা তৈরি করে, যা দানীর Muslim Architecture in Bengal-এ সংযোজিত হয়েছে, তাতে ভগ্নপ্রাপ্ত ছাদের অংশে ভল্টের রেখা দিয়ে নকশা করা হয়েছে। আব্দুল কাদের যিনি সংরক্ষণ ও পুনঃনির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন, বলেন যে, চারপাশ আটকোনাকার অংশ ছিল এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত ছাদের স্লাব পাওয়া গেছে। এজন্য ভল্ট বা ক্যানোপি বা প্যাভেলিয়ন হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এ মন্তব্য সঠিক নয় কারণ শায়েস্তাখানী আমলে নির্মিত এক গম্বুজবিশিষ্ট সমাধিসৌধের, যেমন অধুনালুপ্ত লাডলী বেগম (ডি' ওয়েলির স্কেচ দ্রষ্টব্য) এবং বিবি মরিয়ম এবং বিবি চম্পার সমাধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ অজানা সমাধিটি নির্মিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত,

কাদের ছাদের যে অষ্টকোণাকার অংশের কথা বলছেন আসলে সেটি ড্রাম, যার উপর থেকে গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। তৃতীয়ত, অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে চার কোনায় মিহরাবের আকৃতিতে স্কুইঞ্চের ব্যবহার দেখা যায়, যা গম্বুজ নির্মাণে সাহায্য করেছে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খেয়ালখুশিমতো এটির ছাদ ফ্লাট ভল্টের সাহায্যে পুনঃনির্মাণ করেছে।

অজানা সমাধির অপর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কষ্টিপাথরের উপর ভিত, যা শায়েস্তা খানী ইমারতে দেখা যায়। এ সমাধিসৌধে বিবি পরীর সমাধিতে ব্যবহৃত পাথরের জালির মতো কাটা জালি (Jelousi), ‰ তৈফুরের ভাষায়, ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে এগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

৩৯। মালিক পীর ইয়েমেনীর সমাধি ও মসজিদ, ১৪৭৫ খ্রিঃ/উনবিংশ শতাব্দী

মোশাররফ হোসেন ভুঁইয়ার বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায় (ত্রয়োদশ সংখ্যা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, জানু-ডিসেম্বর, ১৯৯৫) প্রকাশিত 'ঢাকা নগরীর সুফী সাধক ও তাঁদের মাজার' শীর্ষক প্রবন্ধে ঢাকা নগরীতে সমাহিত কয়েকজন বুজুর্গ-পীর, ওলী, দরবেশদের উল্লেখ করেন। কিন্তু যিনি এক্ষেত্রে গবেষণাধর্মী ও তথ্যবহুল গ্রন্থ রচনা করেন তিনি হচ্ছেন হাকিম হাবিবুর রহমান। তিনি তাঁর 'আসুদগান-ই ঢাকা' শীর্ষক গ্রন্থে ঢাকায় সমাহিত অসংখ্য পীর-ওলী-আওলিয়া, ইসলামপ্রচারক, সুফীসাধকদের সম্বন্ধে তথ্যবহুল বিবরণ দেন।

হাকিম হাবিবুর রহমান শাহ মালেক পীর সম্বন্ধে বলেন, "উক্ত মাজারটি পল্টনের একটি বিরাট চৌহদ্দির মধ্য অবস্থিত, যার স্থাপনকাল ৬০ বছরের বেশি হবে না। বর্তমান মাজারটির গম্বুজ চীনামাটির পাথর (মিনাকরা টালি) দ্বারা সুসজ্জিত। গম্বুজটি নির্মাণ করেন মরহুম কাজী রফিউদ্দিন। আর উহার সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করেছিলেন নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ। আগে মাজারটি ছিল একটি পিপল গাছ সংলগ্ন। কিন্তু এখন সেই পিপল গাছটি আর নেই। আগে লোকেরা এ এলাকাটিকে দৈত্য দানবের বাগান বলতো। তারা রাতের বেলায় জ্বিন-ভূতের ভয়ে এদিকে আসতো না। এ গম্বুজটি নির্মিত হয়েছে ১৯০৯ সালে। ১৮৮৪ সালে প্রথম রেলগাড়ির প্রচলন হলে রেলওয়ে কোম্পানী সম্পূর্ণ আবাসিক এলাকাটি উচ্ছেদ করে দেয়। ফলে এখানে একটি নিরিবিলি পরিবেশ গড়ে ওঠে। তারপর অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে গেলে হঠাৎ আসামের মণিপুর রাজ-বংশের জনৈক ব্যক্তি এখানে এসে মুসলমান হয়ে যায়। তিনি নওয়াব আহসানুল্লাহ মরহুমের সাহায্যে একটি বিরাট জায়গায় দেয়াল বেষ্টন করে দিয়ে তথায় নিজের আবাস নির্মাণ করেন। সে সঙ্গে তৈরি করেন একটি মসজিদ। তিনি ফকীর রাজা নামে পরিচিত। এখানেই তিনি সংসারী হলেন কিন্তু তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। তাঁর স্ত্রীর প্রথম স্বামীর একটি পুত্র ছিল। সেও থাকত এখানে। তাঁর সময় এ স্থানটি বেশ জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। তিনি দর্শনার্থীদের খুব সম্মান করতেন বিধায় প্রচুর লোকের সমাগম হতো।"

'সোহায়েল-ইয়েমেনী' গ্রন্থে লেখা আছে যে, হযরত মালেক পীর ফকির রাজা হযরত শাহ জালাল মুজাররাদে ইয়ামনীর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি যখন সিলেট গমন

করেন তখন শাহ মালেক তবলিগের উদ্দেশ্যে তথায় থেকে যান এবং শাহ জালালের মৃত্যুর পর পুনরায় এখানে চলে আসেন ও স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

"হযরত শাহ জালাল মুজাররাদে ইয়েমেনী বলে যাকে আখ্যায়িত করা হয় তার সম্পর্কে অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি ইয়ামনের অধিবাসী ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন তাবরীজের অধিবাসী। যাই হোক যদি মালেক শাহ ও শাহ জালালের সমসাময়িক হওয়া সত্য হয় তবে উক্ত মাজারটি বাংলাদেশে সর্বাধিক পুরাতন বলে ধরতে হবে। কারণ তার ইন্তেকাল হয়েছিল ৬৪২ হিজরী সালে এবং উহা বাংলাদেশের সর্বপ্রথম বুজুর্গের মাজার।"

আবদুল মান্নান তালেব তাঁর 'বাংলাদেশে ইসলাম' গ্রন্থে শাহ মালেক পীর ইয়েমেনী প্রসঙ্গে হাকিম হাবিবুর রহমান প্রদত্ত তথ্য সমর্থন করে বলেন যে, তিনি শাহ জালালের সাথে বাংলাদেশে আসেন এবং শাহ জালাল ঢাকা অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের জন্য সেখানে পাঠান। ঢাকার সেক্রেটারিয়েট এলাকায় যেখানে তাঁর সমাধি রয়েছে তখন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল এবং তিনি বসতি স্থাপন করে কেরামতির সাহায্যে অমুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।" সর্বশেষে মোশাররফ হোসেন ভুঁইয়া বলেন যে, "শাহ মালেক ও শাহ বলখীর (বগুড়ায় তাঁর মাজার অবস্থিত) ১০০ জন খাস শিষ্য ছিলেন। তাঁদেরকে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করে ধর্মপ্রচারকল্পে বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করা হতো। প্রতিদিন দলগুলো তাঁদের দ্বারা দীক্ষিত নও-মুসলিমদের তালিকাসহ কার্যক্রমের রিপোর্ট পেশ করতেন। এরূপে সুপরিকল্পিতভাবে কাজের ফলে ধর্মান্তরের হিড়িক পড়ে যায় এবং এতদঞ্চলে মুসলিম শাসনের ভিত রচিত হতে থাকে।"

ঢাকার জিরো পয়েন্ট থেকে সেক্রেটারিয়েটের ১ নম্বর গেটের দিকে যে প্রশস্ত সড়কটি চলে গেছে তার পূর্ব পাশে আটকোনাকৃতি একগম্বুজবিশিষ্ট মাজার লক্ষ করা যায়। বর্তমান ওসমানী উদ্যানের উত্তর-পূর্ব কোণে মালেক পীর ইয়েমেনীর মাজার ও মসজিদ কমপ্লেক্স অবস্থিত। মালেক পীর ইয়েমেনী সম্ভবত সুলতান আলাউদ্দীন খলজীর শাসনামলে (১২৯৬-১৩১৬ খ্রিঃ) বাংলাদেশে আসেন। তিনি চতুর্দশ শতাব্দীতে ইন্তেকাল করেন। অবশ্য বর্তমাজার সমাধিসৌধটি তাঁর শবাধারে অনেক পরে নির্মিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকার নবাবদের অর্থানুকূল্যে।

মোশাররফ হোসেন মাজার সম্বন্ধে বলেন, "পীর ইয়েমেনীর এ সমাধিটির একটি বিশিষ্ট্য হল এই যে, এটিই ঢাকা নগরীর একমাত্র অষ্টভুজাকৃতি সমাধি, যা ভারতীয় মুসলিম সমাধিস্থাপত্যের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী বৈশিষ্ট্য। এর সুন্দর গম্বুজটি অভ্যন্তরে পানদানতিফের উপর নির্মিত। গম্বুজ ও দেয়ালের বহির্ভাগ এবং ইমারতের মেঝে রংবেরঙের টালি দ্বারা মোজাইককৃত। অভ্যন্তরভাগ প্লাস্টারের উপর চুনকাম করা। অষ্টভুজের একেকটি বাহুর পরিমাণ প্রায় ৬ ফুট। গম্বুজটির উপর একটি কলসচূড়া, যার শিরোভাগে রয়েছে ক্রিসেন্ট (একফালি চাঁদ)। ভূমি থেকে গম্বুজের ক্রিসেন্ট পর্যন্ত উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুট। পূর্বদিক থেকে খিলানাকৃতি প্রবেশতোরণ পার হয়ে সমতল ছাদ আচ্ছাদিত এবং পাশে উন্মুক্ত একটি করিডর বা গলিপথ দিয়ে মাজারের ভিতর যেতে

হয়। বাড়িঘর পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঁচু প্লাটফর্মের মাঝখানেই লাল সবুজ গিলাফাবৃত কবর গাহ।"

মালেক পীর ইয়েমেনীর সমাধির প্রধান আকর্ষণ 'চিনি টিকরী'র অলঙ্করণ। চীনা মাটির তৈজসপত্র ভেঙে চাতুর্যের সাথে বসিয়ে বিভিন্ন মোটিভ সৃষ্টি করা হয়, যেমন কশাইটুলী বা তারা মসজিদে করা হয়েছে। আটভুজাকৃতি ইমারতটির বাইরের প্রাচীর এরূপ 'চিনি টিকরী' দিয়ে আবৃত। প্যারাপেট এবং আট কোনার ক্ষুদ্রাকৃতি টারেটগুলো এবং বাল্বের আকৃতির গম্বুজটিও অনুরূপভাবে অলঙ্কৃত। উনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকার নবাব আহসানউল্লাহ নির্মাণকাজ শুরু করলেও নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ১৯০৯-এ কাজ সমাপ্ত করেন এবং যিনি প্রধান স্থপতির দায়িত্ব পালন করেন তিনি হচ্ছেন কাজি রফিউদ্দীন।

বর্তমান গুলিস্তানের পীর ইয়েমেনী মার্কেটের পিছনে যে মসজিদটি দেখা যাবে তাই পীর ইয়েমেনের মসজিদ নামে পরিচিত। এ মসজিদটির তিনটি অংশ খুবই সুস্পষ্ট। মধ্যভাগে কেন্দ্রীয় মিহরাবের সম্মুখে যে স্থানটি রয়েছে তা গম্বুজ দ্বারা আবৃত যার সাথে মালেক পীর ইয়েমেনীর মাজারের গম্বুজের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। এর দুই পাশে চৌচালা ভল্ট দ্বারা আবৃত নামাজস্থান। গম্বুজ ও চৌচালা দুটি 'চিনি টিকরী' দ্বারা আচ্ছাদিত। লক্ষণীয় যে চৌচালার ছাদে অর্থাৎ মিলনস্থানে (Intersection) তিনটি করে শিকারা বা চূড়া রয়েছে। তারা মসজিদ যে তারা মটিভ দেখা যায় গম্বুজ ও চৌচালা ছাদেও সেরূপ দেখা যাবে। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃত খাঁজকাটা খিলানসম্বলিত মিহরাব দেখা যাবে। গম্বুজ স্কুইঞ্চের সাহায্যে নির্মিত।"

৪০। শাহ জালাল দাক্ষিণীর মাজার, ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দ উনবিংশ শতাব্দী

আহমদ হাসান দানী বলেন, "কিংবদন্তি অনুযায়ী সাধক সুফী শাহ জালাল দাক্ষিণী ঢাকার গভর্নরের বাসভবনের (বর্তমানে প্রেসিডেন্টের বাসভবন বা বঙ্গভবন) অভ্যন্তরে শায়িত আছেন, যদিও বর্তমাজার ইমারতই অতি আধুনিক। শাহ জালাল শাহ পিয়ারার শিষ্য ছিলেন। তিনি দক্ষিণ ভারত বা দাক্ষিণাত্য থেকে বাংলায় এসে ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করেন। গৌড়ের সুলতান তাঁর অসামান্য প্রভাবে ঈর্ষান্বিত হয়ে ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে হত্যা করেন। হাকিম হাবিবুর রহমান শাহ জালাল দাক্ষিণী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "ফকির চরিত, ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থাদিতে তাঁর বর্ণনা ভরপুর। তিনি হযরত পিয়ারার (রহঃ) বিশিষ্ট খলিফা ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিল গুজরাটি। তাঁর পীর হযরত পিয়ারা (রঃ) শাহ হযরত ইয়াদুল্লা শাহের মুরীদ ছিলেন এবং হযরত সৈয়দ শাহ গেসুদাক (রহঃ)-এর বিশ্বস্ত লোক ছিলেন।" তাঁর মাজার দাক্ষিণাত্যে বিদ্যমান আছে। অন্য এক স্থানে হাবিবুর রহমান বলেন, "ঢাকা থেকে হযরত শাহ জালালের ঘটনা এরূপ ছিল যে, তিনি স্বীয় মুরীদগণের সম্মুখে বাদশাহের ন্যায় উপবেশন করতেন আর মুরীদরা তার সামনে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। কাউকে শরীয়তের সামান্য বিরাধী দেখলে তিনি তৎক্ষণাৎ শাস্তি বিধান করতেন।

তখনকার বাদশাহের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাঁকে এরূপ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি বাদশাহের আদেশ মানতে রাজী হলেন না। অতঃপর রাজকীয় সিপাহীরা তার মুরীদগণের ওপর হামলা করল। যতক্ষণ মুরীদরা নিহত হচ্ছিলেন ততক্ষণ তিনি 'ইয়া কাহহারু', 'ইয়া কাহহারু' বলে চিৎকার করছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর ওপর তলোয়ার এসে পড়লো তখন তিনি 'ইয়া রাহমানু', 'ইয়া রাহমানু' বলতে বলতে শাহাদাত বরণ করেন। উক্ত ঘটনাটি ৮৮১ হিজরী সালে সংঘটিত হয়। 'খাদিয়াতুল আম্বিয়া' নামক গ্রন্থে এভাবে লেখা আছে : হযরত জালাল দাক্ষিণী (রহঃ)-এর মাজার খুব বিখ্যাত। সকলেই জানেন যে, তিনি মতিঝিলের একটি গম্বুজের নিচে সমাহিত রয়েছেন। কিন্তু এতে কলেমা তৈয়েবা লেখা ব্যতীত আর কিছুই নেই।" আবদুল মান্নান তালিব মন্তব্য করেন যে দক্ষিণ ভারতের গুজরাটের অধিবাসী ছিলেন হযরত শাহ জালাল দাক্ষিণী। তিনি মাওলানা আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী লিখিত 'আখবারুল আখাইয়ার' গ্রন্থের উল্লেখ করে বলেন যে, শাহ জালাল দাক্ষিণী উত্তর ভারতের প্রখ্যাত সুফীসাধক শায়খ সলীম চিশতীর বিখ্যাত বাঙালি শিষ্যের নিকট শিষ্যত্ব লাভ করেছেন যা পূর্বে বলা হয়েছে। মোহর আলী তাঁর History of the Muslims of Bengal, Riyadh, 1985 গ্রন্থে বলেন যে, হিজরী নবম শতাব্দী অর্থাৎ খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে শাহ জালাল দাক্ষিণী দলবলসহ ঢাকায় আসেন এবং ধর্মপ্রচার সুরু করেন। তিনি মতিঝিলে একগম্বুজবিশিষ্ট সমাধিতে সমাহিত। অবশ্য এটি সমসাময়িককালে নির্মিত হয়েছিল কি না জানা যায় না। দানী যথার্থই বলেন যে, প্রাক-মুঘল যুগের সাধক শাহ জালাল দাক্ষিণীর কবরের উপরিস্থিত ইমারতটি আধুনিককালে নির্মিত। মাজারের গায়ে কালিমা তৈয়েবা ছাড়া আর কিছুই প্রামাণ্য উপাদান নেই। শিলালিপির অভাবে কে কখন এ ইমারতটি নির্মাণ করেন তা সঠিকভাবে বলা যায় না। ঢাকার নবাব আবদুল গণি দিলখুশা ও মতিঝিলের বাগানবাড়িতে মাজারগুলো নির্মাণ ও সংস্কার করেন। এ থেকে ধারণা করা হয় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে শাহ জালাল দাক্ষিণীর মাজারটি নির্মিত হয়। তিনি শহীদ হয়েছিলেন বিধায় সমাধির সম্মুখে একটি উঁচু ধরনের প্লাটফরম নির্মিত হয় যেখানে সুফী-সাধক শাহ জালাল দাক্ষিণীর শিষ্যদের কতল করা হয়। এটি 'গঞ্জে-ই-শহীদান' নামে পরিচিত।

৪১। শাহ নেয়ামতউল্লাহ বুতশেকানের সমাধি, অষ্টাদশ শতাব্দী

হাকিম হাবিবুর রহমান বলেন, "তাঁর (শাহ নেয়ামতউল্লাহ (রঃ)) মাজার দিলকুশা গার্ডেনের পাকা একটি উঁচু ঢিবির ওপর মসজিদের পূর্ব পাশে অবস্থিত। মাঝের কবরটি তাঁর এবং পাশের কবর দুটি তাঁর দুই খলিফার। তিনি এখানেই থাকতেন। তাঁর সম্মুখ দিয়ে কোনো মূর্তি নিয়ে গেলে তাঁর ইশারায় উহা খণ্ডবিখণ্ড করা হতো (হয়ে যেত)! তাই তাঁকে 'ভূত' (প্রতিমা, বিগ্রহ) শেকান (ফার্সি শব্দ) বা ধ্বংসকারী নামেও আখ্যায়িত করা হয়।"

প্রতিমা বা বিগ্রহধ্বংসের বিচিত্র কাহিনী হাবিবুর রহমান তাঁর 'আসুদগান-ই ঢাকা'য় বর্ণনা দেন। তাঁর ভাষ্য, "পূর্ব দিকে একটি বিরাট আবাসিক এলাকা-পাণ্ডু নদীর

তীরবর্তী খিলগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখনো উহাকে খিলগাঁও বলা হয়। পাণ্ডু নদী অপেক্ষা গঙ্গা নদী হিন্দুদের নিকট অধিকতর পবিত্র বলে হিন্দুরা বুড়িগঙ্গাতেই মূর্তি বিসর্জন দিত। তাই মূর্তি নিয়ে যাবার সময় বাধ্য হয়ে তাদের শাহ সাহেবের সম্মুখ দিয়ে বুড়িগঙ্গাতে গমন করতে হতো। এখানে আগে থেকেই হিন্দুদের বসতি ছিল এবং এখনো আছে। তাই এখানে হিন্দুদের আবাদীর বহু নিদর্শন বিদ্যমান। .... হযরত ভূত শেকান সম্বন্ধে বর্ণনা রয়েছে যে, খিলগাঁ হতে হিন্দুরা দেব-দেবীর মূর্তি নিয়ে যাওয়ার পথে তার ইঙ্গিতে সেগুলোকে ভেঙে দেয়া হতো।"

উপরোক্ত ঘটনাবলীর পুনরুক্তি করে আব্দুল মান্নান তালেব বলেন, "যতদূর জানা যায় পূর্ববঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে শাহ নিয়ামতউল্লাহ ঢাকা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। তিনি কোথা থেকে আগমন করেছিলেন সে সম্পর্কে কোনো বিবরণ জানা যায় না। তবে প্রচলিত কিংবদন্তি থেকে অনুমিত হয় যে, মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই তিনি ঢাকা অঞ্চলে আগমন করেছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, 'কিংবদন্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি ঢাকা নগরী সন্নিহিত এলাকার ইসলাম প্রচারে অগ্রসর হলে স্থানীয় প্রভাবশালী হিন্দুরা নানাভাবে তাঁকে বাধা দিতে থাকে। একদিন তিনি ইবাদতে মশগুল ছিলেন, এমন সময় হিন্দুরা দেব মূর্তি নিয়ে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তারা প্রতিমা বিসর্জন দেবার জন্য শোভাযাত্রা নিয়ে যাচ্ছিল। দরবেশের আস্তানার নিকট এসে তারা বাদ্যের আওয়াজ বৃদ্ধি করে ভীষণ শোরগোলের সৃষ্টি করে। ফলে দরবেশের ইবাদতের বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তিনি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মূর্তিগুলোর প্রতি আঙ্গুলি নির্দেশ করেন। ফলে পথের উপর মূর্তিগুলো ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। শোভাযাত্রীরা ভীত হয়ে পলায়ন করে। এ অভাবনীয় দৃশ্যে হিন্দুদের মনে ভাবান্তর দেখা দেয়। এ ঘটনার পর দলে দলে হিন্দুরা তার আস্তানায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন বলে শোনা যায়।"

শাহ নেয়ামতউল্লাহর সাথে 'বুতশেকান' নামে যে শব্দটি সংযোগ করা হয়েছে তার দুটি অর্থ করা হয়েছে। প্রথমত, ভূত-প্রেত ধ্বংসকারী বা বিতাড়নকারী; দ্বিতীয়ত, মূর্তি প্রতিমা বা বিগ্রহ ধ্বংসকারী। শেষোক্ত প্রসঙ্গে সুলতান মাহমুদকে মিথ্যা করে হিন্দু ঐতিহাসিকগণ বুতশেকান বা 'মূর্তিভঙ্গকারী' বলে অভিহিত করেন। বিশেষ করে বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির ধ্বংসের পর। যাহোক, সুফী দরবেশ ওয়ালী আল্লার অলৌকিক কেরামতি সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তি রয়েছে এবং শাহ নেয়ামতউল্লাহর ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

শাহ নেয়ামতউল্লাহ কখন বাংলা মুলুকে আগমন করেন তা নিয়ে মতবিরোধ নেই। কারণ তিনি নিঃসন্দেহে প্রাক-মুঘল যুগে বাংলায় ধর্মপ্রচারে আসেন এবং ঢাকার দিলকুশা মহল্লায় বসবাস করে ইসলামের সেবায় ব্রতী হন। হাবিবা খাতুন বলেন, "The earliest Muslim habitation in Dhaka at Narinda is testified by the existence of the Mosque of Binat, dated 1456 A.D., which the extension of the area towards north is also proved by the existence of

the tomb and mosque of Shah Niamat Allah Butshekin of Dilkhusa." অর্থাৎ, "ঢাকার নারিন্দায় সর্বপ্রাচীন মুসলিম বসতির প্রমাণ পাওয়া যায় ১৪৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিনত (বিবি) মসজিদ প্রতিষ্ঠা থেকে এবং উত্তরদিকে সম্প্রসারিত এলাকায় বর্তমান দিলকুশায় শাহ নেয়ামতউল্লাহর সমাধি এবং মসজিদের নির্মাণ থেকে।" হাবিবা খাতুনের মতে নেয়ামতউল্লাহও মিরপুরের শাহ আলী এবং মোহাম্মদপুরের শাহ লঙ্গরের মতো বাগদাদের একজন রাজকুমার ছিলেন। জাগতিক ঐশ্বর্য বিসর্জন দিয়ে তিনি ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা মুলুকে আসেন এবং ঢাকার দিলকুশা এলাকায় আস্তানা স্থাপন করেন।

দিলকুশা মসজিদের উত্তর-পূর্ব পার্শ্বে একটি উচ্চ প্লাটফর্মের উপর ছাদ-আচ্ছাদিত ইমারতের ভিতরে শাহ নেয়ামতুল্লাহ বুতশেকানের মাজার অবস্থিত। উল্লেখ্য যে, একই সারিতে তিনটি ধাপবিশিষ্ট শবাধার আছে। মধ্যবর্তী শবাধারটি নেয়ামতুল্লাহর এবং বাকি দু'টি তাঁর দু'জন খলিফার। হাবিবা খাতুন তাঁর 'Sonargaon' সন্দর্ভে উল্লেখ করেন যে, বর্তমান ইমারতটি নির্মাণকালে এখানে প্রাচীন এক গম্বুজবিশিষ্ট সমাধিসৌধ ছিল এবং তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতের দক্ষিণ ও পূর্বদিকের প্রবেশপথের চিহ্ন দেখেন। বর্তমাজা যে মাজারটি নির্মিত তা সমান্তরাল ছাদবিশিষ্ট একটি আধুনিক সৌধ।

৪২। মরিয়ম সালেহের মসজিদ, বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ

নিউ মার্কেটের পূর্বদিকে বলাকা সিনেমা হলের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাবুপুরা নীলক্ষেত মহল্লায় তিন গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার একটি মসজিদ দেখা যাবে। এর সংলগ্ন একটি মাজার আছে। সমাধিতে শাহ দেওয়ান ওরফে খলিলুর রহমান শায়িত রয়েছেন। তাঁর পুত্রের নাম আবদুল্লাহ এবং আবদুল্লাহর কন্যা মরিয়ম সালেহ বাবুপুরার মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদের সম্মুখভাগে প্রধান প্রবেশপথের উপর স্থাপিত একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, এ ইমারতটি হিজরী ১১১৮/ ১৭০৬-০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইট এবং প্লাস্টারের সাহায্যে নির্মিত মসজিদটি মুঘল স্থাপত্যরীতির পরিচায়ক। এটির সাথে লালবাগের দুর্গের তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের সাদৃশ্য রয়েছে।

মোহাম্মদ যাকারিয়া মসজিদটির নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দেন, "উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই মসজিদের আয়তন (ভিতরের দিকে) ৩৯ × ১৩ ফুট। চুন-সুরকির গাঁথনির সাহায্যে ইটের এ মসজিদের দেয়ালগুলি আস্তর করা। পূর্ব দেয়ালে আছে ৩টি প্রবেশপথ। এগুলি অর্ধগম্বুজাকৃতির খিলানযুক্ত। সামনের দেয়াল প্যানেল দ্বারা অলঙ্কৃত ও কেন্দ্রীয় অংশ বাইরের দিকে কিছুটা উদ্গত। দরজা বরাবর ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহরাব এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে দরজা আছে। চারকোণে ৪টি আটকোনাকৃতির মিনার বা টারেট আছে। এগুলি কার্নিশের উপরে গোলাকার এবং শীর্ষদেশ ছোট গম্বুজ দ্বারা শোভিত। ছাদের উপরে আছে ৩টি গম্বুজ। কেন্দ্রীয় গম্বুজ অন্য দু'টির চেয়ে বড়। হাল আমলে মসজিদে পূর্বদিকে একটি বারান্দা সংযোজন করা হয়েছে এবং এতে মসজিদের আদি সৌন্দার্য নষ্ট হয়েছে।"

৪৩। নিমতলী প্রাসাদ ও ফটক, ১৭৫৪- ৮৭ খ্রিস্টাব্দ

পুরাতন সেক্রেটারিয়েট সড়কে এবং বর্তমান এশিয়েটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ ভবনের পিছনে যে প্রাচীন ইমারতটি রয়েছে তাই নিমতলী প্রাসাদের ফটক নামে পরিচিত। প্রাচীন প্রাসাদটি বহু পূর্বে বিলীন হয়ে গেছে। ধারণা করা হয় যে, ব্রিটিশ আমলে লেঃ সুইনটনের তত্ত্বাবআজা এখানে ঢাকার নায়েব নাযিম জসরত খানের বাসস্থান হিসাবে নিমতলী প্রাসাদ নির্মিত হয়। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রাডলি বার্ট ধ্বংসপ্রাপ্ত নিমতলী প্রাসাদটির বর্ণনা করেন। ঢাকার মুসলমানদের সর্বশেষ জাঁকজমকপূর্ণ সমারোহ নিমতলী কুঠিতে অনুষ্ঠিত হত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন দেওয়ানী লাভ করল তখন ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে তারা নবাব জসরত খানকে বর্তমান কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থিত পুরাতন দুর্গ থেকে অপসারিত করেন। কিছুদিন তিনি বড় কাটরায় অবস্থায় করে। তিনি নিমতলী কুঠিতে তার পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস শুরু করেন। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বসবাস করার পর নিঃসন্তান অবস্থায় সর্বশেষে নবাব মৃত্যুবরণ করলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। অতঃপর তিন-চতুর্থাংশ শতাব্দী ধরে গৌরব ও ঐতিহ্যের সাথে নবাবদের বসবাসের পর নিমতলী কুঠি নিলাম করা হয় এবং ব্রিটিশ আমলে নির্মিত নবাবদের অনেক ইমারতই ভেঙে ফেলা হয়। বারদুয়ারী নামে পরিচিত (নিমতলী ফটক) একটি প্রশস্ত হলঘরসম্বলিত ফটকটি কালের স্বাক্ষর হয়ে এখনও টিকে আছে। ব্রাডলি বার্ট ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে বলেন, "It was here that the last of the Naib Nazims held their court and in imagination one can conjure up again the scene—the great pretensions, the effort at display, the pomp and ceremonial, the pathetic adherence to custom and tradition and hovering over all, unmistakable but indefinable, the spirit of a departed glory and lost cause." বঙ্গানুবাদ "এখানে (ঢাকার) নায়েব নাজিমদের সর্বশেষ সদস্যের দরবার অনুষ্ঠিত এবং হত। মানসপটে ভেসে আসে সেই সমস্ত জৌলুসপূর্ণ, শানশওকাতে ভরপুর অনুষ্ঠানাদি, প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী আচার ও রীতি, (যা একান্তভাবে মুঘল) যার আর কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট থাকল না।" ব্রাডলি বার্ট বিশেষ করে মোহররমের মিছিলের উল্লেখ করেন, যা নিমতলী কুঠি থেকে শুরু ও শেষ হত। বিশপ হেবারের ভাষ্য অনুযায়ী নওবতখানা ছিল, যেখান থেকে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হত। ঢাকার জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত যে কতিপয় মোহররমের চিত্র রয়েছে তা দেখলে সে সময়ের ঢাকার বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। এ সমস্তই নায়েব নাযিম জসরত খান এবং নসরত জঙ্গের পৃষ্ঠপোষকতায় করা হত।

সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর এবং আহমদ হাসান দানী নিমতলী কুঠি ও ফটকের উল্লেখ করেন। তৈফুর বলেন যে, তড়িঘড়ি করে লেঃ সুইনটন ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে নিমতলী প্রাসাদ ও ফটক নির্মাণ করেন এবং ঢাকার নায়েব-নাযিমগণ ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এখানে বসবাস করেন। এরপর ফটকটি ধ্বংস হতে রক্ষা পেলেও প্রাসাদটি ভেঙে ফেলা হয়।

এই ফটকের বাইরে নায়েব-নাযিমের গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য একটি ইংরেজ সেনাদল contingent সবসময় অবস্থান করত। তৈফুরের বর্ণনা থেকে জানা যায়, "A little reference to this building may be of some interest. This palace consisted of a number of separate buildings within a vast compound most of which are now extinct. Upon it imposing western gateway the Dhaka Museum office is situated at present . In a portion of the Baradari of the central building the museum exhibits are now kept. Visitors of the present High Court, the F. H. Hall and a part of the Ramna ground, will come across traces of some gardens aquariums and tanks which were within the palace exclosure. They will also observe a narrow water channel towards the north (now dried up) which formed part of elaborate human system. (Turkish Bath) of the palace. Its source of water supply came from the Kamalapur river in the east. The channel was sufficienthy wide and flowing in old days." বঙ্গানুবাদ ঃ "নিমতলী প্রাসাদ বা কুঠির বর্ণনা খুবই হৃদয়গ্রাহী। একটি খোলা চত্বরের অভ্যন্তরে কয়েকটি ভবন নিয়ে নিমতলী প্রাসাদ গঠিত ছিল, যা আর অবশিষ্ট নেই। কেবলমাত্র পশ্চিমদিকের সুউচ্চ ও চমৎকারভাবে নির্মিত ফটকটি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, যা বর্তমাজা ঢাকা জাদুঘরের দফতর (পরবর্তীকালে এশিয়েটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের দফতর) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই বারদুয়ারীর কিছু অংশে জাদুঘরে দর্শনীয় বস্তুগুলো সাজিয়ে রাখা হত। হাইকোর্ট. এফ. এইচ. হল এবং রমনা খেলার মাঠের অংশবিশেষে দর্শকগণ আসলে বাগানবাড়ি, মাছ রাখার আধার (aquarium), জলাশয় প্রভৃতি প্রাসাদের অভ্যন্তরে দেখতে পেত। উত্তরদিকের পানির পাইপ দিয়ে হাম্মামখানায় পানি সরবরাহ করা হত। পূর্বে অবস্থিত কমলাপুর নদী (খাল) থেকে পানি প্রাসাদে আনা হত। এই চ্যানেল ছিল খুব প্রশস্ত এবং প্রবলবেগে পানি আসত।" আহমদ হাসান দানী নিমতলী প্রাসাদ প্রসঙ্গে বলেন যে, "সমান্তরাল ছাদ (flat roof) ব্রিটিশ আমলে সর্বপ্রথম নিমতলী ফটকে ব্যবহৃত হয়।" কিন্তু তাঁর মতে, এ ধরনের ছাদ নির্মাণকৌশল মুঘলরীতিতে নির্মিত ফটকের স্টাইলকে বিনষ্ট করেনি, যদিও নূতন ইমারতে পূর্বের সৌকর্য, সৌন্দর্য দেখা যাবে না।

'Gate Architecture of Dhaka' শীর্ষক প্রবন্ধে, যা Dhaka Past Present Future-এ প্রকাশিত হয় তিনজন প্রবন্ধকার আবু এইচ. ইমামুদ্দীন, শামীম আরা হাসান এবং ওয়াহিদুল আলম, নিমতলী ফটকের বিস্তারিত বিবরণ দেন :

'The facade of Nimtali gate is projected outwards by angular walls from the sides. The gate structure is three storeyed and the frontal arch rises upto two storeys. The arch is fluted and stands on two pillars. There are three small windows above the arch on the top

floor. The inner facade on east is much wider than the front. The central arch of the inner facade is flanked by decorated windows and projected balconies on the top floor, covered over by semi-dome. To pass through the gate one has to go through three archs. In plan there are two rectangular chambers on either side of the passage way and a stair leading to the upper floors. Its architectural details have been taken from various sources and the end result represents an indigeneous building craft, product of local master masons known as ustagars still familiar in the old town of Dhaka."

৪৪। মুসা খানের মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দী

বর্তমান শহীদুল্লাহ হলের উত্তর-পশ্চিম কোণে এবং কার্জন হলের সন্নিকটে, বিশ্ববিদ্যালয় স্টেডিয়ামের উল্টোদিকে মুসা খানের মসজিদ অবস্থিত। মুসা খান ছিলেন ঈসা খান মসনদ-ই-আলার পুত্র এবং এ মসজিদটি পিতার নামে তাঁর পুত্র মুনাওয়ার খান নির্মাণ করেন। মুনাওয়ার খান এটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মাণ করেন। কিন্তু আহমদ হাসান দানী বলেন, "It seems that the real builder was Munawar Khan, the son of Musa Khan. who probably constructed it in the time of Shaista Khan. (1664—1677 ;—1680 —1688)। দানীর মন্তব্য সঠিক নয়। যদিও শায়েস্তা খানী আমলের ইমারতের বহু বৈশিষ্ট্য মুসা খানের মসজিদে প্রতিভাত।

দ্বিতলবিশিষ্ট মুসা খানের মসজিদটি খান মুহাম্মদ মৃধা, কারতালাব খান এবং দেওয়ানবাজার মসজিদের অনুকরণে নির্মিত। নিচে ভল্টের যে প্লাটফর্ম রয়েছে তার উপর তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। বারান্দাবিহীন আয়তাকার এ মসজিদের চার কোনায় নিয়মমাফিক অষ্টকোণাকার চারটি বুরুজ নির্মিত হয়েছে। বুরুজগুলো খুব পুরু নয়, অপেক্ষাকৃত ছোট, খাওয়াজা শাহবাজের মসজিদের বুরুজের মত; বেড়ির সাহায্যে কয়েকটি অংশে বিভক্ত। বুরুজ ছাদের উপরে উঠে গেছে এবং শীর্ষে নিরেট কুউপোলা দ্বারা আবৃত। তার উপরে কলসচূড়া শোভা পাচ্ছে। বুরুজগুলো নিচু থেকে উপরের দিকে সামান্য ঢালু এবং উপরের অংশ প্যানেল দ্বারা শোভিত। প্লাস্টারে কাটা অলঙ্করণ শোভা পাচ্ছে। পূর্বদিকে তিনটি খিলানপথ রয়েছে এবং চারবিন্দুকেন্দ্রিক খিলান মুঘল স্থাপত্যরীতির পরিচায়ক, অন্যান্য ইমারতের খিলানের মতো মুসার মসজিদের খিলানে খাঁজ দেখা যাবে না। প্রবেশপথের উভয় পাশে সরু টারেট বা pinnacle উপরে উঠে গেছে, যা ভারসাম্য রক্ষা করছে। উত্তর ও দক্ষিণ-দিকে একটি করে একই ধরনের খিলানপথ দেখা যাবে এবং অনুরূপভাবে পার্শ্ববর্তী টারেট ছাদের উপরে উঠে গেছে। প্রবেশপথগুলো মসজিদের দেয়াল থেকে উদ্গাত এবং উপরে মার্লন মোটিভ দ্বারা সমৃদ্ধ। মসজিদের পূর্ব ও পশ্চিম প্রাচীর প্রায় ৬ ফুট পুরু এবং উত্তর ও দক্ষিণ প্রাচীর মাত্র ৪ ফুট পুরু। মসজিদটি খুবই সাদামাটা অলঙ্কারবিহীন। ছাদের চারদিকে মার্লনের ব্যবহার দেখা যাবে।

মুসা মসজিদের অভ্যন্তর তিনটি অংশে বিভক্ত এবং এর প্রতিটির উপর থেকে তিনটি গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। মধ্যভাগের গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত বড়। হাজী খাওয়াজা শাহবাজের মসজিদের মতো অভ্যন্তরে, পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত lateral খিলান দেখা যায় না। গম্বুজগুলো বাল্বের আকৃতিতে একটু স্ফীত এবং মার্লনশোভিত অষ্টকোণাকার ড্রামের উপর থেকে নির্মিত। শীর্ষদেশে যে কলসচূড়া রয়েছে তা পদ্মপাতার ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিবলাপ্রাচীরে তিনটি মিহরাব দেখা যাবে, কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড়। দেওয়ালে প্লাস্টার কাটা সামান্য নকশা রয়েছে। মিহরাবগুলো আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ। মসজিদের সামনে 'খোলা বারান্দা এবং দোতালায় যাবার জন্য দক্ষিণ দিকে ঘেরা একটি সিঁড়ি আছে। মসজিদের উত্তর-পূর্ব কোণে মুসা খানের কবর রয়েছে। পরবর্তীকালে ভাষাবিদ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহকে এ প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়। খান মুহাম্মদ মৃধার মসজিদের সাথে মুসা খানের মসজিদের সাদৃশ্য দেখা যায়।

৪৫। শাহী মসজিদ, লালমাটিয়া, অষ্টাদশ শতাব্দী

মসজিদ নগরী ঢাকায় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়েছে। কায়রো, ইস্তাম্বুল, ইসফাহান ব্যতীত অপর কোনো শহরে এত অধিকসংখ্যক মসজিদ নির্মিত হয়নি। প্রাক-মুঘল ঢাকা এখন মহানগরীতে (mega city) রূপান্তরীত। জনবসতি গড়ে ওঠার সাথে সাথে মহল্লায় মহল্লায় নামাজ পড়ার জন্য জুমা ও ওয়াক্তিয়া মসজিদ নির্মিত হয়েছে। বেশিরভাগ মসজিদই স্থানীয় উৎসাহী ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের উদ্যোগে নির্মিত হয়েছে। এ ধরনের একটি মসজিদ লালমাটিয়ার শাহী মসজিদ। এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে জানা যায়।

৪৬। নবাববাড়ি মসজিদ, দিলখুশা, অষ্টাদশ/ বিংশ শতাব্দী

লালমাটিয়ার শাহী মসজিদের মতো স্থানীয় মুসল্লীদের চাহিদা মেটাবার জন্য নবাবদের উদ্যোগে দিলখুশায় নবাববাড়ি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। দিলখুশায় ঢাকার নবাব পরিবারের একটি উদ্যান ছিল এবং এ উদ্যানটি বর্তমাজা ক্রমবর্ধমান ইমারত নির্মাণের চাপে বিলুপ্ত। এই বাগানের পশ্চিমদিকে তিন গম্বুজবিশিষ্ট অষ্টাদশ শতাব্দীর যে মসজিদটি ছিল তা সংস্কার করে আধুনিকীকরণ হয়েছে। এর উপর পাশে শাহ নেয়ামতুল্লাহ বুতশেকানের সমাধি।

দিলখুশার মসজিদটি নবাববাড়ি জামে মসজিদ নামেও পরিচিত। পুরাতন চিত্র দেখলে এখানকার ভগ্নপ্রাপ্ত দেওয়ালের অংশ দেখা যাবে, যা ফটক হিসাবে চিহ্নিত। বর্তমাজা এর কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। ভেঙে দিয়ে জায়গা বের করা হয়েছে যার ফলে খাঁজকাটা খিলানবিশিষ্ট ঐতিহ্যবাহী ইমারত যাতে এক সময় টারেট শোভা পেত তা কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বাইরের দেয়াল সাদামাটা। কেবলমাত্র অষ্টকোণাকার ড্রামের উপর থেকে তিনটি গম্বুজ দেখা যাবে। এগুলোর শীর্ষে কলসচূড়া শোভা পাচ্ছে। মিহরাব প্রাচীরটি সামান্য উদ্গত যার দু'পাশে সরু টারেট দেখা যাবে। প্রাচীরের উপরের অংশ মার্লন দ্বারা অলঙ্কৃত।

দিলখুশা মসজিদের অভ্যন্তরে মার্বেল মোসাইকের ব্যবহারে প্রাচীনত্ব নষ্ট করা হয়েছে। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি মিহরাব রয়েছে। পশ্চিম দেয়ালের কোন অলঙ্করণ দেখা যায় না।

৪৭। শাহ্ আলী বাগদাদীর দরগাহ, মসজিদ, মীরপুর, ঊনবিংশ শতাব্দী

বাংলায় আগত মুসলিম সুফী, সাধক, ওলী-দরবেশদের দিকপাল হিসাবে শাহ আলী বাগদাদীকে চিহ্নিত করা হয়। তিনি ঢাকা শহরের জিরো পয়েন্ট থেকে উত্তরে ১২ মাইল দূরে মীরপুর অঞ্চলে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

'আসুদগান-ই ঢাকা' (হেকিম হাবিবুর রহমান) এবং 'বাংলাদেশে ইসলাম' (আব্দুল মান্নান তালিব) গ্রন্থে শাহ আলী বাগদাদী সম্বন্ধে জানা যায় যে, তিনি বাগদাদ নগরী থেকে প্রায় একশত মুরীদসহ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রথমে ফরিদপুরের গেরদা নামক স্থানে আস্তানা স্থাপন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি তাঁর ভাই শাহ ওসমান রেজাকে গেরদায় ইসলাম প্রচারের জন্য রেখে ঢাকায় এসে মীরপুর মহল্লায় আসেন এবং প্রথমে প্রাক-মুঘল আমলে হিঃ ৮৮০/১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দে (শিলালিপি অনুযায়ী) নির্মিত একটি মসজিদে ইসলাম প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করেন।

মোশাররফ হোসেন ভুঁইয়া বলেন, "এদেশে বাংলাদেশে সৈয়দ শাহ আলী বোগদাদীর বংশের বলে দাবীদার সৈয়দ আলী আশরাফের (মরহুম) কাছে কুরসী নামা (বংশতালিকা) অনুসারে তিনি ৮১৩/ ১৪ হিজরী বা ১৪১২ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ২০ বছর বয়সে ১০০ জন মতান্তরে ৪০ জন সুফী সাধক ও দরবেশ সঙ্গে নিয়ে ইসলাম প্রচারের জন্য বাগদাদ থেকে দিল্লিতে আসেন। কথিত আছে যে, তিনি দু'টি মূল্যবান বস্তু সঙ্গে এনেছিলেন, হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর মুই মোবারক (পবিত্র কেশ বা দাড়ি) এবং বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানীর—পিরহান (জামা)। দিল্লিতে তখন তুঘলক বংশের শেষ সময়। ইতিহাসখ্যাত তৈমুর লং-এর দিল্লি আক্রমণের পর তুঘলক বংশের পতন ঘটে এবং সৈয়দ বংশের রাজত্ব শুরু হয় (১৪১৪ খ্রিঃ)। শাহ আলী সৈয়দ বংশের মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। এ মহিলার গর্ভজাত শাহ ওসমান নামে তাঁর এক পুত্রসন্তান ছিল। গোলাম সাকলায়েন সাহেবের প্রদত্ত বিবরণে জানা যায় যে, তদানীন্তন দিল্লির বাদশাহ (সুলতান) ফরিদপুর জেলার (তৎকালীন ফতেহাবাদ পরগনা) কসবা গীরদা বা মীরানে গেরদার (তৎকালীন নাম ঢোল সমুদ্র) নামক স্থানে বারো হাজার বিঘা পরিমিত এক বিরাট এলাকা শাহ আলীকে লাখেরাজ হিসাবে দান করেন। মোশাররফ হোসেন শাহ্ ওসমানকে শাহ্ আলী বাগদাদীর পুত্র বলে অভিহিত করেন। আ. ক. ম. যাকারিয়া তাঁকে ভ্রাতা বলেছেন। কোনটি সত্য বলা কঠিন। দ্বিতীয়ত সৈয়দবংশীয় কোনো সুলতান শাহ্ আলী বাগদাদীকে লাখেরাজ সম্পত্তি দিয়েছিলেন কি না নিশ্চিত করে বলা যায় না, যা গোলাম সাকলাইন তার 'বাংলাদেশের সুফী সাধক' শীর্ষক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এমনও হতে পারে যে, শাহ আলী বাগদাদী নিজ উদ্যোগে হিজরী ৮৩৭/১৪৩৪ খ্রিস্টাব্দে ফতেহাবাদ বা ফরিদপুরে আসেন এবং আস্তানা স্থাপন করেন।

সৈয়দ মুর্তজা আলীর মতে, সুলতান জালালুদ্দীন মাহমুদ শাহ এ লখেরাজ সম্পত্তি শাহ আলীকে প্রদান করেন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে শাহ আলী বাগদাদী ঢাকায় চলে আসেন এবং মীরপুর এলাকায় আস্তানা স্থাপন করেন। তিনি এখানে অনেক কামেলিয়াত হাসিল করেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে হিজরী ৮৮৫/১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ইউসুফ শাহের আমলে নির্মিত একটি ভগ্নপ্রাপ্ত মসজিদে ইসলাম প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন এবং এখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। উল্লেখ্য যে, মসজিদ শবাধার প্রতিষ্ঠা করে মাজার সৃষ্টি একটি বিরল ঘটনা। যাহোক, তাঁর মৃত্যু প্রসঙ্গে অনেক কিংবদন্তি রয়েছে। সৈয়দ মোহাম্মদ তাইফুর এবং সৈয়দ মুর্তজা আলীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে পীর সাহেব মৃত্যুর পূর্বে চিল্লা পালনের জন্য এ মসজিদের দরজা বন্ধ করে দিতে বলেন মুরীদদের এবং নির্দেশ দেন যে চল্লিশ দিন শেষ না হলে যেন দরজা না খোলা হয়। ঊনচল্লিশ দিন গত হওয়ার পর অর্থাৎ শেষ দিন তাঁর অনুসারীগণ হুজরার ভেতর থেকে এক বিরাট চিৎকার ও আর্তনাদ শুনতে পান। জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, মুরীদগণ দরজা ভেঙে ভিতরে কোনো দেহ দেখতে পাননি; তার স্থলে একজন মানুষের শরীরের খণ্ডবিখণ্ড অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রক্ত জমাট অবস্থায় একটি গর্তে দেখতে পান। ভক্তগণ টুকরো টুকরো মানবদেহের অংশগুলো মসজিদেই সমাহিত করলেন। ঘটনা কতটুকু সত্য তা সঠিকভাবে বলা যায় না।

শাহ আলী বাগদাদীর মৃত্যুকাল নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ডঃ মোহম্মদ এনামুল হক বলেন, "It is well known fact that almost all mosques adjoining to dargahs in Bengal were built after the death of the saints or during their life time, so it can fairly be presumed that Shah Ali Baghdadi died before the year 1480 A.D.)" । তিনি একবার বলেছেন তাঁর মৃত্যুর পর, আবার তাঁর জীবদ্দশায় মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বে নির্মিত হলে সমাহিত করার কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পর নির্মিত হলে, প্রশ্ন থেকে যায় কে ছিল নির্মাতা। এটি ভ্রান্ত ধারণা। অন্যদিকে পূর্বে বলা হয়েছে যে, সুলতান ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে হিজরী ৮৮৫/১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে যে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল সেকথা দ্বার্থহীন কণ্ঠে আহমদ হাসান দানী বলেছেন। মসজিদ পূর্বে নির্মিত না হলে গিরদ্দা থেকে শাহ আলী বাগদাদী মিরপুর এলাকায় কোথায় আস্তানা স্থাপন করেন এবং কিভাবে চিল্লা পালন করেন। অপরদিকে অ্যালেন, সৈ. মো. তাইফুর, আ. মান্নান তালিব উল্লেখ করেন যে, তিনি ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। কোন তথ্যের ভিত্তিতে তাঁরা একথা বলেছেন তা জানা যায় না। দানীও জনশ্রুতি অনুযায়ী এ সনের উল্লেখ করলেও বিশেষ জোর দেননি। আ. ক. ম. যাকরিয়া মৃত্যুসন হিসেবে ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দ উল্লেখ করেননি। অপর দিকে আ. মা. তালেব আরও জটিলতার সৃষ্টি করেছেন একথা বলে যে, "তিনি দীর্ঘদিন এ দেশে ইসলাম প্রচারে কার্যরত থাকেন। অতঃপর ৯২৩ হিজরীতে (১৫১৭ খ্রীঃ) মীরপুরে ইন্তেকাল করেন।"

মোশাররফ হোসেন শাহ্ আলী বাগদাদীর মৃত্যুতারিখ নিয়ে দু'ধরনের মত প্রকাশ করেছেন। একবার বলছেন হিঃ ৯২৩/১৪৯৮ খ্রিঃ; অন্য এক জায়গায় বলছেন হিঃ ৯৩২/১৪৯৮ খ্রিঃ। আব্দুল মান্নান প্রদত্ত তারিখ সঠিক বলে ধরে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত, অর্থাৎ হিঃ ৯২৩/১৫১৭ খ্রিঃ অর্থাৎ সুলতানী আমলের শেষ পর্যায়। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে হোসেনশাহী রাজত্বের অবসানে স্বাধীন বাংলার শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। মোশাররফ হোসেন প্রদত্ত সন ভুল রয়েছে কারণ ৯২৩ অথবা ৯৩২ হিজরী ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দ হতে পারে না।

৮৮৫ হিজরীর মসজিদের শিলালিপি ছাড়াও ইমারতের গায়ে একটি শিলালিপি রয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, হিজরী ১২২৩/১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে ফার্সি ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপিটি নবাব নায়েব-ই-নাযিম নবাব জেসারত খানের শাসনামলে মগবাজার শাহ্ সাহেব শাহ্ মোহাম্মদী আলী বাগদাদীর মাজারের আমূল সংস্কার করেন। সৈঃ মোঃ তৈফুর এ শিলালিপির (stone chronogram) পাঠোদ্ধার করেছেন। তিনি বলেন, "From the mode of construction there can be no doubt that the original building was a pre-Mughal architecture. The building was originally a mosque of the period of Sultan Fateh Shah of Bengal."

বর্গাকারে নির্মিত এই ইমারতের বাইরের দিকের আয়তন ৩৬×৩৬ ফুট। দেয়ালগুলো প্রায় ৮ ফুট চওড়া। ইমারতটি একটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। বারংবার সংস্কারের পরেও এ ইমারতে সুলতানী স্থাপত্যরীতি লক্ষ্য করা যায়। গম্বুজটি পেনডেনটিভের সাহায্যে নির্মিত।

ঢাকার নবাব আহসানউল্লাহ (যাকারিয়া) মতান্তরে স্যার আব্দুল গণি (এস.এম. তৈফুর) মাজারের উত্তর পাশে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

৪৮। জামে মসজিদ, পল্লবী, বিংশ শতাব্দী

মীরপুরের পল্লবী এলাকায় বিংশ শতাব্দীতে নির্মিত একটি মসজিদ নির্মিত হয়। মিনার ছাড়া এ মসজিদের তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে না। মসজিদটি আয়তাকার, সামনে বারান্দা রয়েছে। পশ্চিম দেওয়ালে পাঁচটি মিহরাব রয়েছে। ছাদ সমান্তরাল, গম্বুজ দ্বারা আবৃত নয়, ছাদে টারেট শোভা পাচ্ছে; প্যারাপেট রয়েছে, কার্নিশ সমান্তরাল, পূর্বদিক থেকে পাঁচটি খিলানপথ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। উত্তর ও দক্ষিণদিকে দু'টি করে জানালা আছে। মিনারটি অদ্ভুত ধরনের—সামাররার মালবীয় টাওয়ারের অনুকরণে নিচ থেকে উপরে ঢালু হয়ে গেছে। ভিতরে সিঁড়ি দিয়ে সর্বোচ্চ স্তরে যাওয়া যায় যেখান থেকে আযান দেওয়া হয়। মিনারটি নিচে কিউপলা দ্বারা আবৃত। শীর্ষদেশে কলসচূড়া শোভা পাচ্ছে। দু'টি ব্যালকনি রয়েছে।

৪৯। দায়রা শরিফ মসজিদ, আযিমপুর, ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দ

আযিমপুরের একটি অতি প্রাচীন এবং বহুল পরিচিত মহল্লা হচ্ছে দায়রা শরিফ। আযিমপুর নামকরণ হয়েছে শাহজাদা আযম থেকে। এ অঞ্চলে মুঘল রাজকর্মচারীর বাসস্থান ছিল। শহরের পশ্চিম কোণে অবস্থিত আযিমপুরের দায়রা শরিফ একটি পবিত্র

স্থান রূপে বিবেচিত। দায়রা অর্থ ঘেরা এলাকা। এখানে যে সমস্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি পীর ফকির দরবেশ বসবাস করতেন তারা শহরে যেতেন না, এখানে আধ্যাত্মিক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতেন। এটি দুই অংশে বিভক্ত, ছোট দায়রা ও বড় দায়রা। চট্টগ্রাম থেকে মোহম্মদ দায়েম নামে একজন সাহেব পুরুষ এ অঞ্চলে আসেন সপ্তদশ অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং এখানে বসতি স্থাপন করেন। তিনি এখানে ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

লালবাগ মসজিদের অনুকরণে তিন গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদটি এ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণ। এটি একটি massive অর্থাৎ সুদৃঢ়ভাবে নির্মিত ইমারত, যা মুঘল স্থাপত্যের রীতিতে নির্মিত। এখানে ক্ল্যাসিকাল শায়েস্তাখানী স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বাল্বের আকৃতিতে গম্বুজ, মধ্যভাগের গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত বড়, মার্লনসমৃদ্ধ ড্রাম, শীর্ষদেশে কলসচূড়া, প্যারাপেটে মার্লন নকশা, ছোট ছোট টারেটের ব্যবহার, অষ্টকোণাকার বুরুজ, অভ্যন্তরে তিনটি মিহরাব, যা আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ। পরবর্তীকালে এখানে একটি অষ্টকোণাকার মিনার নির্মিত হয়েছে। এ ছাড়া নির্মাতার (মোহম্মদ দায়েম) বর্গাকার এবং গম্বুজবিশিষ্ট একটি সমাধি-সৌধ দক্ষিণ দিকে সংযোজিত হয়েছে, যার স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যে মূল ইমারতের রীতির সাথে সাদৃশ্য দেখা যাবে।

৫০। জামে মসজিদ, পুরানা পল্টন, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ

পুরানা পল্টন গুলিস্তানের স্টেডিয়ামের পাশে অবস্থিত। ঢাকা নগরীর সম্প্রসারণের বহু পূর্বে বিশেষ করে গুলিস্তান, স্টেডিয়াম, দিলখুশা অঞ্চলে ঘরবাড়ি, বিপণি নির্মাণের বহু পূর্বে পুরানা পল্টনের প্রধান আকর্ষণ ছিল এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার মসজিদ। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এ মসজিদটি মুঘল আমলের এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার মসজিদের মডেলে তৈরি করা হয়। চিরাচরিত রীতিতে নির্মিত ড্রামের উপর গম্বুজ, বাল্বের আকৃতিতে গম্বুজ, গম্বুজের উপর কলসচূড়া, যা পদ্মপাতার ভিতের উপর স্থাপিত। কৌণিক বুরুজ নিরেট টারেটের মতো ছাদের উপর উঠে গেছে, একটি প্রবেশপথ, তিনটি মিহরাব ইত্যাদি। বর্তমানে এটিকে এমনভাবে সংস্কার করা হয়েছে যে এর প্রাচীনত্ব বলতে কিছু নেই।

৫১। বায়তুল মুকাররাম মসজিদ, গুলিস্তান, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ (৩৬)

পূর্ব পাকিস্তান সরকার ঢাকার প্রধান প্রাণকেন্দ্রে একটি কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা করে। ঢাকার Landmark হিসাবে পরিগণিত খুবই বিশালাকার এ মসজিদটি। এখন এটি জাতীয় মসজিদের সম্মান লাভ করেছে। পাকিস্তানের প্রখ্যাত স্থপতি এ. এইচ. থারিয়ানী এ মসজিদের ভূমি-নকশা প্রণয়ন করেন। ভূমি থেকে অনেক উঁচু একটি প্লাটফর্মের উপর বায়তুল মুকাররাম মসজিদ ১৯৬০ সালের ২৭শে জানুয়ারি আবদুল লতিফ বাওয়ানী কর্তৃক স্থাপিত হয়।

বায়তুল মসজিদটি বর্তমানে ৬০,০০০ বর্গফুট আয়তনবিশিষ্ট এলাকা নিয়ে নির্মিত। বাইরের দিক থেকে দেখলে এটি কাবার মডেলে নির্মিত বলে মনে হবে। এটি ছয়তলাবিশিষ্ট এবং অভ্যন্তরে সিঁড়ি রয়েছে। প্রধান লিওয়ান বা নামাজঘরটি অসংখ্য

মার্বেলের সুউচ্চ স্তম্ভ দ্বারা গঠিত। মেজানিন ফ্লোর মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। এ মসজিদে প্রবেশ করতে হলে দুটি সুদৃশ্য খিলানবিশিষ্ট পোর্টিকো ব্যবহার করতে হয়। প্রধান প্রবেশপথটি রাস্তা থেকে ৯৯ ফুট উঁচু এবং ৯৯টি আল্লাহর নামে সিফাত দ্বারা অলঙ্কৃত। নিচে বিপণির অর্থ দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত।

৫২। বঙ্গভবন মসজিদ, বিংশ শতাব্দী

বর্তমানে প্রেসিডেন্ট হাউসের যা সাধারণভাবে বঙ্গভবন নামে কথিত, বিশাল প্রাচীর ঘেরা এলাকায় একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে নির্মিত এটি এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ। এটি বায়তুল মোকাররমের সমসাময়িক ইমারত বলে মনে করা হয়।

৫৩। জামে মসজিদ, পটুয়াটুলী, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ

ব্যস্তসমস্ত সদরঘাট এলাকার পাটুয়াটুলী সড়কে একটি জামে মসজিদ নির্মিত হয়েছে। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মসজিদের প্রধান আকর্ষণ সুউচ্চ মিনার। চারতলা বিশিষ্ট এ মসজিদটি তিনটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত।

৫৪। এডুকেশন এক্সটেনশন অথবা নিয়ারের মসজিদ, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ

ঢাকা কলেজ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের মধ্য দিয়ে যে রাস্তা চলে গেছে এডুকেশন এক্সটেনশন বা বর্তমান নিয়াবের দিকে তার অভ্যন্তরে দোচালাবিশিষ্ট একটি অপূর্ব মসজিদ নজরে পড়ে।

উল্লেখ্য যে, ঐতিহ্যবাহী দোচালার ব্যবহার প্রাক-মুঘল ও মুঘল আমলে দেখা যাবে। পূর্ব থেকে দেখলে এটিকে কংক্রিটে বাংলার দোচালা কুঁড়েঘর বলে মনে হবে। এর কার্নিশগুলো ধনুকাকৃতি এবং ছাদ দু'টি অংশে দোচালায় বিভক্ত, যা উপরিভাগে মিশেছে (ridge)। কারতালাব খানের মসজিদসংলগ্ন দোচালা বা শাহবাজের সম্মুখস্থ বারান্দার দোচালা বারান্দার সঙ্গে এর মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

৫৫। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, মসজিদ, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ (৩৭)

বিশ্ববিদ্যালয় টি.এস.সি. থেকে শাহবাগ যাবার সড়কের পাশে অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস মসজিদটি নির্মিত। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মসজিদটি মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসল্লীদের জন্য নির্মিত হয়। এ মসজিদটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে এটি সাহান টাইপের মসজিদের ভূমি-নকশার উপর নির্মিত। দামেস্কের জামে মসজিদের অনুকরণে এখানে লিওয়ান অর্থাৎ পশ্চিমদিকে নামাজঘর, মধ্যভাগে সাহান বা খোলাচত্বর, চত্বরের তিন পাশে প্রদক্ষিণ পথ বা রিওয়াক, লিওয়ানের দুপাশে সুউচ্চ দু'টি মিনার ছাড়াও অভ্যন্তরে মিহরাব ও মিনার দেখা যাবে। মিনারগুলো গোলাকৃতি, অষ্টকোণাকৃতি নয়। অভ্যন্তরে খিলান দ্বারা সমৃদ্ধ। যে বৈশিষ্ট্যটি এ মসজিদে নেই তা হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী গম্বুজ। এর স্থলে সমান্তরাল ছাদ, যা মসজিদের নকশাকে ব্যাহত করেছে। সম্পূর্ণ কংক্রিটে নির্মিত এ ছাদটির কোনো আকর্ষণ নেই। খিলানগুলো কৌণিক হওয়ায় রিওয়াকটি খুবই আকর্ষণীয়। মিনার দু'টি ফাঁপা। মাঝে একটি ব্যাবকণী আছে এবং উপরের অংশ নিরেট কিউপোলা দিয়ে আচ্ছাদিত। শীর্ষে চূড়া শোভা পাচ্ছে।

৫৬। সেক্রেটারিয়েট মসজিদ, বিংশ শতাব্দী

বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েটের অভ্যন্তরে একটি আধুনিক মসজিদ নির্মিত হয়েছে। মসজিদটি খুব বড়, আয়তনে প্রায় ৭২,০০০ বর্গফুট। দিল্লির কুতুব মিনারের অনুকরণে এখানে একটি মিনার নির্মিত হয়েছে যাতে ব্যালকনি দেখা যাবে। উপরের অংশ গোলাকার হলেও নিচের দু'টি অংশ অষ্টকোণাকৃতি।

৫৭। জিনজিরা মসজিদ, বিংশ শতাব্দী

মুঘল স্থাপত্যের অনুকরণে তিনগম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার একটি মসজিদ জিনজিরা বাজারে নির্মিত হয়েছে। পাঁচটি খাঁজকাটা খিলানপথ দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। চারকোনায় চারটি সরু বুরুজ বা টারেট আছে। নিচ থেকে উপরে ঢালু হয়ে যাওয়া বুরুজগুলো কলসচূড়ায় শেষ হয়েছে। একঘেয়েমি দূর করার জন্য বুরুজগুলো মোল্ডিং বা বেড়ি দ্বারা বিভক্ত। ছাদে তিনটি গম্বুজ, মধ্যভাগের গম্বুজটি একটু বড় এবং মার্লনসমৃদ্ধ ড্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত। চূড়ায় পরপর কয়েকটি ছোট থেকে বড় আকারের কলস দেখা যায়। চূড়া গম্বুজের মাথায় পদ্মপাতার ভিত থেকে উপরে উঠে গেছে। প্যারাপেট ও কার্নিশ খুবই চমৎকার সমান্তরাল; অনেক সময় এগুলোকে কাংগুরা বলা হয়; সামনের দেয়াল বা সম্মুখভাগ এবং গম্বুজগুলো চিনি টিকরী বা চিনা মাটির ভাঙা অংশ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন মোটিভ দ্বারা অলঙ্কৃত। অভ্যন্তরে পাঁচটি অবতলাকৃতি মিহরাব দেখা যাবে। মসজিদের সামনে খোলা চত্বর আছে।

৫৮। ফকিরবাড়ি মসজিদ, মীরপুর, বিংশ শতাব্দী

বিংশ শতাব্দীতে মীরপুরে ফকিরবাড়ি মসজিদ নামে যে মসজিদ নির্মিত হয়েছে তা এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য স্ফীত আকারে বাল্বের অনুকরণে নির্মিত গম্বুজ যা গোলাকারে ড্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়া সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বড় টারেট এবং ক্ষুদ্র টারেট পিনাকেল বা মার্লনের অলঙ্করণ, কলসচূড়া, চিনা টিকরীর আচ্ছাদন। পূর্ব-দিকে একটি বারান্দা সংযোজিত হয়েছে।

৫৯। নবাবগঞ্জ জামে মসজিদ, বিংশ শতাব্দী

ঢাকা শহরের পশ্চিমে নবাবগঞ্জ মহল্লায় একটি মসজিদ নির্মিত হয়। ৩০৮০ বর্গ-ফুট এলাকা জুড়ে স্থাপিত এ মসজিদটি একটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। সামনে পূর্বদিকে একটি বারান্দা আছে, যার কোনায় চারটি বুরুজ রয়েছে, যা অষ্টকোণাকৃতি। উত্তর-পূর্ব কোনায় একটি চতুষ্কোণার উঁচু মিনার নির্মিত হয়েছে এবং কিয়স্ক বা চারিদিকে খোলা গম্বুজবিশিষ্ট প্যাভেলিয়ন দেখা যাবে। অভ্যন্তরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠা যায়। বিংশ শতাব্দীতে নির্মিত এটি চিনি টিকরীর অলঙ্করণ দ্বারা শোভিত।

(ঘ) পুরাতন ঢাকা গ্রুপ

৬০। বিনাত বিবির মসজিদ, নারিন্দা, ১৪৫৭ খ্রিস্টাব্দ; বিংশ শতাব্দীতে পুণঃনির্মিত

ঢাকা মহানগরীর সর্বপ্রাচীন ইমারত হচ্ছে প্রাক-মুঘল আমলে নির্মিত নারিন্দার বিনত বিবির মসজিদ। শিলালিপিতে বখত বিনাত লিখা থাকলেও স্থানীয়ভাবে এটি বিনত বিবির মসজিদ নামে পরিচিত। বর্তমানে নারিন্দা মহল্লা নারানদিয়া নামে অধিক

জনপ্রিয়তা লাভ করে। সুলতান মাহমুদ শাহের সময়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি অনুযায়ী এটি এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার একটি মসজিদ ৮৬১ হি/১৪৫৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। শিলালিপিটি সামসুদ্দীন আহমদ পাঠোদ্ধার করেন। এটি পাঁচ লাইনে উৎকীর্ণ, যা মসজিদে প্রবেশের প্রধান খিলানপথের উপর প্রোথিত রয়েছে। এটি নিম্নরূপ ঃ

১। দয়ালু ও মহানুভব আল্লাহর নামে
২। আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই
৩। 'হায় ফালাহ্' শব্দের উচ্চারণে নিরাপদে
৪। দিবাভাগ অথবা রাত্রে মসজিদে প্রবেশকারী
৫। মারহামাতের কন্যা মুসাম্মত বখত বিনাত এটি নির্মাণ করেন
৬। (নির্মাণ তারিখ) হিজরী ৮৬১/১৪৫৬ খ্রিস্টাব্দ

উপরোক্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মারহামাতের কন্যা মুসাম্মত বখত বিনাত হিজরী ৮৬১/১৪৫৬-৫৭ খ্রিস্টাব্দে নারিন্দার এই ক্ষুদ্র মসজিদটি নির্মাণ করেন। কে এই বখত বিনাত বা বিনত বিবি তা জানা যায় না। এস. এম. তৈফুর, আহমদ হাসান দানী,. যাকারিয়া প্রমুখ এ মসজিদটির শিলালিপির মৌলিকত্ব বা প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করেননি। কিন্তু সামসুদ্দীন আহমদ কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। শিলালিপিটি ব্যতিক্রমধর্মী কারণ প্রথমতঃ এর প্রথম দুই লাইনে 'বিসমিল্লাহ' ও 'কালিম' আরবিতে লেখা আছে। বাকি তিনটি লাইন ফার্সিতে অর্থাৎ জগাখিচুড়ি, যা সচরাচর দেখা যায় না।

দ্বিতীয়ত, নির্মাতার পরিচয় মায়ের মাধ্যমে, বাপের মাধ্যমে নয়, যা বিভ্রান্তিকর। **তৃতীয়ত**, বাংলাদেশে প্রাপ্ত অধিকাংশ শিলালিপিতে সুলতানের নাম উল্লেখ থাকে। এ শিলালিপিতে তা নেই। **চতুর্থতঃ** প্রায় সকল শিলালিপিতে সন-তারিখ শব্দে উল্লেখ থাকে, সংখ্যায় নয়; কিন্তু এখানে সংখ্যায় উৎকীর্ণ। যাহোক আমরা যদি শিলালিপি সঠিক ও আসল বলে ধরে নিই তা হলে এ ইমারতটি ঢাকার সর্বপ্রাচীন ইমারত এবং মসজিদের মর্যাদা পাবে। নির্মাতা যখন বিনাত, কিন্তু তাঁর নাম পরিবর্তিত হয়ে বিনত বিবি কিভাবে হল তা বলা কঠিন। তবে ঢাকা ও আশেপাশের বহু মাজার বা সমাধিতে বিবির উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন বিবি পরীর মাজার (ঢাকার লালবাগ দুর্গ) এবং বিবি মরিয়ম (নারায়ণগঞ্জ)। এভাবে জনশ্রুতিতে বখত নামটি বাদ পড়ে হয়তো বিনাত বিবিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

এইচ. ই. স্টেপলটন বলেন, "মসজিদটি ক্ষুদ্রাকৃতি এবং আধুনিক আকৃতির কিন্তু ঢাকা শহরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে একটি উঁচু ঢিপির উপর নির্মিত ইমারতে প্রোথিত পাথরটি (শিলালিপি) সম্ভবত এর সঠিক স্থানে রয়েছে।" তিনি বলতে চান যে অন্য কোন স্থান থেকে শিলালিপিটি এনে এখানে বসানো হয়নি, যা সাধারণত প্রায় ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। অর্থাৎ ভগ্নপ্রাপ্ত একটি ইমারতের শিলালিপি অবিন্যস্তভাবে পড়ে থাকলে তা একটি মসজিদ বা মাজারে বসিয়ে দেওয়া হয় যাতে সেটি খোয়া না যায়। যাহোক, প্রাক-মুঘল যুগের এ মসজিদটি সুলতান মাহমুদ শাহের আমলে (১৪৩৬-১৪৫৯ খ্রিঃ)

নির্মিত হয়। বিনত বিবির মসজিদটি গোলাকার এবং গম্বুজবিশিষ্ট ছিল। এর আয়তন ১২×১২ ফুট, ভিতরের দিক থেকে। মসজিদের দেয়ালও ৬ ফুট প্রশস্ত। চার কোনায় চারটি টারেট রয়েছে। পূর্ব-দক্ষিণ ও উত্তর দেয়ালে একটি করে খিলানপথ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। কিবলা প্রাচীরে একটিমাত্র মিহরাব। বাইরের দিকে মিহরাবের দেয়াল সামান্য উদ্গত। যেহেতু প্রাক-মুঘল যুগে নির্মিত সেহেতু গম্বুজে কোনো ড্রাম ব্যবহৃত হয়নি। সরাসরি ছাদ থেকে গম্বুজ উঠে গেছে। ভিতরে চার কোনায় স্কুইঞ্চের ব্যবহার দেখা যাবে গম্বুজ নির্মাণে। বর্তমানে কার্নিশ সমান্তরাল এবং পূর্বে বক্রাকার ছিল কি না বলা যায় না। পোড়ামাটির আবরণ দেখা যাবে না কারণ মুঘল এবং পরবর্তীকালে এটি সংস্কার করা হয়েছে; দক্ষিণদিকে আর একটি গম্বুজবিশিষ্ট এবং পূর্বদিকে বারান্দা নির্মিত হয়েছে। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে গনী যখন 'Dacca' শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করছিলেন তখন স্থানীয় লোকেরা প্রাক-মুঘল আমলের গম্বুজ ভেঙে একটি বৃহদাকার মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা করছিল। তিনি আক্ষেপ করে বলেন যে হয়তো গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পূর্বে এ গম্বুজটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং এর ফলে পুরাকীর্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে। ("The antiquity has again lost its battle in Dacca") কিন্তু সৌভাগ্যবশত তা হয়নি। মূল এক গম্বুজবিশিষ্ট আকার এ ইমারতটিতে অপরিবর্তিত রেখে এর চারিপাশে কিবলাপ্রাচীর ছাড়া, মসজিদটির সম্প্রসারণ ও সংস্কার করা হয়েছে ক্রমবর্ধমান মুসল্লীদের চাপে। দুর্ভাগ্যবশত ঢাকার এই প্রাচীন মসজিদটি বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ইমারতের তালিকাভুক্ত করা হয়নি, যার ফলে এর মৌলিক স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে এটি চিনি টিকারী দ্বারা অলঙ্কৃত আধুনিক মসজিদ হিসাবে শোভা পাচ্ছে।

৬১। হায়াত বেপারীর মসজিদ এবং সেতু, ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিনাত বিবি মসজিদের সন্নিকটে এবং অধুনালুপ্ত নারিন্দা পুলের কিছুটা দক্ষিণে একটি সেতু ও পুরাতন মসজিদ রয়েছে। মোহাম্মদ যাকারিয়ার ভাষায় : "১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে হায়াত বেপারী নামক একজন ধণাঢ্য ব্যক্তি এক খিলানবিশিষ্ট একটি পাকা পুল নারিন্দাতে ধোলাই খালের (অবলুপ্ত) উপরে নির্মাণ করেন। 'তওয়ারিখ-ই-ঢাকা' নামক গ্রন্থে জনাব রহমান আলী এ তথ্য প্রকাশ করেছেন। কিছুকাল আগে পুলটি নষ্ট হয়ে গেলে এটিকে নূতন করে নির্মাণ করা হয়।" মসজিদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন "নারিন্দা পুলের কিছু দক্ষিণে এই পুরাতন মসজিদ অবস্থিত। নারিন্দা পুলের উত্তরে অবস্থিত বিনত বিবির মসজিদের মতো এটিও ছিল এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ। বর্গাকারে নির্মিত এ মসজিদ ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে হায়াত ব্যাপারী কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে এ মসজিদটি নূতন করে নির্মাণ করা হয়েছে।"

৬২। পাগলা সেতু, পাগলা, সপ্তদশ শতাব্দী

ঢাকা শহরের বারো মাইল পূর্বে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সড়কের উপর বুড়িগঙ্গার তীরে একটি ভগ্নপ্রাপ্ত সেতুর অংশবিশেষ দেখা যাবে। এটি পাগলা নামক স্থানে রয়েছে এবং

ধারণা করা হয়ে থাকে যে এটি একটি সেতুর ধ্বংসাবশেষ। ১৬৬৬ ইউরোপীয় পর্যটক ট্যাভারনিয়ার এটি এরূপ বর্ণনা করেন "অর্ধ মাইল ভাটায় (বুড়িগঙ্গা নদীর) পাগালু নামে একটি ছোট নদী রয়েছে। এ নদীর উপর একটি সুন্দর সেতু নির্মিত হয়েছে, যা মীর জুমলা নির্মাণ করেন। এ নদীটি উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এসেছে এবং উজানে অর্ধমাইল দূর থেকে আর একটি নদী যার নাম বাদামতলী প্রবাহিত যার উপরও ইটের তৈরি একটি সেতু দেখা যাবে। নদীর উভয় তীরে অসংখ্য টাওয়ার রয়েছে, যার উপর ডাকাতদের হত্যা করে মাথার খুলি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।" অনুরূপভাবে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে বিশপ হেবার যখন ঢাকা আসেন তিনিও ভগ্নপ্রাপ্ত পাগলার সেতু দেখতে পান। তখনও এটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি। তাঁর ভাষায়, "একদিন সন্ধ্যায় মিঃ মিট-ফোর্ডের সঙ্গে একটি নৌকা করে পাগলা পুল বা পাগলা সেতু দেখতে গেলাম, যা ঢাকা শহর থেকে চার মাইল পূর্বে। এটি গথিক টিউডর স্থাপত্যকলার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন, কারণ আমি জানি না যে এটিকে এশিয়েটিক ইমারত বলা যাবে না কারণ মাঝিরা বলছে যে এটি কোনো এক ফরাসি দেশীয় স্থপতির সৃষ্টি।"

পাগলা সেতু কোনো ইউরোপীয় স্থপতি অথবা মীরজুমলার স্থাপত্যকীর্তি নয়, কারণ এটিতে টিউডর গথিক রীতিতে নির্মীত যে খিলানের কথা বলা হয়েছে তা দানীর ভাষায় চার কেন্দ্রীয় কৌণিক খিলান (pointed four—centred arch), যা ঢাকার মুঘল ইমারতে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং পাগলার সপ্তদশ শতাব্দীতে মীর জুমলার শাসনামলে নির্মিত ইমারত। মীর জুমলা (১৬৬০-১৬৬১) সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বে বাংলার সুবাদার ছিলেন এবং তিনি শায়েস্তা খানের পরে এদেশে আসেন। আহমদ হাসান দানী তাঁর 'Dacca' গ্রন্থে বলেন যে, "মীর জুমলা টঙ্গী এবং পাগলার সেতু নির্মাণ করেন।" দানী তাঁর 'Muslim Architecture in Bengal' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "The bridge is in ruins, but even in it present condition it has a romantic appeal. The construction speaks of the great Mughal taste. The bridge consisted of three open arches, each arch being four-centred and stilted, and a further blind arch at either end. The spandrels of the arches are decorated with prominent rosettes and the base of the arches is provided with semi-circular cut-waters. But of greater importance are four octagonal hollow towers, one at each corner. These toweres have multi-cusped arched openings and are further relieved with deep panels while a fluted dome crowns the heads. On the whole even with the fallen towers, the romantic beauty of the architecture catches the eye." বঙ্গানুবাদ : "ভগ্নাবস্থায় কালের স্বাক্ষী হিসাবে দাঁড়িয়ে থাকলেও পাগলার সেতুর রোমাঞ্চকর আকর্ষণ রয়েছে। এর নির্মাণকৌশল মুঘল স্থাপত্য ঐতিহ্যকে প্রতিভাত করেছে। তিনটি প্রশস্ত চারকেন্দ্রীক কৌণিক খিলান দ্বারা নির্মিত। খিলানগুলোর মাথায় সামান্য বক্রাকার (stilted arch); এগুলোর উভয় পাশে একটি করে নিরেট খিলান (blind arch) দেখা যাবে। খিলানের

উপরের দিকের পার্শ্ববর্তী স্থানে (Spandrel) ছোট ছোট গোলাপ (rosettes) দ্বারা অলঙ্কৃত। খিলানের নিম্নাংশ পানির নিচে প্রোথিত (cut-waters)। কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে সেতুর চার কোনায় চারটি বৃহদাকারে নির্মিত অষ্টকোণাকার ফাঁপা টাওয়ার। এ টাওয়ারগুলো বহুখাঁজবিশিষ্ট খিলান দ্বারা নির্মিত। দেয়ালের গাত্র প্লাস্টার দ্বারা অলঙ্কৃত এবং টাওয়ারের উপরিভাগ নিরেট গম্বুজ দ্বারা আবৃত। ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও টাওয়ারগুলোতে ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যকীর্তি প্রতিভাত।"

ডি' ওয়েলি ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে যখন ঢাকার কালেক্টরের দায়িত্ব পালন করছিলেন তখন ঢাকার পুরাকীর্তির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু ইমারত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রত্নকীর্তির জলরং চিত্র অঙ্কন করেন। তাঁর অঙ্কিত চিত্রসমূহ পরবর্তীকালে ১৮২৪ -৩০ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে Antiquities of Dacca শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।। এ গ্রন্থে যে সমস্ত চিত্র ছাপা হয়েছে তাতে মীর জুমলা কর্তৃক নির্মিত টঙ্গী সেতু (অধুনালুপ্ত) এবং পাগলা সেতুর চিত্র রয়েছে। পরবর্তীকালে দানী ও তাইফুর তাঁদের গ্রন্থে পাগলা পুলের চিত্র সংযোজন করেন।

বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর পাগলা সেতুর সংস্কার করেছে এবং এটি সংরক্ষিত (Protected monuments) ইমারতের তালিকায় সংযোজন করেছে।

৬৩। মিয়া সাহেবের ময়দানের খানকা, অষ্টাদশ শতাব্দী

হাকিম হাবিবুর রহমান তাঁর 'আসুদগান-ই-ঢাকা' শীর্ষক গ্রন্থে বলেন, "লক্ষ্মী বাজারে মিয়া সাহেবের ময়দান নামক জায়গাটি খুবই প্রসিদ্ধ। এককালে উহাতে একচেটিয়া মুসলমানদের বসতি ছিল। কিন্তু বর্তমানে ওখানে সামান্য আবাদী এলাকা রয়েছে। উক্ত দরগাহটি প্রকৃতপক্ষে শাহ্ আব্দুর রহীমের কারণেই খ্যাতি লাভ করেছে। বর্তমানে যেসব খানকা সেখানে আছে উহাদের মধ্য এটি সর্ব প্রাচীন। শাহ্ আব্দুর রহীম ছিলেন কাশ্মীরের অধিবাসী। দ্বাদশ হিজরীর প্রথম দিকে তিনি বাংলাদেশে আগমন করেন। প্রথমে কিছুদিন তিনি মুর্শিদাবাদে অবস্থান করেন এবং পরে ঢাকা আগমন করে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তাঁর সঙ্গে শরিফুদ্দীন নামে এক ভাতিজাকে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন মুজাহিদী তরীকার লোক এবং তিনি সুফী দোয়েত উল্লাহওরফে সুফী হাসান (রহঃ)-এর খলিফা ছিলেন। আর সুফী আবদুল্লাহ ছিলেন শাহ মাসুমের খলিফা। শাহ্ আব্দুর রহীম কর্তৃক সে আমলে মুজাহেদী তরীকার যথেষ্ট প্রসার ঘটে। চট্টগ্রামের বিখ্যাত বুজুর্গ সুফী শাহ্ আমানতউল্লাহও তাঁরই খলিফা ছিলেন। শাহ জনাব আব্দুর রহীম তাঁর ৮৪ বছর বয়সকালে কোনো এক পাগল কর্তৃক আসর ও মাগরিবের মাঝামাঝি সময়ে আহত হন। পাগলটি তলোয়ার দ্বারা তাঁর শরীরে সাতটি আঘাত করে। তারপরই তিনি এক মাস তিন দিন বেঁচে ছিলেন। ১১৫৮ হিজরীর ৭ই সাবান ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে পাগলটি তাঁকে আঘাত করেছিল। অতঃপর সে বছরই রমজান মাসের নবম তারিখে বৃহস্পাতিবার দিবাগত রাতে তিনি ইন্তেকাল করেন; পরদিন দশই রমজান তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর শাহদাতের পর শাহ সাইফুদ্দিনের পুত্র শাহ নাজিমুদ্দিন গদীনশীন হন।"

এস. এম. তৈফুর মিয়া সাহেবের খানকা প্রসঙ্গে হাকিম হাবিবুর রহমানের বিবরণের পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন এবং সারাজীবন আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণায় মশগুল থাকতেন। তিনি একজন প্রতিভাবান সুফী ছিলেন এবং যেহেতু তিনি এক পাগলের আকস্মিক আঘাতে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন সেজন্য তাঁকে 'শহীদ' বলা হত। তাইফুরের মতে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত কতিপয় খানকার মধ্যে মিয়া সাহেবের ময়দানের খানকাটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ছিল।

৬৪। গোলাম মোহাম্মদের ফটক, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ

আহমদ হাসান দানী গোলাম মোহম্মদের ফটক প্রসঙ্গে বলেন, "শেখ গোলাম মুহম্মদ নবাব জসরত খানের সময়ের প্রখ্যাত জমিদার গোলাম নবীর তৃতীয় পুত্র ছিলেন। তিনি ঢাকার পর্তুগীজ কুঠির একজন এজেন্ট ছিলেন। নারায়ণগঞ্জের অপর পাড়ে নবীগঞ্জের কদর রসুল ইমারতের সংস্কারে পিতা ও পুত্র অংশগ্রহণ করে খ্যাতি অর্জন করেন। পিতার মৃত্যুর পর গোলাম মুহম্মদ সংগত টোলায় প্রতিষ্ঠিত পর্তুগীজ বাসভবনটি ক্রয় করেন এবং সেখানে নিজের জন্য অট্টালিকা তৈরি করেন। জাফরী করা ইট দিয়ে তৈরি দেয়াল এ অঞ্চলের প্রাচীনত্বকে প্রমাণিত করে।

লক্ষ্মীবাজার থেকে একটি রাস্তা পুরাতন আবাসিক এলাকার দিয়ে চলে গেছে। এখানে একটি সুউচ্চ ইটের ফটক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু বর্তমানে এর ডান এবং বাম পাশে আধুনিক ইমারত নির্মিত হয়ে প্রাচীন ইমারতের সৌন্দর্যকে ব্যাহত করেছে। সৌভাগ্যক্রমে দু'টি কাঠের নকশাকৃত দরজার ফ্রেম এখানে পাওয়া যায় ও যা সম্ভবত এ ইমারতে দরজা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ফটকটি দ্বিতলবিশিষ্ট। উপরের তলা সম্প্রতি সংস্কার করা হয়েছে। নিচের অংশ তিনটি খাঁজকাটা খিলান দ্বারা নির্মিত এবং এর মধ্য দিয়ে ফটকে প্রবেশ করতে হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় খিলানের মধ্য দিয়ে একটি কক্ষে (vestibule) আসা যায়। এরপরে প্রহরীকক্ষ (guard room)। ছাদ সমান্তরাল এবং কাঠের বিম ও বর্গা দিয়ে তৈরি।"

দানী বলেন যে, "এ ফটকটি নির্মাণে ছোট কাটরার ফটককে অনুকরণ করে করা হয়েছে।"

৬৫। বিবি মেহেরের মসজিদ, ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ

গোলাম মুহম্মদের তোরণদ্বার থেকে সামান্য দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গেলে বর্গাকার এবং গম্বুজবিশিষ্ট একটি মসজিদ নজরে পড়বে। গম্বুজটি বহুদিন পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে সমান্তরাল ছাদ দিয়ে মসজিদটিকে আচ্ছাদিত করা হয়েছে। প্রধান প্রবেশপথের উপর গাঁথা একটি শিলালিপির পাঠোদ্ধার করে জানা যায় যে মসজিদটি শেখ গোলাম মুহম্মদের এক আত্মীয়া জনৈকা বিবি মেহের কর্তৃক ১৭ হিজরী ১২৩০/১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। ঢাকার শায়েস্তাখানী রীতিতে বর্গাকার একগম্বুজ মসজিদের ভূমি নকশার উপর ভিত্তি করে বিবি মেহেরের মসজিদটি নির্মিত। পূর্বদিকে তিনটি খিলান পথ রয়েছে এবং চার কোনায় ক্ষুদ্রাকৃতি টাওয়ার। অভ্যন্তরে কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব রয়েছে।

৬৬। তাঁতিবাজার সেতু, নবাবপুর, ১৮১৫ (অধুনালুপ্ত)

ঢাকার ইমারতসমূহের আধুনিকতার ছাপ প্রায় সমস্ত ভবনে দেখা যাবে। প্রাক-মুঘল তো দূরের কথা, মুঘল ঢাকা বিংশ শতাব্দীর মহানগরীর জনস্রোত ও নগর সম্প্রসারণ ও ইমারত নির্মাণের হিড়িকে হারিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান আমলে যে সমস্ত মুঘল ইমারত কালের ধ্বংসলীলা এবং মানুষের ধ্বংসস্পৃহাকে (vandalism) ফাঁকি দিয়ে টিকে ছিল তা সড়ক নির্মাণের অজুহাতে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থকার ১৯৫২-৫৩ সাল ঢাকায় যে সমস্ত প্রাচীন কীর্তি দেখেছিলেন তার অনেকগুলো এখন খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেমন নারিন্দার সেতু, বাবুবাজারের সেতু, ধোলাইখালের উপর নির্মিত তাঁতিবাজারের সেতু। শেষোক্ত সেতুটি স্বীয় মর্যাদা নিয়ে ইংলিশ রোডের উপর বহুদিন অক্ষত অবস্থায় ছিল। সুবাদারগণ বজরায় চড়ে যে ধোলাইখাল দিয়ে বুড়িগঙ্গা হতে ঢাকা শহরে প্রবেশ করতেন পাল তুলে সে ঐতিহ্যবাহী ধোলাইখাল কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। সরকারের সড়ক বিভাগ এটিকে মাটি ভরে অনেক আগেই সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে বাস্তবায়ন করছে। পুরাতত্ত্ব হারিয়ে যাচ্ছে আধুনিকতার কাছে। পরিতাপের বিষয় এই যে পুরাকীর্তি ধ্বংস করে কোন দেশে নগর সম্প্রসারণ বা সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে! অপর একটি দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে যে, ইমারত সংস্কারের নামে যথেচ্ছভাবে চলছে পুরাতন ইমারতে প্রাচীনত্ব বা স্থাপত্য ঐতিহ্য ধ্বংসের মহাযজ্ঞ, যেমন তারা মসজিদ।

আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর পূর্বে নবাবপুর-তাঁতিবাজার সড়ক (ইংলিশ রোড) নামে পরিচিত যে সড়কটি নয়াবাজারের দিকে গেছে তার উপর ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত একটি খিলানের সাহায্যে একটি প্রশস্ত সেতু নির্মিত হয়। ঢাকার কালেক্টর ডি' ওয়েলি, যিনি চিত্রকর হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করেন, তাঁতিবাজারের সে সেতুটি দেখে বিস্তারিত বর্ণনা করেছিলেন, তা আজ অবলুপ্ত। তাঁর ইংরেজি ভাষ্য দেওয়া হল, যার সঠিক বাংলা অনুবাদ করা কঠিন, "To the noise of mariners and ship-wrights which once resounded along the nala to the bustle and point of commerce and princely equippage has succeded a degree of loneliness and silence : A sentiment of pensive serenity possesses the scene ..... In the midst of such a scene, as this, passion is lulled and the imagination, willingly enthralled by feelings of melancholy pleasure, is instructively led to compare the vicissitudes from human power and opinion, and the mutabilities of human art, with the permanence of nature itself. Here the Ganges flows on, as it has even flowed, with silent majesty, while the mutifarious works, which the art and industry of man have erected on its banks and across its channels have successively fallen into its stream or crumbled to dust."

ডি' ওয়েলি তাঁতিবাজারের সেতুর স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, "In its construction it desplayed a considerable degree of architectural taste and talent. Its form and proportions are firm and elegant. Its

arch noble and its decoration, enrichment has been led on by simplicity."

অধুনালুপ্ত তাঁতিবাজার সেতুটি এলাকায় দর্শনীয় বস্তু ছিল এবং ধোলাইপাড়ে সন্ধ্যার পর বহু লোকের সমাগম ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঢাকা ছিল সমৃদ্ধ এবং জৌলুসপূর্ণ। বর্তমানে বিষাক্ত ধোঁয়া, অগণিত জনস্রোতের চাপ, ব্যবসা-বাণিজ্যের হিড়িক, গাড়িঘোড়ার আধিক্য, সড়ক নির্মাণের প্রয়োজনীতায় পুরাতন ঐতিহ্যবাহী ঢাকার বহু ইমারতই ধ্বংস হয়েছে এবং বিংশ শতাব্দীতে ঢাকা পরিণত হয়েছে concrete jungle-এ।

৬৭। সিতারা বেগমের সমাধি, ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ

ঢাকার সিংটোলা এলাকার বাংলাবাজারের প্যারী দাস রোডে তিন গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এটিকে সিতারা বেগমের সমাধি বলা হয়। সিতারা বেগম গোলাম মুহম্মদের, যিনি একটি আকর্ষণীয় ফটক নির্মাণ করেন, স্ত্রী ছিলেন। সিতারা বেগম স্বামীর স্মরণে এ মসজিদটি নির্মাণ করেন ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে। প্রধান খিলানপথের উপরে একটি শিলালিপি থেকে নির্মাণকাল জানা যায়।

আহমদ হাসান দানী তাঁর 'Dacca' গ্রন্থে এ মসজিদের বিষদ বিবরণ দেন। তাঁর ভাষায়, "একটি উঁচু ঢিবির পশ্চিমাংশে সম্মুখভাগে অসাধারণ নকশাসম্বলিত একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। মসজিদটির প্লাস্টার করা দেয়ালের কিছু অংশ উদ্গত। এটি মধ্যবর্তী খাঁজকাটা খিলানপথের সম্মুখে উদ্গত। এর দু'পাশে অষ্টকোণাকার বুরুজ রয়েছে। অর্ধগম্বুজাকৃতি এ্যালকভের ভিতর দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। আয়তাকার প্যানেলের ফ্রেম ইমারতের সৌকর্য বৃদ্ধি করেছে। তিনটি খিলানপথ দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। প্যারাপেটে মার্লন শোভা পাচ্ছে। তিনটি বাল্বের আকৃতির গম্বুজ দ্বারা আবৃত সিতারা বেগমের মসজিদটিতে অষ্টকোণাকার ড্রাম ব্যবহৃত হয়েছে। ড্রামেও মার্লনের ব্যবহার দেখা যাবে। অভ্যন্তরে একটি হলঘর, পশ্চিমদিকে তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব।" দানী যথার্থই বলেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শায়েস্তা খানী-উত্তর স্থাপত্যরীতির অনুসরণে এ মসজিদটি নির্মিত।

৬৮। আগা মসিহ লেনের মসজিদ, ঊনবিংশ শতাব্দী

পুরাতন এলাকার আগা মসিহ লেনে ঊনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত যে মসজিদটি রয়েছে তা কাজী আলাউদ্দীন রোড ধরে গেলে দেখা যাবে। এটিও শায়েস্তা খানী স্থাপত্যরীতির অনুকরণে নির্মিত, যাতে তিনটি খিলান দরজা দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। এটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদ হওয়ায় সিতারা বেগমের মসজিদের সাথে এর সাদৃশ্য রয়েছে।

৬৯। শাহ জামালের সমাধি, তাঁতিপাড়া, ঊনবিংশ শতাব্দী

কোতওয়ালী সড়ক ধরে তাঁতিবাজার এলাকায় প্রবেশ করলে স্থানীয় সুফীসাধক শাহ জামালের সমাধি চোখে পড়বে। এটি উঁচু এবং মজবুত দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত। অভ্যন্তরে শাহ জামালের শবাধার রয়েছে। সম্প্রতি এখানে মাদ্রাসা নির্মিত হয়েছিল।

কিন্তু মাদ্রাসাটি বর্তমানে নেই। শাহ জামালের সমাধিটি তাঁর মুরীদ শেখ মোঃ জাকির উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মাণ করেন।

৭০। আহসান মঞ্জিল, বাকল্যান্ড বাঁধ, সদরঘাট, উনবিংশ শতাব্দী

বুড়িগঙ্গার তীরে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী আহসান মঞ্জিল ঢাকাবাসী ছাড়াও বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর্তমাজার পুনঃনির্মিত আহসান মঞ্জিল একসময়ে জরাজীর্ণ অবস্থায় বহু বছর অবহেলিত ছিল। ইসলামপুর রোড হয়ে ওয়াইজঘাট এবং বাকল্যান্ড বাঁধ দিয়ে আহসান মঞ্জিলে যাওয়া যায়। একসময়ে এখানে ফরাসিদের কুঠি ছিল। খাজা আহসানউল্লাহ, যিনি নবাব সলিমউল্লাহর প্রপিতামহ ছিলেন, এ কুঠিটি ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে ক্রয় করেন। বর্তমান বাসস্থানটি নির্মাণ করেন নবাব শাহ আবদুল গণি। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে আহসান মঞ্জিল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবদুল গণির পুত্র নবাব আহসানউল্লাহর নাম থেকে এ মঞ্জিলের নামকরণ হয়।

প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী আহসান মঞ্জিল ইতিহাসের অনেক ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে। এ কারণে নিঃসন্দেহে এটিকে একটি ঐতিহাসিক ভবন বলা যায়। ঢাকার উত্থান ও পতন, তথা পূর্ববাংলার ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছিল একসময়ে এ ভবনে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববাংলা ও আসামকে নিয়ে যখন একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হয় তখন ঢাকার নবাব পরিবার বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে জেনারেল লর্ড কার্জন নবাবদের আহসান মঞ্জিলে অবস্থান করেন। তিনি নবাব সলিমউল্লাহর অতিথি হিসাবে আহসান মঞ্জিলে ছিলেন। এ ভবনেই ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বাতিল ঘোষিত হয়। এরপর আহসান মঞ্জিলে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়।

আহমদ হাসান দানী অনিন্দ্যসুন্দর আহসান মঞ্জিলের বিবরণ দেন : "বিশাল এলাকা জুড়ে দ্বিতলবিশিষ্ট আহসান মঞ্জিল নির্মিত। আহসান মঞ্জিলের প্রধান আকর্ষণ প্রধান প্রাসাদ। একটি বিশাল চতুর্ভুজের মধ্যভাগে সুউচ্চ ভিতের উপর স্থাপিত আহসান মঞ্জিল দ্বিতলবিশিষ্ট এবং মধ্যভাগে একটি সুদৃশ্য গম্বুজ রয়েছে। বুড়িগঙ্গা নদীর সম্মুখে প্রসারিত এবং দূর থেকে অতি মনোরম এ ভবনটি বিশালাকার এবং ঐতিহ্যবাহী। নদীর দিক থেকে বাকল্যান্ড বাঁধের সামনে দিয়ে এ ভবনে প্রবেশ করতে হয়। অগণিত সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতলে উঠতে হয়। দ্বিতলে তিন খিলানবিশিষ্ট পোর্টালের মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরে যাওয়া যায়। খিলানগুলো ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতিতে খাঁজকাটা পিলাষ্টার, গোলাকার খিলান, কার্নিশ, মোল্ডিং, কিয়স্ক এবং পারাপেট দ্বারা সমৃদ্ধ। পূর্ব ও পশ্চিমদিকে ভারসাম্য রক্ষার জন্য অনুরূপ দু'টি ফটক নির্মিত হয়েছে। গম্বুজটি অষ্টকোণাকার ড্রামের উপর থেকে উপরে উঠে গেছে। এ গম্বুজের নিচে চতুষ্কোণাকার কক্ষটি অভ্যর্থনা কক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মধ্যভাগে এই কক্ষটি ভবনটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে, পূর্ব প্রান্ত এবং পশ্চিমে প্রান্ত। পূর্বদিকে বৈঠকখানা রয়েছে এবং পশ্চিমদিকে নাচঘর (ball room) এবং শয়নকক্ষ। উত্তর এবং দক্ষিণদিকে ভল্টের বারান্দা দেখা যাবে। এর সম্মুখে মধ্যভাগে একটি খোলা টিরেস বা পোর্টিকো। অভ্যর্থনা কক্ষের পিছনের কক্ষটিতে পেঁচানো সিঁড়ি নির্মিত হয়েছে। এ সিঁড়ি দিয়ে নিচের তলায় যাওয়া যায়। দ্বিতলের ভূমি-নকশার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নিচের তলার কক্ষগুলোতে সাজানো হয়েছে। পশ্চিম দিকে ভোজনকক্ষ এবং পূর্ব দিকে দরবার কক্ষ রয়েছে।"

আহসান মঞ্জিলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রধান স্থপতির সহায়তায় এটিকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পূর্বে এটি অবাঞ্ছিত লোকদের আড্ডাখানা ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ জায়গা দখল করে তাদের ব্যবসা চালাত। অপরিচ্ছন্ন ও ভগ্নপ্রাপ্ত বহু অংশ জননিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ ছিল। অতঃপর ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জনের অবস্থান কালে গৃহিত আলোকচিত্র ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করে নীল নকশা তৈরি করা হয়। নবাবদের পরিবারকে স্থানান্তরি করা হয়, জঙ্গল পরিষ্কার করা হয় এবং ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে একটি সাইট অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। পুরাতন মঞ্জিলের সাথে মিল রেখে আহসান মঞ্জিলটি পুনঃনির্মিত ও অলঙ্কৃত করা হয় যাতে এর লুপ্ত ঐতিহ্য ও গৌরব আবার ফিরে আসে।

প্রধান স্থপতি শাহ আলম জহিরুদ্দীন 'History of Architectural conservation and Government initiatives in Bangladesh' শীর্ষক প্রবন্ধে যা 'Architectural Conservation : Bangladesh'-এ প্রকাশিত হয়েছে, সংরক্ষণ পদ্ধতির বিষদ বিবরণ দেন। তিনি বলেন, "যদিও অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মুঘল স্থাপত্যকীর্তির প্রতিফলন দেখা যায় তবুও জাগতিক (secular) ইমারতসমূহে ইউরোপীয় স্থাপত্যের প্রভাব দেখা যাবে। চতুর্ভুজের মধ্যভাগে বিশালাকার প্রাসাদ আহসান মঞ্জিলটি ইউরোপীয় স্টাইলে নির্মিত যাতে ভারতীয় (মুঘল) প্রভাব বিদ্যমান। মধ্যভাগ তিন খিলানবিশিষ্ট সুদৃশ্য পোর্টালটি দ্বারা সমৃদ্ধ সিঁড়ির শ্রেণীতে মুঘল স্থাপত্যের প্রভাব দেখা যাবে কিন্তু নিম্নভাগে প্লাস্টারের অলঙ্করণ এবং আইওনিক স্তম্ভ। গোলাকার খিলান ইউরোপীয় ধাঁচে সৃষ্টি করা হয়। এ ছাড়া গম্বুজের আকৃতি ও গঠন এবং নির্মাণকৌশল, আটকোনাকার ড্রাম সমস্তই ইউরোপীয় স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত। প্যারাপেট নকশা, প্লাস্টারে কাটা মোটিভ, স্তম্ভের উপর নির্মিত কিয়স্ক ভারতীয় স্থাপত্যরীতির প্রতিফলন।" প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এবং স্থাপত্যকলা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আজ আহসান মঞ্জিল তার প্রাচীন ঐতিহ্য ও গর্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমানে এটি পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ, কারণ ঘরগুলোতে তখনকার দিনের আসবাবপত্র, তৈজসপত্র, দেওয়াল-নকশা প্রভৃতি বহু দর্শনীয় বস্তু দ্বারা সাজানো হয়েছে। বর্তমানে এতে আছে খাজাঞ্চিখানা, ঘণ্টাঘর, বিলিয়ার্ড রুম, ভোজ-কক্ষ, অবসর কক্ষ, রন্ধনশালা, তৈজসপত্র রাখার কক্ষ, শয়নকক্ষ, দরবারগৃহ, নাচঘর, বৈঠকখানা, খাসমহল, মেহমানখানা বা অতিথিভবন। পুরাতন ফ্রেঞ্চ কোয়ার্টারটি মহিলাদের কোয়ার্টারে রূপান্তরিত করা হয়। আহসান মঞ্জিলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে জাতীয় জাদুঘর।

(ঙ) তেজগাঁ

৭১। মালিক আম্বরের মসজিদ, সমাধি এবং সেতু, ১৬৭৯-৮০

যে রাস্তাটি শাহবাগ থেকে ফার্মগেটের দিকে গেছে অর্থাৎ এয়ারপোর্ট (ময়মনসিংহ) রোডের যে স্থানটি তেজগাঁ বা তসতরীবাজার সে স্থানটিতে বর্তমানে কারওরান বাজার

অবস্থিত। হোটেল সোনারগাঁর সম্মুখে মুঘল আমলের একটি মসজিদ, সমাধি ও সেতু নির্মিত হয়। একসময় ময়মনসিংহ রোডের এ স্থানে এস্কাটন খালের উপর একটি সেতু ছিল। এটি ছিল মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিমে। খিলান দিয়ে নির্মিত সেতুটি নির্মাণ করেন মালিক আম্বর। তিনি খোজা ছিলেন এবং নবাব শায়েস্তা খানের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। যে খিলানের উপর ভিত্তি করে সেতুটি নির্মিত হয় তা চার কেন্দ্রবিন্দু থেকে (four-centred) সৃষ্টি করা হয়, যা মুঘলরীতির পরিচালক। উভয় পাশে পানি প্রবাহিত হবার মতো ব্যবস্থা ছিল। উল্লেখ্য যে, মুঘল আমলে বেশ কয়েকটি সেতু নির্মিত হয় কারণ শহরের মধ্য দিয়ে খাল ও জলধারা (stream) প্রবাহিত হত—যেমন টঙ্গী সেতু, তাঁতিবাজার সেতু, পাগলা সেতু, নারিন্দা সেতু ইত্যাদি। বর্তমানে এগুলোর কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট নেই।

মালিক আম্বর এ স্থানে একটি তিনগম্বুজ আয়তাকার মসজিদ উঁচু ভিতের উপর নির্মাণ করেন, যার ফলে এটি বহু দূর থেকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মোহম্মদ যাকারিয়ার ভাষায়, "পূর্বদিকে একপ্রস্থ সিঁড়ি পার হলে একটি তোরণ পড়ে। ইষ্টক নির্মিত তোরণে কষ্টি পাথরের চৌকাঠ (frame)। তোরণ পার হলেই মসজিদের প্রাচীর ঘেরা অঙ্গন। অঙ্গনের পশ্চিম দিক ঘেঁষে মসজিদটি নির্মিত। আদিতে গম্বুজবিশিস্ট এ মসজিদের পূর্বদিকে ছিল ৩টি দরজা এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকে ছিল ১টি করে দরজা। পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মেহরাব। দরজাগুলোতে কালো পাথরের চৌকাঠ। মেহরাবগুলি পাথরের এবং সেগুলিতে সুন্দর নকশার কারুকার্য আছে। কেন্দ্রীয় মেহরাবের পাশে মিম্বর। সেটিও পাথরের তৈরি। মসজিদের চারকোণে ৪টি সুন্দর মিনার বা টারেট (turret) ছিল। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উপরে ছিল একটি শিলালিপি। শিলালিপি থেকে জানা যায় যে ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে নওয়াব শায়েস্তা খানের প্রধান খোজা খাজা আম্বর এ মসজিদ, মসজিদের অঙ্গনে একটি পাকা কুয়া ও মসজিদের দক্ষিণে একটি পাকা পুল নির্মাণ করেন।" দানীর মতে, ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে মসজিদ কূপ ও সেতুটি নির্মিত হয়। এ শিলালিপিটি প্রধান খিলানপথের উপরে গাঁথা ছিল।

মালিক আম্বরের মসজিদটি শায়েস্তা খানী রীতিতে নির্মিত। আহমদ হাসান দানী বলেন, "মসজিদটি ইদানীং সংস্কার করা হলেও এর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো, যেমন তিন গম্বুজ, প্লাস্টার করা সম্মুখভাগ এবং অভ্যন্তরের হলঘর শায়েস্তা খানী স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত। এ ইমারতের অন্যতম অপর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মিহরাব, মিম্বর এবং খিলানে পাথরের ব্যবহার। এসব কালো কষ্টিপাথর রাজমহল থেকে বাংলা মুলুকে আনা হয়।"

মসজিদের উত্তরে ইটের তৈরি একটি শবাধার রয়েছে, যেখান মালিক আম্বর শায়িত রয়েছেন। মালিক আম্বর একটি সেতুও নির্মাণ করেন, যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

৭২। টঙ্গী সেতু, সপ্তদশ শতাব্দী

টঙ্গী নদীর উপর আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বাংলার সুবাদার মীর জুমলা একটি সেতু নির্মাণ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কে ঢাকা থেকে উত্তরে উত্তরা পার হয়ে টঙ্গী যাবার পথে এ সেতুটি নির্মাণ করেন। পাগলা সেতুর মতোই এটি মজবুত করে গঠিত ছিল এবং উত্তরাঞ্চলে যাতায়াতের জন্য এটি ব্যবহৃত

হত। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় বোমা মেরে এটি উড়িয়ে দেওয়া হয়। যাহোক ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার তদানিন্তন কালেক্টর ডি' ওয়েলি টঙ্গী সেতুর একটি জলরঙের চিত্র অঙ্কন করেন, যা দেখে সেতুর স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য অনুমান করা যায়। এটি ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে অঙ্কিত। নাজমা খান মজলিস তাঁর প্রবন্ধ "Dhaka in early nineteenth century paintings" যা Dhaka Past resent and Future গ্রন্থে প্রকাশিত হয়, টঙ্গী সেতুর চিত্রটি প্রকাশ করেন। তাঁর ভাষায়, "In support of this (extension of Shaista Khan's administrative area of Dhaka Buriganga upto Tongi, the northern extremity of Dhaka has been painted by D' Oyly captioned 'The ruins of the Tongi (Tungi) bridge'. It is a picturesque bridge though now dilapidated. Stylistically it belongs to the Shaista Khani, group of architecture" বঙ্গানুবাদ : "এ মতের (ঢাকার বুড়িগঙ্গা থেকে টঙ্গী পর্যন্ত শায়েস্তা খানের প্রশাসনিক এলাকা) সমর্থনে ঢাকার উত্তরাঞ্চল হিসাবে ডি' ওয়েলি 'টঙ্গী সেতুর ধ্বংসাবশেষ' শীর্ষক একটি চিত্র অঙ্কন করেন। (চিত্র দেখে ধারণা করা যায়) যে এটি খুবই চমৎকার সেতু ছিল, যদিও ধ্বংসপ্রাপ্ত। স্থাপত্যরীতির দিক থেকে এটি শায়েস্তা খানী নামে অভিহিত করা যায়।" পাগলা সেতুর সাথে টঙ্গী সেতুর যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। তিনটি চার বিন্দুকেন্দ্রিক খিলানের, যার উপরিভাগ সামান্য বক্রাকার (ogee) এবং খুবই প্রশস্ত, সাহায্যে সেতুটি নির্মিত। সেতুটির দেয়াল খুব প্রশস্ত। মোটা করে ইটের স্তর সৃষ্টি করে পিলাস্টার দিয়ে মজবুত করা হয়।

মহানগর ঢাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ

নারায়ণগঞ্জ

ঢাকা মহানগর ছাড়াও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্থাপত্যকলার অসাধারণ ও অপূর্ব নির্দশনটি দেখা যাবে। ঢাকার দক্ষিণে বন্দরনগরী অবস্থিত। প্রায় বুড়িগঙ্গা নদীর তীর বরাবর প্রসারিত ঢাকার পোস্তগোলা থেকে লক্ষ্যা নদী পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ মাইল পথ। যাত্রাপথে পাগলা নামক স্থানে দেখা যাবে সেতু যা পূর্বেই বলা হয়েছে। এর পরে ফতুল্লা নামক জনপদ, এখানে মুঘল কর্মকর্তা ফতেহউল্লাহর নাম থেকে নামকরণ করা হয়েছিল। তিনি এখানে এক মসজিদ এবং সম্ভবত জলদুর্গ নির্মাণ করেন।

নারায়ণগঞ্জ বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত নদীবন্দর। এর নামকরণ হয়েছে নারায়ণ বিগ্রহ থেকে। বিষ্ণুর অপর নাম নারায়ণ, কথিত আছে যে বিধানলাল পাণ্ডে, যিনি বিশ্বস্ততার সাথে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজবাহিনীর সহায়তা করেন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট থেকে লাখেরাজ সম্পত্তি লাভ করেন। তিনি ঠাকুরের সেবাযত্ন, গরিব-দুঃখীদের সাহায্যে এবং নিজের ভরণপোষণের জন্য এ লাখেরাজ সম্পত্তি লাভ করেন। যাহোক, নারায়ণগঞ্জের সর্বপ্রাচীন পূর্বাঞ্চল হাজীগঞ্জ নামে পরিচিত। পূর্বে মুঘলদের আমলে নাম ছিল খিজিরপুর, এখানে একটি জলদুর্গ সহজেই নজরে পড়ে, যা ভুলক্রমে মীর জুমলার কীর্তি বলা হয়ে থাকে। লক্ষ্যা এবং বুড়িগঙ্গার সঙ্গমস্থলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে এ দুর্গটি

নির্মিত হয়। এ অঞ্চলে শায়েস্তা খানের সময়ের কয়েকটি ইমারত দেখা যাবে, বিশেষ করে উল্লেখ্য বিবি মরিয়ম বা তুরান দুখত বা বিবি বিবানের সমাধি। দানী মনে করেন যে, তিনি শায়েস্তা খানের কন্যা ছিলেন। হাজীগঞ্জ এলাকায় রয়েছে দুর্গ, বিবি মরিয়মের মসজিদ ও সমাধিসৌধ।

১। খিজিরপুর বা হাজীগঞ্জ দুর্গ, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ (৩৯)

বাংলাদেশে দু'ধরনের দুর্গ দেখা যাবে (ক) দুর্গপ্রাসাদ, যেমন লালবাগ দুর্গ, গৌড়ের প্রাসাদদুর্গ Citadel of Gaud .(খ) জলদুর্গ। জলদস্যু আরাকানী ও ফিরিঙ্গিদের আক্রমণে বাংলাদেশ এক সময় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের দমন এবং বিদ্রোহী বারোভুঁইয়াদের বিদ্রোহ দমনের জন্য নদীর বাঁকে বেশ কয়েকটি দুর্গ বাংলায় মুঘলগণ নির্মাণ করেন। যেমন হাজীগঞ্জের দুর্গ, মুন্সীগঞ্জের ইদরকপুর দুর্গ সোনাকান্দার দুর্গ। হাজীগঞ্জের খিজিরপুরে যে দুর্গ নির্মিত হয় তা পাঁচ কোনাকার (pentagonal) উল্লেখ্য যে. এ দুর্গের বাহুগুলো এক মাপের নয়। উঁচু ঢিবির উপর নির্মিত প্রাচীরবেষ্টিত (bastion wall) এবং উত্তর-পশ্চিমে মোটামুটি ২৫০ ফুট এবং উত্তর-দক্ষিণে ২০০ ফুট। দুর্গের কোনাগুলো গোলাকারে নির্মিত। কোনাগুলোতে কামান বসানোর জন্য বুরুজ নির্মিত হয় এবং এগুলো মোটামুটি এখনও টিকে আছে। দুর্গের দেয়াল বেশ উঁচু। নদীর দিকে একটি সুউচ্চ খিলানসহকারে প্রবেশপথ বা ফটক নির্মিত হয়। ফটকটির খিলান চার বিন্দু থেকে কৌণিক খিলান সৃষ্টি করা হয়েছে। কয়েকটি সিঁড়ি বেয়ে ফটকে উঠতে হয়। ফটকের উভয় পাশে আয়তাকার কুলুঙ্গি রয়েছে। খিলানের উপর আয়তাকার প্যানেল এবং সবচেয়ে উপরে মার্লন রয়েছে। সমগ্র দুর্গটি প্যারাপেট দিয়ে ঘেরা এবং প্যারাপেটের মধ্যভাগে ছিদ্র রাখা হয়েছে যাতে তীর-ধনুক ব্যবহার করা যায়। প্রাচীরের বেষ্টনিদেয়াল উপরের দিকে খুবই প্রশস্ত এবং এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে হেঁটে যাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, এ সমস্ত জলদুর্গে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য কোনো বাসস্থান নির্মিত হয়নি। বর্ষাকালে যখন মগ ও ফিরিঙ্গিগণ ডাকাতি, রাহাজানি, লুটপাট, খুন-জখম করত তখন এ সমস্ত দুর্গ ব্যবহৃত হত। এ দুর্গের প্রকৃত নির্মাতা কে তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে ধারণা করা হয় যে, ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খানের শাসনামলে ফরাসি পর্যটক টেভারনিয়ার যখন বাংলা মুলুকে আসেন তখন তিনি হাজীগঞ্জ দুর্গটি দেখতে পান। অর্থাৎ শায়েস্তা খানের পূর্বে সম্ভবত ইসলাম খানের আমলে নির্মিত হয়। আর একটি কারণ হতে পারে এই যে এ সময় মগ ও ফিরিঙ্গিদের উৎপাত ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ এবং বারো ভুঁইয়াদের বিদ্রোহও চরমে ওঠে। বর্তমানে হাজীগঞ্জ, তথা খিজিরপুরের দুর্গ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত হয়েছে।

২। বিবি মরিয়মের মসজিদ ও সমাধিসৌধ, সপ্তদশ শতাব্দী

মসজিদ (৪০)

হাজীগঞ্জ দুর্গে দক্ষিণে ও নারায়ণগঞ্জ শহরের উপরভাগে অবস্থিত বিবি মরিয়মের মসজিদ। বিবি মরিয়মকে 'তুরান দুখত' বলা হত। আয়তাকার তিন গম্বুজবিশিষ্ট

মসজিদটি খুবই আকর্ষণীয়। মোহম্মদ যাকারিয়া বলেন, "উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই মসজিদের আয়তন বাইরের দিকে ৫০×২১ ফুট ও ভিতরের দিকে ৪৪×১১ ১/২ ফুট। একটি উদ্গাত অংশ আছে। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়াল দু'টি মোটামুটি ৩ ফুট করে পুরু। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশপথ আছে। ভিতরে পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহরাব। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পাশের দু'টি থেকে আকারে বড়। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের প্রবেশপথ দু'টি বাইরের দিকে সংকীর্ণ। কিন্তু ভিতরের দিকে বেশ স্ফীত। মসজিদের চার কোণে ৪টি মিনার বা টারেট ছিল। সেগুলিকে প্রায় নূতন করে নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে এগুলির আদি রূপ কি ছিল তা ধারণা করা কঠিন।" মসজিদের প্যারাপেট ও কার্নিশ সরলরেখায় নির্মিত। ছাদের উপরে আছে ৩টি গম্বুজ। কেন্দ্রীয় গম্বুজটি আকারে অন্য দু'টির চেয়ে বড়। মসজিদের সামনে ৫০×২১ ফুট আয়তনবিশিষ্ট একটি খোলা আঙিনা ছিল। সেখানে হাল আমলে একটি নূতন বারান্দা নির্মাণ করা হয়েছে এবং তাতে মসজিদের সৌন্দর্য অনেক ব্যাহত হয়েছে।"

বলাই বাহুল্য যে ঢাকায় ঐতিহ্যবাহী শায়েস্তা খান তিন গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার ভূমি-নকশা বিবি মরিয়মের মসজিদে প্রতিফলিত হয়েছে।

সমাধিসৌধ

আয়েশা বেগম 'শিল্পকলা' পত্রিকায় (১৩৯৪-৯৮ বাঃ) 'বিবি মরিয়মের সমাধি স্মৃতিসৌধ ঃ স্থাপত্য তাৎপর্য' শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁর ভাষায়, "বিবি মরিয়মের সমাধি বাংলাদেশের কেবল মুঘল স্থাপত্যেই নয়, সমগ্র মুসলিম সমাধি স্থাপত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একটি অনন্যসাধারণ সমাধি স্থাপত্যের নিদর্শন। .... প্রাচীরবেষ্টিত ফটকসম্বলিত প্রাঙ্গণের মূল ইমারত সমাধি এবং সমান্তরাল পশ্চিম দিকে সুরম্য তিন গম্বুজের বিবি মরিয়মের মসজিদ (সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ) এবং একইভাবে ভারসাম্য রক্ষা করে পূর্ব দিকে অতিথি অভ্যর্থনাগার। উত্তর দিকের বেষ্টনি প্রাচীরের মধ্যস্থলে সমাধির কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের সমান্তরালে এই প্রাঙ্গণে প্রবেশের প্রধান ফটক। পশ্চিম-উত্তর কোণে প্রাচীরের বাইরে কবর আছে। প্রবেশ ফটকের সাথে সঙ্গতি রেখে পরপর তিনটি ইমারতের পরিকল্পনা অবস্থানে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ঐক্যতান বিরাজ করছে।"

অতুলনীয় স্থাপত্য নিদর্শনের প্রতীক বিবি মরিয়মের মাজারটি তাঁর মসজিদের প্রায় ৫০ ফুট পূর্বদিকে অবস্থিত। একটু উঁচু ভিতের প্লাটফরমের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধরনের ভিত বা stybolate লালবাগ দুর্গের বিবি পরীর সমাধি সৌধেও দেখা যাবে। চত্বরের মধ্যভাগে বর্গাকৃতি এক গম্বুজবিশিষ্ট বিবি মরিয়মের সমাধিসৌধ। এর এক-একটি বাহু ৪৯ ফুট ১০ ইঞ্চি দীর্ঘ। মূল কেন্দ্রীয় গম্বুজবিশিষ্ট কক্ষটির এক দিকের দৈর্ঘ্য ২১ ফুট ৯ ইঞ্চি। সমাধিসৌধের মধ্যভাগে বর্গাকার কক্ষে শবাধারটি প্রতিষ্ঠিত। কেন্দ্রীয় শবাধার-সম্বলিত কক্ষের প্রতি বাহু ১০ ফুট ১০ ইঞ্চি। এই কেন্দ্রীয় শবাধার কক্ষটির চারপাশে টানা বারান্দা। বারান্দা ভল্ট দ্বারা আবৃত। সমাধির দেয়াল প্রায় ২ ফুট ৭ ইঞ্চি প্রশস্ত। এ ইমারতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে উঁচু চত্বরের উপর কালো পাথরের ভিত্তি-ভূমির উপর

সমাধিসৌধটি নির্মিত হয়েছে। শায়েস্তা খানের আমলে বেশ কয়েকটি ইমারতের ভিত্তি-ভূমিতে কষ্টিপাথরের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন অজানা সমাধি, মোহম্মদপুর, যা শায়েস্তা খানের কন্যার বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

বিবি মরিয়মের শবাধারটি সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি এবং তা অতি সুন্দর ফুল লতাপাতার কারুকার্যমণ্ডিত। আয়েশা বেগম যথার্থই বলেছেন যে, এরকম সাদা মার্বেল পাথরের শবাধার বিবি পরীর সমাধি ও কুমারপুর (রাজশাহী)-এর সমাধিতে প্রত্যক্ষ করা যায়। ইট ও পাথরের উপর্যুপরি ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ছাদ পড়ে গিয়েছিল ও দেয়াল বিধ্বস্ত হয়ে যায় সম্ভবত টর্নেডো বা ভূমিকম্পে। মোহম্মদ যাকারিয়া ও গ্রন্থকার যখন সমাধিটি দেখেন তখন এটির গম্বুজ ও ভল্টগুলো পড়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তৎপরতায় এ কীর্তিটি সংরক্ষিত ইমারতের তালিকায় স্থান পায় এবং প্রত্নতত্ত্ব দফতর এর সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

মূল সমাধিকক্ষে প্রবেশের জন্য উত্তরদিক ব্যতীত অপর তিনদিকে দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিমে প্রবেশপথ ছিল। এখন কেবলমাত্র দক্ষিণদিকেরটি খোলা রয়েছে, অপর দু'টি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইমারতের উপরে একটি গম্বুজ রয়েছে। দানী বলেন যে, ড্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত গম্বুজটি ইমারতের তুলনায় ক্ষুদ্রাকৃতি এবং অভ্যন্তরে একটি ইট চুন-সুরকির ক্যানোপি ব্যবহৃত হয়েছে। লক্ষণীয় যে আসমা সিরাজউদ্দীন বিবি মরিয়মের সমাধিসৌধের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন (Mughal Tombs of Dhaka) । দানী যে ক্যানোপির কথা বলেছেন আসমা সিরাজউদ্দীন তা সমর্থন করেননি। বস্তুত একমাত্র চিশতী বিহিস্তী ছাড়া অপর কোন ইমারতে ক্যানোপি বা প্যাভেলিয়ন ব্যবহৃত হয়নি। বর্তমানে অবশ্য ইচ্ছাকৃতভাবে এর উপর গম্বুজ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিবি মরিয়মের সমাধিসৌধের বাইরের দিকে তাকালে প্রতিটি দিকে পাঁচটি খাজকাটা খিলান দেখা যাবে। অর্থাৎ সর্বমোট ১৫টি খিলান রয়েছে। খিলানগুলো বহু-খাঁজবিশিষ্ট সূচালো (multi-cusped pointed arch)। পূর্বদিকের সম্মুখভাগে (facade) প্রথম ও চতুর্থ খিলানের পার্শ্বে দেয়ালে কুলুঙ্গি রয়েছে। গম্বুজটি বাল্বের ধারনের এবং উপরে কলসচূড়া শোভা পাচ্ছে, যা পদ্মপাতার ভিতর থেকে উপরে উঠে গেছে। খিলান চতুর্কেন্দ্রিক আকৃতির (four-centred arch)। সমাধির কার্নিশ সমান্তরাল প্যারাপেট মার্লন শোভা পাচ্ছে। বাইরের দেওয়ালগুলো প্যানেল নকশা দ্বারা অলঙ্কৃত। ইমারতের চার কোনায় বুরুজ রয়েছে, তবে খুব prominent বা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ছাদের উপরে বুরুজের কোনো অংশ যায়নি। গৌড়ের শাহ নিয়ামতউল্লাহর মাজারে যেমন একটি মিহরাব রয়েছে এরূপ কোনো মিহরাব এখানে দেখা যায় না। দারা বেগমের সামাধিতেও মিহরাব ব্যবহৃত হয়েছে।

মোহম্মদ যাকারিয়া যথার্থ বলেন, "এই মরিয়ম বিবির পরিচয় নিয়ে কিছু মতভেদ দেখা যায়। অধ্যাপক দানীর মতে নবাব শায়েস্তা খানের এক কন্যার নাম ছিল বিবি মরিয়ম। তাঁর মৃত্যুর পরে শায়েস্তা খান এ মাজার ও মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন বলে তিনি অনুমান করেন। সৈয়দ মোহম্মদ তাইফুরের মতে বিবি মরিয়ম ছিলেন ঈসা খান

মসনদ-ই-আলার স্ত্রী এবং তাঁর মৃত্যুর পর ঈসা খান এ সমাধিসৌধ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু ইমারতের স্থাপত্যকৌশল ও গঠনপ্রণালী দেখে মনে হয় এটি মোঘল আমলের। তাঁর মতে হাজীগঞ্জ দুর্গটিও প্রাক-মুঘল আমলের।" **প্রথমত**, বিবি মরিয়ম ছিলেন তুরান দুখত এবং শায়েস্তা খানের 'ওয়াসিয়তনামায়' 'ইরান দুখত' বা বিবি পরী এবং 'তুরান দুখত' (বিবি মরিয়মের) নাম পাওয়া যায়। **দ্বিতীয়ত**, তৈফুরের তথ্য নির্ভরযোগ্য নয় কারণ ঈসা খানের কোনো কীর্তিই খিজিরপুর বা হাজীগঞ্জে নেই। **তৃতীয়ত**, শায়েস্তা খানের হাজীগঞ্জে আসার সম্ভাবনা ছিল কারণ তাঁর সময়ে পাগলার পুলসহ আরও কয়েকটি ইমারত এ অঞ্চলে স্থাপিত হয়। আয়েশা বেগম যথার্থই বলেন, "বিবি পরীর সমাধিসৌধটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে নির্মিত মুঘল সমাধিস্থাপত্য। এ সময়কার মুঘল সমাধিস্থাপত্যের যেসব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তার সাথে বিবি মরিয়মের সমাধিস্থাপত্য বৈশিষ্ট্য খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ। এ সমাধি ইমারতের উপাদান, নির্মাণপদ্ধতি এবং সর্বোপরি স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে এই স্মৃতিসৌধটিকে শায়েস্তা খানের সময়ের নির্মিত সমাধি বলে প্রতীয়মান হয়।" উল্লেখ্য যে, এ দু'টি সমাধির অভ্যন্তরে যে প্রদক্ষিণ পথ ambulatory রয়েছে তা সাদৃশ্যপূর্ণ। অবশ্য বিবি মরিয়মের একটানা এবং বিবি পরীর আট অংশে বিভক্ত চার কোনায় চারটি এবং চার পাশে চারটি।

বিবি মরিয়মের সমাধি-সৌধের পশ্চিমে মসজিদ এবং পূর্বদিকে অতিথি অভ্যর্থনাগার। এ কারণে আয়েশা বেগম এটিকে তাজমহলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অবশ্য বিবি মরিয়মের সমাধির সাথে শাহজাহনের বিশ্ববিশ্রুত তাজমহলের কোনো দিক দিয়েই তুলনা হয় না।

মুন্সীগঞ্জ

১। ইদরাকপুর দুর্গ, সপ্তদশ শতাব্দী

নারায়ণগঞ্জ থেকে লঞ্চে এবং ঢাকা থেকে সড়কপথে বিক্রমপুরের মুন্সীগঞ্জে যাওয়া যায়। মুন্সীগঞ্জের প্রধান আকর্ষণ ইদরাকপুর দুর্গ। সোনাকান্দা এবং হাজীগঞ্জের দুর্গের মতো মগ ও ফিরিঙ্গিদের দমন করার জন্য এ জলদুর্গ নির্মিত হয়। কোনো এক সময় এটি ইছামতি নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। কত সনে ইছামতি বালুচরে পরিণত হয়েছে। মুন্সীগঞ্জ শহরের মধ্যভাগে এ প্রাচীর ইমারতটির একাংশ মহকুমা প্রশাসকের সরকারী বাসস্থান এবং অপর অংশ সাব-জেল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সোনাকান্দা দুর্গের তুলনায় আকারে ছোট এবং প্রতিরক্ষা প্রাচীর (bastion wall) খুব ছোট দেখায়। ভূমি থেকে মাত্র ৪ ফুট উঁচু; সম্ভবত মাটিতে বসে গিয়ে থাকবে অথবা বালুর চর উপরে ওঠায় উচ্চতা কমে গেছে। দেওয়ালে মোটা বুরুজ ব্যবহৃত হয় দুর্গের পূর্ব দেয়াল ঘেঁষে প্রায় কেন্দ্রস্থলে রয়েছে গোলাকার একটি বিরাট ড্রাম। এটি ১০০ ফুট ব্যাসার্ধবিশিষ্ট। এ ড্রামটি সুরক্ষিত করার জন্য আর একটি বেষ্টনিপ্রাচীর ব্যবহৃত হয়েছে। এই উঁচু ড্রামটি বুরুজ হিসাবে ব্যবহৃত হত এবং এখানে দূরপাল্লার কামান বসানো হত যাতে হার্মাদ, মগ ও ফিরিঙ্গিদের ধ্বংস করা যায়।

খুব সম্ভব ইদরাকপুর দুর্গটি ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে মীর জুমলা কর্তৃক নির্মিত হয়। এ দুর্গ সম্বন্ধে নাযিমুদ্দীন আহমদ বলেন, "An interesting group of fortresses guarding water routes to Dacca against the recurring raids of the

Portuguese and Mugh pirates in the 17th century, are still preserved in picturesque surroundings. One of these is perched on the bank of dried up Ichamati at Idrakpur in Munshiganj, about 15 miles south east of Dacca. The half buried remains of this brick fort was built in 1660 A.D. by Mir. Jumla, the Mughal Governor of Bengal as an outpost to ward off the pirates. It was a long (210'×240') masonry enclosure with a simple arched gateway on nonth and a circular bastion at each corner—filled solidly to rampart level—above which runs the battlemented parapet pierced by loopholes for musketry. Striking features of riverfort is an enormous solid circular platform or drum towards the river with a diameter of 108 feet. It rises to a height of about 30'and approached by flight of steps across the eastern wall of the main enclosure which itself is placed in a 130 feet wide annexe with a small bastion at the north east corner. The purpose of this huge drum evidently was to mount a high calibre cannon and to serve as a watch tower."

২। রেকাবীবাজার, টাঙ্গর শাহী মসজিদ, ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ্ব

মুন্সীগঞ্জের রেকাবীবাজার এলাকার টাঙ্গর নামক স্থানে একটি প্রাচীন মসজিদ দেখা যাবে। মুন্সীগঞ্জ শহর থেকে তিন মাইল পশ্চিমে এবং ঢাকার দক্ষিণাঞ্চল থেকে ১২ মাইল অদূরে অবস্থিত এই মসজিদটি, বর্তমানে যা সংস্কার করে আধুনিক করা হয়েছে। এ মসজিদে একটি শিলালিপি ছিল, যা বর্তমানে পশ্চিমপাড়া মসজিদের প্রাচীর-বেষ্টনিতে গাঁথা আছে। আদিতে টাঙ্গর শাহী মসজিদটি সুলায়মান কররানীর আমলে নির্মিত, যার তারিখ হিজরী ৯৭৬ উল্লেখ আছে অর্থাৎ ১৫৬৯ ইং অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

মসজিদটি এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গকার ইমারত, যার চার কোনায় চারটি অষ্টকোণাকার বুরুজ (tower) রয়েছে। আবু মুসার মতে, এটির পরিমাপ ৬.৯৫ বর্গমিটার। দেয়ালের প্রশস্ততা ২.২৫ মিটার। পূর্বদিকে তিনটি কৌণিক খিলানপথ রয়েছে। মধ্যভাগেরটি একটু বড়। বর্তমানে প্লাস্টার করা দেয়াল উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও দেখা যাবে। অভ্যন্তরে কিবলাপ্রাচীরে তিনটি মিহরাব দেখা যাবে। মধ্যবর্তী মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড়। খাঁজকাটা খিলান দ্বারা মিহরাবগুলো সজ্জিত। মসজিদটি একটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। স্কুইঞ্চের সাহায্যে গম্বুজ নির্মিত হয়েছে।

৩। সোনাকান্দা, দুর্গ, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ

ইদরাকপুর জলদুর্গের প্রায় অপর দিকে ধলেশ্বরী, শীতলক্ষ্যা এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর সঙ্গমস্থলে এবং বন্দরের হাজী বাবা সালেহের মসজিদ ও মাজার থেকে ১ মাইলের মধ্যে সোনাকান্দা অবস্থিত। এখানকার প্রধান আকর্ষণ জলদুর্গ। বর্তমানে ধলেশ্বরী আরও অনেক দক্ষিণদিকে সরে গিয়েছে এবং ব্রহ্মপুত্র নদী আরও অনেক পূর্বে সরে গিয়ে মৃতপ্রায়। আর শীতলক্ষ্যা নদী অনেক পশ্চিমে সরে গেছে। যে সময় সোনাকান্দা জলদুর্গ নির্মিত হয় তখন এর ভৌগোলিক অবস্থান ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

মির্জা নাথান তাঁর 'বাহারিস্তান-ই-গায়েবী' শীর্ষক গ্রন্থে বলেন, "গৌড় আকবর নগর অথবা রাজমহল, ঘোড়াঘাট, ঢাকা এবং এ ধরনের আরও কিছু দুর্গ ছাড়া বাংলায় প্রাচীন দুর্গ নেই বললেই চলে, কিন্তু প্রয়োজনে মাঝিরা এত দ্রুত দুর্গ নির্মাণ করতে পারে যে দক্ষ কারিগরেরাও কয়েকমাস বা বছর ধরে তা করতে পারবে না।" সোনাকান্দা নামকরণ নিয়ে নানা ধরনের জনশ্রুতি আছে। একটি কিংবদন্তি হচ্ছে যে ঈসা খান কেদার রায়ের বিধবা কন্যা সোনাবিবিকে বলপূর্বক বিবাহ করেন। তাঁর নাম সোনাবিবি। দুর্গে থাকাকালীন তিনি কেঁদেছিলেন তাই জায়গার নাম হয়েছে সোনাকান্দা। অপরদিকে ঈসা খানের স্ত্রী সোনাবিবি স্বামীর অবর্তমানে দুর্গ রক্ষা করতে অসমর্থ হয়ে কেঁদেছিলেন তাই এই দুর্গের নাম হয় সোনাকান্দা। কিন্তু এ সমস্ত জনশ্রুতি বিশ্বাসযোগ্য নয়।

হাজীগঞ্জ এবং ইদরাকপুর জলদুর্গের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সোনাকান্দা দুর্গ অধিকতর আকর্ষণীয়। আয়তাকারে নির্মিত এ দুর্গ পূর্ব-পশ্চিমে ৩০০ ফুট লম্বা ও উত্তর-দক্ষিণে ২০৮ ফুট প্রশস্ত। ইটের তৈরি দুর্গের দেয়ালগুলো ৩$\frac{১}{২}$ ফুট পুরু এবং ১০ ফুট উঁচু। দুর্গের পূর্বভাগ আয়তকারে নির্মিত হলেও পশ্চিমভাগ অর্ধগোলাকার ড্রাম-এর আকারে নির্মিত। অন্যান্য জলদুর্গের মতো এ অংশে একটি সুউচ্চ বেদি বা platform রয়েছে। এখানে বসানো হত দূরপাল্লার কামান এবং জলদস্যুদের উৎপাত বন্ধের জন্য কামান দাগা হত। যেহেতু জলদুর্গগুলো প্রাসাদদুর্গ ছিল না, সে কারণে এখানে বসতবাড়ি নির্মিত হয়নি। কেবলমাত্র সৈন্যসামন্ত ও রক্ষিবাহিনী থাকার ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে সোনাকান্দা দুর্গ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ যত্নসহকারে সংস্কার করেছে।

বন্দর

নারায়ণগঞ্জের অপরপ্রান্তে একটি ব্যস্তসমস্ত এলাকা হচ্ছে বন্দর। এর আর একটি নাম শাহ বন্দর। মুঘল শাসনামলে এটি একটি সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়িক কেন্দ্রে পরিণত হয়। ব্রিটিশ শাসনামলে বন্দরের গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দর (inland port) হিসাবে অধিক প্রাধান্য লাভ করে। এতদসত্ত্বেও জেমস টেলর বলেন যে, "এখানের বড় বড় বিপণিগুলোতে তৈলবীজ, লবণ, শস্য, চিনি, তামাক, লোহার দ্রব্যাদি, কাষ্ঠসামগ্রী প্রভৃতি বিক্রি হত। শাহ বন্দরের প্রধান আকর্ষণ দুটি—শাহ হাজী বাবা সালেহের মূল এক গম্বুজ, যা পরে তিন গম্বুজে রূপান্তরীত মসজিদ, হিজরী ৯১১/১৫০৫ খ্রিষ্টাব্দে এবং তার মাজার এবং খন্দকারতোলা মসজিদ, হিজরী ৮৮৬/১৪৮২ খ্রিস্টাব্দ।

১। খন্দকারতোলা, শাহী মসজিদ, হিজরী ৮৮৬/১৪৮২ খ্রিস্টাব্দ

সৈয়দ মোহম্মদ তৈফুর তাঁর 'Glimpses of Old Dhaka' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, শাহ বন্দর শাহবাবার নাম থেকে নামকরণ করা হয়েছে। যে মসজিদ রয়েছে তার নির্মাণ তারিখ ১৪৩২ খ্রিস্টাব্দ বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু তাঁর প্রদত্ত সন তারিখটি সঠিক নয়। সামসুদ্দীন আহম্মদ তাঁর 'Inscriptions of Bengal' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, সুলতান জালালুদ্দীন ওয়া দুনিয়া আবুল মোজাফফর ফতেহ শাহের রাজত্বকালে হিজরী ৮৮৬/১৪৮২ খ্রিস্টাব্দে মালিক বাবা সালেহ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে

খন্দকারতোলা বা শাহী মসজিদ নামে পরিচিত এ মসজিদটি সম্বন্ধে আহমদ হাসান দানী, মোহম্মদ যাকারিয়া এবং পারভীন হাসান বর্ণনা করেন। বর্গকার এবং গম্বুজ বিশিষ্ট শাহী মসজিদটি পারভীন হাসান তাঁর 'Eight Sultanate Mosques of Dhaka District' শীর্ষক প্রবন্ধে যা UNESCO প্রকাশিত The Islamic Heritage of Bengal গ্রন্থে প্রকাশিত হয়, বর্ণনা করেন। অন্যদিকে মোহম্মদ যাকারিয়াও দীর্ঘ আলোচনা করেন। তাঁর ভাষায়, "বর্গাকারে নির্মিত এই মসজিদের আয়তন বাইরের দিকে ৩৪×৩৪ ফুট। দেয়ালগুলো প্রায় ৬ ফুট প্রশস্ত। মসজিদের ভিতরে আছে একটিমাত্র কক্ষ এবং এই কক্ষের আয়তন ২২×২২ ফুট। মসজিদের চার কোণে ৪টি মিনার বা টারেট আছে। অষ্টকোনাকারে নির্মিত এই মিনারগুলি কার্নিশের খুব উপরে ওঠেনি। উপরে আছে একটিমাত্র গম্বুজ এবং তা আকারে বিরাট ও দেখতে ভারি মনোরম। গম্বুজটি দেখতে অনেকটা বাগেরহাটের রণবিজয়পুর মসজিদের গম্বুজের মতো। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশপথ আছে। পশ্চিম দিকে আছে ৩টি মিহরাব। মিহরাবগুলোতে কালো পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। মসজিদের মেঝেতেও কালো পাথর আছে। সামনের দেয়ালে পোড়ামাটির ফলক ছিল। কিন্তু মসজিদটিতে পরবর্তীকালে এত সংস্কার করা হয়েছে যে পোড়ামাটির কাজ এখন আর নেই। এত সংস্কারের পরেও মসজিদের প্রাচীনত্ব সহজেই ধরা পড়ে। মসজিদের কার্নিশ বেশ বাঁকানোভাবে তৈরি ছিল এবং এখনও তা চোখে পড়ে।

খন্দকারতোলা বা শাহী মসজিদটিতে প্রাক-মুঘল এবং মুঘল স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ দেখা যাবে।

২। হাজী বাবা সালেহের মসজিদ ও মাজার, হিজরী ৯১১/১৫০৫ খ্রিস্টাব্দ (৪১)

পারভীন হাসান তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে বাবা সালেহ্ কর্তৃক নির্মিত দ্বিতীয় মসজিদটির সঠিক বর্ণনা দেন। খন্দকারতোলা মসজিদকে এক মাইলের মধ্যে স্থানীয়ভাবে সম্মানিত সাধক ও সুফী হাজী বাবা সালেহ্ অপর যে মসজিদটি নির্মাণ করেন তা তাঁর নাম থেকেই পরিচিত। মাত্র ২৫ বছরের ব্যবধানে প্রায় একই এলাকায় বাবা সালেহ্ অপর যে মসজিদটি নির্মাণ করেন সেটিও আসলে এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার ইমারত। এটির নির্মাণ-তারিখ হিজরী ৯১১/১৫০৫ খ্রিস্টাব্দ। সুলতান হোসেন শাহের আমল শাহ্ বন্দরে এ মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন হয় মুসল্লীদের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে। এতে প্রতীয়মান হয় যে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় ইসলামের ছায়াতলে আসতে থাকে। পারভীন হাসান এ মসজিদের পরিমাণ ৩৬ বর্গমিটার বলে উল্লেখ করেন। মূল মসজিদের কাঠামো ঠিক রেখে উত্তর ও দক্ষিণে সম্প্রসারণ করে ক্ষুদ্রাকৃতি দু'টি গম্বুজবিশিষ্ট কক্ষ সংযোজন করেন। যার ফলে এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার মসজিদটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদের রূপান্তরিত হয়। উপরন্তু, একটি প্রশস্ত বারান্দাও নির্মিত হয়। এর ফলে মৌলিক স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য ব্যাহত হয়।

মোহম্মদ যাকারিয়া হাজী বাবা সালেহ প্রসঙ্গে বলেন যে, প্রথম মসজিদটি নির্মাণকালে তাঁর নামের পূর্বে হাজী শব্দটি ছিল না। কিন্তু ২৪/২৫ বছর পরে তিনি যখন

অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেন তখন তাঁর নামের পূর্বে হাজী শব্দটি দেখা যায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে তিনি হজ্জব্রত পালন করার পর আল্লাহর মনস্তুষ্টির জন্য আর একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি সম্ভবত এ অঞ্চলের একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন অথবা বুজুর্গ পীর ওলী আল্লাহ।

উপরোক্ত মসজিদের পূর্বদিকে একটি মাজার দেখা যাবে। এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার এ ইমারতটিতে হাজী বাবা সালেহ সমাহিত রয়েছেন। শবাধার প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। প্রাচীন মাজারটি ভেঙে নষ্ট হয়ে গেলে পরবর্তীকালে একটি আধুনিক মাজার নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে মাজারের গম্বুজটি সাদা চুনকাম করা।

নবীগঞ্জ

লক্ষ্যা নদীর পূর্বতীরে এবং নারায়ণগঞ্জ বন্দরনগরীর অপর পাড়ে নবীগঞ্জ অবস্থিত। নবীগঞ্জ অতি আধুনিককালে নামকরণ হয়েছে। সম্ভবত নবী করিমের তথাকথিত কদম রসুলের জন্য জনপদটির নাম হয়েছে নবীগঞ্জ। পূর্বে নাম ছিল রসুলপুর। মির্জা নাথান তাঁর 'বাহারিস্তান-ই-গায়েবী'তে এ স্থানের নাম রসুলপুর এবং কদম রসুল বলে উল্লেখ করেন। কদম রসুল অর্থ রসুলের পায়ের ছাপবিশিষ্ট একটি কষ্টিপাথর। তিনি বলেন যে এ পদছাপটি মাসুম খান কাবুলি আরব দেশের কোনো বণিকের নিকট থেকে অনেক টাকা দিয়ে ক্রয় করেন। সৈয়দ আওলাদ হাসান বলেন যে, দেওয়ান মুনাওয়ার খান (ঈসা খানের পৌত্র এবং মুসা খানের পুত্র) এটি আবিষ্কার করেন এবং তিনি এটিকে কেন্দ্র করে একটি অনিন্দ্যসুন্দর ইমারত নির্মাণ করেন। এস. এম. তাইফুর আওলাদ হাসানকে সমর্থন করে বলেন যে, ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে ঈসা খানের সেনাপতি মাসুম খান কাবুলি কদম রসুল নামে একটি স্মৃতিসৌধ (shrine) নির্মাণ করেন। কিন্তু আহমদ হাসান দানী তাঁদের মতবাদকে সমর্থন করেননি। মীর্জা নাথান উল্লেখ করেন যে লক্ষ্যা নদীতীরে একটি দমদমা বা দুর্গ বা উঁচু ভূমি ছিল। এ স্থানটিকে তিনি কদম রসুল বা রসুলপুর নামে অভিহিত করেন।

১। কদম রসুল, স্মৃতিসৌধ (Shrine) অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দী

কদম রসুল নামের ইমারতে হযরত মুহম্মদের (সা) যে কদম মোবারক বা পায়ের ছাপবিশিষ্ট কষ্টিপাথর রয়েছে তা কতটুকু প্রকৃত অথবা আসল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। গ্রন্থকার এ মাজারটিকে দেখেছেন এবং তাঁর মনে হয়েছে এটি 'fake', বিশেষ করে কয়েকটি কারণে। প্রথমত, এটি মোটেই গভীর নয় এবং ক্ষুদ্রকার। দ্বিতীয়ত, পাথরে রসুলের (স) পদচিহ্ন রয়েছে তা উচ্চ মাজার নয়, অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে গাঢ় কাল কষ্টি পাথর নয়, যা বাংলার মুসলিম স্থাপত্যকীর্তিতে ব্যবহৃত হয়েছে। তৃতীয়ত, কদম রসুলের সাথে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত নয় যেমন জেরুজালেমে খলিফা আব্দুল মালিক কর্তৃক ৬৯১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত ডোম-অব-দি রক, যেখানে পদচিহ্ন রেখে নবী করিম (স) উর্দ্ধগমন বা মিরাজে গমন করেন। চতুর্থত, বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বহু স্থানে কদম মোবারক দেখা যাবে, যেমন গৌড়ের কদম রসুল, চট্টগ্রামের কদম মোবারক।

নবীগঞ্জে একটি উঁচু ভূমির উপরে বর্গাকারে নির্মিত একটি ছোট একতলা ইমারতে বর্তমানে পাথরটি সংরক্ষিত আছে এবং উৎসাহী ভক্তদের মুতাওয়াল্লী কখনো কখনো পাথরটি দেখিয়ে থাকেন এবং এর ধোয়া পানি পান করান যাতে রোগ সেরে যায়। এ

গৃহের পূর্বদিকে আছে একটি ছোট বারান্দা। যাকারিয়া বলেন, "এ গৃহ ও বারান্দা ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার বিখ্যাত জমিদার গোলাম নবী কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এতে পরবর্তীকালে এত সংস্কারকার্য করা হয়েছিল যে এর আদিরূপ বের করা প্রায় অসম্ভব।" আহম্মদ হাসান দানী অন্যদিকে বলেন যে, "ঢাকা জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে ১৭৩৮ খ্রিস্টাব্দে গোলাম নবী কর্তৃক কদম রসুল প্রতিষ্ঠিত হয়।" সৈয়দ মুহম্মদ তৈফুর উদ্ভট কথা বলেন। তাঁর ভাষ্য, "The Qadam Rasul is a pre-Mughal shrine in Dhaka district ..... Travellers would be attracted to the place by colourful building. Standing upon a high ground (called Damdama), like many such mausoleums in Indo-Pakistan the shrine contains foot print upon a black stone which is said to be the foot print of the Prophet Muhammad. In 1558 it was installed here by Masum Khan Kabuli, the general of Isa Khan's army. Islam Khan, Shah Jahan and all other princes and Umeras used to pay their respect to the shrine on their way to and from Dhaka city. Ihtimam Khan, Commander of the Mughal fleet of Islam Khan, who died in Sarail of Mymensing district was buried in this place." এস. এম. তৈফুর বলেন যে, নবীগঞ্জের কদমরসুল স্মৃতিসৌধটি একটি প্রাক-মুঘল যুগের ইমারত যদিও তিনি ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে মাসুম খান কাবুলিকে এর নির্মাতা বলে চিহ্নিত করেন। ১৫৮০ সন তারিখকে নির্মাণকাল ধরে নিলেও প্রাক-মুঘল বলা যায় না এ ইমারতটিকে, কারণ প্রাক-মুঘল যুগের সমাপ্তি হয়েছে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে। ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দ ছিল পাঠান যুগ বা কররানীর যুগ। দ্বিতীয়ত, স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এটি অতি সাধারণ আধুনিক ইমারত, যা অষ্টাদশ/ঊনবিংশ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। দানী বলেন যে, গোলাম নবী নামে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে এ ইমারতটি নির্মাণ করেন। যদিও তৈফুর ভুলবশত বলেন যে, ত্রিপুরার জমিদার গোলাম নবী ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে এটি পুনঃনির্মাণ করেন।

তথাকথিত কদম রসুলসম্বলিত গৃহের দক্ষিণদিকে একটি লঙ্গরখানা ছিল এবং উত্তরদিকে ছিল ঢাকার নায়েব-ই-নাযিম নবাব জসরত খান কর্তৃক নির্মিত একটি গৃহ। এর পূর্বদিকে ছিল একটি হুজরাখানা। এসব ইমারতের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। অতি সম্প্রতি এখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। সুলতান শাহ্ সুজা কদম রসুলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৮০ বিঘা ভূমি দান করেন।

কদম রসুল স্মৃতিসৌধের প্রধান আকর্ষণ সুউচ্চ প্রবেশ-তারণ। মোহাম্মদ যাকারিয়ার ভাষায়, "এসব ইমারতের পশ্চিমদিকে নদীতীরে আছে একটি বিরাট দোতালা-ইমারত। এটিকে কদম রসুলের তোরণদ্বার বলা হয়। অর্ধবৃত্তাকারের বিরাট খিলানের সাহায্যে নির্মিত তোরণদ্বারের উপরে ও দু'পাশে আছে মুঘল স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত উঁচু ইমারতাদি। এই ইমারতটি ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে গোলাম নবীর পুত্র গোলাম মোহম্মদ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। এই তোরণদ্বারটিই বর্তমানে কদম রসুলের আকর্ষণীয় ইমারত।"

সোনারগাঁও

পূর্ব ইতিহাস

নামকরণ ঃ সোনারগাঁও কিংবা প্রচীনকাল থেকে অধিক পরিচিত 'সুবর্ণগ্রামের' মানে হচ্ছে সোনালি গ্রাম। লোকস্মৃতিতে এটি 'স্বর্ণনগর' নামেও পরিচিত। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 'সুবর্ণগ্রাম' প্রাক-মুসিলম যুগের খুবই প্রাচীন কৃষি ও শিল্পসম্পদ ও ঐশ্বর্যের ইঙ্গিত বহন করছে। কানিংহামের মতে, হিন্দু কীর্তির নিদর্শন এখানে খুব সামান্য-সংখ্যক দেখা গেলেও মুহাম্মদ ইব্‌ন বখতিয়ার খালজীর পূর্বে এটি অবশ্যই ছিল হিন্দু রাজধানী। রেনেলের ভাষায়, "সোনারগঙ বা সুনেরগাউম ছিল এক বিশাল নগরী, এবং ঢাকা নির্মাণের পূর্বে এটিই ছিল বাংলার পূর্বাঞ্চলের রাজধানী, কিন্তু ক্রমশ এটি ধ্বংস হতে হতে একটি নগণ্য গ্রামে পরিণত হয়ে গেছে।"

অবস্থান ঃ সোনারগাঁও ঢাকা নগরী থেকে প্রায় ১৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে এবং নারায়ণগঞ্জ থেকে তিন মাইল পূর্বে অবস্থিত। দৈর্ঘ্যে ৪৮ মাইল ও প্রস্থে ২০ মাইল জুড়ে এ বিশাল অঞ্চলটির অবস্থান। পুরাতন মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র ও লক্ষ্যা এ তিনটি বড় নদীর সঙ্গমস্থলে এটি অবস্থিত ছিল। বর্ষাকালে নৌকা বা লঞ্চযোগে লক্ষ্যা মেঘনা হয়ে ব্রহ্মপুত্রের ছোট শাখা পেরিয়ে গ্রাম পর্যন্ত আরেকটি ছোট খাঁড়ি বরাবর সোনারগাঁয় যাওয়া যায়। গোটা অঞ্চলটি বর্তমানে একটি অধঃপতিত ও উপেক্ষিত এলাকায় পরিণত হয়ে আছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মোগরাপাড়া ক্রসিং থেকে যে পাকা রাস্তা বেরিয়ে গেছে তা দিয়েও মোটরযানে করে সোনারগাঁয় যাতায়াত সম্ভব।

গুরুত্ব ঃ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগরী সোনারগাঁও এককালে শুধু বিরাট রাজধানীই ছিল না বরং সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে একই সঙ্গে এটি ছিল একটি সফল ব্যবসাকেন্দ্র এবং শিক্ষা-দীক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতির পাদপীঠ। সমুদ্রপথে বাংলার সাথে মধ্য ও দূরপ্রাচ্যের সংযোগসৃষ্টির মাধ্যমে মধ্যযুগের একটি অভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধিশালী বন্দরনগরী হিসেবে গড়ে ওঠার ব্যাপারে একে সাহায্য করেছে মেঘনার মতো বিশাল নদীর তীরে

এর অবস্থান। এ সুবিধাজনক অবস্থানের কারণে স্থানীয় জনসাধারণের সাথে বিদেশী বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ ঘটে। আর বিশ্বপরিব্রাজক ইব্‌নে বতুতা এবং এলিজাবেথীয় দূত রালফ ফিচের পক্ষে সোনারগাঁও পরিদর্শনের পথও সুগম হয়। পরিশেষে, এটি ছিল সবচেয়ে নিখুঁত ও মসৃণ বস্ত্র মসলিন উৎপাদনের বিখ্যাত কেন্দ্র।

প্রাক-মুসলিম ইতিহাস ঃ ঐতিহাসিকভাবে সোনারগাঁয়ের উদ্ভব প্রাক-মুসলিম যুগ থেকেই। আর একথা স্পষ্ট যে, ত্রয়োদশ শতাব্দী জুড়ে গোটা সোনারগাঁও অঞ্চলে একটি প্রভাবশালী হিন্দু রাজবংশ শাসন করছিল। আর. সি. মজুমদারের বর্ণনানুযায়ী, প্রকৃতপক্ষে "ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে সোনারগাঁয়ের কোনো নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না।" জেমস ওয়াইজ বলেন, "(মুসলমান) অভিযানের সময় বৈদ্য শ্রেণী উদ্ভূত লক্ষণ সেন সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল নদীয়ায়। পরাজিত হয়ে তিনি তাঁর পূর্বসূরী বল্লাল সেনের আবাসভূমিতে পালিয়ে যান এবং সেখানে (বিক্রমপুর) থেকে অথবা সোনারগাঁও থেকে তিনি পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহ শাসন করেন।" মুসলমান ঐতিহাসিকদের বর্ণনানুসারে, মুহাম্মদ বখতিয়ার খালজীর নদীয়া আক্রমণের সময় লক্ষণ সেন মধ্যাহ্নভোজনে রত ছিলেন। মুসলমান সৈন্যদের যুদ্ধ দামামা শোনার সাথে সাথেই তিনি প্রাসাদের খিড়কী দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঢাকার নিকটস্থ বিক্রমপুরের দিকে পালিয়ে যান।

যাহোক, সোনারগাঁও নগরীর প্রাচীনতম নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় জিয়াউদ্‌দীন বারানীর 'তারিখ-ই-ফিরুজশাহী'তে। তিনি সোনারগাঁয়ের দেব-বংশীয় রাজা রায়দনুজের সাথে দিল্লির দাসবংশীয় শক্তিশালী নৃপতি সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের সাথে (১২৬৫-৮৭) বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। বলবনের রাজত্বকালে বাংলার গভর্নর মুগীসউদ্দীন তুগ্রিল (১২৬৮-৮১) বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সোনারগাঁও থেকে পালিয়ে তিনি সুলতানের কোপানল থেকে রক্ষা পান কিন্তু সুলতান স্বয়ং দ্রুত অগ্রসর হয়ে কিছুদিনের মধ্যেই সোনারগাঁয়ের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছান। বলবন রায়দনুজের সাথে এক চুক্তিতে আসেন যে, রাজা তাঁকে বিদ্রোহী তুগ্রিলকে খুঁজে পেতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন। ১২৮১ খ্রিস্টাব্দে সুলতান বলবন বিদ্রোহীদেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে গোটা সোনারগাঁও অঞ্চলে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে সোনারগাঁয়ে প্রাক-মুসলিম পুরাকীর্তির কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া না গেলেও এক সময় এ অঞ্চল ছিল হিন্দু প্রভুত্ব ও সংস্কৃতির প্রসিদ্ধ কেন্দ্র।

মুসলিম ইতিহাস ঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকে যখন সুলতান বলবন স্বয়ং বিদ্রোহী শাসনকর্তা তুগ্রিলকে দমন করে গোটা অঞ্চলটিকে তাঁর রাজ্যভুক্ত করেন তখন থেকেই সোনারগাঁয়ের নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের যাত্রা শুরু হয়। বলবনের মৃত্যুর পর তাঁর বংশ ১২৮৬ থেকে ১৩২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করে। বলবনের পুত্র বুঘরা খাঁ এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণ সমগ্র বাংলাকে লক্ষ্মণাবতী (গৌড়), সাতগাঁও, সোনারগাঁও ও চাটিগাঁও (চট্টগ্রাম) অঞ্চলে বিভক্ত করে শাসন করেন। তখন থেকেই সোনারগাঁও শুধু রাজধানীই নয় বরং অসংখ্য ওলী-দরবেশ ও ধর্মপ্রচারকদের আবাসভূমি

হয়ে দাঁড়ায়। কে, আর, কানুনগোর ভাষায়, "একথা স্পষ্ট যে, বঙ্গের (পূর্ববঙ্গ) রাজধানী সোনারগাঁও এসময় অপরিহার্যভাবে লক্ষণাবতীর সিংহাসনে আরোহণের সোপান হয়ে ওঠে।"

অতএব ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, বলবন বংশের রাজত্বকালে, বিশেষত নাসিরুদ্দীন মাহমুদ বুঘরা খানের শাসনামলে (১২৮১–৯১) সোনারগাঁও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজধানী হিসেবে স্বীকৃত হয়। ১২৯১ খ্রিস্টাব্দে বুঘরা খান মারা গেলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রুকনুদ্দীন কায়কাউস (১২৯১–১৩০১)। বলবন পরিবারের বিলুপ্তির পর সুলতান বলবনের জনৈক ক্রীতদাস ফিরোজ ইতিমধ্যে প্রভূত ক্ষমতা অর্জন করে ১৩০১ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুলতান শামসুদ্দীন ফিরুজশাহ ১৩২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ২০ বৎসর ব্যাপী দীর্ঘ সময় ধরে সমগ্র বিহার, লক্ষণাবতী, সাতগাঁও ও বঙ্গ (সোনারগাঁও) শাসন করেন। যাহোক, ফিরুজশাহের নিরবচ্ছিন্ন শাসন তাঁর পুত্রদের বিরোধিতায় ব্যাহত হয়। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে দুরন্ত ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন বাহাদুর। বাহাদুর গৌড় থেকে স্বনামে বিভিন্ন মুদ্রা চালু করেন এবং সুলতান গিয়াসুদ্দীন বাহদুর শাহ উপাধি ধারণ করে পিতার জীবদ্দশাতেই ১৩১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে সোনারগাঁও শাসন করেন। পিতার মৃত্যুর পর বাহাদুর শাহ একজন ছাড়া আর সমস্ত ভাইকে হত্যা করেন, সোনারগাঁও থেকে মুদ্রা চালু করেন এবং ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে শাসনকার্য চালিয়ে যেতে থাকেন। বারানী বর্ণনা করেন, ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সুলতান গিয়াসুদ্দীনের (১৩২০-২৫) অভিযানের প্রাক্কালে বঙ্গদেশ তিনটি রাজনৈতিক অংশে বিভক্ত ছিল, যেমন : লক্ষণাবতী (গৌড়), সোনারগাঁও গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর এবং লক্ষণাবতী বা গৌড় তাঁর একমাত্র জীবিত ভ্রাতা নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহের অধীনে ছিল। বাহাদুর শাহের পতন ঘটানোর জন্য তুঘলক শাহের সাথে নাসিরুদ্দীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তুঘলক শাহের নির্ভীক সেনাপতি বাহরাম খান ওরফে তাতার খানের হাতে গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ পরাজিত হন ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দে রাজকীয় বাহিনীর কাছে পরাজিত ও বন্দী হলে বাহাদুর শাহকে দিল্লিতে আনা হয়। এভাবে বাংলা আবারও দিল্লির একটি প্রদেশে পরিণত হয়। নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম ও বাহরাম খান যথাক্রমে লক্ষাণাবর্তী এবং সোনারগাঁও ও সাতগাঁও অঞ্চলের গভর্নরের দায়িত্বে নিযুক্ত হন।

১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের সিংহাসনে আরোহণের পর গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে সোনারগাঁয় প্রেরিত হন। ধারণা করা হয় যে, সুলতানের প্রতিনিধি বাহরাম খানের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে দিল্লির অধীনস্থ সামন্ত-রাজা হিসেবে বাহাদুর সেখানে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। মুহাম্মদ তুঘলক সামন্তরাজা হিসেবে কদর খানকেও লক্ষণাবতীতে নিযুক্ত করেন। কদর খান নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিমের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিলেন। বাহাদুর শাহ ছিলেন বিদ্রোহী ভাবাপন্ন। দিল্লির আওতা থেকে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করার জন্য তিনি সম্ভাব্য সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করেন এবং সমগ্র বাংলার সার্বভৌমত্ব লাভের জন্য

সোনারগাঁও থেকে ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রচেষ্টা চালান। রাজকীয় প্রতিনিধি বাহরাম খানের আধিপত্য ক্ষুণ্ন করে তিনি নিজ নামে মুদ্রা চালু করেন। কিন্তু ১৩২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরাজিত ও নৃশংসভাবে নিহত হন। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত কিছুকালের জন্য রাজধানী সোনারগাঁওসহ পূর্ববাংলার স্বাধীনতা আবার বিলুপ্ত হয়।

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে বাংলার তিনটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চল লক্ষাণাবতী, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও শাসন করেন যথাক্রমে কদর খান, মালিক ইজ্জুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া এবং বাহরাম খান। দশ বছর ধরে গোটা প্রদেশটিতে তেমন কোনো রাজনৈতিক গোলযোগ ছিল না। কিন্তু ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাহরাম খানের মৃত্যুর পর তাঁর সিলাহদার বা বর্মবাহক ফখরুদ্দীন ওরফে ফখরা তাঁর অবস্থান ভুলুয়া বা নোয়াখালী থেকে সোনারগাঁও বিজয়ের চেষ্টা করেন। সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ উপাধি নিয়ে তিনি সোনারগাঁয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে লক্ষণাবতীর গভর্নর কদর খান কিছুসংখ্যক রাজকর্মচারী নিয়ে ফখরুদ্দীনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তাঁরা অবশ্য কিছুদিনের জন্য মুবারক শাহকে সোনারগাঁও থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন, ফখরুদ্দীন মেঘনার অপর পাড়ে পালিয়ে গিয়ে স্বীয় অবস্থান সুদৃঢ় করেন এবং দ্রুত এক বাহিনী যোগাড় করে রাজধানী সোনারগাঁওসহ বাংলার সিংহাসন অধিকারের জন্য আবার দ্রুত প্রচেষ্টা চালান। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কদর খান নিহত এবং ফখরুদ্দীন সোনারগাঁয়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি সেনাপতি মুখলিসকে পাঠিয়ে লক্ষণাবতীকে স্বীয় রাজ্যভুক্ত করার যে প্রচেষ্টা চালান তা ব্যর্থ করে দেন কদর খানের সেনাবাহিনীর বখশী আলী মুবারক। সোনারগাঁও টাঁকশাল থেকে মুদ্রিত ফখরুদ্দীনের অসংখ্য মুদ্রা প্রমাণ করে যে, ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সোনারগাঁও শাসন করেন। বাংলা তখন তিনটি স্বাধীন অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। লক্ষণাবতীর পশ্চিমাংশ ছিল আলাউদ্দীন আলী শাহের পালিত ভ্রাতা হাজী ইলিয়াসের শাসনাধীনে। তিনি দক্ষিণ বাংলা বা সাতগাঁওকে রাজ্যভুক্ত করেই সন্তুষ্ট থাকেন। মুবারক শাহ ছিলেন সোনারগাঁয়ে। মুবারক শাহের পরে ক্ষমতায় আসেন তাঁর ছেলে গাজী শাহ। তিনি ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহের সোনারগাঁও দখলের পূর্ব পর্যন্ত শাসনকার্যে নিয়োজিত ছিলেন।

ইলিয়াস শাহ শাসনামলে বাংলার দু'টি প্রাচীন রাজধানী শহর গৌড় ও হযরত পাণ্ডুয়ার কাছে সোনারগাঁয়ের গুরুত্ব অনেকাংশে কমে যায়। তখন এটি একটি প্রাদেশিক শাসনকর্তার রাজধানীতে পরিণত হয়। তবে, ইতিহাসের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের (১৩৪২-৫৭) পুত্র এবং বাংলার বৃহত্তম মসজিদ (আদিনা মসজিদের নির্মাতা) সুলতান সিকান্দার শাহ (১৩৫৭–৮৯) শায়খ আলাউল হক (মৃঃ ১৩৮৪) নামে জনৈক বিখ্যাত সাধকের বিপুল জনপ্রিয়তায় সন্দিহান হয়ে তাঁকে হযরত পাণ্ডুয়া থেকে সোনারগাঁয়ে বিতাড়িত করেন। শায়খ আলাউদ্দীন আলাউল হকের প্রচেষ্টায় গৌড়, পাণ্ডুয়া ও সোনারগাঁও ইসলামি শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্রে পরিণত

হয়। পাণ্ডুয়ায় প্রতিষ্ঠিত খানকাহের ন্যায় সোনারগাঁও-এ তিনি যে খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন তা ইসলামি শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক সাধনার একটি কেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে। আরও জানা যায় যে, বিমাতার ষড়যন্ত্রের জন্যই গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ তাঁর পিতা সিকান্দার শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সোনারগাঁয় গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। তিনি যে পিতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় যুদ্ধ পরিচালনা করে তাঁকে পরাজিত এবং সোনারগাঁও ও সাতগাঁও স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেছিলেন (১৩৮৯-১৪১৯), মুদ্রায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কানিংহ্যাম সোনারগাঁও থেকে একটি শিলালিপি আবিষ্কার করেন। এতে মুয়াজ্জামাবাদের সেনাপতি ও উজির জনৈক মালিক (?) কর্তৃক ৮৮৯ হিজরী তথা ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে ফতেহ শাহের রাজত্বকালে (১৪৮১-৮৭ খ্রিঃ) একটি মসজিদ নির্মাণের কথা উল্লেখ আছে। 'আইন-ই আকবরী'তে ব্রহ্মপুত্র ও লক্ষ্যার মধ্যবর্তী 'সরকার সোনারগাঁয়' মুয়াজ্জামাবাদ নামে একটি মহল্লা বা এলাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাইফুরের মতে, সুলতান সিকান্দার শাহের জনৈক সিপাহী মুয়াজ্জামের নাম থেকেই এই নামের উৎপত্তি এবং এটি ছিল একই সঙ্গে টাঁকশাল নগরী ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, যার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত ছয়গম্বুজবিশিষ্ট একটি মসজিদে।

বাংলার মুসলিম ইতিহাসের স্বর্ণযুগের সূচনা হয় ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দীন হুসায়ন শাহের সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে (১৪৯৩–১৫১৯)। সুখসমৃদ্ধির এই মহান যুগে শিল্প ও সংস্কৃতির ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিল। শুধু সোনারগাঁও অঞ্চলেই প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্থাপত্যক্ষেত্রে এ আমলটি ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত প্রমাণাদির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রথমত ৯১১ হিজরী, তথা ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দের শিলালিপিটি। এতে নারায়ণগঞ্জের অপর দিকে লক্ষ্যার অদূরে বন্দর এলাকায় হাজী বাবা সালেহ-এর সমাধি নামে একটি ইমারত নির্মাণের কথা উল্লেখিত আছে, দ্বিতীয় খাওয়াস খানের শিলালিপি, যিনি ৯১৯ হিজরী তথা ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দে মুয়াজ্জামপুরের মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদ নির্মাণের প্রয়াস আরও বেশি সুদূরপ্রাসীর হয় হুসেন শাহের ছেলে নাসিরুদ্দীন সুলতান নুসরাত শাহের রাজত্বকালে। (১৫১৯-৩২) বেশকিছু শিলালিপিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়, যেমন, সাদীপুর লিপিতে ৯২৯ হিজরী তথা ১৫২২-২৩ খ্রিস্টাব্দে জনৈক তাকী-উদ্-দীন কর্তৃক জলাধার সহ একটি মসজিদ নির্মাণের উল্লেখ আছে। ৯২৫ হিজরী, তথা ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দের আরেকটি শিলালিপিতে জনৈক মোল্লা হিজাবর আকবর খান কর্তৃক গোয়ালদী মসজিদ নির্মাণের প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দু'শ বছর যাবত সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলা স্বাধীনভাবে টিকে ছিল। কিন্তু দিল্লির শুরবংশীয় শাসক শেরশাহ (১৪৮৬-১৫৪৫) কর্তৃক রাজধানী গৌড় অধিকারের সাথে সাথে (১৫৩৯) বাংলার এ স্বাধীনতার অবলুপ্তি ঘটে। অবশ্য আফগান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর বাংলার দূরবর্তী অঞ্চলেও নানাবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। শেরশাহের গৃহীত কর্মসূচীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল, সোনারগাঁও থেকে সড়ক নির্মাণ। এটি সাধারণভাবে সড়ক-

ই-আযম বা গ্রান্ড ট্রাংক রোড নামে সর্বাধিক পরিচিত ছিল। কানুনগো সন্দেহ পোষণ করলেও অনেক ঐতিহাসিকই বর্ণনা করেছেন যে, সড়কের প্রতি ক্রোশ (প্রায় দুই মাইল) পর পর হিন্দু মুসলিম পর্যটকদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সরাইখানা বা বিশ্রামাগার এবং মুসাফিরদের সুবিধার জন্য কূপ খনন ও মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল, আর ছায়াদানের জন্য বড় বড় বৃক্ষও রোপণ করা হয়েছিল।

১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে তাজ খান কররানী নামে আরেকজন আফগান দলপতি বিহারের শাসনকর্তা হিসাবে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য শুরু করলে বাংলার উপর শুর বংশের প্রভুত্ব বিনষ্ট হয়। কররানী বংশের শাসকগণ ১৫৬৫ হইতে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বংশানুক্রমিকভাবে বাংলা শাসন করেন। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে এ বংশের শেষ শাসক দাউদ শাহ (১৫৭২-৭৬) রাজমহলের যুদ্ধে মুঘলদের হাতে পরাজিত হন। সম্রাট আকবরের সময় বঙ্গবিজয় সম্পন্ন হয়েছিল। তাঁর মহান রাজত্বকাল সোনারগাঁও ছিল 'হযরত জালাল সোনারগাঁও' নামে পরিচিত। বাংলার ওপর আকবরের প্রভুত্ব অর্জনের যুগটি 'বারো ভুঁইয়া' উপাধিপ্রাপ্ত বাংলার বারোজন স্বাধীন জমিদারের উন্মেষের জন্য বিশেষভাবে আকর্ষণীয়।

প্রায় আড়াইশ' বছরের বিরতির পর সোনারগাঁয়ের চরম বিকাশের আবার সূচনা ঘটে বারো ভুঁইয়াদের, বিশেষ করে ঈসা খান, 'মসনদ-ই-আলার' পৃষ্ঠপোষকতায়। বারো ভুঁইয়াগণ তাঁদের রাজধানী স্থাপন করেন অসংখ্য খাল বিল, জলাভূমি, নদ-নদী আর গভীর জঙ্গলে আকীর্ণ দুর্গম অঞ্চলসমূহে। এঁরা ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন শাসকবৃন্দ যাঁদের অদম্য তেজ ও সামরিক শৌর্য-বীর্য মুঘল রাজশক্তিকে কোণঠাসা করে রেখেছিল। বারো ভুঁইয়াদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী ভুঁইয়া ছিলেন সোনারগাঁয়ের ঈসা খান। মুঘল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি পাঠান ও হিন্দু জমিদারদের নিয়ে একটি বলিষ্ঠ জোট গড়ে তোলেন। 'আকবরনামায়' ঈসা খানকে বলা হয়েছে 'মারযবান-ই-ভাট্টি' বা ভাট্রির জমিদার। বর্তমানকালে অধঃপতিত গ্রাম সোনারগাঁও ও তার চার পাশের বিভিন্ন অঞ্চলসহ গোটা ঢাকা জেলাই ছিল তখন ভাটি অঞ্চল। আর ঈযা খান এই সোনারগাঁয়েই মুঘলদের বিরুদ্ধে নিজের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে দুর্দমনীয় হয়ে ওঠেন। ঈসা খানের সাথে দাউদ শাহ কররানীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আকবরের বিরুদ্ধে সামরিক সহযোগিতা দানের স্বীকৃতি হিসাবে দাউদ শাহ ঈসা খানকে 'মসনদ-ই আলা' অর্থাৎ বাংলার 'জমিদারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম' উপাধি দান করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি মুঘল সেনাপতিদেরকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারিয়ে দিয়েছিলেন এবং নিজে হয়ে উঠেছিলেন পশ্চিম সিলেট, ত্রিপুরা, ঢাকার পূর্বাঞ্চল ও ময়মনসিংহ জেলা নিয়ে গঠিত বিরাট অঞ্চলের অধিপতি। কথিত আছে যে, একবার দ্বন্দ্বযুদ্ধে ঈসা খান মানসিংহকে পরাভূত করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুঘলদের হাতে তাঁর রাজ্যের অধিকাংশ এলাকার পতন ঘটে। তবু প্রায়ই বিপুল বিক্রমে মুঘল শিবিরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি মহাত্রাস সৃষ্টি করতেন। কিন্তু অবশেষে ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দে ঈসা খান মুঘল রাজশক্তির সাথে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হন।

১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে ঈসা খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুসা খান 'মসনদ-ই-আলা' উপাধি ধারণ করে সোনারগাঁয়ের জমিদারীতে অভিষিক্ত হন। মুসা খানও তাঁর পরাক্রমশালী পিতার মতো মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের জন্য বারো ভুঁইয়াদেরকে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি নিজেও স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করেন। তাঁর শাসনামলে সোনারগাঁও একটি সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যকেন্দ্র এবং কোলাহলমুখর নগরীতে পরিণত হয়। নগরীটি শুধু সুরক্ষিতই ছিল না, বরং মেঘনা, লক্ষ্যা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল বলে গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বন্দরে পরিণত হয়েছিল। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে (১৬০৫-২৭) বাংলার সুবাদার ইসলাম খান ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। তিনি মুসা খানের নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত বারো ভুঁইয়াদের সমূলে দমন করার কঠিন ব্রত গ্রহণ করেন। ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে যাত্রাপুর ও ডাকচেরার যুদ্ধে ইসলাম খানের কাছে পরাজিত হন মুসা খান ও তাঁর মিত্রবাহিনী। এ দু'টি শক্তিশালী দুর্গের পতনে মুসা খান বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে তিনি রাজধানী সোনারগাঁয়ে ফিরে আসেন। মুঘলবাহিনী পশ্চাদ্ধাবন করলে তিনি সোনারগাঁও ছেড়ে অধিকতর নিরাপদ দ্বীপাঞ্চল ইব্রাহীমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অঞ্চলটি বর্তমানে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। মুসা খান সোনারগাঁও-এর দায়িত্বে নিয়োজিত করেন হাজী শামসুদ্দীন বাগদাদীকে। তিনি নগরের দায়িত্ব যথারীতি মুঘল সুবেদার ইসলাম খানের হাতে তুলে দেন (এপ্রিলের মধ্যভাগে, ১৬১১)।

বহু প্রাচীনকাল থেকে অনেক রাজার গৌরবময় রাজধানী, প্রাচ্যের অন্যতম রূপকথার স্বর্ণনগরী সোনারগাঁও এভাবে মুঘল শাসনাধীনে আনার পর তার সমস্ত আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। মুঘলরা পূর্ববাংলার রাজধানী হিসাবে ঢাকা বা জাহাঙ্গীনগরকে গড়ে তোলে। অন্য কথায়, মসজিদ ও মসলিনখ্যাত ঐতিহাসিক নগরী সোনারগাঁর প্রাচীন ঐতিহ্য ও শৌর্য-বীর্য নতুন রাজধানী ঢাকার জাঁকজমকের কাছে ম্লান হয়ে যায়। ফলে এটি একটি পরিত্যক্ত ও অবহেলিত নগরীতে পরিণত হয়। ঈসা খান ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের নির্মিত ইমারতের কোনো চিহ্ন আজ আর সোনারগাঁয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। যা কিছু টিকে আছে তা হল সোনারগাঁর অতীত ঐশ্বর্যের একটি বিষাদ মলিন স্মৃতি।

বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টিতে সোনারগাঁও

বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনায় বিশেষভাবে মুরদেশীয় বিখ্যাত বিশ্বপরিব্রাজক ইবনে বতুতার মনোরম বর্ণনায় সোনারগাঁও মুখ্য স্থান দখল করে আছে। ইবনে বতুতা বাংলা পরিদর্শন করেন ১৩৪৫-৪৬ খ্রিস্টাব্দে। তিনি সাতগাঁও হয়ে সিলেটে যান বিখ্যাত সাধক হযরত শাহ্ জালারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। সেখানে তাঁর মেহমান হিসেবে তিনি কিছুদিন থাকার পরে নদীর ভাটিপথে সোনারগাঁর দিকে যাত্রা করেন। সেখান থেকে আবার জাহাজে পাড়ি জমান জাভার উদ্দেশে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণিত যে, এই বিখ্যাত পর্যটক বাংলায় আসেন সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের রাজত্বকালে (১৩৩৮-৪৯) এবং তিনি তৎকালীন বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার খুবই

যথাযথ ও জীবন্ত এক বিবরণ রেখে যান। তাঁর বর্ণনায় দেখা যায় ফখরুদ্দীন ফকির-দরবেশের খুব ভক্ত ছিলেন। এই সময় অসংখ্য সাধুপুরুষ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় তাঁদের নিবাস গড়ে তোলেন। ইবনে বতুতার ভাষায়, "নদীর ভাটিপথে আমরা পনেরো দিন ধরে বিভিন্ন গ্রাম ও নানা ফলমূলের বাগানের মধ্যে দিয়ে ভ্রমণ করলাম (সিলেট থেকে সোনারগাঁও পর্যন্ত), ঠিক যেন কোনো বাজারের মধ্য দিয়ে আমরা এগুচ্ছিলাম। এর ডান ও বাঁ পাশের তীরে রয়েছে জলের চাকা, ফলমূলাদির বাগান আর গ্রামের পর গ্রাম. মিশরের নীলনদের দুই তীরের মতো।" চতুর্দশ শতাব্দীতে সোনারগাঁও পূর্ববাংলা তথা 'বাংলাভাটী' অঞ্চলের রাজধানী ছিল। তখনকার বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে এর বিবরণ দিতে গিয়ে ইবনে বতুতা গর্ববোধ করেন। জিনিসপত্রের দাম এত সস্তা এবং চাল ও অন্যান্য পণ্যের এত প্রাচুর্য ছিল যে বাংলার মতো পৃথিবীর আর কোথাও তিনি তা দেখতে পাননি। ইবনে বতুতার প্রদত্ত ছক থেকে চতুর্দশ শতকের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যে আভাস পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় : চাল ৭ টাকায় ৮ ৩/৪ মন, ধান ৭ টাকায় ২৮ মন, ঘি ৩.৫০ টাকায় ১৪ সের, চিনি ৩.৫০ টাকায় ১৪ সের, ২১ টাকায় ৮টি হৃষ্টপুষ্ট পাখি; ১.৭৫ টাকায় ৮টি মোটাসোটা ভেড়া, ২১ টাকায় একটি দুধের গাই এবং ০.৮৮ টাকায় ১৫টি কবুতর বিক্রি হত।

সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের শাসনামলে (১৩৯৯-১৪১০) চীনের সাথে বাংলার খুবই সুসম্পর্ক বজায় ছিল। দুদেশের মধ্যে যে দূত বিনিময় হয়েছিল তা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। চীন সম্রাট ইয়ংলো চেগো, ওয়াং-চিং ও আর কয়েকজনকে দূত হিসেবে পাঠান বাংলার রাজদরবারে। এসব দূতের মধ্যে প্রাচীনতম একজন বাংলায় এসেছিলেন ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে। চীনা দূতদের সাথে সংশ্লিষ্ট দোভাষী মা–হুয়ান তৎকালীন বাংলার এক মনোজ্ঞ বিবরণ রেখে যান। তিনি লেখেন, "সুমেনতালা (সুমাত্রা) রাজ্য থেকে জাহাজে করে পাং-কো-লা (বাঙ্গালা) রাজ্যে পৌছে যায়। মাওশান ও থুইলান (নিকোবার) দ্বীপের উদ্দেশেও যাত্রা ঠিক করা ছিল। এসব স্থানে পৌঁছে জাহাজ পশ্চিমদিকে ঘোরাতে হল। একুশ দিন বাতাসের অনুকূলে থেকে জাহাজ চেহাটি গানে (চট্টগ্রাম) পৌঁছে নোঙ্গর ফেলল। নদীতে নামার জন্য এরপর ছোট নৌকা কাজে লাগানো হল। ছোট ছোট নৌকায় এখান থেকে ৫০ লী বা আরও বেশ কিছু দূর পেরিয়ে 'সুনা-উর-কিয়াং' বা সোনারগাঁয় পৌছে স্থলভূমিতে অবতরণ করা যায়।" অতএব এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, চীনা দূত গৌড়ের দিকে যাত্রা করার পূর্বে সোনারগাঁয় অবতরণ করেছিলেন। ১৪১১-১২ খ্রিস্টাব্দে আরেকজন চীনা দূত গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের ছেলে সুলতান সাইফুদ্দীন হামযা শাহের দরবার পরিদর্শন করেন। চীনা দূতদের বিবরণ সোনারগাঁয়ের জাঁকজমক ও সমৃদ্ধির উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করে। "রাজা যখন শুনতে পেলেন যে আমাদের বহুমূল্য নৌকা তাঁদের দেশে পৌঁছেছে তখন স্বাগত জানাবার জন্য জেলা কর্মকর্তাদেরকে বস্ত্রাদি ও অন্যান্য উপহারসামগ্রী এবং কয়েক হাজার সৈন্যবাহিনীসহ পাঠালেন। তারা চাটীর (চট্টগ্রাম) পোতাশ্রয়ে অবতরণ করে। সেখান থেকে শুরু করে তারা ১৬টি স্টেশন পর সোনা-উর-কিয়াং (সোনারগাঁও) গিয়ে

পৌঁছে। প্রশস্ত রাস্তা, উপাসনালয়, দিঘি ও বাজার মিলিয়ে এটি একটি দেয়ালবেষ্টিত বিশাল নগরী। সমস্ত দ্রব্য এখানে সংগৃহীত এবং বণ্টন করা হত।"

যেসব ইউরোপীয় পর্যটক সোনারগাঁও পরিদর্শন করে এর সুস্পষ্ট নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে গেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন সম্রাট আকবরের দরবারে প্রেরিত এলিজাবেথীয় দূত রাল্‌ফ ফিচ্। তিনি ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁও আসেন। তাঁর ভাষায়, "শ্রীপুর থেকে ছয় লীগ দূরেই রয়েছে সোনারগাঁও নগরী, যেখানে গোটা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে ভাল সূক্ষ্ম সূতিবস্ত্র প্রস্তুত হয়। এতদঞ্চলের প্রধান রাজার নাম ঈসাকান (ঈসাখান) এবং তিনি অন্য রাজাদের প্রধান ও খ্রিস্টানদের একজন মহান বন্ধু ছিলেন। ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলের বাড়িঘরের মতো এখানকার বাড়িঘরও আকারে খুবই ছোট এবং খড়বিচালি দিয়ে ঢাকা। আর ঘরের চারদিকের দেয়াল ও দরজা মোটা মাদুর দিয়ে ঘেরা যাতে বাঘ শেয়াল ইত্যাদি ঘরে আসতে না পারে। এখানকার অধিকাংশ লোকই ধনী। লোকেরা মাংস খায় না বা পশুহত্যা করে না। তারা ভাত, দুধ ও ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকে।"

ইবনে বতুতা, চীনা দূতবৃন্দ এবং ইংরেজ বণিক-দূত রাল্‌ফ ফিচের লেখা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সোনারগাঁও ছিল মধ্যযুগের রূপকথার নগরী। মেঘনা, লক্ষ্যা ও ব্রহ্মপুত্রের মতো তিনটি নদীর সঙ্গমস্থলে সোনারগাঁয়ের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য এটিকে অন্যতম সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত করেছে। ইবনে বতুতার বর্ণনায় দেখতে পাই, এটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বন্দরনগরী। এখানে চীন ও জাভা থেকে সমুদ্রগামী বণিকগণ ব্যবসার উদ্দেশ্যে তাদের বাণিজ্যজাহাজ নিয়ে আসত। জাভার উদ্দেশে ইবনে বতুতা যে জাহাজে চড়ে বসেন সেটি ছিল মূলত একটি চীনা জাংক। তাঁর বর্ণনার সত্যতা চীনা দূতের বিবরণেও পাওয়া যায় যে সোনারগাঁও ছিল এমন একটি গঞ্জ যেখানে সব ধরনের পণ্য আসত ও বেচাকেনা হত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে রাল্‌ফ ফিচের এতদঞ্চল পরিদর্শনের সময়ও এটি ছিল বর্ধিষ্ণু বন্দরনগরী। ফিচের ভাষায়, "এখান থেকে যে নৌকাবোঝাই সূতিবস্ত্র ও চাল যায় তা থেকেই সরবরাহ করা হয় পুরা ভারত, শ্রীলংকা, পেগু, মালাকা, সুমাত্রা ও আরও অনেক স্থানে।" যাহোক. এতসব সমৃদ্ধি, জাঁকজমক, চাকচিক্য আর মহত্ত্ব ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হতে থাকে নদীর গতি পরিবর্তনের সাথে সাথে এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের স্থানান্তর ও ব্রিটিশ শাসকদের বিরোধী মনোভাবের দরুন মুসলিম শিল্পের অবনতি ঘটার ফলে। প্রায় দু'শ বছরেরও বেশি পরে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে টেলর উল্লেখ করেন যে, সোনারগাঁও ইতিমধ্যে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্য কুখ্যাতি অর্জন করে ফেলেছে। তিনি এমনকি আক্ষেপও .ন, "পূর্ববঙ্গের মুসলমাজার রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধ সোনারগাঁয়ের ্পত্যিক জৌলুসের কোনো অভাব ছিল না।"

রূপকথার মতো ঐশ্বর্যশালী বাংলার রাজধানী সোনারগাঁও তার সকল রোমাঞ্চকর পরিবেশ হারিয়ে ফেলেছে। সত্যিকার অর্থে এর অতীতের সকল ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক এখন শুধু স্মৃতি হয়ে রয়েছে। ধ্বংসের মাঝে সোনারগাঁয়ের যা কিছু টিকে আছে তা হচ্ছে

বিবর্ণ মলিন অধঃপতিত গ্রাম পাইনাম। টেলর এ প্রাচীন নগরীটির হারিয়ে যাওয়া ঐশ্বর্যের সারবস্তুর কথা বিবৃত করতে চেষ্টা করেছেন এভাবে : "পাইনাম হচ্ছে প্রাচীন নগরী সোনারগাঁও, অর্থাৎ এতদঞ্চলের মুসলমান শাসকদের হাবেলী সোনারগাঁও। ব্রহ্মপুত্রের খাঁড়ি থেকে প্রায় দু'মাইল ভেতরের দিকে সুপারি, তেঁতুল আর আম্রকুঞ্জের মধ্যে এর অবস্থান। খড়-বিচালি দিয়ে নির্মিত কুঁড়েঘর আর দ্বিতল-ত্রিতল উঁচু ইটের বাড়িঘর মিলিয়ে দু'টি মহল্লা নিয়ে এটি গঠিত, এর চারপাশে রয়েছে মজে যাওয়া দুর্গন্ধময় খাল যা দেখে মনে হয় মূলত প্রতিরক্ষাহেতু এটি পরিখা হিসেবে নির্মিত হয়েছিল। পরিখার উপর নির্মিত প্রাচীন পুলের একপাশে (গ্রামে যাওয়ার একমাত্র পথে) রয়েছে একটি তোরণের ধ্বংসাবশেষ। পূর্বকালে যখন বর্তমানকালের চেয়ে অঢেল সম্পদ ছিল তখন প্রতিরাত্রে তোরণটি বন্ধ করে দেয়া হত এবং পরদিন ভোর না হওয়া পর্যন্ত কাউকে বাইরে যেতে কিংবা ভেতরে ঢুকতে দেয়া হত না। পাইনামের খুব কাছেই অনেক মসজিদ ও ইমারত ধ্বংসাবস্থায় পড়ে আছে। এসব ইমারত খুব সম্ভব গভর্নরদের শাসনাধীনে নির্মিত হয়েছে। এগুলির অবস্থান পাইনাম থেকে এক মাইলের বেশি দূরে নয়।"

জ্ঞানী-গুণী ও সাধকের কেন্দ্রভূমি

কানিংহ্যাম মন্তব্য করেন যে, "পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে সোনারগাঁও ছিল একটি স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী। ষোড়শ শতাব্দীর দিকে সম্ভবত ভারতের যে-কোনো নগরীর চাইতে অধিকতর ব্যাপক হারে এ নগরীতে পীর-দরবেশ ও ফকির-আউলিয়াদের সমাগম হয়। আধুনিক সোনারগাঁয়ের বনজঙ্গল ও পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পীর-ফকিরদের কমপক্ষে ১৫০টি 'গদ্দী' (মাজার ও চিল্লাখানা) খুঁজে পাওয়া যাবে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকে সোনারগাঁও ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির একটি যথার্থ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। ইসলামি শিক্ষা-দীক্ষা ও মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হিসেবে সোনারগাঁয়ের সুখ্যাতির মূলে ছিল শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ নামে খুবই ধর্মপ্রাণ একজন সাধকের অবদান। তিনি সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের রাজত্বে (১২৬৬-১২৮৭) দিল্লি থেকে সোনারগাঁয় হিজরত করেন। আবু তাওয়ামাহ সোনারগাঁয়ে একটি ইসলামিক একাডেমী এবং খানকা স্থাপন করেন। এম, এ, রহিমের ভাষায়, "শায়খ আবু তাওয়ামাহ ছিলেন সোনারগাঁও ও পূর্ববাংলার মহান গৌরবের প্রকৃত কর্ণধার।" তাঁর পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিক সাফল্য বহু সাধক ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে সোনারগাঁয়ের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মাখদুম মাওলানা শারফুদ্দীন ইয়াহইয়া মাজারী। একথা সত্য যে, আবু তাওয়ামার বিখ্যাত শিষ্য ইয়াহইয়া মাজারী তাঁর শিক্ষকের সাথে সোনারগাঁয়ে এসেছিলেন। ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে আবু তাওয়ামার প্রতিষ্ঠিত সোনারগাঁও-এর মাদ্রাসাটি তৎকালে সমগ্র উপমহাদেশে হাদিসসহ বিভিন্ন ইসলামি বিষয়ের শিক্ষাদানের একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানরূপে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করে।"

সমগ্র সোনারগাঁও অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য পরিত্যক্ত ঢিবির মধ্যে এককালের বিখ্যাত নগরীর সুখকর অতীতের স্মৃতিচিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে। এসব বিরান ভূমি খুবই উঁচুমাজার বুদ্ধিবৃদ্ধির চর্চা ও আধ্যাত্মিক সাধনার কেন্দ্র হিসেবে একসময়ে ছিল উপমহাদেশের গর্বস্বরূপ। জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে সোনারগাঁয়ের ঐতিহ্য চতুর্দশ শতাব্দীতেও খুবই জাজ্বল্যমান ছিল, বিশেষভাবে সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের আমলে (১৩৮৯–১৪১১)। তিনি ছিলেন সাধক ও জ্ঞানীদের একান্ত ভক্ত। তিনি শায়খ নূর কুতুবুল আলমের (মৃ, ১৪৪৭) সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আযমশাহ্ সোনারগাঁয়ে জ্ঞানী-গুণীদের এক জাকজমকপূর্ণ দরবারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এখানকার মোগরাপাড়া এলাকায়ই তাঁকে কবরস্থ করা হয়।[১] সাধক ও ধর্মপ্রচারকদের

---

১ সুলতান গিয়াসুদ্দীন আ'যম শাহের ন্যায়বিচার, বদান্যতা, বিদ্যোৎসাহিতা, ধর্মানুরাগ ও কাব্যচর্চার বহু ঘটনা ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন। রিয়াযু'স-সালাতীনের মতে, তীরন্দাজির অনুশীলনের সময় সুলতানের নিক্ষিপ্ত একটি তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে জনৈক বিধবার একমাত্র শিশুকে নিহত করে। বিধবা তৎকালীন কাজীউল কুযাত—প্রধান বিচারপতি কাজী সিরাজুদ্দীনের কাছে বিচারপ্রার্থী হলে তিনি নির্ভয়ে সুলতানের নামে সমনজারি করেন। সুলতান কাজীর আদালতে হাজির হলে কোনোরকম সম্মান প্রদর্শন না করে কাজী তাঁর বিরুদ্ধে বিধবার অভিযোগের কথা উল্লেখ করেন এবং বিধবাকে ক্ষতিপূরণ দানে সন্তুষ্ট করতে না পারলে শারী'আত মতে তিনি দণ্ডনীয় হ'বেন বলে অভিমত প্রকাশ করেন। সুলতান বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে বিধবার অভিযোগের সন্তোষজনক মীমাংসার কথা কাজীকে অবহিত করেন। কাজীসাহেব তখন স্বীয় আসন থেকে উঠে এসে সুলতানকে সালাম দিতে সুলতান বললেন : "আমার রাজ্যে এমন একজন ন্যায়বিচারক কাজী আছেন এজন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।" এরপর তিনি জামার মধ্যে লুক্কায়িত ছুবিখানা বের করে কাজীকে বললেন ঃ "সুলতানের ভয়ে আপনি ন্যায়-বিচার না করলে এই ছুরি আপনার বুক বিদ্ধ করত।" কাজীসাহেবও তখন তাঁর আসনের নীচ হতে একটি কোড়া এনে সুলতানকে বললেন : "হুজুর, আপনিও যদি শারী'আতের বিচার না মানতেন তবে এই কোড়া আপনার পিঠে পড়ত।"

আরেকটি ঘটনা যা সুলতান গিয়াসুদ্দীন আ'যম শাহকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে তা হল, পারস্যের খ্যাতনামা কবি হাফিয শীরাযীর সাথে পত্রালাপ এবং তাঁকে বাংলাদেশ সফরের আহ্বান জানানো। রিয়াযুস-সালাতীনের লেখক গোলাম হুসায়ন সালীমের বর্ণনা মতে সুলতান গিয়াসুদ্দীন আরবি-ফার্সি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং তিনি কবিতাও রচনা করতেন। একটি ফার্সি কবিতার শেষ চরণের ছন্দ মেলাতে অসমর্থ হয়ে তিনি একজন দূতকে অসম্পূর্ণ কবিতাটি বহু মূল্যবান উপঢৌকনসহ কবি হাফিয-এর নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। কবি হাফিয যথা–সময়ে সুলতানের রচিত কবিতার প্রথম চরণের ছন্দের সাথে মিল রেখে একটি দীর্ঘ কাসীদা রচনা করেন এবং দূতের মারফত ফেরত পাঠান এবং যাতায়াতের অসুবিধার কারণে সুলতানের আমন্ত্রণ গ্রহণে অসমর্থ হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন। 'দীওয়ান-ই-হাফিযে' সংকলিত এই কবিতাটি বাংলাদেশ ও সুলতান গিয়াসুদ্দীনের নাম মুসলিম বিশ্বে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। (দ্রঃ The History of Bengal, Ed.

স্মৃতিচিহ্নবাহী ভগ্নপ্রাপ্ত ইমারতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সোনারগাঁও ইসলামের একনিষ্ঠ সাধকদের মহান আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছিল। ইসলামের গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ এ স্থানে তাঁদের নিবাস ও কর্মস্থল গড়ে তোলেন। এঁদের মধ্যে যে কয়জনের নাম জানা যায় তন্মধ্যে অন্যতম শায়খ আলাউল হক। তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে সুলতান সিকান্দার শাহের রাজত্বকালে হযরত পাণ্ডুয়া থেকে সোনারগাঁও আসেন। তিনি এ স্থানে দু'বছর অবস্থান করেন। তিনি এখানে অবস্থানকালে একটি খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা শারী'আত ও মা'রিফাতের জ্ঞানলাভের জন্য সমবেত হতেন। খানকাহসংলগ্ন লঙ্গরখানায় সর্বশ্রেণীর দরিদ্র জনগণ ও বিদেশী ভ্রমণকারীরা বিনামূল্যে খাদ্যলাভ করত। তাঁরই পুত্র হযরত নূর কুত্বে আলম হিন্দু আধিপত্য হতে বঙ্গদশকে মুক্ত করেন।

বলপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী হিন্দু রাজা গণেশ (১৪১৪–১৮ খ্রিঃ) সুফী দরবেশদের হত্যা ও নির্বাসনের মধ্য দিয়ে বাংলা থেকে ইসলামের সকল চিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টা করেন। রাজা গণেশ বদরুল ইসলামকে হত্যা করেন এবং বিখ্যাত সাধক নূর কুত্ব আলমের পুত্র ও দৌহিত্র শায়খ আনওয়ার ও শায়খ জাহিদকে হযরত পাণ্ডুয়া থেকে সোনারগাঁয়ে বিতাড়িত করেন। পরবর্তীকালে হিন্দু রাজার নির্দেশে শায়খ আনওয়ারকে হত্যা করা হয় এবং তাঁকে কবর দেয়া হয় সোনারগাঁয়ে। এম, এ, রহীমের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়, "এসব বিখ্যাত সাধক ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি সোনারগাঁয়ের ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞানচর্চাকে উজ্জীবিত করে তুলেছিল।" সুলতান আলাউদ্দিন হুসাইন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৩–১৫১৯) শিল্পকলা ও সংস্কৃতির সর্বাধিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। সোনারগাঁও অঞ্চলসহ সমগ্র বাংলায় তখন সাধক ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ আমলের সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন সাধক ছিলেন সৈয়্যদ ইব্রাহিম দানিশমন্দ। তিনি পারস্য থেকে এসে সোনারগাঁয়ে তাঁর নিবাস গড়ে তোলেন। সাদীপুর মসজিদের প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে তাঁকে স্ত্রী ও পুত্রসহ সমাহিত করা হয়। হুসায়ন শাহী বংশের (১৪৯৩–১৫৩৮) পতনের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামি জ্ঞানচর্চার জগতে সোনারগাঁও যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছিল তার প্রমাণ সুলতান নুসরাত শাহের ১৫২৩ খ্রিস্টাব্দের শিলালিপিতে পাওয়া যায়। এ শিলালিপিতে তাকী-উদ-দীন কর্তৃক একটি মসজিদ নির্মাণের উল্লেখ রয়েছে। তাকী-উদ-দীন ছিলেন একজন বিখ্যাত আইনশাস্ত্র বিশারদ ও মুহাদ্দিস বা হাদীস

সুলতান গিয়াসুদ্দীন মক্কাশরীফে একটি মাদ্রাসা ও একটি মুসাফিরখানা নির্মাণ এবং মক্কাবাসীদের পানি সরবরাহের সুব্যবস্থার উদ্দেশ্যে একটি নহর খননের জন্য বহু সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করেন। তাঁর অর্থে নির্মিত মাদ্রাসাটি গিয়াসিয়া মাদ্রাসা নামে পরিচিত ছিল। মাদ্রাসা ও মুসাফিরখানার পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্যে দু'টি খেজুরবাগান বহু অর্থে ক্রয় করে ওয়াকফ করে দেওয়া হয়। ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে গিয়াসিয়া মাদ্রাসার বিরাট অবদান সর্বজনস্বীকৃত। (তারীখে মক্কা, মুফতী কুত্বুদ্দীন)।

বিশেষজ্ঞ। ইসলাম খানের আগমনের সাথে সাথে সোনারগাঁয়ের গৌরবসূর্য ধীরে ধীরে অস্তমিত হতে থাকে। কেননা, তিনি সোনারগাঁয়ের পরিবর্তে ঢাকাকে 'জাহাঙ্গীরনগর' নামে রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলেন।

প্রসিদ্ধ মসলিন নগরী

সোনারগাঁও এবং তার সন্নিকটস্থ এলাকা ঐতিহ্যগতভাবে মসলিন উৎপাদনের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। ঢাকা, সোনারগাঁও, ধামরাই, তিতপাদী, জঙ্গলবাড়ি, বাজিতপুর ইত্যাদি সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলসহ পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী-বেষ্টিত বিরাট লোকালয় জুড়ে ছিল মসলিন উৎপাদনের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এলাকা। সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, শুধু উৎপাদনকেন্দ্র হিসেবেই নয় বরং স্মরণাতীতকাল থেকে মসলিন রফতানিকেন্দ্র হিসেবেও সোনারগাঁও তার যশ ও সমৃদ্ধি অর্জন করে আসছে। পৃথিবীব্যাপী খ্যাতিসম্পন্ন সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্র বুননের কৌশল উদ্ভাবনের চমৎকার সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশের। জে, বি, ভূষণের ভাষায়, "ভারতীয় মসলিন যৌক্তিকভাবেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ছিল পৃথিবীবিখ্যাত এবং ঢাকার তাঁতিরা সন্দেহাতীতভাবে এ ক্ষেত্রে যে শীর্ষস্থান অধিকার করে রেখেছিল, ভারতের ভেতরে বা বাইরে কারো পক্ষে কখনো তা অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব হয়নি।"

সোনারগাঁও ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মসলিন শিল্পের উৎপত্তির ইতিহাস এখনও রহস্যাবৃত। ঐতিহাসিকদের বর্ণনানুযায়ী দেখা যায় যে, প্রাচীন মিশরের মমিগুলো ছিল এদেশ থেকে আমদানিকৃত মসলিন আবৃত এবং নীলরঙে রঞ্জিত। বার্ডউডের মতে, প্রাচীন গ্রিস ও রোমের মত আসিরিয়া ও ব্যাবিলনিয়া মসলিন বস্ত্রের সাথে পরিচিত ছিল এবং সেসব দেশে এ বস্ত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। রয়েলি উল্লেখ করেন যে, "খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রিকগণ মসলিন বস্ত্র ব্যবহার করত। একইভাবে রোম সামাজ্যে মসলিন ছিল খুবই লোভনীয় জিনিস।" উরের ভাষায়, "ঢাকার মসলিন হয়ে উঠেছিল সেরিয়া দ্য ভেস্তা' (Seria de veste) যা কিনা রোমের অভিজাত ও শৌখিন রাজকীয় মহিলাদের কাছে ছিল বহুআকাঙ্ক্ষিত বস্ত্র।" প্লিনির ভাষায়, "রোমের মহিলারা এত পাতলা কাপড় পরত যে তাদের সম্ভ্রম রক্ষা করাটাই ছিল মুশকিল। রোমের মহিলারা সোনা বা রুপোর সুতার কাজ করা কাশিদা নামক একধরনের মসলিনের ব্যবহার নিয়ে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হত।"

খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর ঐতিহাসিক ইবনে খুরদাদ-বে-এর মতো অনেক আরব ঐতিহাসিকদের রচনায়ও সবচেয়ে মনোরম ও বিশ্ববিখ্যাত মসলিনের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। মার্কো পোলোও এরকম নিখুঁতভাবে বয়নকৃত বস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ইবনে বতুতার বর্ণনায় ১৪ টাকায় ১৫ গজ লম্বা সবচেয়ে নিখুঁত সুতিবস্ত্র বিক্রয়ের যে কথা জানা যায় তা নিঃসন্দেহে ছিল মসলিন বস্ত্র। সুলতান আযম শাহের দরবারে আসা চীনা রাষ্ট্রদূতগণ মসলিনের প্রথম বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে গেছেন। তাঁরা ছয় ধরনের মসলিনের পরিচয় দিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করেছেন (১) পি পো, এমন ধরনের বস্ত্র, যা ছিল দুই থেকে তিন ফুট চওড়া ও পঞ্চাশ থেকে ষাট ইঞ্চি লম্বা এবং বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত খুবই সূক্ষ্ম ও মসৃণ; (২) মান-চে-তি, মনোরম হলুদ রঙের

বস্ত্র, চওড়ায় চার ফুট বা তারও বেশি আর লম্বায় পঞ্চাশ ফুট। এটি ছিল খুবই আঁটসাটভাবে বয়নকৃত এবং মজবুত ধরনের; (৩) শাহ-না-কিয়েহ, তিন ফুট চওড়া ও ষাট ফুট লম্বা আরেক ধরনের মসলিন, চীনা লোপুর সাথে যার সাদৃশ্য রয়েছে; (৪) হিন-পেই-তাং-তা-লি, মোটা ধরনের মসলিন, তিন ফুট চওড়া ও ষাট ফুট লম্বা; (৫) শা-তা-এউল, এটি ছিল দু'রকম মাপের, একটি পাঁচ ইঞ্চি চওড়া ও পঞ্চাশ ফুট লম্বা এবং অপরটি আড়াই ফুট চওড়া ও চার ফুট লম্বা। চীনা 'সান সো'র সাথে এর খুবই সাদৃশ্য রয়েছে; (৬) মা-হেই-মা-লী (মলমল) লম্বায় বিশ ফুট বা ততোধিক ও চওড়ায় চার ফুট পরিমাপে তৈরি। এর উভয় পাশে রয়েছে চার বা পাঁচ-দশমাংশ পুরু আচ্ছাদন এবং এটি দেখতে অনেকটা চীন 'তাওলোকীনে'র মতো।

ইউরোপীয় পর্যটকদের মসলিনের ভূয়সী প্রশংসা করার অনেক আগেই চতুর্দশ শতাব্দীতে কবি আমীর খসরু লিখেছেন, "এটি এত সূক্ষ্ম ও হালকা ছিল যে একশ'গজ মসলিন সহজেই মাথার চারদিকে পেঁচানো যেত এবং তার পরেও চুলের রেশ দেখা যেত।" তিনি আরও বলেন যে, এই সূক্ষ্মতম বস্ত্রের একটি টুকরো সহজেই নখের ভিতরে ধারণ করে রাখা সম্ভব, যদিও খোলা অবস্থায় ছড়িয়ে দিলে তা সারাটি জগৎ ঢেকে দিতে পারে। মসলিনের প্রতি বাংলার জনগণের রোমাঞ্চকর অনুভূতির মূলে রয়েছে এর নরম তুলতুলে জমিন, মনোরম সৌন্দর্য এবং শিল্পনৈপুণ্য। ইউরোপীয় পর্যটকগণ প্রথম যখন এসব বস্ত্র দেখল তখন তারা তাদের বিশ্বাস করতে পারল না এবং ভাবল এগুলো যেন "বাতাসের সুতোর পরীদের হাতে বোনা"। সমগ্র উপমহাদেশ ও বহির্বিশ্বে মসলিনের সমাদর ও চাহিদাবৃদ্ধির কারণে বিভিন্ন রকম বুনন এবং বঙ্গের মসলিন প্রস্তুতের হার বেড়ে যায়। বার্থেমা (১৫০৩-১৫০৬ খ্রিঃ) মসলিন বস্ত্রকে বেশ কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করছেন, যেমন বইরাম, ন্যামোনে, লিজাতী, ক্যাইন্তার দউযার, ও সিনাবাফ। বারবোসা ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে বাংলায় খুবই উন্নত ধরনের সুতা উৎপাদনের গাছ জন্মাতে দেখেন। তাঁর ভাষায়, "তারা বিভিন্ন ধরনের অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও মনোরম বস্ত্র প্রস্তুত করে; রঙিন বস্ত্র নিজেদের ব্যবহারের জন্য আর সাদা বস্ত্র বিভিন্ন অঞ্চলে বেচাকেনার জন্য। এসব বস্ত্র খুবই মূল্যবান। তা ছাড়া 'এস্ত্রাবানতিস' (estravantes) নামে পরিচিত কিছু সূক্ষ্ম বস্ত্র মহিলাদের মাথার উড়নি হিসেবে ব্যবহৃত হত। মূর, আরব ও পারসিকরা পাগড়ি হিসেবে ব্যবহারের জন্য এ ধরনের বস্ত্রের খুবই সমাদর করে থাকে।"

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালেও (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিঃ) মসলিন শিল্পের মান ও সৌকর্য বিদ্যমান ছিল। আবুল ফজলের ভাষায়, "সরকার সোনারগাঁয়ে খুবই সূক্ষ্ম এক জাতের মসলিন বিপুল পরিমাণ উৎপাদন করে থাকে।" এটি 'মলমল খাস' নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত। সুন্দরভাবে পালিশ করা, সোনা বা রূপার সুতায় পুষ্প, নকশা আঁকা নারকেলের খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে মলমল খাসকে প্যাকেট করা হত। ঢাকার মসলিন সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে রফতানি হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের মসলিন তখন প্রস্তুত হত; যেমন : কাশিদা, তানজেব, বাফতা, আজীজোল্লাহ, দুরিয়া, জামদানি, ভিটি, চারখানা, আবরোয়ন, ঝুনা, সরবতী, শাবনাম ইত্যাদি।

কিছু অবিশ্বাস্য ঘটনা থেকেই মসলিনের অসাধারণ সূক্ষ্মতা ও নিখুঁত নকশার কথা অনুমান করা যায়। যেমন : এক পাউন্ড সুতা ১৬০ মাইল পর্যন্ত বিস্তার করা যেত; মসলিনের একটি ছোট্ট দলা দুই ফার্লং ষাট গজ পর্যন্ত টেনে লম্বা করা যেত; ২০ হাতের এক থান মসলিন ফুঁ দিয়ে ফুরফুর করে ওড়ানো যেত; এক টুকরা শাবনাম ঘাসের উপর পড়ে থাকলে অত্যধিক স্বচ্ছতার কারণে দেখাই যেত না বলে একে শাবনাম বা সকালের শিশির বলা হয়ে থাকে। আবরোয়ানের নাম আবরোয়ান বা বহমান পানি হয়েছে এজন্য যে, যদি তা পানির উপর ফেলা হত তবে তা স্বচ্ছতার জন্য চোখে বোঝাই যেত না। সম্রাট আওরঙ্গজেব জামদানি খুবই পছন্দ করতেন। একবার তাঁর কন্যা জেবুন্নেসা সাত প্যাঁচ দিয়ে মসলিন পরে তাঁর সামনে উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে অশালীনতার জন্য ভর্ৎসনা করেন।

মসলিন উৎপাদনের নগরী হিসেবে সোনারগাঁয়ের বিশ্বজোড়া খ্যাতির মূল কারণ হচ্ছে এখানে মসলিন শিল্পীদের এক বিরাট উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। এ শিল্পকর্মে তাদের পেশাগত দক্ষতা ছিল অনতিক্রান্ত। তাছাড়া 'আইন-ই-আকবরী'তে 'খাসনগর দিঘি' নামে সোনারগাঁয়ের এক ইতিহাসবিখ্যাত দিঘির কথা বিবৃত হয়েছে। পাইনামের প্রায় এক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এ দিঘির ওপর টেইলর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দিঘিটি বর্তমানে ভরাট হয়ে গেলেও সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, এ দিঘির জলে প্রাকৃতিক নিয়মে রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত ছিল বলে তা মসলিন ধোয়ার জন্য খুবই উপযোগী ছিল। সোনারগাঁও অঞ্চল, বিশেষ করে কাপাশিয়া (রোমান কারপাসাস; সংস্কৃত কারপাস) এলাকায় এখন মসলিন বস্ত্র উৎপাদনের কথা জানা যায়। এ অঞ্চলটি ছিল সূক্ষ্মতম কার্পাস তুলার ব্যাপক চাষের জন্য বিখ্যাত। এ বিশেষ ধরনের কার্পাস তুলা থেকে সর্বচেয়ে অসাধারণ মসলিন শাবনাম ও আবরোয়ান দক্ষ তাঁতিদের হাতে বোনা হত।

১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকে সোনারগাঁও অঞ্চলে মসলিনের বুনন ও এর ব্যবসার চরম উন্নতি সাধিত হয়। মিশ্র অনুভূতি নিয়ে টেইলর তখন বলেছেন : "এমনকি বর্তমানকালে যদিও বয়নশিল্পের ব্যাপক পূর্ণতা সাধিত হয়েছে তথাপি স্বচ্ছতা, সৌন্দর্য ও বুননের চমৎকারিত্বে এ বস্ত্র (মসলিন) অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিশ্বের যে-কোনো দেশের তাঁতশিল্পের সর্বোত্তম উৎপন্ন দ্রব্যকেও তা হার মানিয়ে দেয়।" ইংরেজদের মেশিনে তৈরি সুতার আমদানি মসলিন শিল্পকে সমূলে ধ্বংস করে ফেলে। বাণিজ্যের অবনতি ঘটিয়ে এবং তাঁতিদেরকে নির্যাতন করে এ শিল্পের সমাধি রচনা করতে ইংরেজ শাসকদের কোনো দ্বিধা হয়নি। বলা হয়ে থাকে যে, সূক্ষ্মতম বস্ত্রের বুননে বাংলায় যেসব তাঁতি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী কেটে ফেলতেও তারা কোনো দ্বিধা করেনি।

স্থাপত্যকীর্তি

ইতিহাস ও উপাখ্যানে সোনারগাঁওকে দেখানো হয়েছে নগরীর রানী হিসেবে; অন্ততপক্ষে স্থাপত্য ক্রিয়াকলাপে ও হাতে বোনা দুনিয়ার সেরা মিহি বস্ত্র উৎপাদনের কেন্দ্রভূমি হিসেবে এর ব্যাপক খ্যাতির বিচারে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্যন্ত গোটা চার শতাব্দী ধরে সোনারগাঁও সম্পর্কে নির্ভুল তথ্যাদি পাওয়া যায়। অতীত ঐশ্বর্যের করুণ নিদর্শন হিসেবে বর্তমানে টিকে থাকলেও সম্পূর্ণ নগরীটি একসময় অগণিত সুরম্য ও বর্ণাঢ্য স্থাপত্যকীর্তিতে শোভিত ছিল। বেশ কয়েকটি অঞ্চল জুড়ে বিরাট এলাকায় নির্মিত ইমারতসমূহের মধ্যে মসজিদই ছিল নিঃসন্দেহে সবচেয়ে আকর্ষণীয়। এদের কিছু কিছু আজও প্রাচীন ঐশ্বর্যের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদ হচ্ছে ইসলামের প্রতীক এবং মুসলিম সমাজব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। প্রকৃতপক্ষে মসজিদের নির্মাণরীতির মানোন্নয়ন মুসলিম সমাজব্যবস্থার বিকাশ ও সমৃদ্ধিকেই চিত্রিত করে। সোনারগাঁও ও তার পার্শ্ববর্তী নির্মিত অসংখ্য মসজিদ মুসলিম শাসকদের অপার ধর্মপরায়ণতার সাথে সাথে তাদের সুকুমার শিল্প প্রবণতাকেও প্রতিফলিত করে থাকে। 'সুবর্ণনগরকে' সুশোভিত করার জন্য মসজিদ ছাড়াও মাদ্রাসা, মাজার, দরগাহ, পুল, তোরণ, দুর্গ, প্রাসাদ ইত্যাদি নির্মিত হয়েছিল।

১. মোগরাপাড়া, গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের সমাধি, ১৪১০ খ্রিস্টাব্দ (৪৩)

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ মহাসড়কের প্রায় আধ মাইল উত্তরে, বর্তমানে অবহেলিত মোগরাপাড়া গ্রামে, বাংলাদেশের একটি প্রাচীনতম মুসলিম ইমারত রয়েছে। এ ইমারতটি গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের সমাধি। এটি সম্ভবত ১৪১০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। আযম শাহ ছিলেন ইলিয়াস শাহী বংশের বিখ্যাত সুলতান, যিনি ১৩৮৯-৯০ থেকে ১৪০৯-১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। বিশ বছরের গৌরবময় শাসনের পর তিনি সোনারগাঁয়ে মারা যান।

আযম শাহের এ সমাধিটি পাঁচ পীরের দরগার কাছে একটি শুষ্ক দিঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইমারতটিকে এমনভাবে লুণ্ঠিত ও অঙ্গহীন করা হয়েছে যে প্রস্তরনির্মিত চমৎকার সার্কোফেগাস বা শবাধারটি ছাড়া সমাধির অন্যান্য অংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জেমস ওয়াইজের বিবরণ অনুসারে, "সমাধিটি বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত, কিন্তু একসময় এর মাঝখানে স্থাপিত বিরাট প্রস্তরখণ্ডটি নিয়ে গঠিত ছিল বিশাল সৌধ। এ প্রস্তরখণ্ডটি আবার ছিল পাঁচ ফুট উঁচু স্তম্ভ দ্বারা পরিবেষ্টিত। এসব পাথরের টুকরা ছিল চমৎকারভাবে খোদাই করা। এদের কোণগুলো এবং জ্যামিতিক নকশার গতিময়তা কারিগরের নির্মাণকালে যেমন ছিল এখন তেমনি অম্লান রয়েছে। পাথরগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কঠিন কালো ব্যাসেল্ট দ্বারা গঠিত ছিল। মুসলিম শিল্পরুচির উত্তম পরিচায়ক ধ্বংসপ্রাপ্ত এই সমাধির চেয়ে ভাল কোনো ইমারত পূর্বাঞ্চলীয় বাংলার কোথাও নেই।"

খুব সম্ভব সমাধিটি ছিল এক গম্বুজবিশিষ্ট একটি বর্গাকার ইমারত, এর চারদিকে প্রস্তরস্তম্ভের চিহ্ন এখন তার পুরনো জাঁকজমকের স্মৃতি বহন করে থাকে। পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলার ইসলামি স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন এই চমকপ্রদ সমাধিটি একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড নিয়ে গঠিত, যা একটি চ্যাপটা প্রস্তরফলকের উপর স্থাপিত হয়েছে। এটিকে বড়জোর একটি সেনোটাফ বা সমাধিপ্রস্তর বলা যায়। বাক্সের মতো এ সমাধির চূড়ায় মসৃণ পাথরটি কীলাকার (keel) রূপ ধারণ করেছে। সমাধির দু'পাশেই খোদিত রয়েছে তিনটি করে তিন খাঁজবিশিষ্ট খিলান। এদের খাঁজের মধ্যে আবার রয়েছে প্রলম্বিত শিকল ও ঝুলন্ত ঘণ্টার নকশা। সেনোটাফের মাথায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে মাটিতে

অর্ধপ্রোথিত বেলেপাথরের স্তম্ভ। স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, দণ্ডায়মান অবস্থায় তা চিরাগদান বা আলোকদণ্ড হিসেবে ব্যবহৃত হত।

সমাধিটির আলংকারিক দিক সম্বন্ধে এ. এইচ. দানী বলেন, "প্রস্তরফলকের কার্নিশে রয়েছে বিলেট অলংকরণের একটি সারি যার নীচেই রয়েছে আবার মুক্তাদানার অলংকরণ। এ পদ্ধতির সাথে আদিনা মসজিদের 'বাদশা কা তাখ্‌তে' ব্যবহৃত পদ্ধতির খুবই সামঞ্জস্য বিদ্যমান। এর নীচেই তিনটি প্যানেল রয়েছে। প্রতিটি প্যানেলে দেখা যায় ঝুলন্ত বাতিসহ খিলানবিশিষ্ট কুলুঙ্গি। বাতিগুলিও আদিনা মসজিদের মিহরাবের বাতির মতোই, তবে এখানে বাতিগুলি আদিনা মসজিদের বাতির এক শিকলের পরিবর্তে দু'টি শিকলের সাহায্যে ঝুলে আছে।"

২. দুর্গ (দমদমা), ষোড়শ শতাব্দী (বিলীন)

সোনারগাঁয়ের মোগরাপাড়া এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো, জাঁকাল ইমারতের ধ্বংসাবশেষের বিস্তার দেখে মনে হয় এলাকাটি একসময় প্রত্নতাত্ত্বিক ও পর্যটকদের খুবই প্রিয় দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছিল। এককালীন সমৃদ্ধিশালী ও রাজধানীর ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকের বর্ণনা দেন জেমস ওয়াইজ, "সোনারগাঁওবাসীদের কাছে মোগরাপাড়া প্রাচীন নগরীর অবস্থান হিসেবে বিবেচিত। এর আশেপাশেই নিঃসন্দেহে প্রাচীন অনেক ইমারত বিদ্যমান রয়েছে। আর এর সামান্য দূরেই রয়েছে ক্রমশ উন্নত একটি উঁচু ভূমি যা এখন 'দমদমা' বা দুর্গ নামের পরিচয় বহন করছে। এই বৃত্তাকার ঢিবির চূড়ায় বিশাল তেঁতুলগাছ। দুর্গের কোনো চিহ্নই এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বহু বছর যাবৎ এটি মুহর্‌রমের সময় মুসলমানদের (শিয়া) 'আশুরাখানা' হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।" উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ থেকে যে-কেউ সহজেই বুঝতে পারবে। যে মগরাপাড়া একটি সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। এটি আযম শাহের সমাধির অর্ধ মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত।

বৃহত্তর সোনারগাঁও অঞ্চলে দমদামা নামে যে স্থানটি রয়েছে সেখানে একটি দুর্গ নির্মিত হয়। বর্তমানে এটি অবলুপ্ত। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে জেমস ওয়াইজ এ স্থানটি পরিদর্শন করেন এবং যে উচুঁ টিপির উপর দুর্গ নির্মিত হয়েছিল তা স্থানীয় লোকেরা কেটে সমান করে ফেলে। বর্তমানে এখানে চাষবাস করা হয়। হাবিবা খাতুনের ভাষায়, "বংশী নদীর তীরে গণকপাড়ায় একটি কাদামাটির (Mud fort) দুর্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ছাড়া তুরাগ নদীর তীরে ডুমুরিয়া এবং শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে 'দুরদুরিয়া' নামে আরও দু'টি দুর্গ নির্মিত হয়, বর্তমানে এগুলোর কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না।

দুরদুরিয়া দুর্গ সম্বন্ধে এস. এম. তৈফুর বলেন, সোনারগাঁয়ের উত্তর-পূর্বদিকে দুরদুরিয়া নামে একটি স্থান আছে। 'দুরদুরিয়া' শব্দের অর্থ নদীর দিকে ফটক ('দুর' অর্থ ফটক 'দরিয়া' অর্থ নদী)। এটি কাপাসিয়া থানার অন্তর্গত। বানার নদীর তীরে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ নির্মিত হয়। এটি অর্ধবৃত্তাকার ইমারত, যা দুই মাইল ব্যাপী বিস্তৃত ছিল। সুরক্ষিত করার জন্য দুটি দরিয়া (Moat) ছিল।" তাইফুর এটিকে একডালা বলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন।

আ. ক. ম. যাকারিয়া তাঁর 'সোনারগাঁয়ের প্রত্নসম্পদ প্রসঙ্গে' বলেন, মগরাপাড়া মাজার, মসজিদ, কবরস্থান, নহবতখানা প্রভৃতি কীর্তির চারদিক ঘিরে একটি বিরাট এলাকা নিয়ে যে প্রশস্ত পরিখার চিহ্ন দেখা যায়, সেই এলাকাকে দমদমা বলা হয়। ফার্সি দমদমা শব্দের অর্থ ঢিবি বা উঁচু স্থান-দুর্গ, এই দমদমার সঠিক পরিধি নির্ধারণ করা বর্তমানে সহজ নয়। চারদিকে ঘন বসতি গড়ে ওঠার ফলে পরিখা অবলুপ্তপ্রায়। তবে বর্তমান মাজার, কবরস্থান, নহবতখানা ও মসজিদ যে স্থানে অবস্থিত সেটি যে দমদমার কেন্দ্রস্থান ছিল, তা হয়তো অনুমান করা যেতে পারে। দক্ষিণদিকে অবস্থিত মেনীখালী নদী ছিল দমদমার দক্ষিণ সীমানা। সেদিকে কোনো পরিখা ছিল না। পূর্বদিকে দমদমার সীমানা বর্তমান হাইস্কুলের পূর্বদিকে ছিল বলে ধারণা করা যায়। পশ্চিম দিকের মসজিদ থেকে প্রায় ৪০০ গজ দূরে নাসিমউদ্দীন মুন্সী-নামক এক ব্যক্তির মাজার বলে কথিত একটি পাকা কবরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। দমদমার পশ্চিম পরিখা এই কবরের কিছু পশ্চিমদিক দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত ছিল বলে চিহ্ন পাওয়া যায়। উত্তরদিকের পরিখা ছিল মসজিদ ও মাজার এলাকার অনেক উত্তর দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত। এ পরিখা খুব সম্ভবত গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের মাজারের উত্তর-দিক দিয়ে প্রবাহিত খালের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল এবং এই খাল ছিল প্রায় ২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ব্রহ্মপুত্র নদীর সঙ্গে সংযুক্ত। সেই প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরেই অবস্থিত বিখ্যাত অষ্টমী স্নানের মেলার লাঙ্গলবন্ধ ঘাট।"

৩. মান্নাশাহ্ দরবেশের সমাধি, ষোড়শ শতাব্দী

মগরাপাড়া বাজারের মধ্যেই মান্নাশাহ্ দরবেশের ছাদবিহীন খোলামেলা সমাধিটি বিদ্যমান। এর কোন আবেষ্টনী দেয়ালও নেই। মহান সাধক ও ধর্মপ্রচারক মান্নাশাহ্ প্রসঙ্গে নিশ্চিতরূপে কোনোকিছু জানা যায় না এবং কোনো শিলালিপি রেকর্ডও আবিষ্কৃত হয়নি। তবে, এতদঞ্চলের পুরাকীর্তি নিদর্শন বিচার করে ধরে নেয়া যায় যে এটি ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল।

৪. শায়খ মুহাম্মদ ইউসুফের খানকাহ ও সমাধি এবং শায়খ মাহমুদের সমাধি, ষোড়শ শতাব্দী (৪৪)

মান্নাশাহ্ দরবেশের সমাধি থেকে কিছু দূরেই রয়েছে এতদঞ্চলের বিখ্যাত সুফী সাধক শায়খ মুহাম্মদ ইউসুফের খুবই দর্শনীয় সমাধি ও খানকাহ্। ধারণা করা হয়, তিনি পারস্য থেকে বাংলায় এসেছিলেন ইসলাম প্রচার করার জন্য এবং এ এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। পিতা শায়খ মুহাম্মদ ইউসুফ এবং পুত্র শায়খ মাহমুদ উভয়কেই পলেস্তরার দেয়াল ঘেরা আয়তাকার দরগায় সমাধিস্থ করা হয়েছে। সমাধি দু'টি বাংলাদেশের কুঁড়েঘরের বৈশিষ্ট্যে চৌচালা ছাদ দিয়ে আচ্ছাদিত করা হয়েছে।

৫। ইব্রাহিম দানিশমন্দের খানকাহ, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ

সোনারগাঁয়ে অবস্থিত নওবতখানা থেকে প্রায় ৪০ ফুট উত্তরে একটি খানকাহ ও তদসংলগ্ন প্রাচীরঘেরা স্থানে উত্তর দেয়ালের সঙ্গে সংলগ্ন পরপর ৪টি পাকা কবর আছে। প্রখ্যাত সুফীসাধক ও দরবেশ ইব্রাহিম দানেশমন্দের খানকা ও মাজারটি খুবই

আকর্ষণীয়। সোনারগাঁয়ে সাদীপুর এলাকায় ইব্রাহিম দানিশমন্দের সমাধি অবস্থিত। ইব্রাহিম দানিশমন্দ প্রসঙ্গে সঠিক কিছু জানা যায় না; তবে তার পদবী 'দানিশমন্দ' (ফার্সি শব্দ) থেকে ধারণা করা হয় যে, তিনি পারস্যদেশ থেকে বাংলায় আসেন ধর্ম প্রচারের জন্য। তিনি ধর্মপ্রচারকই ছিলেন না, সাধক ও সুফী হিসাবে তিনি সুনাম অর্জন করেন। সম্ভবত তিনি সুলতান হোসেন শাহের আমলে সোনারগাঁয়ে বসতি শুরু করেন। তৈফুর তাঁর 'Glimpses of Old Dhaka' গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

"In the courtyard of this mosque there are three mausoleums, the roof of which look like Bengal's thatched huts. The westernmost of these shrines contains the remains of Syed Ibrahim Danishmand, the middle one is of direct descendant named Syed Muhammad Ahl-e-Ilm. The next two tombs belong to Ahl-e-Ilm's second son Syed Muhammad Yusuf Ahl-Qalam and his wife Ayesha Banu."

বঙ্গানুবাদ : "মসজিদের চত্বরে তিনটি বাংলা চৌচালা ছাদের মতো তিনটি সমাধি রয়েছে। পশ্চিমদিকের সমাধিতে সৈয়দ ইব্রাহিম দানিশমন্দের শবাধার রয়েছে। মধ্যবর্তী সমাধিটি তাঁর বংশধর সৈয়দ মোহাম্মদের এবং পরবর্তী দুটি সমাধি তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ ইউসুফ এবং তাঁর পত্নী আয়েশা বানুর।"

তৈফুরের বর্ণনা সঠিক নয়। কারণ ইব্রাহিম দানিশমন্দের মাজারের উত্তরদিকে যে চৌচালা ছাদবিশিষ্ট মাজার রয়েছে তা জোড়া সমাধি; একটি শেখ ইউসুফের এবং অপরটি তাঁর পুত্র শেখ মাহমুদের এবং এর সাথে রয়েছে মাহমুদের মাতা এবং ইউসুফের স্ত্রীর সমাধি। আলেকজান্ডার কানিংহাম (আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া) এবং আহমদ হাসান দানী তাঁর 'Dacca' গ্রন্থে ইব্রাহিম দানিশমন্দ সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। তাঁরা শেখ মুহম্মদ ইউসুফ এবং তাঁর পুত্র শেখ মাহমুদের সমাধির উল্লেখ করেন। অন্যদিকে তৈফুর ইব্রাহিম দানিশমন্দের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি নিজেকে দানিশমন্দের বংশধর হিসাবে দাবি করেন।

এ প্রসঙ্গে আ. ক. ম. যাকারিয়া বলেন, "মাজার ইমারতগুলি পূর্ব দিক দিয়ে প্রবেশ করতেই সামনেই যে মাজারটি পড়ে সেটিকে বর্তমানে ইব্রাহীম দানেশমন্দের মাজার বলে অভিহিত করা হয়। খানকাহ শরীফের বর্তমান খাদেম মাজারগুলির নামাকরণ এবং সেই সঙ্গে সোনারগাঁয়ের অনেক কাহিনী বলে থাকেন। সৈয়দ মোহাম্মদ তাইফুর সর্বপশ্চিমের কবরটিকে ইব্রাহীম দানিশমন্দ এবং পূর্ব দিকেরটিকে তার বংশধর আহলে ইমাম-এর পরের টিকে আহলে ইমামের পুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ ইউসুফ এবং এর পরের অর্থাৎ সব পূর্বদিকেরটিকে শেষোক্ত ব্যক্তির স্ত্রী আয়েশা বানুর মাজার বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তিনি তার উক্তির পিছনে কোন প্রমাণের কথা বলেননি। বর্তমান খাদেমও এ মতের সমর্থক এবং মাজারগুলিতে এ ধরনের সাইনবোর্ডও দিয়েছেন।" স্যার ক্যনিংহ্যাম এস্থানে সমাহিত প্রধান ব্যক্তির নাম শেখ মোহাম্মদ ইউসুফ এবং সেইসঙ্গে তাঁর পুত্র শেখ মাহমুদের নাম উল্লেখ করেছেন। ইব্রাহিম দানিশমন্দ, তাঁর বংশধর আহলে ইমাম ও সৈয়দ ইউসুফের পত্নী আয়েশা বানুর কথা তিনি উল্লেখ করেননি। অধ্যাপক আহমদ হাসান দানী তাঁকে সমর্থন করেছেন।

উল্লিখিত মাজার সমাধিগুলো স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, এগুলো চতুষ্কোণাকার কিন্তু আসলে এগুলোর পরিমাপ আয়তাকার এবং অপর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চৌচালা ছাদ। বাংলার গ্রামাঞ্চলে কুঁড়েঘরে যে ধরনের ছাদ থাকে, তা এ সমাধিগুলোর ছাদে প্রতিফলিত হয়েছে।

৬। সোনারগাঁও, দিপিকা দুর্গ, মীর জুমলা, সপ্তদশ শতাব্দী (ধ্বংসপ্রাপ্ত)

হাবিবা খাতুন তাঁর সন্দর্ভ সোনারগাঁয়ে দিপিকা কেল্লা নামে মুঘল আমলের একটি দুর্গের উল্লেখ করেন। সম্ভবত মীর জুমলা সপ্তদশ শতাব্দীতে এ দুর্গটি নির্মাণ করেন। বুড়িগঙ্গা এবং শীতলক্ষ্যা নদীর সঙ্গমস্থলে বুড়িগঙ্গা নদীর পশ্চিমপাড়ে দিপিকা কেল্লা প্রতিষ্ঠিত হয়। হাবিবা খাতুনের মতে, দিপিকা এলাকার পুরাতত্ত্ব গুপ্তযুগের। যাহোক, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুঘরীলের শাসনামলে এস্থানের নাম ছিল নাবিকা। উত্তরে ভাওয়ালের জঙ্গল এবং আরিয়াল বিল দিয়ে এ অঞ্চলটি সুরক্ষিত ছিল। এটি কাদামাটির দুর্গ ছিল, অর্থাৎ স্থায়ী কেল্লা ছিল না। মুঘলদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বারো ভুঁইয়াগণ এটি নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে এটি ধাপা থেকে ধাপা কেল্লা নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ সড়কে ধাপা নামে একটি স্থান রয়েছে। ধাপা থেকে দিপিকা নামকরণ হয়েছে বলে মনে হয়। মুঘলদের কামাজার গোলায় এ কেল্লাটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তীকালে মুঘল সেনাপতি মীর জুমলা এটি পুনঃনির্মাণ করেন। এটি পুর্তগীজদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ব্যবহৃত হত। হাবিবা খাতুনের মতে, ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে জেমস রেনেল যে মানচিত্র অঙ্কন করেন তাতে ধাপার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ কেল্লার ধ্বংসাবশেষ ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দেখা যায়। পঞ্চবাহু আকৃতির (pentagonal) এ দুর্গের চারিদিকে বেষ্টনীপ্রাচীর ছিল এবং চার কোনায় মোট চারটি বুরুজ (bastion) ছিল।

৭। একডালা দুর্গ, সঠিক তারিখ জানা নেই (অধুনালুপ্ত)

বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসে একডালার মতো অন্য কোনো প্রাচীন স্থান মতবিরোধের সৃষ্টি করেনি। 'তারিখ-ই ফিরোজ শাহী'তে একডালা দুর্গের উল্লেখ আছে। দিল্লির সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলক বাংলায় অভিযান করলে তৎকালীন সুলতান সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। ঐতিহাসিকদের ধারণা যে, দিনাজপুরের কোনো অঞ্চলে এই একডালা দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইলিয়াস শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী সুলতান সেকেন্দর শাহ ফিরোজ শাহের দ্বিতীয়বার বাংলায় আক্রমণের সময় একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

'বাংলার ইতিহাসে' একডালাকে একটি কাদামাটির (mudfort) দুর্গ বলা হয়েছে এবং এটি সুরক্ষিত করার জন্য মজবুত প্রাচীরবেষ্টনী ছিল। এ ছাড়া ৬০ ফুট প্রশস্ত দুটি পরিখা (moat) দিয়ে এটিকে সুরক্ষিত করা হয়। যাহোক, হাবিবা খাতুন বেভারিজের মতানুসারে বলেন যে, একডালা সোনারগাঁয়ে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। একথার সমর্থন পাওয়া যায় উইলিয়াম হেগ সম্পাদিত কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ভ্যলুম তৃতীয়তে; সোনারগাঁয়ে যদি একডালা দুর্গ থেকে থাকে তা হলে সেটি ব্রহ্মপুত্র নদীর

একটি দ্বীপে নির্মিত হয়। অপরাপর ঐতিহাসিকগণ—যেমন আবিদ আলী খান, স্টেপেলটন ও ওয়েস্টম্যাকট মনে করেন যে, একডালা দুর্গ দিনাজপুরে নির্মিত হয়। এস. এম. তৈফুরের মতে একডালা গৌড় এবং হযরত পাণ্ডুয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৮। কাট্রাবো দুর্গ, সপ্তদশ শতাব্দী (অধুনালুপ্ত)

হাবিবা খাতুন তাঁর 'সোনারগাঁও' গ্রন্থে কাট্রাবো নামে এক জনপদের বিশেষ আলোচনা করেন। তাঁর মতে, মসনদ-ই-আলা ঈসা খানের রাজধানী শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্বতীরে নির্মিত কাট্রাবোর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। মির্জা নাথান তাঁর 'বাহারিস্তান-ই-গাইবী'তে উল্লেখ করেন যে, খিজিরপুর ও কদম রসুল থেকে ১২ মাইল উত্তরে কাট্রাবো নির্মিত হয়। বর্তমানে কাট্রাবো মাসুম খান কাবুলির নামানুসারে মাসুমাবাদ নামে পরিচিত। একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, কাট্রাবো বারো ভুঁইয়াদের আমলে রাজধানী ছিল। একসময়ে এখানে দেওয়ান ঈসা খানের শাসনামলে একটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল। এটি 'হাট্রার' নামেও পরিচিত ছিল। ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে ঈসা খান এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে মুঘল সেনাপতি মাসুম খান কাবুলি বিদ্রোহ করে মুঘলদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং তখন কাট্রাবো তাঁর ঘাঁটি ছিল। এটিকে তিনি প্রাচীর দিয়ে (rampart wall) সুরক্ষিত করেন। এ ছাড়া মুঘল অভিযান প্রতিহত করার জন্য উত্তরে ভাওয়াল–শ্রীপুর থেকে দক্ষিণে বিক্রমপুর পর্যন্ত এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেল্লা প্রতিষ্ঠা করেন।

হাবিবা খাতুন কাট্রাবো নামক প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের উপর গবেষণা পরিচালনা করেন এবং এখানে বিক্ষিপ্ত অনেক প্রত্নসম্পদ দেখতে পান—বিশেষ করে মাহমুদাবাদ গ্রামে। এ অঞ্চলে ঈসা খানের আমলের দেওয়ান দিঘি বসতবাড়ির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। বসতবাড়িটি 'দেওয়ানবাড়ী' নামে পরিচিত। এ ছাড়া মিঠাপুকুর নামে একটি দিঘি এবং একটি মসজিদ দেখা যাবে। 'দেওয়ানবাড়ি' প্রসঙ্গে হাবিবা খাতুন বলেন যে, এটিতে একটি সুরক্ষিত দুর্গ, যা ৯′ ৬″ ইঞ্চি মোটা ইটের বেষ্টনীপ্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল এবং এই দুর্গটির চার কোনায় আটকোনাকার বুরুজ দ্বারা সুদৃঢ় করা হয়। সমগ্র এলাকাটি দৈর্ঘ্যে উত্তর-দক্ষিণে ১৩০০ ফুট এবং প্রস্থে পূর্ব-পশ্চিমে ১০০০ ফুট। পূর্বদিক থেকে একটি সুউচ্চ ফটকের মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। দুর্গের এক প্রান্তে উঁচু ঢিপি রয়েছে যেখানে কামান বসানো হত। অন্য প্রান্তে বসতবাড়ি। ধারণা করা হয় জলাশয়ের জন্য দুটি বেষ্টনীপ্রাচীর নির্মিত হয়। 'দেওয়ানবাড়ি' নামক স্থানের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে নকশাকরা ইট ও ধ্বংসস্তূপ লক্ষ করা যাবে, যা দেখে মনে হয় যে, দেওয়ান ঈসা খান তাঁর পরিবার পরিজন নিয়ে এখানে বসবাস করতেন। 'দেওয়ানবাড়ী' ছাড়াও ছোট ছোট বহু ইমারতের ভিত দেখা যাবে। পানি সরবরাহের জন্য পোড়ামাটির পাইপ বসানো হয়।

এ ছাড়া ১৪৪০ × ৭২০ ফুট পরিমাপের যে দেওয়ান দিঘি রয়েছে তা খুবই আকর্ষণীয়। দিঘিটি এত বিশাল যে প্রায় ২০ একর জমি নিয়ে এটি খনন করা হয়। দেওয়ান দিঘির পশ্চিম পাড়ে ৫০ × ৪৬ ফুট পরিমাপের যে ঢিবি রয়েছে তা স্থানীয়

কিংবদন্তিতে একটি হাম্মামখানার ধ্বংসস্তূপ বলা হয়েছে। এ ছাড়া কাট্রাবোর অন্যতম ধ্বংসাবশেষ হচ্ছে ৪০ × ৩০ ফুট পরিমাপের বাসস্থান এবং একটি অধুনালুপ্ত স্তম্ভরাজি দ্বারা নির্মিত মসজিদের ভগ্নাবশেষ দেখা যাবে। হাবিবা খাতুন একটি মিহরাবের অংশ-বিশেষ উল্লেখ করে মসজিদের অথবা ঈদগাহের অবস্থিতির কথা জোরালোভাবে বলেছেন।

৯। কাট্রাবো, মসজিদ, ষোড়শ শতাব্দী

হাবিবা খাতুন তাঁর গ্রন্থ 'সোনারগাঁয়ে' কট্রোবো পরগনা অথবা জনপদের উল্লেখ করে বলেন যে, এটি মাহমুদাবাদের সন্নিকটে। এখানে প্রাচীন মসজিদ, মাজার এবং বসতবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখা যাবে। তাঁর মতে এগুলো সুলতানী আমলের স্থাপত্য কীর্তি।

১০। মোগরাপাড়া, মসজিদ, ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দ, পুনর্নির্মাণ ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ

জেমস ওয়াইজের বর্ণনামতে, "উত্তরদিকে কিছু দূরে শায়খ মুহাম্মদ ইউসুফের খানকাহ (কানকাহ) এবং ইউসুফের নিজের ও তাঁর পুত্র শায়খ মাহমুদের সমাধি। এখানে শায়খ মাহমুদের নির্মিত বলে কথিত একটি মসজিদও রয়েছে তবে দরজার উপরে ১১১২ হিজরী সন উৎকীর্ণ লিপি থেকে দেখা যায় যে এটি একটি আধুনিক ইমারত। যাহোক, এ সমাধিসমূহের সাথে সংযুক্ত আবেষ্টনী দেয়ালে দ্বিতীয় আরেকটি লিপি বসানো রয়েছে, যা খুব সম্ভব মূল মসজিদেই স্থাপিত হয়েছিল। কয়েক স্তর চুনকাম করা পাথরের উপর লিপির হরফগুলো প্রায় দেওয়ালে দু'ইঞ্চির মতো গভীর হয়ে গেঁথে আছে।"

লিপি অনুসারে উক্ত মসজিদটি মূলত পঞ্চদশ শতাব্দীর অর্থাৎ ৮৮৯ হিজরী, তথা ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে সুলতান জালালউদ্দীন ফতেহ শাহের রাজত্বকালে (১৪৮২-৮৭) নির্মিত। শামসুদ্দীন আহমদের বর্ণনামতে, এ মসজিদের নির্মাতা অবশ্যই ছিলেন কোনো নামী-দামী সভাসদ ও সেনাপতি। তাঁর নাম খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় ৮৮৯ হিঃ/১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে সুলতান জালালুদ্দীন ফতেহ শাহের রাজত্বকালে সুলতানের পরিচ্ছদরক্ষক ও তাঁর লস্কর (সেনাপ্রধান) দ্বারা এই মসজিদটি নির্মিত হয়। পুরানো মসজিদটি ধ্বংস হয়ে পড়ে যাওয়ার পর তার জায়গায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরেকটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে, যার প্রমাণ পাওয়া যায় ১১১২ হিজরী, তথা ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের এক লিপিতে। প্রাচীন মসজিদটির স্তম্ভ ও মিহরাব প্রস্তর আশে পাশেই দেখা যাবে। ৬ ফুট পুরু দেয়ালসহ এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্তমান মসজিদটি খুব সম্ভব মুঘল আমলে প্রাক-মুঘল যুগের উপকরণ দিয়ে নির্মিত। দানীর ভাষায়, "পান্দান্তিফ গম্বুজটি বহন করছে এবং প্রস্তরস্তম্ভসমূহ কোনো গঠনমূলক উদ্দেশ্য সাধন করছে না। তবে কার্নিশ প্রাচীন বক্রাকার সীমারেখাকে নির্দেশ করে এবং মসজিদের প্রবেশপথটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুঘল আমলে পুরনো রীতিতে মসজিদ সংস্কারের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।"

১১। সোনারগাঁও, নহবতখানা, খাজাঞ্চিখানা, বাসভবন, ষোড়শ শতাব্দী (ধ্বংসপ্রাপ্ত)

সোনারগাঁয়ের পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষের খুবই নির্ভুল ও যথাযথ বিবরণ দিয়েছেন জেমস ওয়াইজ। তিনি বর্ণনা করেন যে, "শায়খ ইউসুফের সমাধির কাছেই নহবতখানা নামে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত তোরণ, এটি বর্তমানে একটি আধুনিক ইমারত, যেখানে এক-সময় গরীব ও মুসাফিরদের জন্য লঙ্গরখানায় বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে কাঙালিভোজের ব্যবস্থা করা হত। এই ইমারতের পেছনে রয়েছে একটি বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। এটি খাজাঞ্চিখানা বা কোষাগার হিসেবে চিহ্নিত। এটি এখন নির্জন খোলামাঠে পরিণত হয়েছে। খাজাঞ্চিখানার উত্তর-পশ্চিম দিকে রয়েছে বাসভবনসমূহের ধ্বংসাবশেষ। বর্তমান ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এসবের মধ্যে একটি ছিল বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত দোতলা দালান এবং বেশ লম্বা-চওড়া হলঘরসহ পলেস্তরায় আচ্ছাদিত দেয়াল-বিশিষ্ট আরেকটি ভবন, যা বর্তমানে মাদ্রাসা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।"

১২। সোনারগাঁও, পাঁচ পীরের দরগাহ্, সপ্তদশ শতাব্দী

এককালে খুবই সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল মোগরাপাড়ার সুন্দর পুরাকীর্তি নিদর্শন হচ্ছে পাঁচ পীরের দরগাহ্। এ পাঁচ পীরকে গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের সমাধির পার্শ্ববর্তী স্থানে সমাহিত হয়ে রয়েছে। সৌন্দর্য ও পবিত্রতার দিক থেকে এ দরগাহ্টি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। নারায়ণগঞ্জ থেকে মোগরাপাড়া অভিমুখী মূল রাস্তার প্রায় আধ মাইল উত্তরে নিস্তব্ধ এলাকায় একই সারিতে একই প্লাটফর্মে পাঁচটি ইটনির্মিত সমাধি নিয়ে গঠিত পাঁচজন প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারকের শবাধার রয়েছে। ওয়াইজের ভাষায়, "পাঁচ পীরের সমাধিগুলো একই সমান্তরালে স্থাপিত এবং ভূমি থেকে এগুলো প্রায় ৪ফুট উঁচু। প্রাচীনকালে ব্রহ্মপুত্র নদ এগুলোর পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল। একসময় সমাধিগুলোকে ছাদ দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করা হলেও এদের স্তম্ভসমূহকে কখনোই সামান্য কয়েক ফুটের বেশি তোলা হয়নি। এসব সমাধির নির্মাণকাল, সাধুপুরুষদের নাম এবং তাঁরা কোন দেশ থেকে এসেছিলেন সেসবের কোনো কিছুই জানা যায় না। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, তাঁরা পশ্চিম দেশ থেকে এসেছেন।" খুবই সাধারণভাবে নির্মিত পাঁচ পীরের সমাধিসমূহে মাথার কাছে একটি করে ইটের নির্মিত চিরাগদান রয়েছে। চিরাগদানের চাল কুঁড়েঘরের আকৃতিতে গঠিত। সাধুপুরুষদের দেহাবশেষ ধারণকারী উঁচু প্লাটফরমের ধার জুড়ে অসম্পূর্ণ ইটের স্তম্ভ রয়েছে, যা দেখে মনে হয় যে মূলত দরগার ছাদ দেয়ার জন্য অথবা জাফরিকাটা রেলিং বসানোর জন্য এগুলি স্থাপন করা হয়েছিল। এসব পীরের পরিচয় যদিও জানা সম্ভব হয়নি, তথাপি পাঁচ পীরের ভক্তি মতবাদ বাংলায় বহুলভাবে পরিচিত। এ রহিমের বিবরণ অনুযায়ী, "পাঁচ পীরের এক দরগাহ সোনারগাঁয়ে বর্তমান। পূর্ববাংলার মাঝিমাল্লারা এখনো পীর বদরসহ, যিনি 'বদর উদ্দীন বদর-ই- 'আলম' নামে পরিচিত, পাঁচ পীরের নাম উচ্চারণ করে তাঁদের আশীর্বাদ কামনা করে থাকে।" অতএব, এ থেকে অনুমিত হয় যে, দরগায় সমাহিত বিখ্যাত পীরদের

একজন হচ্ছেন সম্ভবত পীর বদর। বদর আলম বা পীর বদরের একই রকম দরগাহ্ চট্টগ্রামে দেখা যাবে। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায় এই দরগাহ্‌কে সম্মান করে থাকে।

দরগাহ্‌র দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে ইটনির্মিত একগম্বুজবিশিষ্ট একটি সাদামাটা ছোট্ট ইমারত। এর কোনায় কোনায় রয়েছে মিনার। এটি হচ্ছে দরগাহ্‌সংলগ্ন মসজিদ যার অলংকরণ ও নির্মাণপদ্ধতি প্রমাণ করে যে ইমারতটি সপ্তদশ শতাব্দীর চেয়ে প্রাচীন নয়।

১৩। গোহাট্টা, পোক্কাই দেওয়ানের সমাধি ও ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দী

মোগরাপাড়ার উত্তরাংশে গোহাট্টা নামক এলাকাটি অবস্থিত। ইতস্তত ছড়ানো পুরাকীর্তি ধ্বংসাবশেষ তাদের অতীত জাঁকজমকের চিহ্ন দেখে পর্যটকদের চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। বিভিন্ন মাজার ও ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ এতদঞ্চলের জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ পুরনো দিন এবং সমৃদ্ধিশালী নগরজীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানকার প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে শাহ্ আবদুল আলা ওরফে পোক্কাই দেওয়ানের ইটনির্মিত সমাধি। তিনি ছিলেন এলাকার একজন বিখ্যাত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব যাঁর জীবনের বারোটি বছর একটানা একটি পাথরের প্লাটফর্মে বসেই ধ্যানের মধ্যে কেটে গেছে। পোক্কাই দেওয়ান উপাধির উৎস হচ্ছে, তিনি গভীর জঙ্গলে বারো বছর এমন ধ্যানে মগ্ন ছিলেন যে তাঁকে দেহের চতুর্দিকে গড়ে ওঠো পিঁপড়ের পাহাড় থেকে বের করে আনতে হয়। সাদা পিপঁড়ের দল (বা পোক্কাই) তাঁকে ঘিরে ঢিবি বানাতে বানাতে তাঁর ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এজন্য তাঁকে আখ্যা দেয়া হয় 'পোক্কাই দেওয়ান'। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে পোক্কাই দেওয়ান পরলোক গমন করেন। তাঁর পুত্র শাহ্ ইমাম বখশ ওরফে চুন্নু মিয়া সিলেট থেকে এতদঞ্চলের লোকজনের মধ্যে এসে বসতি স্থাপন করেন এবং সোনারগাঁয়ে মারা যান। দেয়ালবেষ্টিত এলাকার মধ্যে শাহ্ আব্দুল সমাহিত যেখানে তাঁর স্ত্রী এবং পুত্রের সমাধিও দেখতে পাওয়া যায়। পীরেব সমাধির মাথার দিকে একটি জাফরিকাটা পাথরখণ্ড রয়েছে। এই ইমারতটি (যদি আদৌ তা বলা যায়) অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত।

পীরের সমাধির পাশেই দু'টি মসজিদ ভালভাবে এখনও টিকে আছে। একটির ভিত্তি খনন করে ফেলা হলেও তার দেয়াল এখন ৮ ফুট পুরু দেখায়। কিছুসংখ্যক খোদাইকরা পাথর ও ইট ইতস্তত ছড়িয়ে আছে মোগরাপাড়ার পূর্বদিকে। রাস্তার পাশে ইউসুফগঞ্জ মসজিদ নামে একটি মসজিদ অবস্থিত। ১৮৭৪ সালে ওয়াইজ যখন দেখেন তখন এর গম্বুজ গাছপালা ও লতাগুল্ম আচ্ছাদিত ছিল।

১৪। হাবিবপুর, পাগলা শাহের মাজার, অষ্টাদশ শতাব্দী

মোগরাপাড়ার পূর্বদিকে হাবিবপুর গ্রামের কাছে ডিস্ট্রিক্ রোডের ডানপাশে জনৈক অপরিচিত সাধকের সমাধি, ইমারতটি আজও পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এতদঞ্চলে এটি সাধারণত পাগলা শাহের সমাধি নামে পরিচিত। এ ইমারতের সব স্থাপত্যিক সৌন্দর্য নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। জেমস ওয়াইজ যে গল্পের বিবরণ দেন তাতে দেখা যায় যে, সাধক তাঁর ধ্যানের গভীরতা ও প্রভাবে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েন

বলে এরকম চমকপ্রদ উপাধিপ্রাপ্ত হন। তাঁর সম্পর্কে এতদঞ্চলে আরেকটি গল্প প্রচলিত ছিল যে, তিনি দৈববলে চোর ধরে ফেলতে পারতেন এবং তাদেরকে ধরে দেয়াল পেরেক দিয়ে আটকে তারপর তাদের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করতেন। এরকম অনেক দ্বিখণ্ডিত মস্তক মালায় গেঁথে তিনি পার্শ্ববর্তী অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতেন, যা 'মুণ্ডমালা' হিসেবে পরিচিত হয়েছিল।

১৫। সাদীপুর, নুসরাত শাহের মসজিদ, ১৫২৩ খ্রিঃ (বিলীন) এবং গরীবুল্লার মসজিদ, ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দ

মোগরাপাড়া থেকে আধ মাইল উত্তর-পূর্বদিকে সোনারগাঁও পরগনায় খুবই প্রাচীন একটি প্রাক-মুঘল মসজিদের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। এ মসজিদের প্রমাণ পাওয়া গেছে পরিখায় ঘেরা উঁচু ঢিবির উপর আবিস্কৃত সুলতান নাসিরুদ্দীন নুসরাত শাহের আমলের (১৫১৯–৩৩ খ্রিঃ) একটি শিলালিপিতে। লিপিটির তারিখ ৯২৯ হিজরী, তথা ১৫২৩ খ্রিস্টাব্দ। পুরনো মসজিদ বহু আগেই বিলীন হয়ে গেছে। তবে ধারণা করা হয়, এখানে জনৈক শায়খ গরীবুল্লাহ কর্তৃক অপেক্ষাকৃত আধুনিক একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এস. এম. তৈফুরের মতে, বর্তমান এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি নুসরাত শাহের আমলে প্রতিষ্ঠিত মূল মসজিদ। কানিংহ্যাম বা দানী কেউই তাঁর একথার সমর্থন করেন নি। আসলে বর্তমান কাঠামোটি ১১৮২ হিঃ/১৭৬৮ খ্রিঃ নির্মিত হয়েছে। শেখ গরীবুল্লাহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে যখন বস্ত্র নিরীক্ষক ছিলেন তখন সোনারগাঁও ছিল হাতে বোনা মিহি মসলিন কাপড় উৎপাদনে প্রধান কেন্দ্র। দানী বলেন, "এর (মসজিদ) চূড়াগুলো মিনাকরা টালি দ্বারা তৈরি ছিল, তবে ইমারতটি মোটামুটি সাদামাটা এবং আকর্ষণহীন।"

১৬। পাইনাম, সেতু, সপ্তদশ শতাব্দী

সোনারগাঁয়ের অন্যতম চমকপ্রদ স্থাপত্য নিদর্শন হচ্ছে পাইনাম খাল বা নদীর ছোট্ট খাঁড়ির উপর স্থাপিত ইটের নির্মিত সুন্দর একটি পুল। এটি ব্রহ্মপুত্রের খাঁড়ি থেকে প্রায় দু'মাইল ভেতরের দিকে অবস্থিত এবং হাজীগঞ্জ ও বৈদ্যের বাজারের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে থাকে। পুলটি ত্রি-খিলানবিশিষ্ট। এর কেন্দ্রীয় খিলানটি পাশের দু'টি থেকে আকৃতিতে বড়। মুঘল আমলে নির্মিত এ পুলটি ক্যামবার (Camber) পদ্ধতিতে নির্মিত। বাঁধানো পথটি বেশ খাড়া এবং বৃত্তাকার ইটে গঠিত। পাঁচ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তে স্থাপিত ইট দিয়ে পুলটি তৈরি।

১৭। ক্ষুদ্রতর সেতু, তোরণ ইত্যাদি

উপরের পুলটি ছাড়াও পাইনামে আরেকটি ইটনির্মিত পুল রয়েছে। রাস্তা থেকে পাইনাম গ্রামের দিকে যাওয়ার পথে এটি দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত ছোট্ট একটি খালের উপর বৃত্তাকাবে সজ্জিত ইট দিয়ে এটা নির্মিত এবং খিলানের প্রান্তদেশে চ্যাপ্টাভাবে সজ্জিত ব্যাসল্টের কয়েকটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। পুলের দু'পাশে রয়েছে টাওয়ার। এটা মূলত একটি তোরণের পাশে নির্মিত হয়েছিল।

১৮। অন্যান্য ইমারতসমূহ

মোগরাপাড়া থেকে ৪ মাইল দূরে এককালে সমৃদ্ধিশালী ও প্রসিদ্ধ অঞ্চল পাইনাম অবস্থিত। জনসাধারণের কাছে এটি হাবেলী সোনারগাঁও নামে পরিচিত। টানা সড়কের দু'পাশে বেশ কিছুসংখ্যক পুরনো ইমারতের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে যাদের ক্ষুদ্রাকৃতির ইট ও কমনীয় অবয়ব তাদের প্রাচীনত্বকে প্রকাশ করে। গোটা এলাকাটিই ছিল একসময় মসজিদ, মাদ্রাসা ও মাজারে সুশোভিত ব্যাপক জনবহুল নগরী। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজ শাসকগণ এখানে একটি আধুনিক ইমারত নির্মাণ করেছে, যা আজও 'কোম্পানি কি' কোঠি' নামে পরিচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে হিন্দু ভূ-স্বামী ও বণিকগণ রাস্তার উভয় পাশে তাদের বাসভবন নির্মাণ করেছিল। তাইফুর যেমন উল্লেখ করেন, "প্রাচীন দুর্গ ও পরিখার নিদর্শন এখনও সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়। এ থেকে ধারণা করা হয় যে, এ এলাকাটিই এসময় ছিল সোনারগাঁয়ের শাসকদের মূল রাজধানী।"

১৯। গোয়ালদী, মসজিদ, ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ (৪৫)

পাইনাম থেকে দেড় মাইল দূরেই রয়েছে প্রাক-মুঘল আমলের সমৃদ্ধ সামাজিক জীবনযাপনের কেন্দ্রভূমি, আর বর্তমানকালের অবহেলিত গ্রাম গোয়ালদী। এ অঞ্চলের পুরাকীর্তি নিদর্শন বর্তমানে দু'টি প্রাচীন মসজিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। একটি হুসাইন শাহের আমলের, আর অন্যটি আওরঙ্গজেবের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত।

গোয়ালদী মসজিদ আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) নির্মিত এবং সোনারগাঁয়ের প্রাচীনতম ধর্মীয় ইমারত। একটি লিপি অনুসারে এটি ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে মোল্লা হিযাবর আকবর খান কর্তৃক নির্মিত হয়। বর্গাকার এই মসজিদের ছাদ ছিল মূলত একগম্বুজবিশিষ্ট, মূল গম্বুজটি অনেক আগেই পড়ে গেছে। পরে এটি পুনর্নির্মিত হয়। ডঃ ওয়াইজ মসজিদের সচিত্র ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। মসজিদের অভ্যন্তর ১৬$\frac{১}{২}$ ফুট বর্গাকার। চার দেয়াল উপরের দিকে গিয়ে অষ্টভুজের আট দেয়ালের রূপ নিয়েছে। প্রতি কোনায় রয়েছে স্কুইঞ্চ খিলান। পান্দানতিফ থেকে গম্বুজ উত্থিত। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এই মসজিদে তিনটি মিহরাব রয়েছে, মাঝের মিহরাবটি কালো ব্যাসল্ট পাথরে গঠিত। চমকপ্রদভাবে খোদাইকরা এবং অ্যারাবেস্ক শিল্পরীতিতে অলংকৃত। দু'পাশের দু'টি মিহরাব বলিষ্ঠভাবে খোদাইকৃত ও মনোরমভাবে বিন্যস্ত ইট দিয়ে সজ্জিত। খিলানবিশিষ্ট প্রবেশপথের ইটগুলো খুবই মসৃণ। দরজার স্তম্ভসমূহ বেলেপাথরে গঠিত। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এটি মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

গোয়ালদী মসজিদ ছিল একসময় সোনারগাঁয়ের সর্বাধিক অলংকৃত ইমারত। এর পুরু ইটের পৃষ্ঠভাগ টেরাকোটা অলংকরণ রীতিতে রুচিসম্মতভাবে খোদাই করা, গৌড় ও হযরত পাণ্ডুয়ায় যেরকম দেখতে পাওয়া যায়। মিহরাব কুলুঙ্গি আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে স্থাপিত চন্দ্রচূড় খিলান দিয়ে গঠিত। এর উপরে আবার খিলানবিশিষ্ট খাঁজ

বিদ্যমান, যার মাঝখানে রয়েছে গোলাপ ফুলের অলংকার। খুবই মনোরম এই ইমারতটি যখন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তাইফুর পরিদর্শন করেন তখন তিনি দেখতে পান, "এর পাথরের দরজার ফ্রেম, শিল্পমণ্ডিত মিহরাব ও মিম্বর এবং সেখানে সুন্দর আরবী নাসখি হরফে খোদিত শিলালিপির ফলক।"

২০। গোয়ালদী, আব্দুল হামিদের মসজিদ, ১৪০৫ খ্রিস্টাব্দ

প্রাচীন গোয়ালদী মসজিদের প্রায় ৪০০ গজ উত্তরে সুন্দর আরেকটি এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ বিদ্যমান।

এক লিপি অনুসারে এটি ১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে পুরো সংস্কারকৃত হলেও এটি মুঘল স্থাপত্যের সব বৈশিষ্ট্য নিয়েই টিকে আছে।

২১। মুয়াজ্জমপুর, আহমদ শাহের মসজিদ, ষোড়শ শতাব্দী (৪৬)

"আইন-ই আকবরী'তে সরকার সোনারগাঁয়ের অধীনে মহল্লা মুয়াজ্জমপুরের উল্লেখ রয়েছে। এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়, মুয়াজ্জমপুর হচ্ছে "ব্রহ্মপুত্র ও লক্ষ্যা নদীর মধ্যবর্তী এলাকার প্রধান শহর।" এটি একটি প্রাচীন মুসলিম এলাকা। এখানে সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত আহমদ শাহের মসজিদ তার স্থাপত্যিক ঐশ্বর্য নিয়ে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর ইটের খোদাইকার্য এবং গম্বুজ স্থাপন ষোড়শ পদ্ধতি দর্শকদেরকে মোহিত করে থাকে।

পারভীন হাসান এবং আ. ক. ম. যাকারিয়া মুয়াজ্জমপুর মসজিদের বিষদ বর্ণনা দেন। মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেন, "ঢাকা নরসিংদি সড়কে তারাবো পার হয়ে কয়েক মাইল গেলেই বড়পা নামক একটি গ্রাম পড়ে। সেখান থেকে আনুমানিক ৫ মাইল পূর্বদিকে মজমপুর নামক একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। এস্থানেই সুলতানী আমলের সুবিখ্যাত মোয়াজ্জেমপুর বা মুয়াজ্জেমাবাদ। সোনারগাঁও থেকে এই স্থান বেশ কয়েক মাইল উত্তরদিকে অবস্থিত। এই গ্রামে প্রাচীন কীর্তির অনেক ধ্বংসাবশেষ ছিল। কিন্তু বর্তমানে মাটির উপরে কোন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ টিকে নেই। মাটির নিচে গ্রামের সর্বত্র প্রাচীনকালের ইট পাওয়া যায়।" এতে দু'টি শিলালিপি পাওয়া যায়; একটিতে সুলতান শামসুদ্দীন আহমদ শাহের (১৪৩২-৩৬ খ্রিঃ) উল্লেখ আছে এবং সম্ভবত এ থেকেই মসজিদটি আহমদ শাহের মসজিদ বলা হয়ে থাকে। জনৈক ফিরোজ খান কর্তৃক এটি নির্মিত হয়। অপর শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মোয়াজ্জেমাবাদ নামে একটি ইকলিম বা তালুক ছিল এবং সেটির প্রশাসনিক কেন্দ্রও ছিল মোয়াজ্জেমাবাদ। সুলতান সেকেন্দর শাহের রাজত্বকাল (১৩৫৭-১৩৯১ খ্রিঃ) থেকে আরম্ভ করে হোসেন শাহের আমল পর্যন্ত (১৪৯৩–১৫১৯ খ্রিঃ) বিভিন্ন সুলতান কর্তৃক মোয়াজ্জেমাবাদ টাঁকশাল থেকে মুদ্রা ছাপা হত।

ছয় গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি বাবা আদমের মসজিদের মডেলে তৈরি। গম্বুজগুলো সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়েছে সুলতানী আমলের স্থাপত্যিক আদলে। চূড়াগুলো খুবই

সরু। অভ্যন্তরে তিনটি মিহরাব রয়েছে অর্ধবৃত্তাকার ও অবতলাকৃত। পূর্বদিকে একটি বারান্দা পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে। অভ্যন্তরে-মাঝখানে ব্যাসল্টের দু'টি স্তম্ভ রয়েছে। এ দুটি স্তম্ভের পেনডেনটিফের মাধ্যমে গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে। পশ্চিম দেওয়ালের একটি উদ্গাত অংশ আছে। পূর্বদিক থেকে তিন খাঁজবিশিষ্ট খিলানপথ রয়েছে। সুলতানী আমলের অলঙ্করণ বলতে পোড়ামাটির নকশা, ঝুলন্ত শিকল ও ফুল দেখা যাবে। প্যারাপেট, আদিনা মসজিদের বহিঃপ্রাচীরে যেমন খিলানের অলঙ্করণ দেখা যায় মুয়াজ্জমপুরের মসজিদেও অনুরূপ নকশা শোভা পাচ্ছে।

২২। ইউসুফগঞ্জ, মসজিদ, পঞ্চদশ শতাব্দী

পারভীন হাসান তাঁর প্রবন্ধ 'Eight Sultanat-Mosques in Dhaka District' যা UNESCO-র The Islamic Heritage of Bengal-এ প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে, ইউসুফগঞ্জ এলাকায় একটি প্রাক-মুঘল যুগের মসজিদে প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বাবা সালেহের সমাধিসৌধের নিকট এবং খন্দকারতোলা মসজিদের এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার মসজিদটি হিজরী ৯১১/১৫০৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। হোসেনশাহী আমলের এই ইমারতটি বিনত বিবির মসজিদের অনুকরণে স্থাপিত। পরবর্তীকালে এটি সম্প্রসারিত করে তিন গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। এর শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, বাবা সালেহ মক্কা ও মদিনায় হজ্জ্বরত পালন করেন। এর ফলে তিনি হাজী বাবা সালেহ নামে পরিচিতি লাভ করেন। আধুনিকীকরণের ফলে সুলতানী আমলের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে পূর্বদিকে একটি বারান্দা রয়েছে। পরিমাপে মূল বর্গাকার মসজিদটি ৩৬ মিটার বর্গমাপ। মূল মসজিদে তিনটি খিলান দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হত এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে দরজা রয়েছে। কিবলাপ্রাচীরে একটি আবতলাকৃত মিহরাব। মিহরাবের পিছনের অংশ সামান্য উদ্ধত। প্লাস্টার করে প্রাচীন অলঙ্করণটি করা হয়েছে।

২৩। শাহ্ লঙ্গরের শবাধার, ষোড়শ শতাব্দী।

মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেন, "(মুয়াজ্জেমাবাদ) মসজিদের দক্ষিণে শাহ লঙ্গর নামে এক দরবেশের মাজার আছে। এই দরবেশ সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে জনশ্রুতি আছে যে, তিনি ছিলেন বাগদাদের এক শাহজাদা। সংসারের প্রতি অনাসক্তি হেতু তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করতে করতে এখানে এসে আস্তানা গাড়েন এবং এখানেই তাঁর মৃত্যু হয় এবং এখানেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়।" আহমদ হাসান দানীও শাহ লঙ্গরের মাজারের উল্লেখ করেন।

২৪। বারানগর, শাহ্ কারফারমা গাজীর মসজিদ ও মাজার (অধুনালুপ্ত), ষোড়শ শতাব্দী

বারানগরে যে ধ্বংসস্তূপ দেখা যায় তা অবিশ্বাস্য এবং অবিন্যাস্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ইটের টুকরো (Brick bats)। প্রাচীরের ভগ্নাংশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না। মোয়াজ্জেমাবাদের নিকটবর্তী কোন অধ্যুষিত অঞ্চলে সুলতানী আমলে একটি

বিশালাকার মসজিদ নির্মিত হয়েছিল, যা বর্তমানে অবলুপ্ত। কালের স্বাক্ষর হিসাবে প্রাচীরের বুরুজ, দেওয়ালের অংশ, পোড়ামাটির ফলকসম্বলিত অলঙ্করণ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না। জনশ্রুতি অনুযায়ী সম্ভবত কারফরমা গাজী নামে কোনো দরবেশের এখানে আস্তানা ছিল। সোনারগাঁও এলাকায় এ ধরনের অসংখ্য ধ্বংসস্তূপ দেখা যাবে।

ধ্বংসস্তূপ থেকে সুলতানী মসজিদের গঠন, আকৃতি, পরিমাপ, অলঙ্করণ কিছুই সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। তবুও ভগ্নাবস্থায় যে ইমারতটি রয়েছে তা একটি বর্গাকার এলাকা জুড়ে রয়েছে। কেন্দ্রীয় দেয়ালের অংশ ছাড়া অপর কোনো দেয়াল অক্ষত অবস্থায় নেই। তবে দেয়ালের যে অংশ এখনও দেখা যায় তা খুব মোটা ও মজবুত করে তৈরি করা হয়েছিল। ছাদ ও খিলানসমূহ পড়ে গেলে দেয়ালের খুব ক্ষতি হয়। কোনো কোনো স্থানে মোটা ইটের পিলারের শুধুমাত্র ভিত রয়েছে। মসজিদটিতে কতটি গম্বুজ ছিল তা নির্ধারণ করা কঠিন। তবে মনে হয় এটি নয় গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার মসজিদ ছিল। উত্তর ও দক্ষিণদিকে তিনটি করে খিলানপথ দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। পূর্বদিকেও তিনটি খিলানপথ থাকাই স্বাভাবিক। অভ্যন্তরে দুই সারিতে কালো পাথরের স্তম্ভ ছিল এবং প্রতি সারিতে দুটি খিলান ছিল। এভাবে অভ্যন্তরকে নয় ভাগে ভাগ করা হয় এবং নয়টি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। মিহরাব প্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃত মিহরাব ছিল। মিহরাবগুলো চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী একটি আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ ছিল। সমস্ত এলাকাব্যাপী পোড়ামাটির অলঙ্করণের যে টুকরো দেখা যাচ্ছে তা দেখে মনে হয় যে, স্থাপত্য অলঙ্করণে এ মসজিদ বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

মসজিদসংলগ্ন একটি উঁচু ভিতের উপর অবিন্যস্তভাবে ইটের টুকরো পড়ে আছে। সম্ভবত পীর শাহ কারফারমা গাজীর এটি সমাধি ছিল। বর্তমানে কোনো চিহ্ন দেখা যাবে না। এখানে যে পোড়ামাটির ফলক পাওয়া যায় তাতে লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশা রয়েছে। কোনার বুরুজগুলো খুব মজবুত করে তৈরি করা হলেও বহু পূর্বেই ভেঙে পড়েছে।

রামপাল

মীরকাদিম থেকে প্রায় ১ মাইল দক্ষিণ ও বল্লালবাড়ি থেকে প্রায় ১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে বাবা আদম শহীদ নামে এক মসজিদ রয়েছে। কে এই বাবা আদম তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তিনি যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন বলে তাঁকে 'শহীদ' বলা হয়। বাবা আদম শহীদ সম্বন্ধে আব্দুল মান্নান তালিব জনশ্রুতির এক বিরাট ফিরিস্তি দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন, "বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ কিংবদন্তির নায়ক বাবা আদম শহীদ বাংলায় আগমনকারী প্রথম যুগের মুজাহিদ সুফীগণের অন্যতম। অন্যান্য সুফীগণ সম্পর্কে জানা যায় যে, তাঁরা একাকী বা কতিপয় শিষ্য-শাগরিদসহ এদেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক শক্তি ও ইসলামের অন্তর্নিহিত অনাবিল সত্যের জোরে পৌত্তলিকতার এ কেন্দ্রভূমিতে তৌহিদের বাণী প্রচার করেছিলেন। কিন্তু বাবা আদম শহীদ সম্পর্কে জানা যায় যে, যথারীতি একটি ছোটখাটো সেনাবাহিনী নিয়ে

তিনি বাংলার মাটিতে আস্তানা গেড়েছিলেন। ইতিহাসের বিচারে এটা কতদূর সত্য ও বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে একটি মুসলিম সেনাবাহিনী সমুদ্রপথে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যাওয়া কতদূর সঠিক তা বিচার্য হলেও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় বাবা আদম সম্পর্কিত কিংবদন্তি ও জনশ্রুতি আশ্চর্যজনক বিস্তৃতি লাভ করেছে। বিভিন্ন মুখে ও বিভিন্নভাবে এ কিংবদন্তিগুলো শ্রুত হলেও এগুলোর মধ্যে একটি অদ্ভুত রকমের মিল দেখা যায়। এ কিংবদন্তিগুলোর মধ্য থেকে ঐতিহাসিক সত্য বাছাই করার জন্য আমরা নিচে এর সংক্ষিপ্তসার পেশ করছি।

"রাজা বল্লাল সেনের রাজত্বকালে (১১৫৮-১১৭৯ খ্রিঃ) গো কোরবানির অপরাধে নির্যাতিত জনৈক মুসলিম হজ্জযাত্রীর মুখে তার নির্যাতনের কাহিনী শুনে বাবা আদম শহীদ একটি ছোটখাটো সেনাবাহিনী নিয়ে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার অন্তর্গত আবদুল্লাহপুর গ্রামে উপস্থিত হন। গ্রামে তাঁবু স্থাপন করে আহার্যের আয়োজন করার জন্য তাঁর সৈন্যরা একটি গরু জবেহ করে। আকস্মিক একটি চিল মুসলিম শিবির থেকে এক টুকরা গরুর গোশত ছোঁ মেরে নিয়ে রাজার সেনাশিবিরের উপর দিয়ে উড়ে যেতে থাকে। এ সময় অন্য একটি চিল এসে প্রথম চিলটির থাবা থেকে গোশতের টুকরাটি ছিনিয়ে নিতে চায়। গোশতের টুকরাটি নিয়ে শূন্যে উভয় চিলের লড়াই বেধে যায়। ফলে একসময় গোশতের টুকরাটি মাটিতে পড়ে যায়। হিন্দু সেনারা বুঝতে পারে যে এটা কোনো জবেহ করা গরুর গোশত এবং তারা অবিলম্বে রাজা বল্লাল সেনকে এ সংবাদটি অবগত করে। রাজা বল্লাল সেন তৎকালে বিক্রমপুরে রাজত্ব করতেন। রাজা এ ব্যাপারে তদন্ত করে জানতে পারলেন যে, যবনরা (মুসলমান) তাঁর সাথে যুদ্ধ করার জন্য সেনাদলসহ আগমন করেছে। কাজেই তিনি সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে যবনদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। যবন ও হিন্দুদের মধ্যে পনেরো দিনব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধ চললো। চতুর্দশ দিবসে হিন্দুরা তাদের বিপুল পরিমাণ ক্ষতি অনুভব করলো এবং যবনদেরকে অজেয় মনে করলো। সেনাবাহিনীর হতাশা লক্ষ করে পঞ্চদশ দিবসে রাজা বল্লাল সেন স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে সেনাবাহিনী পরিচালনা করলেন। কিন্তু যুদ্ধে বিজয় লাভ সম্পর্কে রাজা নিশ্চিত ছিলেন না। পরাজয় ঘটলে যাতে ম্লেচ্ছ (মুসলমান) বাহিনীর হাতে রাজপরিবারের মহিলাদের কোনোরূপ অমর্যাদা না হতে পারে এজন্য তিনি যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে রাজঅন্তঃপুরে একটি অগ্নিকুণ্ড (চিতা) প্রজ্জ্বলিত করে গেলেন এবং পরিবারের মহিলাদের পরাজয়ের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই চিতায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মাহুতি দেবার নির্দেশ দিয়ে গেলেন। যুদ্ধে পরাজয়ের বার্তা বহন করার জন্য তিনি এক জোড়া সংকেতবাহী কবুতরকে পোশাকের নিচে সংগোপনে রেখে দিলেন।

রাজা নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার কারণে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। মুসলিম সেনারা শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হলো। মুষ্টিমেয় মুসলিম সেনা বীরত্ব-সহকারে যুদ্ধ করতে করতে একের পর এক শাহাদাত বরণ করলো। অবশেষে বাবা আদম তাঁর অসাধারণ শৌর্য ও বিক্রমের পরিচয় দিয়ে একাই যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসেনার বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা করে যেতে থাকলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি অনুভব করলেন যে,

তাঁর শাহাদাত নিকটবর্তী। কাজেই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে তার শেষ নামাজে রত হলেন। সুযোগ বুঝে রাজা ত্বরিতগতিতে অগ্রসর হয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু রাজা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে, তাঁর শত আঘাত দরবেশের ঘাড়ে একটুও আঁচড় কাটতে পারেনি। রাজার বারংবার আঘাতের মধ্যেও দরবেশ তাঁর নামাজ পড়ে যেতে থাকলেন। নিশ্চিন্তে নামাজ শেষ করার পর দরবেশ রাজাকে বললেন, "নিজের তরবারি ত্যাগ করে আমার তরবারি নিয়ে ঘাড়ে আঘাত করুন।' দরবেশের নির্দেশমতো রাজা দরবেশের শিরশ্ছেদ করলেন। এভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের সবাই শাহাদাত বরণ করলেন।

বিজয়ের আনন্দে বল্লাল সেন এতই মত্ত ছিলেন যে তাঁর কাছে যে দু'টি কবুতর ছিল তা ছাড়া পেয়ে প্রাসাদে উড়ে চলে যায়। প্রাসাদের রমণীগণ সংকেতবাহী কবুতর ফিরে আসতে দেখে ধারণা করলো যে বল্লাল সেন যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছেন। অতঃপর অন্তঃপুরবাসীগণ চিতায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মাহুতি দেয়। রাজা ফিরে এসে মহিলাদের আত্মাহুতি দিতে দেখে তিনিও অগ্নিপিণ্ডে ঝাঁপ দেন। বল্লাল সেনের হাতে নিহত হলে বাবা আদম শহীদ উপাধি লাভ করলেন। বাবা আদম শাহাদাত বরণ করলেও তাঁর সাধনা ও আদর্শ সফল হলো এবং সমগ্র এলাকাতে ইসলাম বিজয় লাভ করল।"

উপরোক্ত কাহিনী জনশ্রুতি মাত্র, যদিও বাবা আদম শহীদের একটি মসজিদ ও মাজার রামপালের আবদুল্লাহপুরে দেখা যায়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বল্লাল সেনের কথা শোনা যায়—গৌড়ের সেনবংশের রাজা বল্লাল সেন (১১৫৮-১১৭৯), ঢাকেশ্বরী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বল্লাল সেন (সপ্তদশ শতাব্দী), রামপালের বা বিক্রমপুরের বল্লাল সেন। ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে যে বল্লাল সেনের কথা বলা হয়েছে তিনি লক্ষণ সেনের পিতা বল্লাল সেন। অন্য সমস্ত জাল। বাবা আদম শহীদের মসজিদটি ফতেহ শাহের সময়ে হিজরী ৮৮৮/১৪৮২-৮৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। মসজিদসংলগ্ন একটি মাজার আছে। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, বল্লাল সেন এবং বাবা আদমের মধ্যে ব্যবধান প্রায় ৩০০ বছর। এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেন, "আলোচ্য মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল এই তথাকথিত ঘটনার ৩০০ বছরেরও অধিককাল পরে। মসজিদের শিলালিপিতে বাবা আদম শহীদের কোনো উল্লেখ নেই। উল্লেখ নেই কোনো মাজারেরও। জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে এই অবিশ্বাস্য ও গাঁজাখুরি গল্প যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এ ঘটনা দ্বিতীয় বল্লাল সেন নামক রাজার সময়ে ঘটেছিল বলেও বলা হয়ে থাকে। এটিও একটি মনগড়া কাহিনী। কারণ দ্বিতীয় বল্লাল সেন নামক কোনো রাজার সন্ধান এদেশের প্রামাণ্য ইতিহাসে নেই, আছে কেচ্ছা-কাহিনীতে।

২৫। বাবা আদম শহীদের মসজিদ এবং মাজার, ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দ (৪৭)

ছয় গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার বাবা আদম শহীদের মসজিদটির স্থাপত্য গুরুত্ব সর্বাধিক। ৫৩ ফুট × ৩৬ ফুট উত্তর-দক্ষিণ লম্বা এ মসজিদটি এতদঞ্চলে খুবই আকর্ষণীয়। মোহাম্মদ যাকারিয়া এভাবে বর্ণনা দেন, "ইষ্টকনির্মিত এই মসজিদের প্রাচীরগুলো ৬ ফুট প্রশস্ত। চার কোনায় ৪টি অষ্টকোণাকার টারেট রয়েছে। পূর্ব দেয়ালে

৩টি দরজা আছে। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ২টি করে দরজা থাকার কথা। দরজার পরিবর্তে সেখানে আছে গভীর কুলুঙ্গি। পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহরাব। মসজিদের অভ্যন্তরভাগে আছে গ্রানাইট পাথরের নির্মিত দু'টি স্তম্ভ। স্তম্ভ দু'টি মেঝে থেকে ৪ ফুট পর্যন্ত অষ্টকোণাকৃতির। এরপর ষোল কোণাকৃতির। এ দু'টি স্তম্ভ ও চারপাশের দেয়ালের উপর মসজিদের ৬টি গম্বুজ স্থাপিত। মিহরাবগুলি পোড়ামাটির ফলক দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত ছিল।

বাবা আদমের মসজিদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ঢালু কার্নিশ, যা বাঁকানো অবস্থায় আছে। মসজিদটিতে তিনটি খিলানপথ রয়েছে যার ভিতর দিয়ে অভ্যন্তরে যাওয়া যায়। খিলানগুলো দ্বি-কেন্দ্রীক। খিলানের উপরে বেড়ি বা মৌল্ডিং দেখা যাবে। কখনো দু'সারি এবং মধ্যবর্তীটি তিন সারি। এর উপরে একটি শিলালিপি রয়েছে। এ শিলালিপির পাঠোদ্ধার করে জানা যায় যে সুলতান ফতেহ শাহের রাজত্বকালে জনৈক মালিক-উল মোয়াজ্জেম নামক এবং ব্যক্তি হিজরী ৮৮৮/১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটি নির্মাণ করেন। এক নজরে দেখলে মনে হবে যে এর সাথে দিল্লির কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের আলাই দরওয়াজার সাদৃশ্য রয়েছে, বিশেষ করে গম্বুজের আকৃতি এবং কেন্দ্রীয় মিহরাব, তীর-ফলক দ্বারা খাঁজকাটা মিহরাবের খিলানে। লতাপাতা, জ্যামিতিক নকশা, ঝুলন্ত শিকল ও ফুল প্রভৃতি মোটিভ দ্বারা এ মসজিদটি অলঙ্কৃত করা হয়। প্রাক-মুঘল যুগে ছয় গম্বুজ-বিশিষ্ট মসজিদ দেখা যাবে মুয়াজ্জেমাবাদের মসজিদে।

২৬। পাথরঘাটা, মসজিদ, তালতালা সেতু, সপ্তদশ শতাব্দী (অধুনালুপ্ত)

পাথরঘাটা নামক স্থানে আয়তাকার একটি মসজিদ নির্মিত হয়, যা অবলুপ্ত। সম্ভবত ১৬৯০-৯১ খ্রিস্টাব্দে এ মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে জনৈক আলওয়ার এটির নির্মাতা।

তালতালায় তিনটি খিলানের উপর যে সেতুটি দেখা যায় তা জনশ্রুতি অনুযায়ী বল্লাল সেন কর্তৃক নির্মিত। কিন্তু পাগলা সেতু, মীরকাদিমের সেতু প্রভৃতির সাথে তুলনা করলে নিশ্চিত করে বলা যায় যে এটি মুসলিম আমলে নির্মিত হয়।

২৭। মীরকাদিম, সেতু, সপ্তদশ শতাব্দী (১৬৮০-৯৭ খ্রিস্টাব্দ)

মুন্সীগঞ্জ শহর থেকে কয়েক মাইল উত্তর-পশ্চিমে মীরকাদিম খালের উপরে একটি পাকা সেতু দেখা যাবে। ৩টি খিলানের সাহায্যে নির্মিত। প্রধান খিলানটি ১৪ ফুট প্রশস্ত, পাথরগুলো ২৮ × ৩''। ভূমি থেকে সেতুটি ২৮ ফুট উঁচু। সেতুটি ১৭৩ ফুট দীর্ঘ। এ সেতুটি মুঘল আমলে সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়।

২৮। জিঞ্জিরা, প্রাসাদ ও হাম্মাম

বুড়িগঙ্গা নদীর অপর পাড়ে জিঞ্জিরা মহল্লা অবস্থিত। বড় কাটরার ঠিক সোজাসুজি নদী পার হলে কেরাণিগঞ্জ থানাধীন হাউলী গ্রামে জিঞ্জিরা মহল এখনও কালের স্বাক্ষর হিসাবে টিকে আছে। হাউলী শব্দটি এসেছে ফারসি 'হাভেলী' শব্দ থেকে—এর অর্থ 'আবাসিক এলাকা'; আর জিঞ্জিরা এসেছে 'জাজিরা' বা উপদ্বীপ থেকে, যা তিনদিক

থেকে পানি দ্বারা বেষ্টিত। আসলে পরিখা বা খাল দ্বারা বেষ্টিত বলেই সম্ভবত জাজিরা বলা হত। যাহোক, মুঘল স্থাপত্যকলার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে জিঞ্জিরার মহল ও হাম্মাম একটি উৎকৃষ্ট স্থাপত্যকীর্তি।

'শিল্পকলা' পত্রিকায় (সপ্তদশ বর্ষ, ২য় সংখ্যা ১৪০১ বাং, ১৯৯৫) আয়েশা বেগম 'বিস্মৃত জিনজিরা মহল' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে জিঞ্জিরা মহল এবং হাম্মামের বিশদ বিবরণ দেন। সৈয়দ আওলাদ হাসান তাঁর গ্রন্থ 'Notes in the Antiquities of Dhaka' গ্রন্থে বলেন যে, ইব্রাহিম খান (১৬১৭-২৩ খ্রিঃ), যিনি ঢাকার তৃতীয় মুঘল সুবাদার ছিলেন, জিঞ্জিরা প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারেও একথার উল্লেখ আছে। আহমদ হাসান দানীও প্রথম ইব্রাহিমকে নির্মাতা বলে সমর্থন করেন, জিঞ্জিরা প্রাসাদের নির্মাণকাল সম্ভবত ১৬২০ খ্রিস্টাব্দ। এ সমস্ত মতবাদ খণ্ডন করে আয়েশা বেগম বলেন যে, জিঞ্জিরা মহল প্রথম ইব্রাহিম কর্তৃক সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নির্মিত হয়নি বরং দ্বিতীয় ইব্রাহিমের শাসনামলে (১৬৮০-৯৭) নির্মিত হয়। ডি' ওয়েলি জিঞ্জিরার উল্লেখ করে বলেন, "নদীর পশ্চিম পাড়ে কাটরার প্রায় বিপরীতে গভীর পরিখাবেষ্টিত মজবুত করে তৈরি একটি দালান আছে।" কিন্তু তিনি নির্মাণকাল সম্বন্ধে কিছু বলেননি। গ্রন্থকার এক স্থানে জিঞ্জিরার নির্মাণকাল অষ্টাদশ শতাব্দী বলে মন্তব্য করেন। নাজিমুদ্দীন আহমদ তাঁর 'The River Forts Around Dhaka'-তে বলেন যে, হাজিগঞ্জ, সোনাকান্দা, ইদ্রাকপুরের মতো ঢাকা মহানগরীর সংরক্ষণের জন্য জিঞ্জিরায় একটি জলদুর্গ নির্মিত হয়। কিন্তু জিঞ্জিরায় আবাসিক এলাকা থাকায় আয়েশা বেগম এটিকে জলদুর্গ বলতে নারাজ। প্রাসাদদুর্গের সাথে আকৃতি, আয়তন, ভূমি-নকশা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মিল থাকায় দানী বলেন যে, ঢাকায় মাত্র দু'টি প্রাসাদদুর্গ নির্মিত হয়—একটি লালবাগ দুর্গ, অপরটি জিঞ্জিরা দুর্গ। এস. এম. তৈফুর বলেন, "It was a grand building of beautiful architecture, surrounded by a moat." এটি জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল, বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এটিকে জমি দখলের জটিলতার জন্য সংরক্ষণ করতে পারেননি তবে স্থানীয়ভাবে এর সংস্কার করা হয়েছে।

আয়েশা বেগম জিঞ্জিরা প্রাসাদ সম্বন্ধে বলেন, "বাস্তব পর্যবেক্ষণে জিঞ্জিরা মুঘল প্রাসাদের তিনগুচ্ছ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দেখা যায় অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় রয়েছে। প্রাসাদ এলাকার কয়েকটি কক্ষ। বর্তমানে একটি মসজিদ বিপরীত দিকে অবস্থিত। প্রাসাদের কক্ষগুলো অদ্যবধি বাসোপযোগী অবস্থায় প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রাসাদের আদি কক্ষগুলো সবই একতলা ইমারত। এখন পর্যন্ত এতে সাতটি আদি কক্ষ বিদ্যমান রয়েছে। প্রতিটি কক্ষ আয়তাকার এবং কক্ষগুলো আয়তনে ১৮ ফুট ৬ ইঞ্চি × ১৩ ফুট ৬ ইঞ্চি। কক্ষগুলোর বহির্গাত্র ও ভিতরে পলেস্তরাকৃত। এ প্রাসাদ ইমারতের কক্ষগুলোর ছাদ চারচালা ভল্ট দ্বারা আচ্ছাদিত। বাংলার চারচালাবিশিষ্ট কুঁড়েঘরের চালের অনুকরণে ইটনির্মিত চৌচালা ছাদের ইমারত তৈরি করার মধ্যে এ অঞ্চলের নিজস্ব স্থাপত্য স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।"

হাম্মামখানা জিঞ্জিরা মহলের অন্যতম আকর্ষণ। হাম্মাম স্থাপত্য বাংলাদেশে নূতন নয়। ইতিপূর্বে লালবাগ দুর্গ, ঈশ্বরীপুর, মির্জানগর, জাহাজঘাট প্রভৃতি স্থানে হাম্মামের

নিদর্শন পাওয়া গেছে। হাম্মামের বর্ণনা দিতে গিয়ে আয়েশা বেগম বলেন, "হাম্মামে কমপ্লেক্স বিভিন্ন আকৃতির মোট নয়টি কক্ষের ভিন্ন ভিন্ন মাপ পরিলক্ষিত হয়। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় আকৃতির কক্ষের পরিমাপ ছিল ২৪′৯″ × ১৩′-০০″ এবং ক্ষুদ্রাকৃতির কক্ষের পরিমাপ ৪′-০০″ × ৬′-০০″। দ্বিতল হাম্মাম ইমারতটি আদিতে ৫৩′-৮″ × ১১′-০″ আয়তনবিশিষ্ট ছিল। কক্ষগুলোর ছাদ ছিল চৌচালাকৃতি ও সামান্য উঁচু বৃত্তাকার সসার আকৃতি (Saucer shaped) ভল্টবিশিষ্ট, হাম্মাম ইমারতের দোতলা এত বেশি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যে এর বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে ধারণা করা কঠিন। হাম্মামের গরম বায়ু নির্গমনের উদ্দেশ্যে গম্বুজের মাঝখানে ছিদ্রযুক্ত চিমনির ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এ কক্ষগুলোর অন্তকুঠুরীতে বৃত্তাকার অথবা অষ্টভুজাকৃতি জলাধার ছিল বলে ধারণা করা হয়। হাম্মামের কক্ষগুলোর অভ্যন্তরে দেখলে গরম ও ঠাণ্ডা পানি পরিবাহী টেরাকোটা নল (earthen pipe) সংযোজিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল।"

জিঞ্জিরায় আটকোনাকার যে ইমারতটি রয়েছে তা সম্ভবত প্রবেশপথ হিসাবে ব্যবহৃত হত। দক্ষিণদিক থেকে এ চতুঃকেন্দ্রিক খিলানবিশিষ্ট প্রবেশপথ দিয়ে প্রবেশ করলেই একটি আয়তাকার হলঘরে পৌঁছানো যায়। এ কক্ষটির ছাদও চৌচালাকৃতি ভল্ট দ্বারা যুক্ত। এ প্রবেশকক্ষের দু'পাশে ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ দেখা যায়। এর পার্শ্ববর্তী কুঠরীগুলো প্রহরীকক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হত।

২৯। মানিকগঞ্জ, মাঁচাইন মসজিদ, সপ্তদশ শতাব্দী

বর্তমান মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর থানার ঘাটাইলে মুঘল আমলের একটি মসজিদ রয়েছে। ইমারতটির স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হয় এটি সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত। এটি মুঘল আমলের চিরাচরিত তিন গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার ভূমি-নকশার উপর নির্মিত মাঁচাইন মসজিদ। তিনটি বাল্ব আকৃতির গম্বুজ মসজিদটিকে আচ্ছাদিত করেছে। গম্বুজে ড্রাম রয়েছে এবং শীর্ষদেশ চূড়া দ্বারা শোভিত। পূর্বদিকে তিনটি খিলান প্রবেশপথ দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। প্রবেশপথের উভয় দিকে সরু টারেট দেখা যাবে। এ টারেটগুলো ঢাকার বেগমবাজারে কারতালাব খানের মসজিদে দেখা যাবে। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, মসজিদটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি মিহরাব রয়েছে।

৩০। আযিমনগর, মসজিদ, ১৫০৪ খ্রীস্টাব্দ (অধুনালুপ্ত)

মানিকগঞ্জের হরিরামপুর থানাধীন আযিমনগর থেকে জেমস ওয়াইজ একটি শিলালিপি উদ্ধার করেন। আযিমনগর ধলেশ্বরী নদীর একটি শাখার তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এইচ. ব্লকম্যান এ শিলালিপিটির পাঠোদ্ধার করে জানতে পারেন যে, এখানে প্রাক-মুঘল আমলে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে স্থানীয় সাধকপুরুষ হিঃ ৯১০/১৫০৪-৫ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদ নির্মাণ করেন। নির্মাতার নাম বাবা সালেহ। বর্তমানে এটি সংস্কার করা হয়েছে। বাবা সালেহ নারায়ণগঞ্জের বন্দরেও মসজিদ নির্মাণ করেন। এটি এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ।

কাপাসিয়া

এস. এম. তাইফুর বলেন যে, সোনারগাঁও অঞ্চলে কাপাসিয়া বা (Karpassus of the Romans) নামে একটি অঞ্চল আছে। সংস্কৃত কার্পাস অর্থ তুলা। এখানে প্রচুর পরিমাণে তুলা হত এজন্য স্থানটির নাম হয়েছে কাপাসিয়া। এখানকার তুলা এত উচ্চমাজার ছিল যে তা দিয়ে মসলিন তৈরি হত। এদের মধ্যে 'আবরাওয়ান' (প্রবাহিত জলস্রোত) এবং 'শাবনাম' (শিশির) বিখ্যাত ছিল।

৩১। দুরদুরিয়া দুর্গ, ষোড়শ শতাব্দী (অধুনালুপ্ত)

কাপাসিয়ায় 'দুরদুরিয়া' নামে যে দুর্গ ছিল তা কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এস. এম. তৈফুরের ভাষায় "In the north-eastern part of Sonargaon there is a place called Dur-Durya (Dur-e-Daryia, meaning gateway to the river) in Kapasia thana. There was an important fort --- situated on the bank of the river Banar. It was semi-circular building covering a roundish area of two miles intersected by some wide moats. The fort is called Ekdala. It is in complete ruins". উল্লেখ্য যে, একডালা এমন একটি সাধারণ নাম যে প্রাক-মুঘল যুগে কোনো দুর্গ নির্মিত হলেই তাকে একডালা বলা হত। দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক যখন বাংলায় অভিযান করেন তখন বাংলার স্বাধীন সুলতান সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। এ ছাড়া সুলতান হোসেন শাহের আমলেও একডালা দুর্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গে সোনারগাঁ অঞ্চলের একডালা সম্ভবত কাপাসিয়ায় নির্মিত হয়। বর্তমানে এর কোনো চিহ্ন নেই। দূর-দূরিয়া দুর্গটি স্থানীয়ভাবে রানীবাড়ি নামে পরিচিত। সম্ভবত পাল আমলে এখানে কোনো ইমারত নির্মিত হয়। দূর-দূরিয়াতে একটি মসজিদ, যা হোসেন শাহের আমলে নির্মিত হয়েছিল। পাশ্ববর্তী স্থানে পাথরের শবাধারবিশিষ্ট কোনো পীর-ফকিরের দরগা রয়েছে।

দেওয়ানবাগ, খিজিরপুর

৩২। ঈসা খানের দুর্গ, ষোড়শ শতাব্দী (অধুনালুপ্ত)

শীতলক্ষ্যা সেতু পার হয়ে সোনারগাঁয়ের পথে কিছুদূর এগুলে সড়কের উপর দিকে এবং সড়ক থেকে প্রায় ২০০ গজ উত্তরে একটি এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ দেখা যাবে। গ্রামের নাম দেওয়ানবাগ, যা খিজিরপুর থেকে ৬ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। মুঘলদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ঈসা খান ভাটি অঞ্চলে অনেক দুর্গ নির্মাণ করেন এবং সুরক্ষিত এসব দুর্গে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করতেন। দেওয়ানবাগে ঈসা খানের পৌত্র এবং মুসা খানের পুত্র মুনওয়ারার খান বসবাস করতেন। বর্তমানে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কেবলমাত্র ঢিপির উপর অবিন্যস্তভাবে ইটের খোলা রয়েছে। এখান থেকে ৭টি ভারী এবং প্রকাণ্ড কামান উদ্ধার করা হয়েছে, যা বর্তমানে ঢাকার জাতীয় জাদুঘরের প্রাঙ্গণে দেখা যাবে। কথিত আছে যে, এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষ মজবুত কামানটি তুরস্কের কামান প্রস্তুতকারক সৈয়দ আহমদ তৈরি করেন।

ধামরাই

ঢাকা মহানগরীর ২০ মাইল উত্তরে সাভারের উত্তর-পশ্চিমে বংশাই নদীর ডান তীরে এবং নয়ারহাট সেতুর পশ্চিম-উত্তরে ধামরাই নামক স্থানটি অবস্থিত। এটি যে প্রাক-মুসলিম জনপদ ছিল তা এর নাম থেকেই বোঝা যায়। বৌদ্ধ 'ধর্মরাজিকা' নাম থেকেই ধামরাই নামের উৎপত্তি বলে অনেকে ধারণা করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, দামো ঘোষের 'দামো' ও তাঁর স্ত্রী 'রাই'-এর নাম থেকে ধামরাই শব্দটি এসেছে। যাহোক, প্রাক-মুসলিম আমলে এটি যে বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্র ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে এখানে হিন্দু ও মুসলমানদের বসতি গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ইমারত নির্মিত হয়।

এস. এস. তৈফুর ধামরাই-এর বিবরণ দেন। তিনি বলেন যে, "এ অঞ্চল ঘিরে অসংখ্য ঢিপি দেখা যাবে, যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্রতি বছর এখানে হিন্দুদের মেলা হয় এবং একটি রথও আছে যা নিয়ে রথযাত্রা পালিত হয়। ৩২টি কাঠের চাকাসম্বলিত কাঠের এই রথটি খুবই চমৎকার। এ রথে হিন্দু দেবদেবী নিয়ে মিছিল করা হয়। আশেপাশে কয়েকটি হিন্দু মন্দিরও দেখা যাবে।"

মুসলিম আমলে ধামরাই-এ পীর-ফকিরদের আস্তানা গড়ে ওঠে, অসংখ্য মসজিদ ও মাজার নির্মিত হয। ধামরাই-এর পাঠানটোলা এলাকা থেকে প্রাক-মুঘল যুগের কয়েকটি শিলালিপি উদ্ধার করা হয়। জেমস ওয়াইজের ভাষায় : "ধামরাই কতগুলো বিচ্ছিন্ন গ্রামের সমষ্টি যার প্রতিটি ঢিবির ওপর অবস্থিত। এখানে লাল পাথরের প্রচলন দেখা যায়। পাঠানটোলা বলতে পাঠানদের আবাসস্থল ছিল বলে মনে হয়। এখানে কোনো প্রাচীন মসজিদ দেখা যাবে না (সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে)। একটি বহুদিন অক্ষত অবস্থায় ছিল কিন্তু ইদানীং তাও ধ্বংসের পথে। এ সমস্ত এলাকার মালিকেরা ইমারতের ভিত খুঁড়ে ইট চড়া দামে বিক্রি করে। বর্তমানে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হচ্ছে পাঁচ ভাই বা পীরের মাজার। পাঠানটোলায় যে মাজারটি সহজেই নজরে পড়ে তা হচ্ছে মীর সৈয়দ আলীর সমাধি। আট ফুট উঁচু খোলা ছাদবিশিষ্ট এ মাজারটি দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত। এ মাজারের এক দেয়ালে হোসেন শাহী আমলের একটি শিলালিপি গাঁথা আছে। (যা মাজারসংক্রান্ত নয়, মসজিদ নির্মাণ প্রসঙ্গে)। অন্যান্য পীর-ওলী-আল্লাহদের যে মাজার আছে তা তেমন আকর্ষণীয় নয়। অপর একটি শিলালিপি পাঠানটোলার একজন বাসিন্দার বাসগৃহে আমি সন্ধান পাই।"

৩৩। দু'টি শিলালিপি, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী

একটি বসতবাড়িতে যে শিলালিপি পাওয়া যায় তাতে উল্লেখ আছে যে, সুলতান মাহমুদ শাহের পুত্র সুলতান ফতেহ শাহের আমলে জনৈক জহিরুদ্দীন মালিক আকন্দ মীর কর্তৃক একটি মসজিদ নির্মিত হয়। এর তারিখ হিজরী ৮৮৭/১৪৬২ খ্রিস্টাব্দ। এতে আরও উল্লেখ আছে যে, নির্মাণে একজন নামকরা নৌবাহিনীর অধিপাতি ছিলেন (Admiral) বা 'মীর-ই-বহর'। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সুলতানী আমলে এখানে নৌঘাঁটি ছিল এবং দক্ষ ও সুযোগ্য নাবিক ও নৌ-অধ্যক্ষের দ্বারা নৌবাহিনী পরিচালিত হত। মসজিদটির কোনো হদিস বর্তমানে নেই।

৩৪। ধামরাই, প্রাচীন মসজিদ, ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ

জেমস ওয়াইজ ধামরাই-এর পাঠানটোলা এলাকা থেকে যে শিলালিপিটি উদ্ধার করেন তা মীর সৈয়দ আলীর মাজারে প্রোথিত আছে। ব্লকম্যান এটির পাঠোদ্ধার করেন। এ শিলালিপিটিতে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ কর্তৃক হিঃ ৯২২/১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মাণের উল্লেখ আছে। বর্তমানে এ মসজিদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কেবলমাত্র দু'টি ভগ্নপ্রাপ্ত প্রাচীর অবশিষ্ট রয়েছে। প্রাচীরটি ২২ ফুট দীর্ঘ, ১৬ ফুট প্রস্থ এবং ৫ ফুট উঁচ। খুব সম্ভব এ মসজিদটি ছিল একটি আয়তাকার ইমারত, যা তিন গম্বুজ দ্বারা আবৃত ছিল। হাবিবা খাতুনের মতে, বাগেরহাটের মিঠাপুকুরের মসজিদের সাথে এ মসজিদটির সাদৃশ্য রয়েছে। হাবিবা খাতুন তাঁর নিবন্ধ 'সোনারগাঁয়ে' বলেছেন যে সুলতানী আমলে ধামরাই একটি শক্তিশালী নৌঘাঁটি ছিল এবং জনবহুল নগরী ছিল, যেখানে এ মসজিদটি নির্মিত হয়।

৩৫। সৈয়দ আলী তিরমিজির সমাধি, ষোড়শ শতাব্দী (ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং তৎসংলগ্ন একটি মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দী

পাঠানটোলা এলাকায় স্থানীয় একজন বুজুর্গের সমাধি দেখা যাবে। তিনি সৈয়দ আলী তিরমিজি নামে পরিচিত। তৈফুর বলেন যে, তিনি সাধারণত 'হযরত বাবা পীর' নামে অধিক পরিচিত। তিনি বলেন, "It is significant that both Hussain Shah and Syed Ali were natives of Tirmiz in Mawarannahar of Turkestan and both of them styled themselves as al Husayny." বঙ্গানুবাদ : "এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে হোসেন শাহ এবং সৈয়দ আলী তুর্কীস্থানের মাওয়ারানাহার প্রদেশের তিরমিজি শহরের অধিবাসী ছিলেন এবং এ কারণে তাঁরা উভয়ে আল-হোসেনী উপাধি ধারন করেন।" নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তাঁরা আত্মীয় ছিলেন। বস্তুত এই সমাধিসৌধটি একটি মসজিদের সংলগ্ন ছিল যেটি অধুনালুপ্ত। তাইফুরের এহেন মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ঐতিহাসিকগণের মতে, হোসেন শাহ্ আরব দেশ থেকে এসেছিলেন, তুর্কীস্থান থেকে নয়। সামসুদ্দীন আহম্মদ বলেন যে, অসংখ্য শিলালিপিতে হোসেন শাহকে 'সৈয়দ আশরাফ-উল হোসেনী' অথবা 'সৈয়দদের সৈয়দ' (Sayyid of the Sayyids) হিসাবে বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি মক্কার অধিবাসী বলে সামসুদ্দীন আহমদ মন্তব্য করেন।

সৈয়দ আলী তিরমিজির যে সমাধি রয়েছে তার শবাধার পাথরের নয়, ইটের তিনটি স্তর সৃষ্টি করে করা হয়েছে। উপরে সম্পূর্ণ খোলা অর্থাৎ উন্মুক্ত কোনো আচ্ছাদন নেই কিন্তু চারদিকে উঁচু প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। সম্রাট মুহম্মদ শাহের সময়ে জনৈক আবদুর রসুল কর্তৃক ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে এখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়।

৩৬। পাঁচ পীরের দরগা, ষোড়শ শতাব্দী

কামেল পীর সৈয়দ আলী তিরমিজির অনেক শিষ্য ছিল এবং এঁদের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন খুবই বিখ্যাত। পীর সৈয়দ আলীর মাজারের দক্ষিণে পরপর পাঁচটি সিমেন্টের (masonry) তিন ধাপবিশিষ্ট শবাধার দেখা যাবে। এগুলোক সমাধিসৌধ বলা যায় না,

তবে দরগা বলা যায়; কারণ বহু ভক্ত এখানে মানত করতে আসেন। পাঁচ পীরের মাজারগুলোর সামনে একটি পাথরের দণ্ড থাকত এবং এগুলোর উপর মোমবাতি জ্বালানো হত। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঁচ পীরের মাজার দেখা যাবে। সোনারগাঁয়ের লোকশিল্প জাদুঘরের ৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে শাচিলপুর গ্রামে পাঁচ পীরের মাজার রয়েছে। এ ছাড়া মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেন যে, পরপর সাজানো পাঁচটি শবাধার বিভিন্ন স্থানে দেখা যাবে। ধারণা করা হয়ে থাকে যে, তাঁরা একসাথে ধর্মযুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তাই একই সাথে পাশাপাশি তাঁদের সমাহিত করা হয়।

৩৭। হাজী ও গাজীর সমাধি, ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দ

পাঠানটোলার পশ্চিমে মোকামটোলা এলাকায় এক গম্বুজবিশিষ্ট একটি ইমারত রয়েছে যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটি হাজী ও গাজী নামে দুই ভাইয়ের সমাধি নামে চিহ্নিত করা হয়। গম্বুজটি স্কুইঞ্চের সাহায্যে নির্মিত। দরজার উপরে গাঁথা একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, এটি হিজরী ৯৫৫/১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয় অর্থাৎ এটি ষোড়শ শতাব্দীর ইমারত।

৩৮। সৈয়দ আতাউর রহমাজার সমাধি, উনবিংশ শতাব্দী

হাজী ও গাজী নামের দুই ভাই-এর সমাধির পাশে আধুনিককালে সৈয়দ আতাউর রহমাজার একটি সমাধি নির্মিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে অর্থাৎ বাংলা ১২৩৯/১৮৮৭ ইং সনে এটি স্থাপিত হয়। এটির কোনো স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় না। সমাধির প্রাঙ্গণে প্রাক-মুসলিম যুগের দু'টি পাথরের স্তম্ভ দেখা যাবে।

৩৯। ফকির-দরবেশদের সমাধি, সপ্তদশ শতাব্দী

পূর্বে বলা হয়েছে যে ধর্মপ্রচারের নিমিত্ত বহু পীর-দরবেশ, সুফী-সাধক এখানে এসে আস্তানা গাড়েন এবং ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। ধামরাই-এর আশেপাশে অসংখ্য শবাধার ও মাজার তা-ই প্রমাণ করে।

এ সমস্ত কামেল পীরদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রভাবশালী ছিলেন মোকামটোলার দু'জন পীর-ফকির। তাঁরা শাহজঙ্গী এবং মীর মুখদুম নামে পরিচিত ছিলেন। আহমদ হাসান দানী তাঁর 'Dacca' গ্রন্থে তাঁদের কথা উল্লেখ করেন।

৪০। একটি প্রাচীন মসজিদ, সপ্তদশ শতাব্দী/বিংশ শতাব্দী

ধামরাই বাজারে প্রধান সড়কের পাশে একটি প্রশস্ত ও অলঙ্কৃত মসজিদ দেখা যাবে। সংস্কার ও আধুনিকীকরণের ফলে এর মৌলিক স্থাপত্যিক উপাদান দেখা না গেলেও ভূমি-নকশা মুঘলরীতির পরিচায়ক। সম্ভবত এটি সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয় কিন্তু সলিমুদ্দীন ব্যাপারী এবং দালু হাজী নামে দু'জন ব্যবসায়ী মসজিদটি সম্প্রসারণ ও সংস্কার করেন। শায়েস্তা খানী তিনগম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদের ভূমি-পরিকল্পনায় এটি নির্মিত। কিন্তু ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে মুসল্লীদের ক্রমাগত সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে পরপর দু'টি বারান্দা নির্মিত হয় পূর্বদিকে। প্রথম বারান্দা পাঁচ গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত এবং দ্বিতীয়টিতে চারচালা ভল্ট দ্বারা ছাদ নির্মিত হয়। কিবলার দিকে তিনটি মিহরাব রয়েছে কিন্তু রঙচঙা করে এর সৌন্দর্য নষ্ট করা হয়েছে। এতে চিনি টিকরির ব্যবহার দেখা যাবে।

৪১। রূপগঞ্জ, শরিয়তগঞ্জ, মসজিদ, পঞ্চদশ শতাব্দী

ঢাকা জেলার রূপগঞ্জ এলাকায় একটি এক গম্বুজবিশিষ্ট সংস্কারকৃত মসজিদ দেখা যাবে। এর স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে মনে হয় যে, এটি সুলতানী আমলের মসজিদ ছিল। স্থানীয় লোকেরা বলেন যে, এ মসজিদে একসময়ে একটি শিলালিপি ছিল, যা স্থানীয় একজন হিন্দু জমিদার মুসলমানদের সাথে বিরোধের সময় অপসারণ করেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় মুসলমাজারা উক্ত শিলালিপিটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ধারণা করা হয় এ মসজিদটি সুলতানী আমলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়।

৪২। ফকিরবাড়ি মসজিদ, সপ্তদশ শতাব্দী

রূপগঞ্জের ফকিরবাড়ি এলাকায় একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। স্থানীয় মুসলমানগণ এটি পুনঃনির্মাণ করেন। বর্তমাজার মসজিদে প্রাচীন ইমারতের মাল-মসলা রয়েছে। সন্নিকটে ওজুর জন্য একটি কুয়াও পাওয়া গেছে।

৪৩। মান্দ্রা, মসজিদ (অধুনালুপ্ত), হিজরী ৮৩০/১৪২৭ খ্রিস্টাব্দ

এন. কে. ভট্টশালী যিনি ঢাকা জাদুঘরের কিউরেটর ছিলেন মান্দ্রায় একটি শিলালিপি আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে এ. এইচ. দানী এবং সামসুদ্দীন আহমদ এ শিলালিপিটির পাঠোদ্ধার করেন। এ শিলালিপির ওপর দিকে হিন্দু ভাস্কর্য ছিল। অধুনালুপ্ত মাণ্ডার মসজিদটি সুলতান জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহের আমলে উলুঘ খান মোয়াজ্জম দিনার খান হিঃ ৮৩০/১৪২৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন। উপরোক্ত তিনজন বিশেষজ্ঞের কেউই মসজিদের কোনো বর্ণনা দেননি, এ কারণে যে মসজিদ বহু পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। যাহোক, হাবিবা খাতুন তার 'সোনারগাঁয়ে' পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত এ মসজিদটির উল্লেখ করেন। লক্ষণীয় যে জালালুদ্দীন মোহম্মদ শাহ, যাঁর রাজধানী ছিল হযরত পাণ্ডুয়ায়, স্থাপত্যকলার একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁর সময়ে হযরত পাণ্ডুয়ায় একলাখী সমাধি নির্মিত হয়। এ ছাড়া সুলতানগঞ্জে ১৪৩২ খ্রিস্টাব্দে একটি মসজিদও স্থাপিত হয়।

নরসিংদি

৪৪। পলাশ-পারুলিয়া প্রাচীন মসজিদ, মুঘল যুগ, সপ্তদশ শতাব্দী

নরসিংদি জেলার পলাশ-পারুলিয়া গ্রামে মুঘল আমলের একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাবে। স্থানীয় ইতিহাসবিদ শরিফুল আসগরের মতে, সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বারো ভুঁইয়াদের পৃষ্ঠপোষকতায় মহেশওয়ার্দিতে. যার বর্তমান নাম পলাশ পারুলিয়া, একটি মসজিদ নির্মিত হয়। বর্তমানে এ অঞ্চলটির পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা, পূর্বে মেঘনা এবং দক্ষিণে কিশোরগঞ্জ। ধারণা করা হয় যে, মুঘল আমলে সোনারগাঁও থেকে পলাশ-পারুলিয়া পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মিত হয়। স্থানীয় ইতিহাসবিদ সর্দার আদম আলীর মতানুসারে পলাশ-পারুলিয়ায় মুঘল স্থাপত্যরীতিতে একটি মসজিদ নির্মিত হয় এবং এ অঞ্চলটি স্থানীয় প্রশাসনের প্রধান কেন্দ্র ছিল। একজন নায়েব-ই-দেওয়ান শাসনকার্য পরিচালনা করতেন, যাঁর সাথে মসনদ-ই-আলা ঈসা খানের পৌত্র মুনাওয়ার খানের সম্পর্ক ছিল। এই দেওয়ানের নাম ছিল শরিফ খান। সম্ভবত শরিফ

খানের স্ত্রী জয়নব বিবি হিজরী দ্বাদশ/খ্রিস্টাব্দ অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন।

মসজিদটি আয়তাকার ছিল এবং দৈর্ঘ্যে ছিল ৬০ ফুট। তিন গম্বুজবিশিষ্ট এ ইমারতটিতে প্রবেশের জন্য তিনটি দরজা ছিল। গম্বুজের আকৃতি বাল্বের মতো এবং ড্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত। ড্রামের মার্লন নকশা দেখা যাবে। এ গম্বুজের চূড়া কলসাকৃতি। চার কোনায় চারটি অষ্টকোণাকৃতি বুরুজ রয়েছে। কৌণিক বুরুজগুলো সমান্তরালভাবে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। খিলানগুলো চারকেন্দ্রীয় বলয় থেকে সৃষ্টি, যা মুঘল স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য বহন করছে। খিলানের পিছনে বহু খাঁজবিশিষ্ট খিলান দেখা যায়। সম্মুখভাগ আয়তাকার প্যানেল দ্বারা শোভিত। কার্নিশ সমান্তরাল, বক্রাকার নয়।

পলাশ-পারুলিয়া মসজিদটি মুঘল আমলে নির্মিত তিন গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার ইমারতের মডেলে নির্মিত, যা ঢাকার হাজী খাওয়াজা শাহবাজ, লালবাগ দুর্গ মসজিদে দেখা যাবে।

৪৫। কুমারদী, মসজিদ, মাজার ও অন্যান্য ইমারত

সম্প্রতি 'জনকণ্ঠে' ঢাকা, রবিবার, ২৪ বৈশাখ, ১৪০৭ বাংলায় মোস্তফা কামাল সরকার কুমরাদীর অবহেলিত প্রত্নসম্পদ নামক একটি প্রতিবেদন কলামে বলেন,

"নরসিংদী-শিবপুর পাকা সড়কের পাশে নরসিংদী থেকে ছয় মাইল উত্তরে পাশাপাশি দু'টি গ্রাম কুমরাদী ও মুন্সেফের চর। গ্রাম দুটি শিবপুর থানার পুটিয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত। এই দুই গ্রামের মাঝে রয়েছে একটি মরা নদী। কুমরাদী গ্রামটি অপেক্ষাকৃত উঁচু। অন্যদিকে মুন্সেফের চর গ্রামটি নিচু ও এখানকার মাটি সাদা বালি মিশ্রিত। কুমরাদী গ্রামের মাটির রং লালচে। মাটির এই লালচে রং প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দেয়। এই গ্রামেরই কেন্দ্রস্থলে রয়েছে এক গম্বুজবিশিষ্ট ছোট্ট একটি মসজিদ। এই মসজিদটির পূর্বদিকে এক বিঘা জায়গা জুড়ে রয়েছে একটি দীঘি। এরকম আরও একটি দীঘি রয়েছে মসজিদের পাশে। মসজিদের চারকোণে কারুকার্যমণ্ডিত চারটি পিলার। ভূমি থেকে প্রায় তিন ফুট উঁচু পাকা মেঝে মসজিদটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। মসজিদের পূর্ব ও উত্তরদিকে দু'টি দরজা এবং পূবদিকে প্রশস্ত খোলা বারান্দা। গম্বুজশীর্ষে ছোট চূড়া। নির্মাণশেলীর দিক থেকে এ মসজিদ বাংলার সুলতানী আমলের বলে মনে হয়। মসজিদের উত্তর পাশে রয়েছে একটি প্রাচীন পাকা ইমারত। এই ইমারতটি পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪০ ফুট এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রস্থে প্রায় ১৫ ফুট। এটি তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। পশ্চিমদিকের প্রকোষ্ঠটি অপর দুটি প্রকোষ্ঠ থেকে অপেক্ষাকৃত বড়। মাঝের প্রকোষ্ঠ পাশাপাশি দু'টি বাঁধানো সমাধি। সমাধিতে আরবিতে খোদাই করা রয়েছে কালেমা। বর্তমানে সম্পূর্ণ কালেমা আর অক্ষত নেই। তার কিছু অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। পূর্বদিকের শেষ প্রকোষ্ঠটি আয়তনে সমাধিপ্রকোষ্ঠের অনুরূপ। এই প্রকোষ্ঠের তিনদিকের দেয়ালে ছ'টি করে কুলুঙ্গি। এসব কুলুঙ্গিতে মাজার আলোকিত করার জন্য বাতি জ্বালানো হতো। পশ্চিম দিকের প্রকোষ্ঠটি সমাধিভবনের রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত

কোনো ব্যক্তির আবাসিক প্রকোষ্ঠ হিসাবে ব্যবহৃত হতো বলে অনুমান করা হয়। ইমারতের তিনটি প্রকোষ্ঠে প্রবেশের জন্য উত্তর ও দক্ষিণে ৬টি দরজা রয়েছে। প্রায় বিশ ফুট উঁচু এ ইমারতের বাইরের দিকে ছাদের কার্নিশে খচিত অলঙ্করণে বাংলার সুলতানী আমলের স্থাপত্য অলঙ্করণের ছাপ সুস্পষ্ট। বাইরের দেয়ালের চারদিকের স্থানে স্থানে চুন সুরকি উঠে যাওয়ায় ইমারতটির এখন দৈন্যদশা। এটি ধ্বংসের প্রহর গুনছে। আর ছাদের গজিয়ে ওঠা অসংখ্য বৃক্ষ একটি ঐতিহাসিক প্রাচীন কীর্তিকে দিন দিন ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। সমাধিপ্রকোষ্ঠে প্রবেশপথে দরজার উপর স্থাপিত ছিল একটি শিলালিপি। বর্তমানে শিলালিপিটি আর নেই। কিন্তু শিলালিপির স্থানটি দেখলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এ স্থানে একসময় শিলালিপিটি ছিল। স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে এ প্রতিবেদক জানতে পারে যে, এই যুগল সমাধি জনৈক শাহ মনসুর ও তাঁর স্ত্রীর। আর মাজারসংলগ্ন এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটিও শাহ মনসুরের তৈরি। তাঁর বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি।

অন্যদিকে মুন্সেফের চর গ্রামটির নামকরণ থেকে ধারণা করা হয় যে, শেরশাহের আমলে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জনৈক মুন্সেফ কর্তৃক এই গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়। একথার সপক্ষে আরও কিছু তথ্যপ্রমাণ ও যুক্তি পাওয়া যায়। যেমন মুন্সেফের চরের দু'মাইল পূর্বে শেরপুর নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামের নামের সঙ্গে শেরশাহের স্মৃতি জড়িত থাকতে পারে। মুন্সেফের চরের কাছাকাছি একটি গ্রামের নাম চরমাহমুদপুর। হোসেনশাহী বংশের শেষ সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদকে পরাজিত করে শেরশাহ বাংলাদেশ দখল করেন। মনে করা হয় যে, চরমাহমুদপুর নামের সঙ্গে গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের নামের সম্পর্ক রয়েছে। শেরশাহ এবং মাহমুদ শাহ এক সময়ের লোক। এক্ষেত্রে ধরে নেয়া যায় যে, মাহমুদ শাহের কোনো স্থানীয় প্রতিনিধি মাহমুদ শাহের নামে এ গ্রামের নামকরণ করেন। এলাকাবাসীর ধারণা শেরশাহ বাংলাদেশ দখল করে নেয়ার পর শেরশাহের কোন স্থানীয় প্রতিনিধি শেরশাহের নামে শেরপুর গ্রামের নামকরণ করেন। আর কুমরাদী গ্রামের শাহ মুনসুরের মাজার বলে পরিচিত যুগল সমাধি শেরশাহ কর্তৃক নিয়োজিত কোনো মুন্সেফের ও তাঁর স্ত্রীর। মাজারসংলগ্ন মসজিদটি উল্লিখিত মুন্সেফই হয়ত নির্মাণ করেছিলেন। মুন্সেফের মাজারই দীর্ঘদিন যাবৎ লোকের মুখে প্রচলিত হয়ে অপভ্রংশ হিসাবে মনসুরের মাজার বলে পরিচিতি লাভ করছে এবং মুন্সেফ হয়ে গেছে মনসুর।"

দিনাজপুর

২৫°১৪′ দক্ষিণ এবং ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০৫′ পশ্চিম এবং ৮৯°১৮′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে দিনাজপুর জেলা অবস্থিত। এই জেলার উত্তর-পূর্বে জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ-পূর্বে বগুড়া, দক্ষিণে রাজশাহী এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে মালদা জেলা। এ জেলার আয়তন মোট ২৬০৯ বর্গমাইল।

উত্তরাঞ্চল সমতলক্ষেত্র হলেও দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাংশ বিশেষ করে বারিন্দ অঞ্চল অপেক্ষাকৃত উঁচু। প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদের দিক থেকে বারিন্দ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কিংবদন্তি অনুযায়ী এ জেলা পরশুরামের সরকারের অধীনে ছিল। মনে করা হয় যে, পরশুরাম বগুড়ার মহাস্থানে রাজধানী স্থাপন করে দিনাজপুর-বারিন্দ অঞ্চল শাসন করেন।

নবাবগঞ্জে তর্পণঘাট নামে একটি লোকালয় ছিল। জনশ্রুতি অনুযায়ী বাল্মীকি তর্পণঘাটে স্নান করেন এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন। জনপ্রবাদের সঙ্গে এ কাহিনীর কোনো সম্পর্ক না থাকলেও এ স্থানে যে বহু প্রাচীনকাল থেকে অনেক ইমারতাদির অস্তিত্ব ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রায় ৩ একর পরিমিত এ ভূমির নিচে অসংখ্য প্রাচীন ইটের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। চরকাই-বিরামপুর থেকে ৩ মাইল পূর্বে এবং নবাবগঞ্জ থেকে ১ মাইল পশ্চিমে ফতেহপুর-মাড়াশ মৌজায় সীতাকোট অবস্থিত। সীতাকোট সীতার নাম থেকে নামকরণ হয়েছে। ধারণা করা হয় যে, দ্বিতীয়বার বনবাসের সময় সীতা এখানে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে বসবাস করেন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবারের মতো খনন করে এখানে একটি প্রাচীন বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। ১৯৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এখানে খননকার্য পরিচালনা করে এই বিহার আবিষ্কার করে।

দিনাজপুর জেলার পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় না। প্রাচীন ইতিহাস খুবই অপ্রতুল ও নির্ভরযোগ্য নয়। 'রামায়ণের' রচয়িতা বাল্মীকির সাথে তর্পণঘাটের অথবা সীতাকোটের কতটুকু সম্পর্ক তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। সমগ্র অঞ্চলটি মহাভারতে বর্ণিত বিরাট রাজার 'মৎস্য দেশ' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কথিত আছে

যে, পঞ্চপাণ্ডবের পাঁচ ভাই এই বিরাট রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঘোড়াঘাটে বিরাট রাজার কীর্তি দেখা যায় এবং কথিত আছে যে, এ স্থানে তিনি ঘোড়ার আস্তাবল নির্মাণ করেন। এ কারণে এটি ঘোড়াঘাট নামে পরিচিত। বুকানন হামিলটন বলেন, ঘোড়াঘাট এমন একটি স্থান যেখানে বিরাট রাজা ঘোড়া রাখতেন, যা থেকে স্থানটির এরূপ নামকরণ হয়েছে। পরবর্তীকালে এটি বরেন্দ্র অঞ্চলের অন্তর্গত হয় এবং পরে পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের একটি অংশে পরিণত হয়। পুণ্ড্রবর্ধন পুণ্ড্রদের অঞ্চল ছিল, যার রাজধানী ছিল মহাস্থান।

দিনাজপুরের দেবীকোট বা গঙ্গারামপুর এ জেলার অন্যতম প্রাচীন অঞ্চল। এখানে হিন্দু রাজাদের আমলে নির্মিত ১৮০০ ফুট × ১৫০০ ফুট বিশিষ্ট একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। বানগড়ে বান রাজাদের কীর্তির নিদর্শন বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। দিনাজপুরের পূর্বদিকে অবস্থিত বানগড় নবম শতাব্দীতে পালরাজাদের দখলে আসে। এখানে প্রাপ্ত পাথরের স্তম্ভরাজি ও তাম্রশাসনসমূহ পালরাজাদের ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করে। দিনাজপুরের ১৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে পালরাজাদের প্রাচীন কীর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে বুকানন হ্যামিলটন মহীপাল দিঘি নামে এক বিশাল জলাশয় দেখতে পান। আশেপাশে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের অংশ, ইটের ঢিপি ও ভগ্নাংশ দেখে মনে হয় পাল আমলে স্থানটি ঘনবসতিপূর্ণ ছিল। ধীবর দিঘি নামক অপর একটি জলাশয়ের মাঝে 'বুদেল' স্তম্ভ (Buddel) নামে বৌদ্ধ আমলের একটি কীর্তি দেখা যাবে। এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, পাল আমলে দিনাজপুর অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল।

একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলমানগণ বাংলা বিজয় করে লক্ষ্মণ সেনকে সিংহাসনচ্যুত করেন। তিনি সেনবংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন। এরপর মুসলিম আধিপত্য কায়েম হলে রাজধানী লক্ষ্মণৌতি বা গৌড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। গভর্নর গিয়াসউদ্দীন আইওয়াজ গৌড় থেকে দেবীকোট হয়ে দিনাজপুর পর্যন্ত একটি সড়ক নির্মাণ করেন। খাঁড়া ইটের সাহায্যে এ সড়কটি খুবই মজবুত করে তৈরি করা হয়। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেন এবং তাঁর রাজধানী ছিল সোনারগাঁ। বাংলার সর্বপ্রথম স্বাধীন রাজ্য কায়েম করেন সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে। এ বংশের শাসনকালের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে যদুবংশের অভ্যুত্থানে। দিনাজপুরের প্রতাপশালী হিন্দু জমিদার যাদব বা যদু, যিনি ক্ষমতা দখল করে 'দনুজমর্দন দেব' উপাধি ধারণ করে ইলিয়াস বংশের সর্বশেষ সুলতান শিহাবউদ্দীন ফিরোজকে হত্যা করে বলপূর্বক সিংহাসন দখল করেন। এরপর তাঁর পুত্র মহেন্দ্র দেব শাসন করেন কিন্তু মহেন্দ্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহ উপাধি ধারণ করেন। জোরদখলকারী হিন্দু যদুবংশ ১৪১৫ থেকে ১৪৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করে। দিনাজপুরের নামকরণ হয় দনুজমর্দন দেবের নাম থেকে।

১। গোপালগঞ্জ, মসজিদ, ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দ

দিনাজপুর জেলার গোপালগঞ্জে সুলতান বরবক শাহের রাজত্বকালে ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। মসজিদটি বর্গাকার এক গম্বুজবিশিষ্ট সুলতানী স্থাপত্যরীতির অনুপম দৃষ্টান্ত। এ মসজিদটির একটি অভিনবত্ব হচ্ছে পূর্বদিকের বারান্দা, যা পরবর্তীকালের বহু মসজিদ, বিশেষ করে গৌড়ের চামকাটি, লোটান এবং দিনাজপুরের সুরা মসজিদে দেখা যাবে। দিনাজপুর শহর থেকে চার মাইল উত্তরে এই মসজিদটির পরিমাপ ১২ বর্গফুট। পূর্বদিক থেকে তিনটি খিলানপথে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে দরজা রয়েছে। বারান্দার পরিমাপ ১২′ × ৫′ এবং মূল মসজিদের বরাবর এখানেও পূর্বদিকে তিনটি খিলান-দরজা দেখা যাবে। উভয় পাশে রয়েছে একটি দরজা। অভ্যন্তরে বর্গাকার এলাকার উপর গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। পেনডেনটিভ দিয়ে গম্বুজটি নির্মিত। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি পাথরে নকশা করা অবতলাকৃতি মিহবার। যেহেতু এটি সুলতানী আমলের স্থাপত্যকীর্তি সেজন্য গম্বুজে কোনো ড্রাম ব্যবহৃত হয়নি।

২। সুরা মসজিদ, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ (৪৮)

ঘোড়াঘাটের পাঁচ মাইল পশ্চিমে মৌজা চরগাছা অবস্থিত। এখান থেকে যে সড়ক গেছে তার দু'পাশে বিশাল দিঘি রয়েছে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ দিঘির আয়তন প্রায় ৩৫০ × ২০০ গজ। প্রশস্ত পাড়গুলো এখনও প্রায় ১৫ ফুট উঁচু। এ দিঘির প্রায় ১০০ ফুট দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি সুরম্য মসজিদ দেখা যাবে। মসজিদটি সুরা নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এটি সুরা মসজিদ নামে পরিচিত। সুলতানী আমলের বর্গাকার গম্বুজ-বিশিষ্ট মসজিদের চিরাচরিত মডেলে এটি নির্মিত। গোপালগঞ্জ, গৌড়, সোনারগাঁর, গোয়ালদিতে এ ধরনের মসজিদ দেখা যাবে। ডঃ নাজিমউদ্দীন বলেন, "ইট ও পাথরে নক্শাকৃত সুরা মসজিদ নামের ইমারতটি দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত। এটি এ যুগের (সুলতানী) স্থাপত্যকীর্তির একটি নিদর্শন। এর বর্গাকার নামাজঘর বা লিওয়ানের সামনে পূর্ব দিকে করিডোর নির্মিত হয়েছে। মসজিদটির বাইরে চারকোণায় এবং করিডোরের দু'পাশে মোট ছয়টি অষ্টভুজাকৃতি কৌণিক বুরুজ বা টাওয়ার রয়েছে, যা সমসাময়িক স্থাপত্যরীতির প্রতিফলন।"

পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ সুরা মসজিদটির আয়তন বাইরের দিকে ৪০ × ২৬ ফুট। অভ্যন্তরে ১৬ বর্গফুট, নামাজঘরের উপর গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। দেওয়ালের প্রশস্ততা ৫′। মূল মসজিদ এবং বারান্দায় ছয় কোনায় ছয়টি অষ্টকোণাকার বুরুজ রয়েছে। বুরুজের মসৃণ পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্বদিকে তিনটি খিলানপথ দিয়ে ভিতরে যেতে হয় এবং এই খিলানপথগুলোর বরাবর বারান্দায় তিনটি খিলানপথ দেখা যাবে। বারান্দা ও নামাজঘরের উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে প্রবেশপথ নির্মিত হয়েছে; ডঃ আহমদ হাসান সুরা মসজিদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, কেবলমাত্র গৌড়ে হোসেনশাহী আমলের ইমারতে পাথরের ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল না। গৌড়ের বাইরে, বিশেষ করে দিনাজপুরের সুরাতে মসৃণ পাথরখণ্ডের ব্যবহার দেখা যায়। তিনি বলেন, "এক্ষেত্রে

সুরার মসজিদ একটি আকর্ষণীয় নিদর্শন। ইটের নির্মিত দেওয়ালে পাথরের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে ভূমি থেকে বেশ উঁচু পর্যন্ত। পাথরে কাটা সে নকশা ও অলঙ্করণ ছোট সোনা মসজিদকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

বর্গাকার মসজিদটি একটি সুউচ্চ গম্বুজ দিয়ে আবৃত এবং বারান্দায় তিনটি ক্ষুদ্রাকৃতি গম্বুজ দেখা যাবে। গম্বুজটি স্কুইঞ্চ-এর সাহায্যে নির্মিত। সুলতানী স্থাপত্যরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য বক্রাকার কার্নিশ ছাদে দেখা যায়। বৃষ্টির পানি সহজে নেমে যাওয়ার জন্য বাংলার দোচালা ও চৌচালা কুঁড়েঘরের মতো ঢালু ছাদ সৃষ্টি করা হয়েছে। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃতি গোলাকার মিহরাব রয়েছে, মধ্যবর্তী মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড়। কেন্দ্রীয় মিহরাবের বাইরে কিছু অংশ উদ্গত বা Projection রয়েছে। স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য এবং অলঙ্করণের দিক থেকে এটিতে গৌড়ের লোটান মসজিদের প্রভাব দেখা যাবে। নিঃসন্দেহে এই মসজিদটি হোসেনশাহী আমলে ষোড়শ শতাব্দীতে স্থাপিত হয়।

৩। চেহেল গাজী, মসজিদ ও সমাধি, ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দ

দিনাজপুর শহরের উপকণ্ঠে দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁ সড়কের পশ্চিমদিকে প্রায় ১০ একর জমির উপর চেহেলগাজীর মসজিদ ও মাজার অবস্থিত। এ ছাড়া এখানে জলাশয়, একটি প্রাচীন ঈদগাহ ও বহু কবর রয়েছে। ১৫ ফুট দীর্ঘ প্রাচীরসম্বলিত ঈদগাহটি মুঘল আমলে নির্মিত হয় বলে মনে হয়।

চেহেলগাজী এলাকার সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ইমারত হচ্ছে বর্গাকার এক গম্বুজ-বিশিষ্ট মসজিদ। ১৬ বর্গফুট আয়তনের মসজিদটির দেয়াল খুব পুরু। পূর্বদিকে তিনটি খিলান-দরজা এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। গম্বুজটি স্কুইঞ্চের সাহায্যে নির্মিত এবং কোনো ড্রাম ব্যবহৃত হয়নি। পূর্বদিকে বারান্দা ছিল কিন্তু এটি বহু পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। গম্বুজটিও বহু পূর্বে পড়ে গেছে। এ কারণে বারান্দায় কোনো গম্বুজ ছিল কি না তা বলা দুষ্কর। তবে সুরা ও গোপালগঞ্জের মসজিদের বারান্দার মতো সম্ভবত তিনটি ছোট ছোট গম্বুজ নির্মিত হয়। চেহেল গাজীর মসজিদের অভ্যন্তরে একটিমাত্র মিহরাব ছিল কিবলাপ্রাচীরে। প্রবেশপথগুলোতে ও খিলানপথে পাথরের ব্যবহার দেখা যাবে। এখনও এ মসজিদে পোড়ামাটির নকশা ইমারতের শোভা বৃদ্ধি করছে।

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক ওয়েস্টমেকট এ মসজিদে তিনটি শিলালিপির সন্ধান পান। দু'টি কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে এবং অপরটি দিনাজপুর জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। শেষের শিলালিপির পাঠোদ্ধার করে জানা যায়, সুলতান রুকুনুদ্দীন বরবক শাহের রাজত্বকালে হিঃ ৮৬৫/ইং ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দে "খান-ই আযম-ওয়া-খাকান-ই-মুয়াজ্জম, সার-ই-লস্কর ওয়া উজীর ইকরার খান" উলুখ নুসরাত খান এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদে ১৬ই সফর ৮৬৫ হিজরীর উল্লেখ আছে। মসজিদ প্রসঙ্গে ওয়েস্টমেকট বলেন, "এটি জেলার যে অতি প্রাচীন কীর্তি তার প্রমাণ মজবুত ইটের খিলানসমূহ গম্বুজের গঠন এবং খিলানের অভ্যন্তরে সুন্দর সাইজ করা মসৃণ পাথরের ব্যবহার।"

অবশ্য বেড়ির ব্যবহার দেখে মনে হয় যে, পাথরগুলো অন্যস্থান থেকে সংগৃহীত। শামসুদ্দীন আহমদ তাঁর Inscriptions of Bengal এই মসজিদের শিলালিপির উল্লেখ করেছেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত চেহেল গাজীর মসজিদটি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে নির্মিত।

মাজার : চেহেল গাজী দিনাজপুর জেলার খুবই পবিত্র স্থান এবং এ স্থানটির সাথে চেহেল বা চল্লিশ জন ধর্মযোদ্ধা বা গাজীর নাম জড়িত। এই চল্লিশ জন গাজী সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। তবে স্থানীয় জনপ্রবাদ অনুযায়ী একদল ধর্মপ্রাণ মুসলিম যোদ্ধা গোপাল নামের স্থানীয় একজন জমিদারের সাথে ধর্মযুদ্ধে (জেহাদ) লিপ্ত হন এবং গোপালকে পরাজিত করেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক গোপাল আকস্মিক আক্রমণ করে বিশ্রামরত চল্লিশ জন গাজীকে হত্যা করেন। ফলে এই চল্লিশ জন ধর্মপ্রাণ মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে গোপাল মুসলিমবাহিনীর নিকট পরাজিত হন। নিহত চল্লিশ জন গাজীকে এ স্থানে সমাহিত করা হয়·এবং তা থেকে স্থানটি চেহেল গাজী নামে পরিচিত। উল্লেখ্য যে, এ কাহিনীর কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, কেবলমাত্র প্রবাদ রয়েছে।

সচরাচর সমাধি বলতে ইমারতের যে ধারণা হয় চেহেল গাজীতে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। ওয়েস্টমেকটের বর্ণনায়, "লোহার বেষ্টনীর মধ্যে সমাধি ৫৪ ফুট দীর্ঘ এবং তা পীরের দৈর্ঘ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি মসজিদের উত্তর দিকে দিনাজপুর সড়কের প্রায় একশত গজ পশ্চিমে মাজারটি দার্জিলিং শহরের চার মাইল উত্তরে এবং গোপালগঞ্জ মন্দিরের সন্নিকটে ....। আমি নাম ছাড়া এই পীরের সম্বন্ধে কিছু জানতে পারিনি। পূর্বে এই মাজারটির উপর কোনো ছাদ ছিল কি না জানা যায় না, বর্তমানে এটি প্রাচীরঘেরা এবং একটি ছাদ নির্মিত হয়েছে। মাজার প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, Symbolic বা প্রতীকধর্মী এই মাজারটি এবং পাঁচ পীরের দরগা ভক্তদের নিকট অতি প্রিয়। মসজিদের শিলালিপিতে 'রওজা' শব্দটি থাকায় ধারণা করা হয় যে চেহেল গাজীর মাজার খুবই পবিত্রস্থান ছিল। এ ছাড়া শিলালিপিতে বলা হয়েছে যে মসজিদ নির্মাতা উলুখ নুসরাত খান পার্শ্ববর্তী মাজারের সংরক্ষণকারী।"

৪। কান্তনগর, চেহেল গাজীর মসজিদ ও সমাধি, ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী

কান্তনগর মন্দিরের সন্নিকটে, প্রায় ১ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে এবং দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁও পাকা সড়ক থেকে প্রায় ২০০ গজ পূর্বদিকে চেহেল গাজী নামে অপর একটি পবিত্রস্থান রয়েছে। পূর্বের ইটের দণ্ডের মতো এখানেও ৮৪ ফুট দীর্ঘ একটি ইটের দণ্ড দেখা যাবে। এই মাজারটি গঞ্জে শহীদান বা চেহেল গাজীর মাজার বলে সুপরিচিত। বর্তমানে মাজারের চারিপাশে ৫ ফুট উঁচু পাকা দেয়াল আছে। মাজারটি ৮ ফুট চওড়া। বর্তমানে যে স্থানে রয়েছে তার আশপাশে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে মৃৎপাত্রের টুকরো ইটের ভগ্নাবশেষ। মাজারটিতে কোনো ছাদ নেই। মাজারের সামান্য উত্তর-পশ্চিমদিকে মুসলিম আমলের একটি ছোট ইমারতের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এই ধ্বংসাবশেষের প্রায় ১২৫০ গজ উত্তর-পূর্বদিকে আর একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের আর. এস. মানচিত্রে উভয় ধ্বংসাবশেষকেই মসজিদ জাতীয় ইমারত বলে

চিহ্নিত করা হয়েছে। আ. ফ. ম. যাকারিয়া বলেন যে, মাজার থেকে ৬০০ গজ দক্ষিণ-পশ্চিমে পাকা সড়কের প্রায় লাগোয়া পশ্চিমদিকে আর একটি পাকা মসজিদ ও পাকা কূপ ছিল। এ দু'টি কীর্তির কোনো চিহ্ন আর অবশিষ্ট নেই।

৫। মহলবাড়ি, মসজিদ, ষষ্ঠদশ শতাব্দী

মহেশপুর অথবা স্থানীয়ভাবে পরিচিত মহলবাড়ি এলাকায় একটি প্রাচীন মসজিদের সন্ধান পাওয়া যায়। মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত, এর গম্বুজ বহু আগে ধসে পড়ে যায়। দেয়াল দিয়ে ঘেরা এই মসজিদের ভিতরে ও বাইরে বিক্ষিপ্তভাবে পাথরের টুকরো পড়ে রয়েছে। ৩৫ × ১৭ ফুট আয়তাকার মসজিদটি তিনটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ মসজিদের দেয়ালগুলো ৫ ফুট প্রশস্ত। পূর্বদিকে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণে একটি প্রবেশপথ রয়েছে। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব দেখা যায়। মসজিদটির চার কোনায় চারটি বুরুজ ছিল। মসজিদটির পূর্বদিকের প্রধান প্রবেশপথের উপরে একটি শিলালিপি ছিল। বর্তমানে এটি দিনাজপুর জাদুঘরে রক্ষিত আছে। এটির পাঠোদ্ধার করে জানা যায় যে, সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে জনৈক রহিমউদ্দীনের পুত্র মিয়া মালিক ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদের নির্মাতা।

৬। দরিয়া মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দী

দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ থানাধীন দরিয়া নামক একটি গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আছে। এটি বর্তমানে সংস্কার করা হয়েছে। নবাবগঞ্জ থানার ৭ মাইল পূর্বে মৃতপ্রায় করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে মুঘল আমলের শেষের দিকের ২২′ × ১২′ পরিমাপের মসজিদটি স্থাপিত। আয়তাকার এই মসজিদটি তিনটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। পূর্বদিকে তিনটি প্রবেশপথ, উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে খিলানপথ নির্মিত হয়েছে। কিবলাপ্রাচীরে অর্ধগোলাকার তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব রয়েছে। গম্বুজগুলো সম্ভবত স্কুইঞ্চের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে। গম্বুজের মাথায় কলসচূড়া শোভা পাচ্ছে। দরিয়া মসজিদের অন্যতম ব্যতিক্রম হচ্ছে যে পোড়ামাটির অলঙ্করণে জীবজন্তুর প্রতিকৃতি দেখা যাবে। নয়াবাদের মসজিদেও এ ধরনের ফলক দেখা যাবে। উৎকীর্ণ জীবজন্তুর মধ্যে হাতি, গরু, ঘোড়া, তোতাপাখি, ময়না প্রভৃতির চিত্রফলক রয়েছে।

৭। ঘোড়াঘাট, প্রাচীন দুর্গ, মসজিদ ইত্যাদি, অষ্টাদশ শতাব্দী

ঘোড়াঘাট একটি প্রাচীন জনপদ। প্রাক-মুঘল আমল থেকে এ অঞ্চলটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। মুসলিম আমলের বহু কীর্তি এখানে অদ্যাবধি দেখা যাবে। বর্তমান ঘোড়াঘাটের দক্ষিণ প্রান্তে আধ মাইল দক্ষিণে একটি বিরাট দুর্গ অবস্থিত। এ প্রসঙ্গে আ. ক. ম. যাকারিয়া বলেন, "উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ দুর্গের পূর্ব দেয়ালের দৈর্ঘ্য ছিল দেড় মাইল। পূর্ব দেয়ালের পাশে করতোয়া নদী। পশ্চিম দেয়ালও অনুরূপ দৈর্ঘ্যের। উত্তর দেয়াল আধ মাইলের কিছু বেশি লম্বা এবং দক্ষিণ দেয়াল প্রায় ১ মাইল লম্বা। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দেয়ালের বাইরে যে গভীর পরিখা দেখা যায় তা ছিল প্রায় ৬০ ফুট চওড়া। পশ্চিম দেয়ালের উত্তরাংশে উত্তর দেয়ালের কাছাকাছি স্থানে ছিল দুর্গের একটি প্রবেশপথ যেখান থেকে একটি পাকা রাস্তা পূর্ব-দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ

দিয়ে গিয়ে দক্ষিণ দেয়ালের পশ্চিমাংশ ভেদ করে বাইরে চলে গেছে। সেখানেই ছিল খুব সম্ভব দুর্গের প্রধান তোরণ। দুর্গের ভিতরে পশ্চিম তোরণ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আনুমানিক ৩০০ গজ দূরে ছিল দুর্গের দ্বিতীয় বা অভ্যন্তরীণ প্রাচীর। এই উত্তর প্রাচীর সোজাসুজি পূর্ব দিকে না গিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে গিয়ে পূর্ব দেয়ালে মিশেছে। এ দেয়ালের পূর্ব সীমান্ত থেকে আর একটি দেয়াল সোজা দক্ষিণ মুখে প্রসারিত ছিল। এ দেয়ালের সব অংশ টিকে নেই। আশ্চর্যের বিষয় এ দেয়াল দু'টির পরিখা ছিল দুর্গের ভিতরের দিকে, বাইরের দিকে নয়। খুব সম্ভবত এই পরিখাবেষ্টিত স্থান ছিল দুর্গাধিপতির বাসস্থান।"

আ. ক. ম. যাকারিয়া সরেজমিনে ঘোড়াঘাট অনুসন্ধান করেন। তার বহু পূর্বে বুকানন হ্যামিলটন তাঁর 'Geographical, Statistical and Historical Description of the District or Zila of Dinajpur' গ্রন্থে ঘোড়াঘাটের বিষদ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "The city, in the time of it's greatness, extended 8 or 10 miles in length and about two in width and bricks and ruins may be traced in different parts, through that extant but there is no reason to suppose that it was a close built town of these dimensions." বঙ্গানুবাদ : "সমৃদ্ধির চরম যুগে শহরটি দৈর্ঘ্যে ৮ থেকে ১০ মাইল এবং পাশে ২ মাইল। এ শহরের সর্বত্র ইট এবং প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে। অবশ্য এমন মনে করার কারণ নেই যে শহরটি খুবই সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিত হয়।"

ঘোড়াঘাট দুর্গের অভ্যন্তরে কতিপয় মুঘল আমলের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। গড়ের ভিতরের পূর্বদিকে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাবে। মুঘল আমলে নির্মিত আয়তাকার তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি খুবই আকর্ষণীয় ছিল বলে মনে হয়। পূর্বদিকে তিনটি খিলানপথ এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে দরজা রয়েছে। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব নির্মিত হয়। মসজিদের আশেপাশে কূপ, জলাশয়, ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ও অনেকগুলো মাজার রয়েছে। সুলতানী আমল অপেক্ষা মুঘল আমলে ঘোড়াঘাটের গুরুত্ব ছিল অধিক। আ. ক. ম. যাকারিয়ার মতে, "মুঘল আমলে এ স্থানে ছিল একটি বিখ্যাত সেনানিবাস ও প্রশাসনিক কেন্দ্র। এখান থেকে কামরূপ ও আসামে অনেক অভিযান চালানো হয়েছে।"

৮। নয়াবাদ, মসজিদ, ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ

কাহারোল থানাধীন নয়াবাদ নামক স্থানে একটি প্রাচীন মসজিদ লক্ষ করা যায়। কান্তনগর মন্দিরের এক মাইল দক্ষিণে তিন গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদটির পরিমাপ ৩৮′ × ১৫′ ৯″। চিরাচরিত মুঘলরীতিতে নির্মিত এ মসজিদটির চার কোনায় চারটি কৌণিক বুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলো অষ্টভুজাকৃতি। পূর্বদিকে তিনটি খিলানপথ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। সম্মুখভাগে খাঁজকাটা প্যানেলের নকশা রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। বাইরের কেন্দ্রীয় দরজার উপরে একটি

শিলালিপি রয়েছে। এর পাঠোদ্ধার করে জানা যায় যে, নয়াবাদ মসজিদটি হিঃ ১২০০/হিং ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় শাহ আলমের রাজত্বকালে নির্মিত হয়। নয়াবাদের মসজিদের অলঙ্করণ খুবই আকর্ষণীয় এবং ফুল-লতা-পাতা, জ্যামিতিক নকশা ছাড়াও জীবজন্তুর প্রতিকৃতি পোড়ামাটির ফলকে লক্ষ করা যায়। নয়াবাদ মসজিদে ময়ূরের প্রতিকৃতি দেখা যাবে।

৯। মির্জাপুর, পচাগড়ের সন্নিকটে মসজিদ, ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ (অধুনালুপ্ত)

এম. এ. মুসা নামের বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা মির্জাপুরে পচাগড়ের নিকট ফার্সি হরফে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপির সন্ধান পান। 'সিকাস্তা' বা খাপছাড়া অক্ষরে লিপিবদ্ধ এ শিলালিপির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এতে পারসিকদের অনুকরণে তারিখ উল্লিখিত রয়েছে। বাংলার অপর কোনো শিলালিপিতে পারসিক বছরের উল্লেখ নেই। এই লিপিতে ১২৫৭ মালিক ইয়াজদিগাদ বা পারসিক বছর এবং মাস হিসাবে উর্দী বিহিস্তের উল্লেখ রয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে পারসিক মাস ফারওয়ানদীনে এই মসজিদটির নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ইংরেজি তারিখ গণনায় নির্মাণ-তারিখ হবে ১৬৫৬। শাহজাহানের শাসনামলে শাহ সুজা যখন বাংলার সুবাদার ছিলেন তখন মির্জাপুরের মসজিদটি নির্মিত হয়। এম. এ. মুসা বলেন যে, শেখ ফুল মুহাম্মদের পৌত্র এবং শেখ শারহাওকার পুত্র শেখ মালিকউদ্দীন আখতারুজ্জামান এই মসজিদটির নির্মাতা। ভূমিকম্পে বহু পূর্বে এই মসজিদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

নোয়াখালী

দক্ষিণে ২২°০৬′ এবং উত্তরে ২৩°১৭′ অক্ষাংশ এবং ৯০°৩৮′ পশ্চিমে এবং ৯১°৩৫′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত নোয়াখালী জেলা বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে একটি বিশিষ্ট জনপদ। চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্গত এই জেলার প্রাচীন ইতিহাস সঠিকভাবে জানা যায় না। এর উত্তরে ত্রিপুরা (কুমিল্লা) এবং পাবর্ত্য ত্রিপুরা, পূর্বে চট্টগ্রাম এবং সন্দীপ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে মেঘনার মেহানা। নোয়াখালী শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না তবে শাব্দিক অর্থে 'নোয়া' অর্থ নূতন এবং 'খালী' অর্থ খাল অর্থাৎ নূতন নদীপ্রবাহ (Water course)। বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবহমান জলস্রোত বিভক্ত হয়ে সম্ভবত এই জনপদের সৃষ্টি হয়। প্রাক-মুসলিম যুগের কোনো স্থাপত্যকীর্তি নোয়াখালী জেলায় পাওয়া যায়নি। অবশ্য আ. ক. ম. যাকারিয়ার মতে, এখানে কয়েকটি পাথরের মূর্তি পাওয়া গেছে। প্রবাদ রয়েছে যে, দ্বাদশ শতাব্দীতে মিথিলার রাজা আদিশূরের নবম সন্তান বিশ্বম্ভর শূর এ অঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। তিনি চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ মন্দির থেকে তীর্থযাত্রা শেষ করে নোয়াখালীর মধ্যে দিয়ে ফেরার পথে স্বপ্নে আদিষ্ট হন যে দেবী বরাহী তাঁকে বর দেন যে বিশ্বম্ভর শূর যদি তাঁর উপাসনা করেন তাহলে তিনি স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে পারবেন। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তিনি নোয়াখালীতে বরাহী দেবীর একটি মন্দির নির্মাণ করেন।

নোয়াখালীতে চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলিম বসতি গড়ে ওঠে। এ সময়ে দিল্লির সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক রাজা রত্নমাণিক্যকে ত্রিপুরার রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সাহায্য করেন। ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান হাজী ইলিয়াস শাহ রাজা প্রতাপ মাণিক্যকে পরাজিত করে নোয়াখালী অঞ্চল দখল করেন। সেইসাথে চট্টগ্রামও বিজিত হয়। মুঘল আমলে নোয়াখলী মগ, ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। তাদের উৎপীড়ন ও অত্যাচার, লুটতরাজ নির্যাতন এমন এক পর্যায়ে চলে যায় যে সুবাদার শায়েস্তা খান তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠান। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খানের পুত্র বুজুর্গ উমিদ খানের নেতৃত্বে যে বাহিনী পাঠানো হয় তা চট্টগ্রাম দখল করে এবং এর পর থেকে নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের সমুদ্রতটে ফিরিঙ্গি ও

মগ দস্যুদের লুটতরাজ বন্ধ হয়। মুসলিম আমলে নোয়াখালীর বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, সমাধি নির্মিত হয়েছে।

১। বজরা, মসজিদ এবং সমাধি, অষ্টাদশ শতাব্দী

বেগমগঞ্জ থানার ৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে বজরা নামে একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ রয়েছে। এ স্থানটিতে বহু মুসলিম ধর্মপ্রচারক সাধক-দরবেশ বসতি স্থাপন করেন। বজরা নামের উৎপত্তি হয়েছে বজরা নামক একধরনের বিরাটাকারের নৌকা থেকে। ধারণা করা হয় যে, এখানে পারস্য থেকে একজন পীর এসে বসবাস শুরু করেন। বজরা ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খানের সময়ে সোনারগাঁও পরগণা -- 'আমুরাবাদ নয়াবাদ বুলওয়া' নামে পরিচিত ছিল। মুঘল বাদশা মুহম্মদ শাহ (১৭১৯-৪৮ খ্রিঃ) দিল্লি থেকে আগত আমানউল্লাহ এবং ফানাউল্লাহ খান নামে দুই ভাইকে বজরা এলাকার জমিদারী (fief) অপর্ণ করেন। আমানউল্লাহ তাঁর বসতবাড়ির সামনে একটি বিশালাকার জলাশয় খনন করেন। এর পরিমাণ ছিল ৩০ একর কিন্তু রহস্যজনকভাবে এই খননকাজ হঠাৎ বন্ধ করে দেন। প্রবাদ আছে যে, খননকাজ চলাকালে জলাশয়ের মাঝখানে একটি প্রাচীন কবর বের হয়ে পড়ে। কবরটি ছিল স্থানীয় পীর আনবার অর্থ বা উমর শাহের। অপর একটি জনশ্রুতি অনুযায়ী এই কবরটি বজরা এবং মাতুবী মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল।

বজরার সর্বাপেক্ষা আকর্ষণ হচ্ছে শাহী মসজিদ। একটি উঁচু স্থানে প্রাচীরঘেরা এবং একটি প্রবেশপথসম্বলিত মসজিদটি আয়তাকার। মসজিদটির চারকোনায় চারটি কৌণিক বুরুজ দেখা যাবে। এই মসজিদে প্রবেশ করতে তিনটি খিলানাকৃতি প্রবেশপথ পূর্বদিক থেকে ব্যবহার করতে হয়। উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে দু'টি প্রবেশপথ রয়েছে। সামনের দেয়ালের উপরে প্যারাপেট দেখা যাবে, যা নকশাকৃত। প্রবেশপথ-গুলোর দুপাশে ক্ষুদ্রাকৃতি টারেট রয়েছে। আয়তাকার মসজিদটিতে তিনটি বাল্বের আকৃতির তিনটি গম্বুজ রয়েছে; মধ্যবর্তী গম্বুজটি আকারে একটু বড়। পেনডেনটিভের সাহায্যে গম্বুজগুলো নির্মিত। খিলানগুলো খাঁজ করা এবং আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব রয়েছে। প্যানেল নকশা দ্বারা দেয়াল সুশোভিত। মিহরাবগুলোর পিছনের দেয়াল সামান্য উদ্গাত।

বজরা মসজিদের প্রধান ফটকের উপরে একটি শিলালিপি প্রোথিত রয়েছে। ফার্সি ভাষায় উৎকীর্ণ এই শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই মসজিদটি নির্মিত হয়। ফার্সি লিপি নাসতালিক রীতিতে খোদিত হলেও এর উপরে প্রশংসাসূচক লিপি নাসখী রীতিতে আরবি ভাষায় উৎকীর্ণ করা হয়। বাংলা ১৩১৮-৩৫ সনে স্থানীয় জমিদার আমানউল্লাহ খানের উত্তরাধিকারীগণ এই মসজিদটি চিনি টিকারী বা রঞ্জিত ভাঙা মৃৎপাত্রের টুকরো দিয়ে অলঙ্কৃত করেন। আলী আহমদ এবং মুজিবউদ্দীন আহমদ চীনা কাঁচ দিয়ে এ কাজ সম্পন্ন করেন। জনাব আব্দুল কাদের মসজিদের ওপর একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ লেখেন। তিনি বলেন, "আমানউল্লাহ এবং থানাউল্লাহ এবং তাঁদের মাতা মসজিদ প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পূর্ব

কোণায় সমাহিত রয়েছেন। তাঁদের সমাধির উপর ১৮´৬´´ × ৮´৬´´ পরিমাপের একটি সমাধি নির্মিত হয়েছে। এই ইমারতের উত্তর দিকে তিনটি খাঁজকাটা খিলান এবং দক্ষিণ দিকে তিনটি কৌণিক খিলান দেখা যাবে। শেষোক্ত পথগুলো জালি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়।"

২। ছাগলনাইয়া, শামসের গাজীর কীর্তিসমূহ (অধুনালুপ্ত)

ফেনী থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কের ৯ মাইল উত্তরে ছাগলনাইয়া নামে একটি স্থান আছে। প্রবাদ আছে যে, এখানে শামসের গাজী নামে একজন প্রখ্যাত সামরিক কর্মকর্তার ঘাঁটি ছিল। তিনি একসময় ত্রিপুরা এবং নোয়াখালী অঞ্চলের কয়েকটি পরগনা নিয়ে একটি স্বশাসিত রাজ্য গঠন করেন। বর্তমানে শামসের গাজীর কীর্তির কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট নেই।

৩। মাতুবী, মসজিদ, ঊনবিংশ শতাব্দী (৪৯)

বজরার শাহী মসজিদ থেকে আনুমানিক আধ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে মাতুবী নামে একটি গ্রাম রয়েছে। স্থানীয়ভাবে মান্দরাজ পাটারী বা পাটওয়ারী নামে এ মসজিদটি পরিচিত। সংলগ্ন একটি জলাশয় রয়েছে যা পাটারী জলাশয় নামে পরিচিত। এর পূর্ব পাড়ে উঁচু স্থানে মাতুবী মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। মাতুবী মসজিদটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার ইমারত যার পরিমাপ ৩৫´ × ১৫´। মসজিদটির চার কোনায় চারটি আট কোনাকার বুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলো সমান্তরাল মোল্ডিং বা বেড়ি দিয়ে বিভক্ত। প্রতিটি স্তরে খাড়া সংলগ্ন পিলার দিয়ে নকশাকৃত। বুরুজগুলো ছাদের উপর উঠে গেছে এবং কুউপেলো এবং কলসচূড়া দ্বারা শোভিত। পূর্বদিকে তিনটি খিলানপথ রয়েছে। মধ্যবর্তী পথটি অপেক্ষাকৃত বড়। খিলানগুলো খাঁজকাটা। খিলানগুলোর উভয় পাশে সরু টারেট দেখা যাবে। বজরা খুবই সুন্দর প্যারপেট তবে বক্রাকার কার্নিশ দেখা যায় না। উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে খিলান প্রবেশপথ রয়েছে এবং প্রবেশপথের উভয় দিকে পূর্বদিকের টারেটের অনুরূপ টারেট দেখা যাবে। মসজিদটি তিনটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। মধ্যবর্তী গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত বড়, কলসচূড়াগুলো পদ্মপাতার ভিতের উপর থেকে উঠে গেছে। গম্বুজগুলো আটকোনাকার ড্রামের উপর নির্মিত।

মাতুবী মসজিদের কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃত মিহরাব রয়েছে। পশ্চিম প্রাচীরের বাইরে মিহরাবের পিছনের অংশ উদ্গত। এখানে কোনো পোড়ামাটির নকশা দেখা যাবে না। মাতুবী মসজিদটি ঊনবিংশ শতাব্দী অর্থাৎ মুঘল রাজত্বের শেষার্ধে নির্মিত হয় বলে ধারণা। মসজিদের নির্মাণকাল মসজিদে প্রোথিত একটি শিলালিপি থেকে জানা যায়। এতে ১৮১৪ ইংরেজি সনের উল্লেখ আছে।

পটুয়াখালী

বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পটুয়াখালী মহকুমা ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে পূর্ণাঙ্গ জেলায় রূপান্তরিত হয়। ২১° ৩৮′ ৩৬″ দক্ষিণ এবং ২২° ৩৬′ ১০″ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯° ৫২′ ৩০″ পশ্চিম এবং ৯০° ৩৮′ ৫৫″ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে পটুয়াখালী জেলা অবস্থিত। এই জেলা বঙ্গোপসাগরের উত্তর সৈকতে অবস্থিত এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০ ফুট উঁচু।

বাংলাদেশের বদ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত পটুয়াখালীর উত্তরে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে খুলনা জেলা এবং পূর্বে মেঘনার মোহনা এবং তেতুলিয়া খাল।

পটুয়াখালী নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানা যায় না। উল্লেখ্য যে, এক-সময়ে দক্ষিণাঞ্চল মগ-ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়। পটুয়াখালীর উত্তরদিক থেকে যে খাল প্রবাহিত হচ্ছে তা সাধারণ্যে বারানী খাল নামে পরিচিত। ষোড়শ শতাব্দী থেকে পর্তুগীজ জলদস্যুগণ পটুয়াখালীর উপর নির্মম অত্যাচার ও ধ্বংসলীলা সাধন করে। স্থানীয় লোকেরা পর্তুগীজদের বলত 'লুটুয়া' বা লুটেরা কারণ তারা নির্মমভাবে লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ড পরিচালিত করে। তারা বারানী খালকে 'লুটুয়া খাল' বলে অভিহিত করত। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে পটুয়াখালী ব্রিটিশ শাসনামলে একটি মহকুমায় পরিণত হয়।

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো পটুয়াখালীর আদিবাসীগণ কোল, ভীল এবং অস্ট্রো-এশিয়েটিক জাতিসম্ভূত ছিল। পরবর্তীকালে দ্রাবিড় এবং মোঙ্গলীয় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী এ অঞ্চলে আগমন করে বসবাস করতে থাকে। এ ছাড়া হোমো আলপাইন (Homo Alpines) নামে জনগোষ্ঠী এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এ সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থদের পূর্বপুরুষ বলে মনে করা হয় এবং তারা আর্যভাষায় কথা বলত। সমতটের অন্তর্গত হওয়ায় পটুয়াখালী সমুদ্র গুপ্তের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাহোক গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এ অঞ্চলে দু'টি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। সমতটের প্রথম রাজ্য বা বঙ্গ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন শশাঙ্ক। অবশ্য সঠিকভাবে বলা যায় না যে শশাঙ্কের আধিপত্য সমতটে প্রসারিত ছিল কি না। গৌড় এবং মগধে গুপ্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে দক্ষিণবঙ্গ খড়গ, দেব

ও চন্দ্র নামে তিনটি রাজবংশের শাসনাধীনে আসে। এ ক্ষুদ্র রাজবংশের শাসনকাল সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চন্দ্রবংশীয় রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্র (৯০০ থেকে ৯৩০ খ্রিস্টাব্দ) খুবই প্রতাপশালী রাজা ছিলেন এবং তাঁর আধিপত্য চন্দ্রদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। চন্দ্রদ্বীপ বর্তমানে পটুয়াখালী এবং বাকরগঞ্জ অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। এ অঞ্চলটি একসময়ে হরিকেল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পটুয়াখালী এবং বাকেরগঞ্জসহ দক্ষিণবঙ্গ বর্মরাজাদের অধিকারে ছিল। এরপর সেনরাজাগণ এ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করেন। তাম্রশাসন থেকে এ তথ্য পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সেনরাজাদের উত্তরাধিকারী হিসাবে দেবরাজাগণ এ অঞ্চলে প্রভুত্ব স্থাপন করেন। এ সময় বাসারত দেব নামে একজন নৃপতি বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলায় মুসলিম শাসন সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমশ ইসলামি আধিপত্য পূর্ব এবং দক্ষিণ বাংলায় সম্প্রসারিত হয়। এর ফলে রাজনৈতিক দিক থেকেই নয়, ইসলামি সমাজব্যবস্থা, কৃষ্টি এবং সভ্যতার বিকাশ ঘটে। যাহোক, এ সময় দনুজ রায় নামে একজন সামন্ত রাজা প্রথমে মেন্দিগঞ্জ এবং পরে কাচুন্দর-বৌফল থানায় একটি হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কাযুয়াকে বাকালা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাকলাই ছিল চন্দ্রদ্বীপ বাকলা, যেখানে দনুজ রায় তাঁর রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। যাহোক, সুলতান হোসেন শাহ ষোড়শ শতাব্দীতে বাকলা অধিকার করেন। কিন্তু গুলশাখালী থানাধীন মসজিদবাড়িতে ১৪৬৫ খ্রিস্টাব্দের যে শিলালিপি পাওয়া যায় তাতে সুলতান বরবক শাহের উল্লেখ আছে। এতে ধারণা করা যায় যে, হোসেন শাহের বহু পূর্বে সুলতান বরবক শাহের রাজত্বে এ অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে মুঘল আমলে বারো ভুঁইয়াদের অন্যতম রাজা কন্দর্পনারায়ণ এখানে একটি স্বাধীন জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন।

মুঘল শাসনকালে বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে মগ ও ফিরিঙ্গিদের লুটতরাজ এবং নির্যাতন শুরু হয়। বাকেরগঞ্জ এবং পটুয়াখালীতে পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি হার্মাদদের অকথ্য নিপীড়ন শুরু হয়। আকবরের সময়ে বাংলা মুঘল শাসনাধীনে আসলেও এদের উৎপাত বন্ধ হয়নি। জাহাঙ্গীরের আমলে ইসলাম খান সর্বপ্রথম চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রকে পরাস্ত করে বাকলা চন্দ্রদ্বীপ-পটুয়াখালীতে মুঘল আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে। এর পরেও মগ ও ফিরিঙ্গিদের উৎপীড়ন বন্ধ হয়নি। শাহসুজা তাদের দমন করার জন্য বাকরগঞ্জ জেলায় তিনটি দুর্গ নির্মাণ করেন। বৌফল থানাধীন সোনরকোটে দু'টি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

পটুয়াখালী জেলায় মুসলিম প্রত্নকীর্তির বহু নির্দশন রয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মসজিদবাড়ির মসজিদ।

১। মসজিদবাড়ি, মির্জাগঞ্জের সন্নিকটে, জামে মসজিদ, ১৪৬৫ খ্রিস্টাব্দ (৫০)

পটুয়াখালী জেলার সর্বপ্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে মির্জাগঞ্জের নিকটে মসজিদবাড়ি নামক স্থানে। মির্জাগঞ্জ থানা থেকে ৮ মাইল দক্ষিণে বিঘাই নদীর শাখা আইলা নদীর তীরে অবস্থিত মসজিদবাড়ি গ্রাম। জে. এইচ. রাইলি এখানে যে

শিলালিপি আবিষ্কার করেন তাতে হিজরী ৮৭০ তথা ইংরেজি ১৪৬৫ খ্রিস্টাব্দের উল্লেখ আছে। রাইলি এই শিলালিপিটি উদ্ধার করে এশিয়েটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের প্রেসিডেন্টের নিকট একটি পত্র লেখেন, "I send with pleasure the deer and the stone. The latter was found on the north bank of the Slab river at an abad called 'Byang' in a 'Mat' or Masjid, which is in a tolerable state of preservation." "আনন্দের সাথে আমি একটি হরিণ এবং একটি পাথর পাঠাচ্ছি। শেষোক্ত বস্তুটি শ্লাব নদীর উত্তর পাড়ে পাওয়া যায় একটি আবাদ বা বায়াঙ্গে, যা সম্ভবত একটি মঠ অথবা মসজিদ। বর্তমানে এটি মোটামুটি অক্ষত অবস্থায় আছে।" অন্য একটি চিঠিতে রাইলি লেখেন, "I send a sketch of the Masjid drawn by Mr. Gomes, who fortunately had a drawing of it in his field book. The accompanying extract from Lieutenant Hodge's map will show that the site of the Masjid is about 8 miles from Mirzaganj, the nearest decennially settled village. The lands about the Masjid at present are under cultivation. but there are still a few of the old forest trees standing and Mr. Shaw's resumption decree, dated 1842 state that the lands were at time under dense Sundarban jungle. The jungle..., about these parts is trees not Nul Jungle (Reed). There are two slabs of sand stone evidently used as steps, but bearing no inscriptions. The interior of the Masjid is ornamented with figures cut in bricks (?) and the dome is very substantially built and is about 30 feet high. There is a tank not far from the building and I was told it was found when the jungle was cleared. Of course there are a number of stories connected with the Masjid. One is that a holy Fakeer lived in it and tigers used to sweep the floor of the building clear with their tails every evening." "আমি জনাব গোমেজের অঙ্কিত মসজিদের একটি স্কেচ, যা তাঁর ফিল্ড বই-এ ছিল, পাঠালাম। লেঃ হজের মানচিত্র থেকে প্রতীয়মান হবে যে মির্জাগঞ্জের একটি ক্ষুদ্র গ্রামের ৮ মাইল দূরে মসজিদটি অবস্থিত ছিল। মসজিদের পার্শ্ববর্তী জমিগুলো এখন চাষাবাস হচ্ছে। এর আশপাশে বন-জঙ্গল ও গাছপালা দেখা যাবে। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের Resumption Decree থেকে জানা যায় যে, এক সময় এ সমস্ত জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এখন কেবলমাত্র গাছপালা রয়েছে, কোনো নলখাগড়া নেই। এখানে দুটি পাথরখণ্ড পাওয়া গেছে অবশ্য তাতে কোনো শিলালিপি উৎকীর্ণ নেই। মসজিদের অভ্যন্তরে পোড়ামাটির ফলক দ্বারা অলঙ্কৃত এবং গম্বুজটি বিশালাকার ছিল, যা প্রায় ৩০ ফুট উঁচু। মসজিদের সংলগ্ন একটি জলাশয় রয়েছে। জঙ্গল পরিষ্কার করার সময় এই দিঘিটি আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে মসজিদটিকে ঘিরে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, এখানে একজন ফকির বসবাস করতেন এবং প্রতি সন্ধ্যায় একটি বাঘ এসে তাঁর লেজ দিয়ে মসজিদের মেঝে পরিষ্কার করে দিত।"

শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, "সুলতান বরবক শাহের রাজত্বকালে আইজল খান, (পিতার নাম মুছে গেছে) এই মসজিদটি নির্মাণ করেন।" মসজিদটি বারান্দাসহ বর্গাকার এক গম্বুজবিশিষ্ট ইমারত, যা পূর্বে গোপালগঞ্জ, রাজবিবি, লোটন মসজিদে দেখা গেছে। ঢাকার লালমাটিয়াতে বর্তমানে যে শাহী মসজিদটি রয়েছে তা পূর্বে বারান্দাবিশিষ্ট এক গম্বুজাকৃতি বর্গাকার সমাধি ছিল। মসজিদবাড়ির মূল মসজিদটির পরিমাপ ২১ ফুট ৯ ইঞ্চি। প্রধান নামাজঘরের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে তিনটি করে দরজা আছে, যা খিলানাকৃতির। পূর্বদিকের বারান্দা দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। বারান্দার পরিমাপ ২১′ ৭″ × ৮′ এবং এর উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে এবং পূর্বদিকে মূল মসজিদের খিলানপথের বরাবর তিনটি খিলানপথ রয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত বড়। মসজিদের প্রাচীর ৬′ ৮″ চওড়া। এর ছয় কোনায় ছয়টি কৌণিক বুরুজ ছিল, যা বর্তমানে জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। বারান্দার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে দরজা দেখা যাবে। বারান্দাটি ভল্টের সাহায্যে আবৃত কিন্তু মূল নামাজগৃহটিতে একটি বিশাল আকারের গম্বুজ রয়েছে। গোলাকার ড্রামের উপর নির্মিত হওয়ায় গম্বুজটি মেঝে থেকে ৩০ ফুট উঁচু।

মসজিদবাড়ির অভ্যন্তরে কোনো স্তম্ভ নেই। দেয়াল থেকে পেনডেনটিভের সাহায্যে গম্বুজটি নির্মিত। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব দেখা যাবে। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অন্য দু'টি মিহরাবের চেয়ে বড়।

২। বিবি চিনি, নিয়ামতি, মসজিদ, ষোড়শ শতাব্দী

বেতাগী থানাধীন বিবি চিনি গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। বিবি চিনি নিয়ামতি বা নিয়ামতউল্লাহ নামের একজন সাধক কামেল পুরুষের আস্তানা ছিল। নিয়ামতির বোনের নাম ছিল বিবি চিনি। তাঁর নাম থেকে এই মসজিদের নামকরণ হয়েছে। এই ইমারতটি কখন নির্মিত হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। অনেকের ধারণা যে এই মসজিদটি প্রাক-মুঘল যুগে নির্মিত হয় ষোড়শ শতাব্দীতে, কিন্তু বর্তমানে মুঘল আমলের নক্‌শা ও পলেস্তারা দেখে মনে হয় যে সপ্তদশ শতাব্দীতে এটি সংস্কার করা হয়।

৩। শ্রীরামপুর, মিয়াবাড়ির মসজিদ, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ।

পটুয়াখালী থানাধীন এবং থানা থেকে ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত শ্রীরামপুরে একটি প্রাচীন মসজিদ রয়েছে। এটি মিয়াবাড়ির মসজিদ নামে পরিচিত। গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার মস্‌জিদটি উঁচু ভিতের উপর, খিলানের উপর নির্মিত ভিতকে তাহখানা বলে, যা ঢাকার খান মুহম্মদ মৃধা এবং দেওয়ান বাজারের মসজিদে দেখা যাবে। এই মসজিদের চার কোনায় চারটি বুরুজ রয়েছে। অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য খিলানাকৃতি প্রবেশপথ রয়েছে উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে। কিবলা অর্থাৎ পশ্চিম দিকে মিহরাব রয়েছে। মসজিদটি জরাজীর্ণ অবস্থায় টিকে রয়েছে। বাইরের দেওয়ালের প্লাস্টারে কাটা নকশা, টারেট আট কোনাকার বুরুজ, চার কোনা থেকে সৃষ্ট খিলান প্রভৃতি থেকে এই ইমারতটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

৪। শ্রীরামপুর, জোড় বাংলা মাজার, অষ্টাদশ শতাব্দী

পটুয়াখালী জেলার শ্রীরামপুর থানায় শ্রীরামপুরে দোচালা ধরনের একটি ইমারতের সন্ধান পাওয়া গেছে। আয়েশা বেগম 'জোড় বাংলা মুসলিম সমাধি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করেন যে কালাই খান এবং তাঁর স্ত্রীর জোড়া কবর নির্মিত হয়েছে এই দোচালা ইমারতে। আয়েশা বেগম বলেন যে, সমাধির ২০০ গজ দূরে একটি মসজিদ এবং একটি সেতু নির্মিত হয় এবং এ তিনটি প্রাচীন ইমারত Antiquites Act অনুযায়ী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সংরক্ষণ করছে। সেতুর নিকট যে শিলালিপি আবিস্কৃত হয়েছে তাতে হিজরী ১২১৩/ইংরেজি ১৭৯৮-৯৯ সনের উল্লেখ আছে।

আয়েশা বেগম বলেন, "শ্রীরামপুরের সমাধি ইমারতটি আয়তাকার দ্বিতল সমাধি। এর দৈর্ঘ্য ২.৩৮ মিটার এবং প্রস্থ ২.২৭ মিটার। দোচালা স্থাপত্যরীতির দ্বিতল ইমারত হিসাবে এই সমাধিটি মুসলিম স্থাপত্যে একটি ব্যতিক্রমধর্মী নমুনা। এরূপ স্থাপত্য নিদর্শন দেখা যায় বিষ্ণুপুরের গোস্বামীপাড়ার দোচালা মন্দিরের (সপ্তদশ শতাব্দী) নির্মাণ সৌকর্যে। এই রীতিতে সমতল ছাদটি এক কুঠরীর উপরে দ্বিতল দো-চালা নির্মিত হয়। ফরিদপুরের খালিয়ায় রাজারামের মন্দিরটি দ্বিতল এবং মাঝে দোচালা ও উভয় পাশে দু'টি চারচালাযুক্ত যা অনুরূপ নিদর্শন বহন করছে।"

আয়েশা বেগম স্বীকার করেছেন যে, কলাই খান ও তাঁর স্ত্রীর পূর্বপুরুষগণ হিন্দুধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং কালাই খান ও তাঁর স্ত্রী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু দো-চালা মন্দির নির্মাণের রীতিতে সমাধি নির্মাণ করেন। বর্তমানে শবাধার দু'টির কোনোই চিহ্ন নেই। প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে এই যে, কালাই খান এবং তাঁর স্ত্রীর মন্দিরের আকারে সমাধি নির্মাণ করে তাঁদের শবাধার সমাহিত করা হয়, না পূর্বে নির্মিত জোড়া দ্বিতলবিশিষ্ট মন্দিরের মধ্যে তাঁদের কবর দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, মুসলিম বাংলার ইতিহাসে এটি বিরল। আরিফাইলের সমাধিসংলগ্ন ইমারতটি দোচালা, দ্বিতলবিশিষ্ট নয়, যেমন গৌড়ে ফতেহ খানের সমাধি দোচালাবিশিষ্ট ইমারত। নদীয়া, বিষ্ণুপুর ও বিভিন্ন স্থানে এমনকি পাবনায় জোড়া মন্দির দেখা যাবে, তবে দ্বিতল নয়।

৫। কালিসূর, সৈয়দ-উল-আরেফিনের সমাধি, সপ্তদশ শতাব্দী।

পটুয়াখালী জেলার কালিসূর নামক গ্রামে একটি প্রাচীন মাজার দেখা যায়। আ. ক. ম. যাকারিয়া বলেন, "বাউফল থানার অধীনে কালীগুড়ি গ্রামে একটি প্রাচীন বটগাছের নিচে একটি প্রাচীন মাজার আছে। এটিকে সৈয়দ-উল-আরেফিন নামক একজন দরবেশের মাজার বলে চিহ্নিত করা হয় স্থানীয় প্রবল জনপ্রবাদ মতে। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে নাকি এখানে অনেক কেরামতি প্রদর্শন করেন।" সৈয়দ-উল-আরেফিন একজন প্রখ্যাত কামেল দরবেশ ছিলেন। তার একটি আস্তানা ছিল কালিসূরে এবং বিভিন্ন ধরনের অলৌকিক ঘটনা দ্বারা স্থানীয় হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করেন।

৬। আদমপুর, মুন্সি আমিরুল্লাহর মাজার, ঊনবিংশ শতাব্দী

পটুয়াখালী জেলার আদমপুর গ্রামে মুন্সি আমিরউল্লাহ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদের সাথে শ্রীরামপুরের মিয়াবাড়ির মসজিদের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মসজিদটি নির্মিত হয়।

পাবনা

২৩°৪৯′ দক্ষিণ ও ২৪°৪৬′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°২′ পশ্চিম ও ৮৯°৫০′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত পাবনা জেলা। এই জেলা রাজশাহী বিভাগের দক্ষিণ-পূর্ব কোনায় অবস্থিত। ইছামতি নদীর তটে অবস্থিত এ জেলার প্রশাসনিক কেন্দ্র পাবনা। এর উত্তরে বগুড়া, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ যা পূর্বে ময়মনসিংহ ও ঢাকা থেকে এই জেলাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। দক্ষিণে গঙ্গা নদী, যা ফরিদপুর এবং নদীয়া জেলাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে রাজশাহী। আলেকজান্ডার কানিংহামের মতে, পাবনা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে পুন্ড্র বা পৌন্ড্রবর্ধন থেকে। তাঁর ভাষায় : "স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভাষায়, পোনা-বর্ধন থেকে সংক্ষেপে পোনাভান এবং তা থেকে পবনা বা পাবনা শব্দটির উৎপত্তি।"

১। শাহজাদপুর, মখদুম শাহ দৌল্লাহর মসজিদ, পঞ্চদশ শতাব্দী (৫১)

পাবনা জেলায় সর্বপ্রথম মুসলিম বসতি স্থাপিত হয় শাহজাদপুরে। হারসাগর নদীর তীরবর্তী শাহজাদপুরে প্রখ্যাত সুফীসাধক মখদুম শাহ দৌল্লাহ শহীদ ধর্মপ্রচারের জন্য তাঁর শিষ্যদের নিয়ে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। আবদুল ওয়ালী হযরত মখদুম শাহ দৌল্লা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেন।

"ইয়ামেনের রাজা হযরত মুয়াম্মর ইবন জাবালার, যিনি নবী করীমের একজন অন্তরঙ্গ সাহাবী ছিলেন, দুটি পুত্র এবং একটি কন্যা ছিল। এ দু'জনের মধ্যে মখদুম শাহ দৌল্লা নামের শাহজাদা পিতার অনুমতিক্রমে স্বদেশ ত্যাগ করে আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর সাথে তিন জন ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। তাদের নাম খাওয়াজা কালাম দানিশমাদ, খাওয়াজা নূর এবং খাওয়াজা আনওয়ার, তার বোন, দশ জন দরবেশ এবং অসংখ্য অনুগামী। প্রথমে তিনি বুখারায় এসে উপস্থিত হন এবং সেখানকার প্রখ্যাত সাধক শাহ জালালউদ্দীন বুখারীর সান্নিধ্য লাভ করেন। জালালউদ্দীন বুখারী ছাই রঙের কয়েকটি পায়রা মখদুম শাহকে উপহার দেন। বহুদিন সমুদ্রপথে যাত্রার পর তাঁরা শাহজাদপুরের দুই মাইল দক্ষিণে পোতাজিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হন। এ সময় বন্যার দরুন সমগ্র

অঞ্চল জলমগ্ন ছিল এবং শুকনা জায়গা না থাকায় তারা অবতরণ করতে পারছিলেন না। তাঁদের জাহাজ চরে আটকিয়ে যায় এবং সবদিকে থৈথৈ পানি দেখে মনে হয় যে একটি বিশাল সমুদ্র। বুখারার পায়রাগুলো প্রতিদিন সকালে জাহাজ থেকে উঠে স্থলভাগ খুঁজতে যেত এবং সন্ধ্যায় ভাটার সময় জাহাজে ফিরে আসত। কয়েকদিন অপেক্ষা করার পর শাহ দৌল্লাহর সঙ্গীরা পায়রার পায়ে মাটি ও দূর্বাঘাস লক্ষ্য করে। পরের দিন পাখি যে দিকে উড়ে যাচ্ছে সেদিকে একটি ডিঙ্গি নিয়ে কয়েকজন সাহাবী একটি চরে অবতরণ করে। যে স্থানে মখদুম শাহ দৌল্লা এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ অবতরণ করেন তাই বর্তমানে শাহজাদপুর নামে পরিচিত। মখদুম শাহের নাম থেকেই শাহজাদপুর নামকরণ হয়েছে। ক্রমশ পানি সরে যেতে থাকলে একটি বিশাল স্থলভাগ বেরিয়ে পড়ে। শাহজাদপুরে অবতরণ ও বসতি স্থাপনকে স্মরণীয় করার জন্য মখদুম শাহ দৌল্লা সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।"

আব্দুল ওয়ালী আরও বলেন, "যে সময় শাহ দৌল্লাহ শাহজাদপুরে অবতরণ করেন তখন সেখানে শুভ বিহার (?) নামে এক রাজ্যের হিন্দু রাজা রাজত্ব করছিলেন। তিনি মুসলমানদের আগমনে ভীত ও শঙ্কিত হয়ে বিদেশীদের কলোনী স্থাপনে বাধা দেন এবং তাদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠান। উভয় পক্ষে তুমুল সংঘর্ষ হয় এবং শাহ দৌল্লাহ দু'বার যুদ্ধে জয়লাভ করেন কিন্তু তৃতীয়বার তিনি তাঁর ২১ জন মুরীদসহ যুদ্ধে শহীদ হন। মখদুম শাহের দু'জন ভ্রাতষ্পুত্রও যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর বোনও আত্মহুতি দেন।"

আব্দুল ওয়ালী পুনরায় বলেন, "শত্রুপক্ষের একজন সৈন্য গোপনে শাহের শবাধারের কাছে এসে তাঁর মাথাটি কেটে ফেলে এবং সেটি নিয়ে পালিয়ে যায়। এখানে প্রশ্ন থেকে যায় সে পীর সাহেব রণক্ষেত্রে শহীদ হন, না নামাজ পড়া অবস্থায় তাঁকে হত্যা করা হয়। যদি পরেরটি সত্য হয় তাহলে তাঁর ছিন্ন মস্তকটি নিয়ে সুবা-ই-বিহারের রাজার সামনে রাখা হয়। রাজা মস্তক থেকে রশনী বের হতে দেখে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন এবং আগত মুসলমানদের নিকট ছিন্ন মস্তকটি দিয়ে সম্মানের সাথে তাঁকে সমাহিত করার জন্য বলেন। সমাধি ও তৎসংলগ্ন একটি মসজিদ নির্মিত হয়।"

আয়েশা বেগম 'আমাদের ঐতিহ্য শাহজাদপুর মসজিদ' শীর্ষক একটি গ্রন্থে মুখদুম শাহ দৌল্লাহর জীবনী ও স্থাপত্যকীর্তির বিষদ আলোচনা করেন। শাহজাদপুর নগরবাড়ি-বগুড়া পাকা সড়কের প্রায় ১ ১/২ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত। করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এ মসজিদটি বাইরের দিকে ৬২′ ৯″ দীর্ঘ এবং ৪১′ ৩ ১/২″ প্রস্থ। দেয়ালগুলো ৫′ ৭″ প্রশস্ত। মসজিদের ভিতরের মাপ ৫১′ ৯″ × ৩১′ ৫″। ভূমি-পরিকল্পনার দিক থেকে শাহজাদপুর মসজিদটি, যা প্রাকৃতিক কারণে সামান্য মাটির ভিতরে বসে গেছে, ১৫ গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদ। ইতিপূর্বে আমরা আয়তাকার ১৫ গম্বুজবিশিষ্ট একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের সন্ধান পাই ময়মনসিংহের নেত্রোকোনার রোয়াইলবাড়িতে। ১৫ গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ বাংলায় খুবই বিরল। অবশ্য দশ গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদ গৌড়ে মালদাহ, তাঁতিপাড়া, ত্রিবেণী, হুগলীর জাফর খান গাজী এবং ঢাকার রামপালে নির্মিত হয়।

শাহজাদপুর মসজিদ কয়েকটি কারণে বিশেষভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ—প্রথমত, এর কোনায় কোনো অষ্টভুজাকৃতি কৌণিক বুরুজ দেখা যায় না, দ্বিতীয়ত, গম্বুজগুলো অন্যান্য মসজিদের তুলনায় অনুচ্চ, তৃতীয়ত, বাইরের প্রাচীর, সুলতানী আমলের ইমারত হওয়া সত্ত্বেও খুবই সাদামাটা। কয়েকটি কুলুঙ্গি, প্যানেল, মৌল্ডিং দিয়ে নকশাকৃত। আ. ক. ম. যাকারিয়া অবশ্য মনে করেন যে, "মসজিদের বাইরের দেয়ালে লতাপাতা ও ফুলফলের সুন্দর পোড়ামাটির চিত্রফলক এককালে ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু মুঘল আমলে ও পরবর্তীকালে মসজিদের প্রচুর সংস্কার করা হয়। ফলে পোড়ামাটির চিত্রফলকের অধিকাংশ নষ্ট হয়ে যায়। শাহজাদপুর মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য পূর্বদিকে পাঁচটি খিলানপথ ছিল। উত্তর ও দক্ষিণদিকে তিনটি করে প্রবেশপথ ছিল। বর্তমানে প্রবেশপথগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।" আয়েশা বেগম বলেন, "এই মসজিদের (facade) পাঁচটি আয়তাকার ফ্রেমের মাঝে পাঁচটি খিলানবিশিষ্ট প্রবেশপথে (five arched entrances) নির্মিত কেন্দ্রের প্রবেশপথ ২.৬৮ মিটার উচ্চ এবং ১.৮৭ মিটার প্রশস্ত। এই খিলানগুলো স্পষ্টত দ্বিকেন্দ্রিক কৌণিক খিলান। এই উপমহাদেশে দ্বিকেন্দ্রিক কৌণিক খিলান সাধারণভাবে বাংলার স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিগণিত। প্রাক-মুঘল সুলতানী স্থাপত্যের বহু মসজিদে, যেমন জাফর খান গাজীর মসজিদ (১২৯৮ খ্রিঃ), এক লাখী সমাধি (পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ), ষাট (তথাকথিত) গম্বুজ মসজিদ (পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ), খান জাহানের সমাধি (১৪৫৯ খ্রিঃ), বাবা আদমের মসজিদ (১৪৮৩ খ্রিঃ) ইত্যাদি ইমারতে এই কৌণিক খিলানের চর্চা লক্ষণীয়।"

শাহজাদপুর মসজিদের কার্নিশ স্বল্প বক্রাকার, একলাখী সমাধির মতো সুস্পষ্ট নয়। প্যারাপেটের দুই স্তরে মৌল্ডিং রয়েছে। মৌল্ডিং-এর নিচে প্যানেলে খাঁজকাটা খিলান-সম্বলিত কুলুঙ্গি শোভা পাচ্ছে। শিকল খিলানের মধ্যভাগে ঝুলন্ত ও লতাপাতা দেখা যাবে। অভ্যন্তরে দুই সারিতে চারটি করে মোট আটটি পাথরের স্তম্ভ রয়েছে। স্তম্ভ প্রসঙ্গে আয়েশা বেগম বলেন, "যদি দানী প্রণালী সিদ্ধভাবে জরিপ পর্যবেক্ষণ করতেন তাহলে তিনি এই মসজিদের দণ্ডায়মান প্রস্তরস্তম্ভের সংখ্যা যে মাত্র আট তা সহজেই উল্লেখ করতেন। তাঁর লেখায় স্তম্ভের সংখ্যা আটটির পরিবর্তে আটাশটির উল্লেখ পাওয়া যায়। নাজিমউদ্দীন আহমেদ তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত বইতে আটাশটি স্তম্ভের পুনরাবৃত্তি করেছেন। আ. ক. ম. যাকারিয়া প্রথমবারের মতো এই ভুল শুদ্ধ করে তাঁর পুস্তকে আটটি স্তম্ভের উল্লেখ করেছেন।" এ প্রসঙ্গে তিনি অযাচিতভাবে বলেন, "সৈয়দ মাহমুদুল হাসান তাঁর পূর্ববর্তী সব লেখকের পরিবেশিত ভুল তথ্য অনুসরণ করেছেন এবং তার সাথে আরো কিছু নূতন ভুল অবলীলাক্রমে সংযোজন করেছেন। তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত পুস্তকে মিহরাবের সংখ্যা লিখেছেন পাঁচটি।" পাথরের স্তম্ভের ব্যবহার প্রসঙ্গে বলতে হয়, আহমদ হাসান দানী এবং নাজিমউদ্দীন আহমদ যে ২৮টি স্তম্ভের উল্লেখ করেছেন তা তারা একক বা বিচ্ছিন্ন (Isolated অথবা free standing) বলেননি। আয়েশা বেগম যে ভূমি-নকশা দিয়েছেন তা দেখলে সহজেই বোঝা যাবে যে, অভ্যন্তরে মধ্যবর্তী ৮টি একক ও অসংলগ্ন স্তম্ভসহ চারিপাশের দেওয়ালে যে attached বা সংলগ্ন পিলার রয়েছে তা হিসাব করলে ২৮টি হবে। অভ্যন্তরে দুই সারিতে মোট ৮টি স্তম্ভ দ্বারা

তিনটি আইলে বিভক্ত করা হয়েছে এবং উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি পাঁচটি 'বে' দেখা যাবে অর্থাৎ সর্বমোট ১৫টি বর্গাকার এলাকায় বিভক্ত নামাজগৃহটি ১৫টি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। স্তম্ভের ক্ষেত্রে একথা সত্য যে ৮টি free standing স্তম্ভ রয়েছে মধ্যভাগে, যা থেকে পেনডেনটিভের সাহায্যে গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। দানী এবং নাজিমউদ্দীন যে ২৮টি স্তম্ভের উল্লেখ করেছেন তা তাঁরা free standing বলেননি। হিসাব করলে আয়েশা বেগমের শুভঙ্করের ফাঁকি ধরা পড়বে কারণ তাঁর দেওয়া নকশায় অসংলগ্ন ও সংলগ্ন স্তম্ভ নিয়ে মোট ২৮টি স্তম্ভ রয়েছে। উত্তরদিকের প্রাচীরে ২টি, দক্ষিণদিকের প্রাচীরে ২টি, পূর্বদিকের প্রাচীরে ৪টি, কিবলাপ্রাচীরে ৪টি এবং প্রতি চার কোনায় জোড়া স্তম্ভ, পেনডেনটিভ নির্মাণের জন্য (পৃষ্ঠা ৩৩), অর্থাৎ ৮টি এবং মধ্যবর্তী ৮টি অসংলগ্ন স্তম্ভ নিয়ে মোট ২৮টি স্তম্ভ দেখা যাবে। উপরন্তু, গ্রন্থকার সম্বন্ধে তিনি শুধুমাত্র অশালীন মন্তব্যই করেননি, মনগড়া ও অযৌক্তিক উক্তি করেছেন, কারণ গ্রন্থকার তাঁর "Muslim Monuments of Bangladesh" (MMB) (Islamic Foundation, 1986, P. 190)-তে ৮টি স্তম্ভের উল্লেখ করেছেন, ২৮টি নয়। ("in all there are 8 such pillars inside the mosque, dividing the area into three aisles and five bays")। আয়েশা বেগমের মতো একজন সুপরিচিত লেখিকা মিথ্যার উপর ভিত্তি করে অবাস্তব ও অশোভন মন্তব্য করবেন তা অবশ্যই আশা করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন যে, গ্রন্থকার শাহজাদপুর মসজিদে নয়টি গম্বুজ ছিল বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু MMB, পৃষ্ঠা 190-তে তিনি বলেছেন, "The mosque is roofed over by 15 domes".

গম্বুজগুলোর ড্রাম বিভিন্ন এবং অনুচ্চ এবং ক্ষুদ্রাকৃতি কলসচূড়া রয়েছে। পশ্চিমদিকে সর্বমোট পাঁচটি মিহরাব থাকার কথা, প্রতিটি 'বে'র বরাবর কিন্তু ছয় ধাপবিশিষ্ট পাথরের মিম্বর নির্মিত হওয়ায় মিহরাবের সংখ্যা ৮টি। আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ এবং খাঁজকাটা খিলান দ্বারা অলঙ্কৃত অবতলাকৃতি মিহরাবগুলো খুবই আকর্ষণীয়। দ্বিতল মিম্বরের উপরে গম্বুজ দেখা যাবে। অসংলগ্ন মিনারটি আধুনিক এবং তা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। আয়েশা বেগম শাহজাদপুর মসজিদের অলঙ্করণ প্রসঙ্গে বলেন, "শাহজাদপুর মসজিদ মখদুম শাহ দৌলা শহীদ কর্তৃক নির্মাণের সম্ভাবনাসহ সুলতানী বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের পরিণত স্থাপত্য কাঠামোর স্বরূপ পরিগ্রহ লগ্নের মসজিদ বলে প্রতীয়মান হয়। সামগ্রিক প্রতিপাদ্য বিষয়ে সহায়ক বিধায় শাহজাদপুর মসজিদের অনন্য বৈশিষ্ট্যের মিম্বর, ছাদ ও কার্নিশের অতি স্বল্প বাঁক প্রাথমিক পর্যায়ের নির্মাণ পদ্ধতি, অলংকরণ শৈলী ও সর্বোপরি পার্শ্ব বুরুজের অনুপস্থিতি প্রণিধানযোগ্য।" আহমদ হাসান দানী ও নাজিমউদ্দীন আহমেদও শাহজাদপুর মসজিদকে পঞ্চদশ শতাব্দীর ইমারত বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে আ. ক. ম. যাকারিয়া আব্দুল ওয়ালী প্রদত্ত মখদুম শাহ দৌল্লার যে জীবনী বিবৃত করেন তাতে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "এ গল্পের যে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই এবং হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (দঃ) সমসাময়িক কোন ব্যক্তির পুত্র যে বাংলাদেশে আসেননি (ষষ্ঠ শতাব্দী) এ সম্পর্কে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। খুব সম্ভব পঞ্চদশ শতাব্দীতে গৌড়ের কোন সুলতানের অর্থানুকুল্যে এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।"

২। শাহজাদপুর, মখদুম শাহের সমাধি, পঞ্চদশ শতাব্দী

শাহজাদপুর তথা পাবনা জেলার প্রখ্যাত সাধক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন মুখদুম শাহ দৌল্লা। তিনি ধর্মপ্রচারের নিমিত্ত, অনেকের মতে ইয়েমেন, আবার অনেকের মতে বুখারা থেকে বাংলাদেশে আসেন ও ধর্মযুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। শাহজাদপুর মসজিদের দক্ষিণদিকে তাঁকে তাঁর শাহাদাত বরণকারী মুরিদদের সাথে দাফন করা হয়। বুকানন হামিলটনের মতে, ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের বহু পূর্ব থেকেই এদেশে মুসলিম সুফীসাধকগণ আগমন করেন। শাহজাদপুরে মখদুম শাহ বসতি স্থাপন করেন তবে তিনি স্বয়ং মসজিদ স্থাপন করেন কি না সঠিকভাবে বলা যায় না। কারণ তিনি হিন্দু রাজার সাথে যুদ্ধে পরাজিত হলে তাঁর মস্তক ছিন্ন করা হয়। তাঁকে মসজিদের দক্ষিণদিকে সমাহিত করা হয়। এখানে আরও অসংখ্য কবর দেখা যাবে যা 'গঞ্জে শহীদান' নামে পরিচিত। আব্দুল ওয়ালী বলেন যে, যুদ্ধে পরাস্ত হলে মখদুম শাহের ভগিনী একটি জলাশয়ে আত্মাহুতি দেন। বর্তমানে এটি 'সতী' বিবির খাল নামে পরিচিত। বর্তমানে এখানে কোনো খালের চিহ্ন পাওয়া যায় না, হয়তো ভরাট হয়ে চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে। মসজিদের পূর্বদিকে রয়েছে বিরাট সাহান এবং সাহানের উত্তর-পূর্ব কোণে অষ্টভুজাকৃতি একটি আধুনিক ইমারত দেখা যাবে। খুব সম্ভব মখদুম শাহের ওস্তাদ বিখ্যাত সাধক শামসুদ্দীন তাব্রিজীর একটি প্রতীক সমাধি হিসাবে এই ইমারতকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৩। নবগ্রাম, মসজিদ ও মাজার, ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ

পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) অধীন চাটমোহার থেকে ৩ মাইল পূর্বে নবগ্রাম বা নওগাঁতে একটি প্রাচীন মসজিদ দেখা যাবে। মসজিদটিতে একটি শিলালিপি রয়েছে। Epigraphia Indo—Islamica-তে প্রকাশিত এই শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে সুলতান নসরত শাহের আমলে হিজরী ৯৩২/ইংরেজি ১৫২৬ সনে মোবারক খানের পুত্র মিয়া আইজল খান একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। সামসুদ্দীন আহমদ বলেন, " .... the mosque in which the record has been found is in fair representation of the type of sacred building of the time of the Hussain Shahi kings. It may be said to be a replica of the renowned Eklakhi tomb at Pandua (Malda District) which served as a model for such construction in subsequent years. The sanctuary is a brick built square structure with a fluted turret at each corner and in the centre of outer walls. The facade is recessed with deep niches and shallow rectangular parts, decorated with elaborately carved bricks. The walls are curvilinear at the top which is the chief peculiarity of early Bengali structures; but the curvature is so gradual that it is scarcely discernible by untrained eyes. Each of the walls on the

north, south and east of the mosque is pierced by a couple of arched doorways by which the prayer hall can be approached. The whole construction is crowned by a single dome. The interior space from wall to wall measures about 20 feet square. The mosque is still in use but very poorly attended by praying mats." যে মসজিদে এই শিলালিপিটি পাওয়া যায় তা বাংলার হোসেনশাহী শাসনামলে মসজিদ স্থাপত্যরীতির একটি অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এটিকে মালদহের (বড়) পাণ্ডুয়ায় নির্মিত প্রখ্যাত একলাখী সমাধির হুবহু নকল বলা যায় এবং একলাখী সমাধি পরবর্তী স্থাপত্যকীর্তির জন্য একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মডেল হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মসজিদটি পোড়া ইটের বর্গাকার ইমারত যার চার কোনায় খাঁজকাটা (fluted) বুরুজ দেখা যাবে। এ ধরনের বুরুজ বাইরের দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানেও দেখা যাবে।

মসজিদের সম্মুখভাবে খিলানাকৃতির কুলুঙ্গি, আয়তাকার প্যানেল এবং পোড়ামাটির নকশা দ্বারা অলঙ্কৃত। কার্নিশ বক্রাকার যা প্রাথমিক যুগের বাংলার স্থাপত্যরীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বক্রাকার কার্নিশ ততটা গভীর ও আকর্ষণীয় নয়। উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদিক থেকে খিলানপথ দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। সমস্ত ইমারতটি একটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। অভ্যন্তরের পরিমাণ ২৪ বর্গফুট। মসজিদটি এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে তবে মুসল্লীদের সংখ্যা খুব কম হয়।"

নবগ্রাম জামে মসজিদটির নির্মাতা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, তিনি একজন সেনাপতি বা জঙ্গদার ছিলেন। সুলতান সেকান্দর শাহের রাজত্বকালে খান মিয়া মোয়াজ্জেম আইজল খান জঙ্গদার। তাঁর পিতার নাম মোবারক খান। ভূমি-নকশার দিক থেকে বিচার করলে এটিকে বারান্দাবিশিষ্ট বর্গাকার এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের স্টাইলে নির্মিত যা লোটান, রাজবিবি গোপালগঞ্জের মসজিদের সাথে তুলনা করা যায়। আ. ক. ম. যাকারিয়ার মতে, মসজিদটির পরিমাপ ৫০′ × ৩২$\frac{১}{২}$″। অভ্যন্তরীণ কক্ষ বা নামাজঘর ২৪′ বর্গফুট এবং বারান্দা ২৪′ × ১১′। দেয়ালগুলো ৫′ প্রশস্ত। মসজিদের চার কোনায় এবং বারান্দার দুই কোণে খাঁজকাটা বুরুজ দেখা যাবে। এ প্রসঙ্গে আহমদ হাসান দানী বলেন, "In its design and decoration it closely follows those of the Lattan Masjid and Gumti Gate" নকশার দিক থেকে কৌণিক বুরুজগুলো লোটান মসজিদ এবং গুমতি ফটকের অলঙ্করণের অনুকরণে নির্মিত। এ সমস্ত বুরুজে সমান্তরাল ব্যান্ড বা মৌল্ডিং রয়েছে। গোলাকার খাঁজ বুরুজগুলোকে আরও আকর্ষণীয় করেছে এবং হযরত পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদের কৌণিক বুরুজগুলোতেও একই ধরনের বুরুজ দেখা যাবে।

মসজিদের সম্মুখভাগে বিভিন্ন ধরনের আলঙ্কারিক মোটিভ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে ঝুলন্ত শিকল এবং ফুল প্রাধান্য পেয়েছে। এ ছাড়া লতাপাতা, জ্যামিতিক নকশা, ফুল প্রভৃতি খোদিত রয়েছে, যা arabesque নামে সাধারণভাবে পরিচিত। অভ্যন্তরে কিবলাপ্রাচীরে তিনটি মিহরাব দেখা যাবে, যা নামাজঘর এবং বারান্দার প্রবেশপথের

বরাবর। মসজিদের কিবলাপ্রাচীর রুচিসম্মতভাবে অলঙ্কৃত। সুলতান নসরত শাহের আমলে হোসেনশাহী স্থাপত্যের চরম বিকাশ ঘটে এবং প্রমাণস্বরূপ বিভিন্ন স্থানে নির্মিত মসজিদের উল্লেখ করতে হয়। যেমন নবগ্রাম মসজিদ নির্মাণের তিন বছর পূর্বে (১৫২৩) রাজশাহীর বাঘায় নির্মিত মসজিদ। এ ছাড়া মালদহ বড় সোনা মসজিদ, মঙ্গলকোট, দেওতলা (শাহ জালালের চিল্লাখানা) প্রভৃতি স্থানে তার স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন দেখা যাবে।

নবগ্রাম মসজিদের প্রাঙ্গণে একটি ছোট মাজার দেখা যাবে। মাজারটি ৯′৪″ লম্বা, ৬′ চওড়া এবং ৬′৩″ উঁচু। আ. ক. ম. যাকারিয়ার মতে, এই মাজারটি নির্মিত হয় হযরত আব্দুল আলী বাকী শাহ্ শরীফ জিন্দানী নামে একজন সাধকপুরুষের শবাধারের উপর।

৪। চাটমোহর, মসজিদ, ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দ

সিরাজগঞ্জ-ঈশ্বরদী রেললাইনের উত্তর পার্শ্বে বড়াল নদীর তীরে অবস্থিত চাটমোহর একটি প্রাচীন স্থান। চাটমোহর রেলস্টেশন থেকে প্রায় ১$\frac{1}{2}$ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে এবং চাটমোহরের নূতন বাজার থেকে প্রায় আধ মাইল পূর্বদিকে একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা বা জনপদ রয়েছে। এই এলাকার সর্বপ্রাচীন কীর্তি হচ্ছে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ। আয়েশা বেগম 'শিল্পকলা'; ১৯৯২, ডিসেম্বর সংখ্যায় 'চাটমোহরের শাহী মসজিদ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। মসজিদটিতে একটি শিলালিপি ছিল। আ. ক. ম. যাকারিয়া বলেন যে, এই শিলালিপিটি বর্তমানে রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। চাটমোহর মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং এর সমস্ত গম্বুজ পড়ে যায়। কেবলমাত্র পশ্চিমদিকের দেয়ালটি অক্ষত রয়েছে। মসজিদটি শাহী মসজিদ অর্থাৎ বাদশাহদের অর্থানুকূল্যে নির্মিত হয়। স্থানীয় উদ্যোগে নয়। শিলালিপিতে বর্ণিত রয়েছে আব্দুল ফাতাহ মুহম্মদ মাসুম খানের (কাবুলি) পৃষ্ঠপোষকতায় তুহী খান ইয়াকশালের পুত্র খান মুহম্মদ কর্তৃক হিজরী ৯৮৯/ইং ১৫৮১-৮২ সনে চাটমোহরে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। 'আইন-ই-আকবরী'তে এই মসজিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। মাসুম খান কাবুলি সম্রাট আকবরের আমলের একজন বিশিষ্ট সেনাপতি ছিলেন। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সুবাদার মুনিম খানের মৃত্যুর পর এবং রাজধানী গৌড় থেকে পশ্চিমে তাণ্ডায় স্থানান্তরিত হলে বাংলায় উচ্চাভিলাষী জমিদারেরা বিশেষ করে বারো ভুঁইয়া ও অন্যান্য ভূস্বামীগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মাসুম খান কাবুলি ক্ষমতা কুক্ষিগত করে আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। তিনি পাবনা জেলায় এই স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ধারণা করা হয় যে, চাটমোহরে তাঁর রাজধানী ছিল, যেখানে তিনি দুর্গ, মসজিদ, সমাধি নির্মাণ করেন।

চাটমোহর মসজিদটির ভূমি-নকশা ও ধ্বংসাবশেষ দেখলে প্রতীয়মান হবে যে, এটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার ইমারত ছিল। বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে এক আইল বিশিষ্ট তিন গম্বুজ দ্বারা আবৃত আয়তাকার অনেক মসজিদ নির্মিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বগুড়ার শেরপুরের খেরুয়া মসজিদ (১৫৮২), যা চাটমোহর

মসজিদের সমসাময়িক এবং খন্দকারতোলা মসজিদ (১৬৩২) ইত্যাদি। চাটমোহর মসজিদ প্রসঙ্গে ক্যাথারিন বি. আসের বলেন, "Unfortunately this mosque has never been studied and there is good reason to believe it is no longer extant for it is not included in the otherwise thorough Bengal List of 1896. O'Malley mentions a ruined mosque in Chatmohar but includes no description; thus it is not known if the Chatmohar Jami Mosque was constructed in a traditional Bengali mode or in the Mughal style that would have been more familiar to the rebel Masum Khan." "দুর্ভাগ্যবশত এই মসজিদটি সঠিকভাবে অনুসন্ধান করা হয়নি এবং একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, এটির কোনো অস্তিত্ব নেই, যদি থাকত তাহলে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তুতকৃত 'Bengal List of monument' গ্রন্থে এর উল্লেখ থাকত। উপরন্তু, ও'ম্যালে বেঙ্গল ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ারে চাটমোহরে অবস্থিত ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি মসজিদের উল্লেখ করলেও কোন বিবরণ দেননি। ফলে জানা যায় না যে, এই মসজিদটি চিরাচরিত বাংলার ঐতিহ্যবাহী (দোচালা/চৌচালা) রীতিতে না মুঘল স্টাইলে নির্মিত হয়েছিল।" আসের মনে করেন যে, যেহেতু মাসুম খান কাবুলি আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন সেহেতু তিনি হয়তো মুঘল স্থাপত্যরীতির স্থলে স্থানীয় চৌচালা রীতিতে মসজিদ করেছেন। কিন্তু সমসাময়িক স্থাপত্যরীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, চাটমোহরের মসজিদটি সুলতানী এবং মুঘল স্থাপত্যরীতির ক্রান্তিলগ্নে নির্মিত হয়; বরং বলা যায় যে, চাটমোহরের মসজিদটি যদিও ধ্বংসপ্রাপ্ত এটি সুলতানী থেকে মুঘল স্থাপত্যে উত্তরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এটি যে আয়তাকার এক আইলবিশিষ্ট তিন গম্বুজ দ্বারা আবৃত মসজিদ ছিল সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

চারদিকে অনুচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা প্রায় দুই বিঘা জমির উপর নির্মিত চাটমোহর মসজিদটির পরিমাপ বাইরের দিকে ৬৩′ × ৩৫′ এবং ভিতরের দিকে প্রায় ৫১′ × ২২$\frac{১}{২}$′। মুঘল আমলের পাতলা পোড়া ইটের তৈরি প্রাচীরগুলো ছিল প্রায় ৬ ফুট পুরু। মসজিদের গম্বুজগুলো পড়ে গেলেও ধারণা করা যায় যে, ভূমি থেকে এগুলো প্রায় ৪৫ ফুট উঁচুতে নির্মিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত এই মসজিদটিতে পূর্বদিক থেকে তিনটি খিলানপথ দিয়ে প্রবেশ করতে হত। প্রধান খিলানপথটি অপেক্ষাকৃত বড় ছিল। খিলানপথগুলো আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ ছিল। দেওয়ালে আয়তাকার কুলুঙ্গি খোদাইকৃত নকশা দ্বারা অলঙ্কৃত। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে খিলানপথ ছিল। চার কোনায় চারটি আটকোনাকার বুরুজ ছিল। ভগ্নাবস্থায় এই মসজিদের পারোপেট বা কার্নিশ বক্রাকার ছিল, না সমান্তরাল ছিল তা বলা দুষ্কর।

সুলতানী আমলের টেরাকোটার নকশা দেখে প্রতীয়মান হয় যে, এ ধরনের অলঙ্করণ বিলুপ্ত হয়নি। অবশ্য মুঘল আমলের অনেক ইমারতেই এ ধরনের অলঙ্করণ দেখা যাবে। যেমন টাঙ্গাইলের আতিয়া ও ময়মনসিংহের আষ্টগ্রামের মসজিদ।

অভ্যন্তরে কিবলাপ্রাচীরে তিনটি খিলানাকৃতি অবতলাকৃতি মিহরাব দেখা যাবে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি (transverse) খিলান সৃষ্টি করা হয়েছে যার সাহায্যে পেনডেনটিভের মাধ্যমে তিনটি গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। মধ্যবর্তী মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড়। এর পাশে তিন ধাপবিশিষ্ট একটি মিম্বর নির্মিত হয়েছে। রাধারমণ সাহা তাঁর 'পাবনা জেলার ইতিহাস'-এ উল্লেখ করেন যে, চাটমোহর মসজিদটি একটি হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত। কিন্তু এটি খুবই স্থূল ও অযৌক্তিক মন্তব্য। মসজিদে প্রাচীন যুগের হিন্দু, বৌদ্ধ স্তম্ভ, কষ্টিপাথর পাওয়া গেছে। যে শিললিপিটি উদ্ধার করা হয়েছে তার পিছনে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের মূর্তি ছিল বলে যাকারিয়া বলেছেন। এ ধরনের কষ্টিপাথর ছোট সোনা মসজিদেও পাওয়া গেছে। কিন্তু তাই বলে মসজিদ হিন্দু মন্দিরের উপর নির্মিত হতে পারে না, কারণ মসজিদ ও মন্দিরের ভূমি-পরিকল্পনা সম্পূর্ণ পৃথক। চাটমোহর মসজিদটি বাংলার মুঘল স্থাপত্যের প্রথম যুগের অন্যতম আকর্ষণীয় ইমারত ছিল।

বিশেষজ্ঞদের মতে চাটমোহরে মাসুম খান কাবুলি একটি দুর্গ যার বর্তমানে কোনো অস্তিত্ব নেই, নির্মাণ করেন এবং একটি বিরাট জলাশয় খনন করেন।

ফরিদপুর

২২°.৫১′ দক্ষিণ এবং ২৩°৫৫′ উত্তর-দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ৮৯°১৯′ পশ্চিম এবং ৯০°৩৭′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে ফরিদপুর জেলা অবস্থিত। এ জেলার সর্বমোট জমির পরিমাণ ২৬৯৫ বর্গমাইল। এর উত্তরে পদ্মা বা গঙ্গা নদী, পূর্বদিকে মেঘনা, পশ্চিমে গোরাই নদী এবং এর শাখা মধুমতি এবং দক্ষিণ বাকরগঞ্জ।

ফরিদপুরের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে এ জেলার মাদারিপুর অঞ্চল কোনো একসময় বিক্রমপুরের অংশ ছিল। হিউয়েন সাং কর্তৃক উল্লিখিত সমতট নামে বঙ্গরাজ্যে ফরিদপুর সন্নিবেশিত ছিল। বঙ্গ শব্দটি থেকেই পরবর্তীকালে বাংলাদেশের নামাকরণ হয়েছে। 'রঘুবংশে' বাঙালিদের নৌকায় বসবাসকারী জাতি বলা হয়েছে। এ গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে যে, তারা চণ্ডালের বংশধর এবং জনগোষ্ঠীর সিংহভাগই তারা প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে।

ফরিদপুর কোনো একসময়ে গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোটালিপাড়া বা কতওয়ালী নামক স্থানে প্রাপ্ত স্বর্ণমুদ্রায় এটি প্রমাণিত হয়। এ সময়ে সমগ্র অঞ্চল শশাঙ্কের পুত্র সমাচার দেবের শাসনাধীন ছিল। গুগরাহটী নামক স্থানে সমাচার দেবের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এ অঞ্চলটি রাজা হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর কতিপয় স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। পাল ও সেন রাজাদের শাসনামলে এ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন অঞ্চলের বিলুপ্তি ঘটে।

চতুর্দশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলসহ ফরিদপুরে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যদুবংশের নবদীক্ষিত মুসলিম নৃপতি জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ পঞ্চদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রাম বা চাটগাঁ এবং ফতেহাবাদে (আধুনিক ফরিদপুর অঞ্চল) সর্বপ্রথম মুদ্রা ছাপান। ইনামূল হক মনে করেন যে, ফরিদপুরের নামাকরণ হয়েছে প্রখ্যাত সাধক শেখ ফরিদউদদীন গঞ্জ-ই-শকরের নাম (মৃত্যু ১২৬৯ খ্রিঃ) থেকে। অপর দিকে আবদুল করিম বলেন যে, সমসাময়িক ধর্মীয় সাহিত্যে শেখ ফরিদ যে বাংলায় এসেছিলেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাহোক, শেখ ফরিদের নাম থেকে জেলার নাম যে ফরিদপুর হয়েছে তা ধরে নেওয়া যায়। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দের টোডরমলের রাজস্ব জরিপে ফরিদপুরকে

মুহাম্মদাবাদ বা ভূষণার সরকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জাহাঙ্গীরের শাসনামলে বাংলায় কতিপয় স্বাধীন রাজ্য বা অঞ্চল গড়ে ওঠে, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে। এ সমস্ত স্বশাসিত অঞ্চলগুলো বারো ভুঁইয়াদের দখলে ছিল। এই বারো ভুঁইয়াদের মধ্যে প্রতাপশালী দুই ভাই চাঁদ রায় এবং কেদার রায় রাজবাড়ি থেকে ফরিদপুরের পালঙ্গ থানার কেদারবাড়ি পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন। কেদার রায়ের নামানুসারে কেদারবাড়ির নাম হয়েছে। এখানে গভীর খাল প্রশস্ত সড়কের ভগ্নাংশে যা কাঁচকিগুরা রাস্তা নামে পরিচিত, কেদার রায় ও চাঁদ রায়ের বসতবাড়ি দুর্গ ও প্রাচীন কীর্তির স্বাক্ষর বহন করছে। রাজা সীতারাম রায় ভূষণা থানার কিলাবাড়িতে দুর্গ নির্মাণ করেন। সীতারাম রায় মুঘলবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন এবং যে স্থানে মুঘলগণ জয়লাভ করে তা ফাতেহবাদ নামে পরিচিত। বারো ভুঁইয়াদের মধ্যে পরাক্রমশালী জমিদার ঈসা খান, যিনি সমগ্র ভাটি (Bhati) বা নিম্নাঞ্চল অধিকারে করে স্বাধীনভাবে শাসন করেন ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে মুঘলদের নিকট পরাজিত হন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলায় সুবাদার ইসলাম খান সমগ্র বাংলার মুঘল অধিপত্য পুনপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁর সময় থেকে ফরিদপুর মুঘল সুবার অধীনে আসে।

১। পাথরাইল, মজলিস আওলিয়া, মসজিদ, ষোড়শ শতাব্দী

ভাঙ্গা থানাধীন পাথরাইল নামক স্থানে ষোড়শ শতাব্দীর একটি সৌন্দর্যমণ্ডিত মসজিদ নির্মিত হয়েছে। মজলিস আওলিয়া সাহেব নামক একজন ধর্মপ্রাণ পুরুষ, সাধক ও দরবেশের নাম থেকে মসজিদটির নামাকরণ হয়েছে। ৮৪´ × ৪১$\frac{১}{২}$ পরিমাপের বিশালাকার মসজিদটি আয়তাকার দশ গম্বুজবিশিষ্ট ইমারত যার সাথে রাজশাহীর বাঘা মসজিদের সাদৃশ্য রয়েছে। মসজিদটির পূর্বসূরি হিসাবে হুগলীর ত্রিবেণীতে নির্মিত জাফর খান গাজীর মসজিদ এবং ঢাকার রামপালের বাবা আদমের মসজিদের উল্লেখ করা যায়। চারকোনায় অষ্টভুজাকৃতি বুরুজ বা টাওয়ার রয়েছে এবং সুলতানী আমলের অন্যতম স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য বক্রাকার কার্নিশ দেখা যাবে। আহমদ হাসান দানী বলেন, "এই মসজিদে পাঁচটি খিলানপথ রয়েছে এবং সম্মুখভাগ সুরুচিপূর্ণভাবে প্যানেল নকশা দ্বারা অলঙ্কৃত। বক্রাকার কার্নিশ এবং প্যারাপেট খুবই সুস্পষ্ট।" খাঁজকাটা খিলান পথগুলো আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ। ছাদে দু'টি প্যারাপেট ও মোল্ডিং দেখা যাবে।

অভ্যন্তরে মজলিস আওলিয়া মসজিদটি ইটের তৈরি চারটি স্তম্ভ দ্বারা দু'টি আইলে বিভক্ত। এ সমস্ত স্তম্ভের সাহায্যে অভ্যন্তরে দশটি বর্গকার এলাকার সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এর প্রতিটির উপর একটি করে গম্বুজ নির্মিত হয়েছে, যা বহু পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। ড্রামবিহীন এ সমস্ত গম্বুজ অর্ধগোলাকার এবং চূড়ায় কলস দেখা যাবে। ছাদে সর্বমোট দশটি গম্বুজ থাকায় এটি সুলতানী আমলের আয়তাকার দশ গম্বুজ টাইপের অন্তর্গত। কিবলাপ্রাচীরে পাঁচটি অবতলাকৃতি মিহবার রয়েছে যা পূর্বদিকে খিলানপথের বরাবর। মিহরাবগুলো পোড়ামাটির নকশা দ্বারা অলঙ্কৃত এবং আয়তাকার। ফ্রেমে আবদ্ধ। গম্বুজগুলো স্কুইঞ্চের সাহায্যে নির্মিত। উত্তর ও দক্ষিণদিকে কৌণিক খিলানপথ রয়েছে।

আহমদ হাসান দানী বলেন, "The richness of its embellishment with conventionalised designs places it in the Hussain Shahi period" বঙ্গানুবাদ : "চিরাচরিত নকশার অলঙ্করণের সৌকর্য এটিকে হোসেনশাহী আমলের ইমারত বলে প্রমাণিত করে।"

২। পাথরাইল, মজলিস আওলিয়ার সমাধি, ষোড়শ শতাব্দী (৫২)

পাথরাইলে ১৫০০′ × ১০০০′ ফুট পরিমাপের উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত একটি বিশাল জলাশয় রয়েছে। এই জলাশয়ের পশ্চিম পাড়ে ইটের তৈরি একটি শবাধার রয়েছে। স্থানীয় লোকেরা এটিকে প্রখ্যাত পীর মজলিস আওলিয়ার মাজার বলে থাকে। এই মশহুর দরবেশের প্রকৃত নাম মজলিস আবদুল্লাহ খান। সমগ্র এলাকাটি জুড়ে অসংখ্য মাজার রয়েছে। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, কোনো একসময়ে এ অঞ্চলটি ঘনবসতিপূর্ণ ছিল। মসজিদসংলগ্ন এ মাজারটি ষোড়শ শতাব্দীর বলে প্রতীয়মান হয়।

৩। পাথরাইল, ফতেহ শাহের সমাধি,পঞ্চদশ-ষষ্ঠদশ শতাব্দী (অধুনালুপ্ত)

মজলিস আওলিয়া মসজিদের সন্নিকটে ফতেহ শাহের মাজার দেখা যাবে। এটি বহু পূর্বে বিনষ্ট হয়েছে। বর্তমান ইটের স্তূপ ও ঢিপি রয়েছে। বিখ্যাত সাধক ফতেহ শাহ সম্ভবত ফতেহাবাদ অঞ্চলটি জয় করেন এবং তাঁর নামানুসারে এলাকাটি ফতেহাবাদ নামে পরিচিত। তাঁর প্রকৃত নাম আমীন জৈনুদ্দীন ফতেহ শাহ। হাবিবা খাতুন বলেন যে, সন্নিকটে ১২ বর্গ ফুটে একটি মসজিদ ছিল, যা বহু পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বাগেরহাটের খান জাহানের মতো ফতেহ শাহ এ অঞ্চলের সাধক-যোদ্ধা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলার প্রত্যান্ত অঞ্চলে এ ধরনের ধর্মীয় কার্যকলাপ দেখা যাবে এবং যে সমস্ত সাধকপুরুষ এদেশে এসে ধর্মপ্রচার করেন, স্থানীয় হিন্দু জমিদারের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং বসতি স্থাপন করেন তাঁদের অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে; যেমন সিলেটের শাহ জালাল, পাবনার শাহ মুখদুম, রামপালের বাবা আদম এবং বাগেরহাটের খান জাহান। পাথরাইলে ফতেহ শাহ সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আসেন এবং সেখানেই ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। আবশ্য তাঁর সমাধির নির্মাণকাল সঠিকভাবে বলা যাবে না। তবে ধারণা করা যায় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাব্দে অথবা ষষ্ঠদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এ মাজারটি নির্মিত হয়।

৪। আজিমনগর, পাথরাইলের নিকটবর্তী, ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে

বাংলাদেশে সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মকর্তা মোঃ আবুল হাশেম মিয়া ফরিদপুরে পাথরাইলে নিকট আজিমনগরে নির্মিত একটি মসজিদ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দেন। 'ইতিহাস' পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধে তিনি বলেন যে মসজিদ আওলিয়া মসজিদের তিন মাইল পশ্চিমে আজিমনগরে আয়তাকারবিশিষ্ট একটি মসজিদ রয়েছে। উত্তর-দক্ষিণে ২২ এবং পূর্ব পশ্চিমে ১১′-৯″ পরিমাপের এই মসজিদটির উচ্চতা ১৪ ফুট এবং প্রাচীরের প্রশস্ততা ২-৪″। মসজিদটির চার কোনায় চারটি গোলাকার বুরুজ দেখা যাবে। যার উপরে কুপোলা বা নিরেট ক্ষুদ্রাকার গম্বুজ রয়েছে। বুরুজগুলো নিচ থেকে উপরের দিকে সরু হয়ে গেছে। মসজিদটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে,

এটি অভ্যন্তরে তিন অংশে বিভক্ত এবং মধ্যভাগে একটি গম্বুজ ও দুই পাশে দু'টি গোলাকার ভল্ট দ্বারা আবৃত। গম্বুজটি পেনডেনটিভের সাহায্যে নির্মিত এবং ড্রামের উপর স্থাপিত। বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে ভল্টের ব্যবহার খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ যা সচরাচর দেখা যায় না। হযরত পাণ্ডুয়ায় সেকেন্দর শাহ্ কর্তৃক নির্মিত আদিনা মসজিদে (চতুর্দশ শতাব্দী) এবং গৌড়ের গুণমন্ত মসজিদে (পঞ্চদশ শতাব্দী) ভল্টের ব্যবহার দেখা যায়।

আজিমনগরের মসজিদটির পূর্বদিকে তিনটি খিলানপথ দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। মধ্যবর্তী খিলানপথটি অপেক্ষাকৃত বড়। পাশের প্রবেশপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খিলান চার কেন্দ্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রধান প্রবেশপথের উভয় পাশে দুটি করে খিলানসম্বলিত কুলুঙ্গি দেখা যাবে। উত্তর ও দক্ষিণদিকে দুটি করে খিলানপথ রয়েছে। মধ্যবর্তী খিলানপথের উপরে একটি শিলালিপি গাঁথা আছে। ফার্সি ভাষায় উৎকীর্ণ এই শিলালিপিটিতে তারিখ রয়েছে হিঃ ১২১৬/ইং ১৮৯১। সম্মুখভাগে অসংখ্য টারেট রয়েছে এবং কার্নিশটি বক্রাকার নয়, সমান্তরাল। কিবলা-প্রাচীরে একটি মিহরাব দেখা যাবে। মসজিদের পশ্চিমদিকে একটি বর্গাকার এক গম্বুজবিশিষ্ট ইমারতের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, সম্ভবত এটি ছিল হুজরাখানা।

৫। দাসর, সাঈদ নিহভানের সমাধি, সপ্তদশ শতাব্দী।

কালকিনী থানাধীন দাসর নামক স্থানে সাঈদ নিহভান নামে একজন সাধক-পুরুষের আস্তানা ছিল। তিনি একজন স্থানীয় মশহুর পীর ছিলেন। জনপ্রবাদ অনুযায়ী তিনি আরব দেশ থেকে এদেশে ধর্মপ্রচারে আসেন। এখানে তাঁর জীবন কাটে ধর্ম-কর্মে ও ধর্মপ্রচারে। তাঁর মাজারের কোন সঠিক তারিখ জানা যায় না। তবে সম্ভবত তাঁর মাজারটি সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত। জনশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা ছিল এবং তিনি কখনো কখনো বাঘের পিঠে চড়ে যেতেন।

৬। ফতেহগঞ্জপুর, মানসিংহের ফটক, সপ্তদশ শতাব্দী

মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মানসিংহ বাংলাদেশে সমরাভিযানে আসেন এবং এখানে সুবাদার নিযুক্ত হয়ে বারো ভুঁইয়াদের দমনে ব্যস্ত থাকেন। ১৫৮৯ থেকে ১৬০৬ পর্যন্ত সময়কালে মানসিংহ সুবাদার ছিলেন। ফরিদপুর জেলার ফতেহগঞ্জে তিনি বারো ভুঁইয়াদের অন্যতম কেদার রায়কে পরাজিত করেন এবং এ কারণে এ স্থানের নাম হয় ফাতেহগঞ্জ পুর। বিজয়ের স্মারক হিসাবে মানসিংহ এখানে একটি অনিন্দ্যসুন্দর ফটক নির্মান করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত এই ফটকটি ভগ্নপ্রাপ্ত।

৭। গাট্টি বা গিরদা, শাহ্ আলী বাগদাদীর চিল্লাখানা, ষোড়শ শতাব্দী

ঢাকার মিরপুরে শায়িত প্রখ্যাত দরবেশ শাহ্ আলী বাগদাদী বাগদাদ থেকে বাংলাদেশে এসে প্রথমে ফরিদপুরের গিরদা বা বাগান নামক স্থানে আস্তানা স্থাপন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি এখান থেকে ঢাকায় বসবাস শুরু করেন। গাট্টি বা বাগান নামে এ চিল্লাখানাটি ষোড়শ শতাব্দীর, কারণ তিনি সম্ভবত ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন।

৮। মাদারীপুর, শাহ মাদারের সমাধি, সপ্তদশ শতাব্দী

ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমায় (বর্তমানে জেলা) শাহ মাদার নামে একজন সাধকপুরুষের সমাধি দেখা যাবে। ধারণা করা হয় যে, এই দরবেশের নাম থেকে মাদারীপুরের নামাকরণ হয়েছে।

এম. এম. হক তাঁর একটি নিবন্ধে শাহ মাদারকে মাদারী নামীয় একটি সুফীগোষ্ঠীয় প্রবর্তক বলেছেন। তিনি বলেন যে, শাহ মাদার মক্কার কুরাইশ বংশের সদস্য ছিলেন এবং সুদূর আরবদেশ থেকে বাংলাদেশে ধর্মপ্রচারের জন্য আসেন। তিনি ভারতবর্ষের গুজরাট, আজমীর, কনৌজ, কল্পী, জৌনপুর, লক্ষ্ণৌ, কানপুর এবং মানকপুর হয়ে অবশেষে বাংলাদেশে আসেন। এ সমস্ত অঞ্চলে ভ্রমণকালে তিনি বহু ফকির দরবেশ সুফীসাধকদের সংস্পর্শে আসেন এবং বাংলায় এসে 'মাদারী' নামে একটি স্বতন্ত্র সুফী সিলসিলা প্রতিষ্ঠা করেন। মুহম্মদ ইনামুল হকও মন্তব্য করেন যে, শাহ মাদারের নামের সাথে মাদারীপুর নাম জড়িত। এম. এম. হকের মতে, 'মাদারী' সুফীগোষ্ঠী পঞ্চদশ এবং সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

মাদারীগোষ্ঠীর প্রভাব সুদূর চট্টগ্রামে প্রসারিত হয়। চট্টগ্রাম শহরের ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মাদারী টোলা নামে একটি লোকালয় আছে। পর্তুগীজ পর্যটক জ্যোয়া দ্যা বারস চট্টগ্রামের শাসকদের 'মাদারীজীস' বলে অভিহিত করেন। ধারণা করা হয় যে, গৌড় সুলতান মাহমুদ শাহের আমলে (১৪৪২-১৪৫৯ খ্রিঃ) মাদারীগণ প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। শাহ মাদারের নামানুসারে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কতিপয় স্থান রয়েছে, যেমন কুতবদিয়ার 'মাদারবাড়ি', চট্টগ্রাম শহরের মাদারশাহ।

৯। সাতৈর, মসজিদ, সপ্তদশ শতাব্দী

বাংলার মসজিদস্থাপত্যের ইতিহাসে যে সমস্ত ইমারত সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় তার মধ্যে এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার এবং তিনি গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদের সংখ্যা সর্বাধিক কিন্তু বৈপরিত্য সৃষ্টির জন্য স্থাপতিগণ তিন আইলবিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, যা নয়টি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। যদিও এর সংখ্যা খুবই কম তবুও স্থাপত্যরীতি ও অলঙ্করণের দিক থেকে নয় গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার মসজিদ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সর্বমোট চারটি নয়গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ নির্মিত হয়েছে যথা-বাগেরহাট, মসজিদখুড়, কসবা এবং সাতৈর। হুসনে জাহান লীনা নয় গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের উপর লিখিত একটি প্রবন্ধে সঠিকভাবে বলেছেন যে, মোটামুটিভাবে এগুলোর স্থাপত্যরীতি ও অলঙ্করণ পদ্ধতি একরূপ।

রাজবাড়ির ১৮ মাইল পশ্চিমে সাতৈর নামের একটি গ্রামে নয় গম্বুজবিশিষ্ট যে মসজিদটি রয়েছে তার পরিমাপ ৬১'-৬" প্রতি বাহুতে। বর্গাকার এই মসজিদটির দেয়াল আট ফুট প্রশস্ত। বাইরের চার কোনায় চারটি বুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলো নিচে থেকে উপরের দিকে সরু হয়ে গেছে, অর্থাৎ ঢালু। সাতৈর মসজিদের বুরুজগুলো আট ভুজাকৃতি। পূর্বদিকে তিনটি খিলানপথ দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। এ ছাড়া উত্তর

ও দক্ষিণদিকে তিনটি খিলানপথ রয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে সাতৈর মসজিদটি শুধু নয় গম্বুজবিশিষ্ট নয়, নয় দরজাবিশিষ্টও বটে। বাইরের দেয়ালে পোড়ামাটির নকশা দেখা যাবে এবং বক্রাকার কার্নিশ শোভা পাচ্ছে। অভ্যন্তরে চারটি পাথরের অসংলগ্ন স্তম্ভ স্থাপিত হয়েছে, যা নামাজঘরকে তিন ভাগে ভাগ করেছে। দেয়াল এবং স্তম্ভের উপর থেকে পেনডেনটিভের সাহায্যে তিনসারি খিলান নির্মিত হয়েছে। অভ্যন্তরে সৃষ্ট নয়টি বর্গাকার এলাকার উপর নয়টি গোলাকৃতি ক্ষুদ্রাকার গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। সুলতানী আমলের স্থাপত্যিক রীতি অনুযায়ী এ সমস্ত গম্বুজে কোনো ড্রাম নেই। গম্বুজের কলসচূড়া পদ্ম জাতীয় ভিত থেকে উঠে গেছে। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অর্ধগোলাকার অবতলাকৃতি মিহরাব রয়েছে; মধ্যবর্তী মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড়। কেন্দ্রীয় মিহরাবের বাইরের দেয়াল উদ্গাত বা Projection দেখা যাবে। মিহরাবগুলো আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ এবং খিলানগুলো নকশাকৃত। সাতৈর মসজিদটি পঞ্চদশ শতাব্দীর ইমারত হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

বগুড়া

২৪°৩২ দক্ষিণ এবং ২৫°১৯ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮°৫২ পশ্চিম এবং ৮৯°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যবর্তী স্থানে বগুড়া অবস্থিত। রাজশাহী বিভাগে অবস্থিত বগুড়া জেলার আয়তন ১৫০২ বর্গমাইল এবং পশ্চিমে রাজশাহী ও দিনাজপুর জেলার দক্ষিণে পাবনা ও রাজশাহী, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদী এবং উত্তরে রংপুর ও দিনাজপুর। সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের পুত্র নাসিরউদ্দীন বখরা খানের নামানুসারে এ জেলার নামকরণ হয়েছে। তিনি ১২৭৯ থেকে ১২৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়ায় উল্লেখ আছে, "এ জেলা সম্বন্ধে খুব কমই জানা যায়। কোনো এক সময় করতোয়া নদী প্রাচীন কামরূপ এবং পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধনের সীমারেখা নির্ধারণ করত। পুণ্ড্র পোদদের রাজ্য ছিল এবং এর রাজধানী ছিল মহাস্থান। নবম শতাব্দীতে পালবংশ রাজত্ব করত কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে হিন্দু সেনরাজারা তাদের উৎখাত করেন। এই হিন্দুরাজ্য বা প্রাচীন পুণ্ড্রদেশকে বরেন্দ্র নামে অভিহিত করত।"

স্থানীয় কিংবদন্তি অনুযায়ী বগুড়াকে বিরাট রাজার দেশ হিসাবে বলা হত। মনে করা হয়ে থাকে যে, পাণ্ডবদের পাঁচ ভাই এখানে বহু দিন আত্মগোপন করে ছিলেন। অপর একটি কিংবদন্তি অনুযায়ী বগুড়ার ছিল রাজা বিরাটের গোশালা বা দক্ষিণা গো-গৃহ। ওয়েস্টম্যাকট যথার্থই বলেন যে, বগুড়ায় বৌদ্ধ যুগের বহু নিদর্শন পাওনা গেছে। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং ৬৩০-৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে এদেশে আগমন করে বৌদ্ধ সংস্কৃতির উল্লেখ করেন। চীনা পর্যটক পুণ্ড্রবর্দ্ধন সম্বন্ধে যে বিবরণ দেন তা বগুড়ার পার্শ্ববর্তী রাজ্যকেই ইঙ্গিত করে, যার রাজধানী ছিল মহাস্থান।

১। শাহ সুলতান মাহি সাওয়ারের মাজার, ষষ্ঠদশ-সপ্তদশ শতাব্দী

বুকানন হ্যামিলটন উল্লেখ করেন যে মহাস্থানের বিশাল প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের চূড়ায় একজন সাধকপুরুষের মাজার রয়েছে। এই সাধকপুরুষ শাহ সুলতান মাহি সাওয়ার নামে পরিচিত। মনে করা হয় যে, তিনি বলখের কোনো সুলতানের পুত্র ছিলেন এবং কিছুকাল শাসনকার্য পরিচালনার পর সংসার ত্যাগ করে ধর্মপ্রচারে বের হন। প্রথমে

তিনি দামেস্কের শেখ তৌফিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে পূর্বদিকে আগমন করে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি সম্ভবত জলপথে এদেশে প্রবেশ করেন। সন্দীপ এবং হরিরামনগর হয়ে মাহি সাওয়ার বগুড়ার মহাস্থানে এসে বাসস্থান স্থাপন করেন। মাহি সাওয়ার অর্থ মাছের পৃষ্ঠে আরোহণকারী এবং কিংবদন্তি অনুযায়ী তিনি মাছের পিঠে আরোহণ করে বাংলাদেশে আসেন। হরিরামনগরে এসে তিনি সেখানকার হিন্দুরাজা কালীর উপাসক বলবানকে হত্যা করেন এবং তাঁর একজন মন্ত্রীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। মহাস্থানে তিনি স্থানীয় রাজা পরশুরাম ও তাঁর ভগ্নী শিলাদেবীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এই সংঘর্ষে রাজা নিহত হন এবং তাঁর ভগ্নী করতোয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। যে স্থানে এ ঘটনা ঘটে তা শিলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত।

শাহ্ সুলতান মাহি সাওয়ারের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে আবদুল করীম বলেন যে, তাঁর সঠিক পরিচয় নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি আরবদেশে ইসলামপ্রচারে আগত সাধকদের মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছেন। মহাস্থান গড়ের সুরক্ষিত এলাকার উত্তরে শাহ সুলতান মাহি সাওয়ারের মাজার রয়েছে। ছাদবিহীন এই মাজারটিতে পাথরে নির্মিত একটি প্রবেশপথ রয়েছে এবং পাথরটি যে প্রাক-ইসলামি যুগের তাতে সন্দেহ নেই। কারণ এতে 'শ্রী নরসিংহদাসস্য' শব্দটি উৎকীর্ণ রয়েছে। অবশ্য এটি বাংলার সপ্তদশ শতাব্দীর হরফে লেখা। পি. সি. সেন বলেন যে, মাজার সংলগ্ন সাদা চুনকাম করা একটি বেদী বা প্লাটফর্ম রয়েছে। যেখানে সাধকপুরুষ নামাজ পড়তেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ মুহাম্মদ তাহির, সৈয়দ আবদুর রহমান এবং সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাকে একটি সনদের মারফত মাজারসংলগ্ন লাখেরাজ সম্পত্তি দান করেন যাতে মাজারটি সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়। এই সনদে আওরঙ্গজেবের পালিত ভাই মুজাফফর জঙ্গ বাহাদুরের সীলমোহর রয়েছে।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পরিচালক নাজিমউদ্দীন আহমেদ তাঁর 'মহাস্থান' শীর্ষক গ্রন্থে শাহ সুলতান মাহি সাওয়ারের মাজারের বিস্তারিত বিবরণ দেন। তিনি বলেন যে, "মহাস্থান দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি ঢিপিতে ধাপবিশিষ্ট মাজার রয়েছে এবং এর উচ্চতা ভূমি থেকে ২৫ ফুট। এই মাজারের সংলগ্ন একটি মসজিদ ও প্রবেশপথ রয়েছে। মুসলিম আমলে উঁচু মাজারে যাওয়ার জন্য দীর্ঘ সিঁড়ি নির্মিত হয়। মাজারের চারিপাশে অসংখ্য কবর দেখা যাবে।" আহমদ হাসান দানী বলেন, করতোয়া নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত পুণ্ড্র নগর নামক একটি প্রাচীন স্থানে মাহি সাওয়ার বসতি স্থাপন করেন। তিন ধাপবিশিষ্ট এই মাজারটি মূলত একটি শবাধার, যার উপরভাগ নৌকার তলার মতো দেখতে (Keel-top)

শাহ সুলতান মাহি সাওয়ারের দরগা কমপ্লেক্স-এ অন্যতম আকর্ষণীয় এর ফটক। পরিমাপ এই ফটকটির ১২'-৭" × ৪'-৫" উচ্চতা। যদিও ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার কানিংহাম বর্ণনা দেন যে, মাহী সাওয়ারের মাজারটি এক গম্বুজবিশিষ্ট চতুষ্কোণাকার ইমারত কিন্তু আসলে সোনারগাঁয়ের মোগরাপাড়ায় অবস্থিত সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের শবাধারের মতো একটি কবর মাত্র।

২। ফারুখ শিয়ারের মসজিদ, ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দ (৫৩)

শাহ্ সুলতান মাহি সাওয়ারের দক্ষিণদিকে এক গম্বুজবিশিষ্ট একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। শিলালিপি অনুযায়ী এটি ফারুখশিয়ার কর্তৃক ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। পরিমাপে ২৩′ ৩″ বর্গাকৃতি এই ইমারতটির চার কোনায় চারটি সরু টাওয়ার রয়েছে। টাওয়ারগুলো আটকোনাকৃতি। পূর্ব-উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। কোনার টাওয়ার ছাড়াও মিহরাব-প্রাচীরে দু'টি সরু টারেট ও প্যারাপেট দেখা যাবে। মসজিদটিতে ড্রামের ওপর বাল্বের আকৃতিতে একটি গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। গম্বুজের চূড়া কলসাকৃতি যা গোলাপ ফুলের পাতাসম্বলিত ক্ষেত্র থেকে উঠে গেছে। অভ্যন্তরে কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব রয়েছে। মুঘল আমলে নির্মিত এই মসজিদটি খুবই আকর্ষণীয়।

৩। মানকালীর কুণ্ডু, মসজিদ, সপ্তদশ শতাব্দী

১৯৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দে মহাস্থানের মানকালীর কুণ্ডুতে খননের ফলে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। নিম্নস্তরে নর্দান ব্লাক পলিশের (N.B.P.) মৃৎপাত্র পাওয়া যায় এবং উপরের স্তরে প্রাক-মুঘল যুগের একটি মসজিদের ভিত্তি উন্মোচিত হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এখানে ৮৬′ ৬″ × ৫২′ পরিমাপের একটি আয়তাকার মসজিদের ধ্বংসস্তূপ পাওয়া গেছে। উত্তর-দক্ষিণে প্রশস্ত প্রাচীরের চওড়া ছিল ৪′ ১″ থেকে ৫′। ভূমি-নকশা দেখে প্রতীয়মান হয় যে, এ মসজিদটি অভ্যন্তরে তিনটি আইল এবং পাঁচটি 'বে' দ্বারা মোট পনেরোটি চতুষ্কোণাকার এলাকায় বিভক্ত ছিল এবং প্রতিটির ওপর একটি করে গম্বুজ ছিল অর্থাৎ সর্বমোট পনেরোটি গম্বুজ ছিল। সম্ভবত পঞ্চদশ অথবা ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে নির্মিত এই মসজিদের ভূমি-নকশার সাথে পাবনার শাহজাদপুরের পনেরো গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের সাদৃশ্য রয়েছে। অভ্যন্তরে কিবলা-প্রাচীরে পাঁচটি অবতলাকৃতি মিহরাব ছিল। মধ্যবর্তী মিহরাবটি ছিল অপেক্ষাকৃত বড়। অসাধারণ এই মিহরাবগুলো শোভা বৃদ্ধি করে।

মানকালীর মসজিদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, মহাস্থানের মতো বাংলাদেশের সর্বপ্রাচীন বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে মুসলিম ইমারত নির্মাণ। এতে প্রতীয়মান হয় যে, বহু পূর্ব থেকেই এখানে মুসলমানদের বসবাস ছিল। এ মসজিদের প্রবেশের জন্য পাঁচটি খিলানসম্বলিত পথ ছিল পূর্বদিকে। এখানে কেন্দ্রীয় মিহরাবের উত্তরদিকে ৫′-১০″ × ৫′-৩″ পরিমাপের একটি মিম্বার পাওয়া গেছে। এ মিম্বারে উঠতে হলে কয়েক ধাপবিশিষ্ট সিঁড়ি ব্যবহার করতে হত। এ মসজিদের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এটিতে সম্ভবত মাকসুরা বা শাসকদের নামাজ পড়ার জন্য ঘেরা একটি নির্দিষ্ট স্থান দেখা যাবে। উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া প্রথম দামেস্কের মাকসুরা নির্মাণ করেন।

শেরপুর

করতোয়া নদীর পশ্চিম পাড়ে বগুড়া শহরের ১৬ মাইল দক্ষিণে শেরপুর শহর অবস্থিত। আবুল ফজল তাঁর "আইন-ই আকবরী'তে শেরপুরকে 'শেরপুর মৌর্চা' বলে অভিহিত করেছেন। এর কারণ এই যে মুর্শিদাবাদ শেরপুর দাক্ষানীয়া নামে অপর একটি

শহর আছে। এ দুটি শহরের মধ্যে পার্থক্য করার জন্যই বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়। সাধারণত মনে করা হয়ে থাকে যে শের শাহের নাম থেকে শেরপুর নামকরণ হয়েছে। শের শাহ স্বয়ং অথবা তাঁর কোনো সেনাপতি শহরটি স্থাপন করেন। মৌর্চা একটি ফার্সি শব্দ এবং এতে প্রতীয়মান হয় যে শেরপুর কোনো সীমান্তবর্তী শহর ছিল।

শেরপুরের খেরুয়া মসজিদে সংরক্ষিত হিঃ ৯৮৯/ ইং ১৫৮২ শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ইয়াকশাল নামের একটি গোষ্ঠী বা পরিবার শেরপুরে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে শেরপুর বিদ্রোহীদের একটি কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়, যারা মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। মুঘল শাসনামলে এ অঞ্চলটি মুঘল সামরিক অভিযানের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে প্রথম গভর্নর মুনিম খান তাণ্ডা থেকে রাজধানী গৌড়ে স্থানান্তরীত করেন ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে। মুনিম খান তাণ্ডায় মহামারীর সময় মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে বাংলার রাজধানী তাণ্ডা থেকে রাজমহলে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এর নামকরণ হয় আকবরনগর। রাজমহল থেকে রাজা মানসিংহ সৈন্যসামন্ত নিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য বগুড়ার শেরপুরে আসেন। তিনি এখানে যুবরাজ সেলিমের নামানুসারে সেলিমনগর নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন।

শেরপুরের প্রাচীন কীর্তি মুঘল আমলে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বলে ধারণা করা হয়। এ সময়ে এখানে দুর্গ ও মসজিদ নির্মিত হয়। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজ গভর্নর ভ্যান ডেন ব্রুক তাঁর মানচিত্রে শেরপুরকে "শেরপুর মিরট' (Ceer Poor Mirts) বা মৌর্চা বলে অভিহিত করেন। সি. জে. ও ডনেলের ভাষায়, শেরপুরে অসংখ্য ইটের নির্মিত ঘরবাড়ি দেখা যাবে যার মধ্যে তুরখান শহীদের দরগা বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। হিন্দু রাজা বল্লাল সেনের (?) সাথে যুদ্ধে গাজী তুরখান শহীদ হন। যে স্থানে তাঁর মাথা কাটা যায় সে স্থানটি 'শির মাকান' এবং যে স্থানে তাঁর দেহ সমাহিত সেটি 'ধড় মাকান' নামে পরিচিত। শেরপুর থেকে একটি সড়ক দক্ষিণদিকে চলে গেছে। এ সড়কটি রানী ভবানীর মন্দির পর্যন্ত সম্প্রসারিত, যে মন্দিরটি নাটোরের রানী ভবানী কর্তৃক নির্মিত। অপর একটি উঁচু সড়ক মন্দির থেকে পশ্চিমদিকে রাজশাহীর চৌগা নামক স্থান পর্যন্ত গেছে। এ সড়কটি একজন স্থানীয় জমিদার কর্তৃক নির্মিত।

৪। মাটির দুর্গ, ষোড়শ শতাব্দী (ধ্বংসপ্রাপ্ত)

শেরপুরে মানসিংহ কর্তৃক নির্মিত দুর্গটি বহু পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। মাটির নির্মিত এ দুর্গটি করতোয়া নদীর তীরে নির্মিত হয় এবং এখান থেকে মানসিংহ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। বর্তমানে এখানে বিক্ষিপ্তভাবে ইট, খোলা, মৃৎপাত্রের অংশবিশেষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

৫। খেরুয়া, মসজিদ, ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে (৫৪)

শেরপুর শহরের এক মাইল দক্ষিণে খেরুয়া নামে একটি লোকালয় রয়েছে। এখানে শেরপুরে সর্বপ্রাচীন মসজিদ নির্মিত হয়েছে। শিলালিপি অনুযায়ী জওহর আলী খান ইয়াকশালের পুত্র মির্জা মুরাদ খান হিঃ ৯৮৯/ইং ১৫৮২ সনে একটি মসজিদ নির্মাণ

করেন। ৫৪′ × ২৪–৬″ পরিমাপের খেরুয়া মসজিদটি আয়তাকার এবং তিন গম্বুজ-বিশিষ্ট। এ ধরনের মসজিদ মুঘল আমলে বিশেষ করে শায়েস্তা খানের শাসনকালে ঢাকায় নির্মিত হয়।

খেরুয়া মসজিদটি খুবই আকর্ষণীয়। এর চার কোনায় চারটি অষ্টভুজাকৃতি টাওয়ার রয়েছে, যা ইমারতকে মজবুত করেছে। স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে টাওয়ারগুলো মলদার হযরত পাণ্ডুয়ার একলাখী সমাধির টাওয়ারগুলোর অনুকরণ বলে মনে হয়। বাইরের প্রাচীরে অলঙ্করণ দেখা যায় না, যদিও অসংখ্য প্যানেল ব্যবহার করে বৈপরিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। পূর্বদিক থেকে তিনটি খিলানপথ দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। ফার্সি ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপিটি মধ্যবর্তী প্রবেশপথের উপরে রয়েছে। প্রবেশপথগুলো আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ। খেরুয়া মসজিদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বক্রাকার কার্নিশ। বাংলাদেশের মতো গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়ায় ক্রমাগত বৃষ্টিপাত হতে থাকে এবং এর ফলে বৃষ্টির পানি যাতে ছাদে জমে থাকতে না পারে সেজন্য ছাদ বক্রাকার করা হয়। এ ধরনের বক্রাকার কার্নিশ প্রাক-মুঘল যুগের হযরত পাণ্ডুয়ায় নির্মিত একলাখী সমাধিতে প্রথম দেখা যাবে। পরবর্তীকালে প্রায় সমস্ত সুলতানী ইমারতে এর ব্যবহার বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে, বিশেষ করে বাগেরহাটের খান জাহানী ইমারতসমূহে। অবশ্য টাঙ্গাইলে আতিয়া মসজিদ এবং ময়মনসিংহের অষ্টগ্রামের মসজিদে বক্রাকার কার্নিশের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

খেরুয়া মসজিদটিতে একটিমাত্র আইল রয়েছে এবং এটি তিনটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। পূর্বদিকের তিনটি প্রবেশপথ ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি দরজা রয়েছে। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব নির্মিত হয়েছে। পশ্চিমদিকের প্রাচীরটি উদ্ধত। গম্বুজ নির্মাণে পেনডেনটিভ বা ছোট ছোট ইট দিয়ে সৃষ্ট ত্রিকোণ সৃষ্টি করা হয়েছে প্রতি কোনায়। খেরুয়া মসজিদটি মুঘল আমলের এক আইলবিশিষ্ট তিন গম্বুজ মসজিদের একটি মডেল হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, যা সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল আমলে বহুল প্রয়োগ দেখা যাবে। খেরুয়া মসজিদের অপর শিলালিপি করাচি জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

৬। বিবির মসজিদ, ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দ

শেরপুরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে খোন্দকারতোলা ও বিবির মসজিদ। খোন্দকারতোলা মসজিদের দক্ষিণে অবস্থিত বিবির মসজিদ মুঘল আমলে নির্মিত। কিংবদন্তি অনুযায়ী রাজা বলরামের কন্যা গাজী শাহ মাদারের অনুরক্ত হয়ে পড়েন কিন্তু রাজা বিবাহে সম্মতি না দেওয়ায় তাঁর কন্যা চিরকুমারী থেকে যান এবং বিবি নামে অভিহিত হন। শাহ মাদারও চিরকুমার থেকে যান।

বিবির মসজিদটি এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকৃতি ইমারত এবং প্রাক-মুঘল এবং মুঘল আমলে এ ধরনের বহু ইমারত নির্মিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রাক-মুঘল যুগে নির্মিত দিনাজপুরের গোপালগঞ্জের মসজিদের কথা বলা যায়। ২২ ফুট পরিমাপের বিবির মসজিদটি ক্ষুদ্রাকৃতি হলেও এর স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। চার

কোনায় চারটি কৌণিক টাওয়ার অষ্টভুজাকৃতি। মসজিদে পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে খিলানপ্রবেশপথ দিয়ে অভ্যন্তরে যেতে হয়। পশ্চিমদিকে তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব রয়েছে। গম্বুজটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও পরবর্তীকালে পুনঃনির্মিত হয়েছে। গম্বুজ নির্মাণে পেনডেনটিভের ব্যবহার দেখা যায়। মসজিদটিতে বক্রাকার কার্নিশ রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে শেরপুরের বিবির মসজিদের সাথে ঢাকায় মোহাম্মদপুরে নির্মির আল্লাহকুরী মসজিদের সাদৃশ্য রয়েছে। শিলালিপি অনুযায়ী বিবির মসজিদটি হিঃ ১০৩৮/ইং ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানের শাসনকালে সৈয়দ আলী মোতওয়াল্লী কর্তৃক নির্মিত হয়।

৭। খোন্দকারতোলা মসজিদ, ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দ

শেরপুরে খেরুয়া ও বিবির মসজিদ ছাড়াও আর যে মসজিদটি দেখা যাবে তা খোন্দকারতোলা নামে পরিচিত। খোন্দাকারতোলা এলাকায় নির্মিত হওয়ায় স্থানীয়ভাবে এটি খোন্দাকারতোলা মসজিদ নামে অভিহিত। মহল্লায় প্রাপ্ত একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে গভর্নর মুয়াজ্জম খান ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। এ মসজিদের সঙ্গে খেরুয়া মসজিদের সাদৃশ্য রয়েছে, বিশেষ করে ভূমি-নকশায়। উভয় মসজিদই এক আইলবিশিষ্ট এবং তিনটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত; অবশ্য খেরুয়া অপেক্ষা খোন্দাকারতোলা মসজিদটি আয়তনে বড়। ৭৮′ × ৩০′ পরিমাপের এ মসজিদটির চার কোনায় অষ্টভুজাকৃতি টাওয়ার রয়েছে এবং টাওয়ারের উপরে খিলান প্যানেল দ্বারা শোভিত টারেট দেখা যাবে। এ ছাড়া ছোট ছোট পিনফল বা সরু টাওয়ার ছাদে বিশেষ আকর্ষণের সৃষ্টি করেছে। মসজিদটির পূর্বদিকে তিনটি খিলানপথ রয়েছে এবং এ পথগুলো আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ। প্রধান প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং এর উপরে শিলালিপি প্রোথিত রয়েছে। প্রবেশপথের উভয় পাশে প্যানেল দেখা যাবে। ছাদে সমান্তরাল কার্নিশ, সমান্তরাল মোল্ডিং, খাঁজকাটা খিলান, গম্বুজের নিচে ড্রাম, কলসচূড়া মসজিদের শোভা বৃদ্ধি করেছে। অভ্যন্তরে কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব রয়েছে।

৮। হযরত বন্দেগী শাহের দরগা, অষ্টাদশ শতাব্দী

শেরপুরের অন্যতম প্রবল আকর্ষণ হযরত বন্দেগী শাহের দরগা। ধর্মপ্রচারক হিসাবে বন্দেগী শাহের সুনাম রয়েছে এবং তাঁর দরগাটি বর্তমানে প্লাস্টার ও সাদা চুনকাম করা সাদামাটা ইমারত। মুঘল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য থাকায় এটি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইমারত হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। ঢাকার খান মুহম্মদ মৃধা অথবা কারতালব খানের মসজিদে ব্যবহৃত তাহখানা বা খিলানবিশিষ্ট প্লাটফর্ম বন্দেগী শাহের মাজারে দেখা যাবে।

৯। বেরুঞ্জ, প্রাচীর ইমারতসমূহ, মসজিদ, সমাধি, প্রাসাদ ইত্যাদি

ধূলচানচিয়া থানাধীন বেরুঞ্জ বা বেলুঞ্জ নামক স্থানে মুসলিম আমলের অনেক প্রত্ন-নিদর্শন রয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় মসজিদ, সমাধি, প্রাসাদ প্রভৃতির ধ্বংসস্তূপ। ধারণা করা হয়ে থাকে যে, আবরদেশ থেকে সৈয়দ আলী হোসেন

নামে এক সাধকপুরুষ বেরুঞ্জে এসে বসতি স্থাপন করেন। এখানে তিনি স্বাধীনভাবে শাসন কায়েম করেন এবং প্রাসাদ, মসজিদ ও অন্যান্য ইমারত নির্মাণ করেন। এ অঞ্চলের সর্বত্র অসংখ্য ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ দেখা যাবে। এখানে মুঘল আমলে সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত একটি মসজিদ ছিল। এক আইলবিশিষ্ট তিন গম্বুজ দ্বারা আবৃত এ মসজিদটি ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বর্তমানে এটির সংস্কার করা হয়েছে। সৈয়দ আলী হোসেন এবং তাঁর স্ত্রীর কবর মসজিদসংলগ্ন স্থানে দেখা যাবে। পাকা আট একর পরিমাপের একটি দিঘি রয়েছে।

১০। পাঁচ বিবি, পাঁচজন স্ত্রীর কবর, অষ্টাদশ শতাব্দী (ধ্বংসপ্রাপ্ত)

বগুড়া জেলার পাঁচ বিবি নামক স্থানে পাঁচটি কবর দেখা যাবে। ধারণা করা হয় যে, এটি পাঁচজন স্ত্রীর কবর। পাশাপাশি নির্মিত হওয়ায় এ স্থানের নাম হয়েছে পাঁচবিবি। বর্তমানে এ পাঁচজন বিবির মধ্যে চারটি কবর যমুনা গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, বর্তমানে মাত্র একটি রয়েছে।

১১। পাথরঘাটা, নিমাই শাহের মাজার, অষ্টাদশ শতাব্দী

তুলসী গঙ্গার তীরে পাথরঘাটা অবস্থিত। স্থানটি খুবই প্রাচীন বলে মনে হয়। জনশ্রুতি অনুযায়ী এখানে নিমাই শাহ নামের এক সাধকপুরুষের আস্তানা ছিল। তিনি স্থানীয় পীর হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন এবং এখানে সমাহিত হন।

১২। আলীয়ার হাট, মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দী

শিবগঞ্জ থানাধীন আলীয়ার হাট গ্রামে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত একটি মসজিদ দেখা যাবে। তিন গম্বুজবিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতি এ মসজিদটি গাগলাই নামের একটি ছোট নালার পাশে অবস্থিত। মোঃ কে, এম. যাকারিয়া তার 'বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ' গ্রন্থে এ মসজিদের উল্লেখ করেছেন। এ মসজিদে পূর্বদিক থেকে তিনটি খিলান দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও একটি করে দরজা আছে। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি মিহরাব দেখা যাবে। কাজী মেসের আলী তাঁর 'বগুড়ার ইতিহাসে' একটি ফার্সি শিলালিপির উল্লেখ করেন। শিলালিপিটির পাঠোদ্ধার হয়নি। স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য দেখে মসজিদটিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইমারত বলে চিহ্নিত করা যায়।

১৩। কেল্লাপুশী এবং শাহ মাদার, ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দ (অধুনালুপ্ত)

বগুড়া জেলায় কেল্লাপুশী নামে একটি অঞ্চল রয়েছে। এটি কেল্লাকুশী নামেও পরিচিত। এটি যে নিঃসন্দেহে একসময়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা ছিল তা এখানে প্রাপ্ত ইট, মৃৎপাত্র, ভিটা, ধ্বংসস্তূপ দেখে প্রতীয়মান হয়। এখানে অসংখ্য কবর রয়েছে, যা মুঘল আমলের বলে ধারণা করা হয়। সাধারণভাবে এ সমস্ত কবর শাহ মাদার এবং গাজীর সমাধি বলে অভিহিত করা হয়। উল্লেখ্য যে, মাদারীপুরের স্থানীয় পীর শাহ মাদারের নামানুসারে যেরূপ নামকরণ হয়, তেমনি কেল্লাকুশীতেও শাহ মাদারের প্রভাব ছিল। তিনি একটি বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন, যিনি মাদারী মতবাদ প্রচার করেন। শাহ মাদার সম্ভবত ১৩১৫ থেকে ১৪৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। আ. ক. ম. যাকারিয়া, আবদুল করীম ও আবদুর রহিম মাদারী ধর্মীয় গোষ্ঠীর উল্লেখ করেন।

কেল্লাকুশীতে প্রাপ্ত কবরগুলোকে সমাধিসৌধ বলা যাবে না কারণ এগুলো শবাধারে (Cenotaph) মাত্র।

ই. ভি. ওয়েস্টম্যাকট বগুড়ার এ অঞ্চলে একটি শিলালিপির সন্ধান পান। ব্লকম্যান এসিয়েটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের জার্নালে (১৮৭৫, ৩য় সংখ্যা) এটির পাঠোদ্ধার করে প্রকাশ করেন। এ থেকে জানা যায় যে, শেরপুর মৌর্চার উত্তরে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। মুহম্মদ শাহ শূরের পুত্র আফগান বিদ্রোহী শাসক গিয়াসউদ্দীন জালাল শাহ এই মসজিদের নির্মাতা। মসজিদের নির্মাণ তারিখ হিং ৯৬০/ই ১৫৫৩। স্থপতির নাম জানা যায় না কারণ শিলালিপি আংশিক ভগ্নাবস্থায় রয়েছে। তাঁকে সামসুদ্দীন আহমদ তাঁর 'Inscriptions of Bengal'-এ দোয়া খান নামে উল্লেখ করেন।

১৪। শেরপুর, শাহ তুরখানের মাজার, সপ্তদশ শতাব্দী (৫৫)

শেরপুরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় ও অতুলনীয় স্থাপত্যিক নিদর্শন হচ্ছে একটি সুউচ্চ প্লাটফর্মের উপর নির্মিত শাহ তুরখানের মাজার। করতোয়া নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত এই মাজারটি সম্বন্ধে ডাব্লু হান্টার বলেন, তুরখান সাঈদের মাজারটি স্থানীয়-ভাবে খুবই ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ। মনে করা হয়ে থাকে যে, হিন্দু রাজা বল্লাল সেন (?) কর্তৃক গাজী তুরখান যুদ্ধে শহীদ হন এবং তাঁর মাথা যে স্থানে সমাহিত তা 'শির মাকান' এবং দেহ যেখানে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাহিত হয় তা 'ধড় মাকান'। বল্লাল সেন সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানা যায় না, তবে তিনি যে সেনবংশীয় বল্লাল সেন নন সেকথা নিশ্চিত করে বলা যায়। সম্ভবত তিনি ছিলেন একজন স্থানীয় জমিদার। বস্তুত আরও দুজন বল্লাল সেনের নাম পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে একজন ঢাকার রামপালের সাধক বাবা আদমকে হত্যা করেন এবং তিনি বাবা আদম শহীদ নামে পরিচিত। অপরজন কিংবদন্তি অনুযায়ী ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দিরের নির্মাতা। শেরপুরের শাহ তুরখানের মতো তিনিও একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন। সুলতান বরবক শাহের তিনি বিরাগভাজন হলে সন্দেহবশে সুলতানের আদেশে শাহ ইসমাইল গাজীকে হত্যা করা হয়। কথিত আছে যে, তাঁর মাথা যেখানে বিচ্ছিন্ন হয় সেখানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় এবং বর্তমানে স্থানটি কাটা দুয়ার নামে পরিচিত। শাহ ইসমাইলের দেহটি হুগলী জেলার মান্দারানে সমাহিত রয়েছে।

শাহ তুরখান শহীদের সমাধি চতুষ্কোণাকার এক গম্বুজবিশিষ্ট ইমারত। ৮ ফুট উঁচু প্লাটফর্মের উপর নির্মিত এই সমাধিটির প্রধান আকর্ষণ এই যে, এটির ভূমি-নকশা অন্যান্য সমাধি অপেক্ষা পৃথক। বহুভুজক্ষেত্র (Polygon)-বিশিষ্ট উঁচু প্লাটফর্মটি সচরাচর দেখা যায় না। অবশ্য হুগলীর ছোট পাণ্ডুয়ায় শাহ শফিউদ্দীনের সমাধিটিও উঁচু বেদীর উপর নির্মিত। বহুভুজ ক্ষেত্রের চারপাশে খাঁজকাটা প্যানেল রয়েছে। গম্বুজটি খুবই উঁচু এবং মাত্র একটি কলসচূড়া দেখা যাবে। সমাধিটির চার কোনায় টাওয়ার রয়েছে এবং সমান্তরাল মৌল্ডিং দিয়ে এগুলো বিভক্ত করা হয়েছে। পশ্চিমদিক থেকে লিনটেলের অর্থাৎ সমান্তরাল বিম দিয়ে প্রবেশপথ দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়।

উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। সম্মুখভাগ বিভিন্ন খাঁজকাটা প্যানেল দ্বারা অলঙ্কৃত। নির্মাণকালে এ ইমারতে বক্রাকার কার্নিশ ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীকালে প্লাষ্টারের সাহায্যে এ কার্নিশটি সমান্তরাল করা হয়েছে যেভাবে মোগরাপাড়া (সোনারগাঁ) মসজিদের কার্নিশটি করা হয়। ক্যাথরিন আসের বলেন, "উঁচু প্লিন্থের উপর নির্মিত এক গম্বুজবিশিষ্টাকার সমাধিটিতে বিভিন্ন সময়ে সংযোজিত সংস্কারের ছাপ রয়েছে, যা সুষ্ঠুভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এর প্রাচীনত্ব দেখা যাবে দক্ষিণদিকের. সম্মুখভাগে। সেখানে হিন্দু আমলের পাথরের স্তম্ভ ব্যবহৃত হয়েছে। স্থাপত্যিক দিক থেকে এটিকে চতুর্দশ শতাব্দীর ইমারত বলে মনে হয় না, যদিও ক্যাথরিন আসের একথা বলেছেন। বস্তুত এটি সপ্তদশ শতাব্দীর একটি স্থাপত্যকীর্তি। শাহ তুরখান শহীদের সমাধিতে সুলতানী মুঘল যুগের স্থাপত্যরীতিতে সমন্বয় দেখা যাবে। সামান্য হেলানো কৌণিক টাওয়ার ও বক্রাকার কার্নিশ নিঃসন্দেহে সুলতানী আমলের। অপরদিকে সম্মুখভাগের সাদামাটা প্যানেল নকশা, গম্বুজ, স্টাকোর অলঙ্করণ মুঘলরীতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৫। অন্যান্য স্থাপত্যকীর্তিসমুহ

উপরোল্লিখিত ইমারতসমূহ ছাড়াও সমগ্র বৃহত্তর বগুড়া অঞ্চলে নানা ধরনের মসজিদ, মাজার, ভিটা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এগুলোর বেশিরভাগই ধ্বংসপ্রাপ্ত। সুলতান ও মুঘল আমলে নির্মিত এসমস্ত প্রত্নিদর্শনের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হচ্ছে ;

(ক) বগুড়া শহর, মদিনা মসজিদ, লস্কর পীরের মাজার, পীর ফাতেহ আলীর সমাধী পাঁচ পীরের দরগাহ;

(খ) শিবগঞ্জ—হিম্মত গাজীর মাজার;

(গ) কাট্টালী—একজন পীরের মাজার এবং একটি পুরাতন মসজিদ;

(ঘ) প্রতাপপুর—আল্লাহ মিয়ার তাকিয়াহ;

(ঙ) কাহালু—কালু গাজীর মাজার;

(চ) বাগবাড়ি—পুরাতন মাজার–'মসজিদ' –বিক্ষিপ্ত ধ্বংসস্তূপ;

(ছ) কসবা—একটি সমাধিসংলগ্ন প্রাচীন মসজিদ;

(জ) গোয়াইল—পণ্ডিত সাধক শাহের মাজার ও তৎসংলগ্ন মসজিদ।

বাকরগঞ্জ

২১°৫৪ দক্ষিণ এবং ২৩° উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯° ৫৫′ উত্তর এবং ৯১° ২′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বাকরগঞ্জ জেলা। এর উত্তরে ফরিদপুর, পূর্বে মেঘনা নদী ও শাহজাদপুর, পশ্চিমে ধলেশ্বর নদী ও খুলনা জেলা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এ জেলার সর্বমোট এলাকা ৪,২৪০ বর্গমাইল। বেভারিজ বলেন যে, "বাকরগঞ্জ জেলাটি গঙ্গা মেঘনা নদীর অববাহিকা হিসাবে বঙ্গোপসাগর থেকে যেন উদ্ধার করা হয়েছে।"

বাকরগঞ্জ জেলার নামকরণ হয়েছে আগা-বকর খানের নামানুসারে। তিনি চট্টগ্রামের প্রশাসক ছিলেন। মুর্শিদ কুলী খান তাঁকে প্রশাসনের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দিয়ে সুন্দরবনের জঙ্গলাকীর্ণ স্থান পুনরুদ্ধার করে রাজস্ব কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে পরগনা বুযুর্গ উমেদপুরের জমিদারী তাঁকে দেওয়া হয়। এ পরগনা বাকরগঞ্জ থানা এবং কোতওয়ালী ও বৌফল থানা নিয়ে গঠিত।

বাকরগঞ্জের মূল নাম ছিল অবশ্য বাকলা—পর্যটক র‍্যালফ ফিচ্ বাকলার উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষায়, "বাঙ্গালার চট্টগ্রাম থেকে আমি বাকোলায় আসি যার অধিপতি ছিলেন একজন হিন্দু সামন্ত রাজা। তিনি খুবই সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন এবং বাঘশিকারী ছিলেন। তাঁর দেশটি বিশাল ও খুবই সমৃদ্ধিশালী এবং ধান, সুতিবস্ত্র সিল্কের কাপড় মওজুদ ছিল। গৃহগুলো খুবই উঁচু ও মজবুত করে নির্মিত। রাস্তাঘাট প্রশস্ত এবং সাধারণ মানুষ কৌপিন পরে থাকত। মহিলাগণ রূপা, হাতির দাঁত ও তামার অলঙ্কার ব্যবহার করত।" রানী প্রথম এলিজাবেথের দূত হিসাবে রালফ ফিচ্ বাকলায় আসেন ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রাজা দনুজমর্দন দেব বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপে একটি হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কাচুয়ার নিকটবর্তী তেতুলিয়া নদীর তীরে অবস্থিত এই অঞ্চলটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বাংলার বারো ভুঁইয়াদের অন্যতম কন্দর্পনারায়ণের শাসনামলে রাজধানী বাকলা থেকে মাধবপাশায় স্থানান্তরিত হয়। মগ জলদস্যুদের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য রাজধানী অভ্যন্তরে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুরাদ খানের নেতৃত্বে বাকলা মুঘলদের দ্বারা বিজিত হয়। 'আইন-ই-আকবরী'তে উল্লেখ আছে যে, বাকলা সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত এবং সেখানে একটি দুর্গ নির্মিত হয়।

বেভারিজ আক্ষেপ করে বলেন যে, "বাকরগঞ্জের প্রাচীন ইতিহাস বা ঐতিহ্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা থেকে এটি বিচ্ছিন্ন এবং এর কোনো প্রাচীন ইতিহাস নেই।" যাহোক, বাকরগঞ্জে নির্মিত হিন্দু ও মুসলিম ইমারতের নিদর্শনাদি থেকে এ অঞ্চলের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে জানা যায়।

১। কসবা, মসজিদ, পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ (৫৬)

গৌরনদী থানার অধীন কসবা নামক স্থানে একটি অতি আকর্ষণীয় আয়তাকার বহু গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ নির্মিত হয়েছে। হেনরি বেভারিজ ভুলবশত এটি সাবী খান নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক নির্মিত বলেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাবী খান ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে একটি সড়ক তৈরি করেন। তিনি বলেন, "বিবি চিনি অপেক্ষা এটি অতীব সুন্দর ইমারত এবং এতে চারটি পাথরে স্তম্ভ রয়েছে; এর দুটি খুবই শীর্ণ এবং প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী ভক্তদের হাতের সংস্পর্শে এগুলো এরূপ হয়েছে।"

যাহোক, আয়তাকার মসজিদটির অভ্যন্তরে দুই সারি খিলান দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত এবং খিলানগুলো পাথরের স্তম্ভ থেকে উঠে গেছে। অভ্যান্তর নয় ভাগে বিভক্ত এবং প্রতিটির উপর একটি করে গম্বুজ রয়েছে অর্থাৎ মসজিদটি নয়টি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। কসবা মসজিদটিরে স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য বাগেরহাটের খান জাহান কর্তৃক নির্মিত স্থাপত্যকীর্তি দ্বারা প্রভাবান্বিত। যেমন চার কোনায় চারটি গোলাকার কৌণিক সংলগ্ন স্তম্ভ বা টাওয়ার যা নিচে থেকে উপরে সরু হয়ে গেছে (tapering), বক্রাকার কার্নিশ, সাদামাটা দেওয়াল ইত্যাদি। কৌণিক স্তম্ভগুলো সমান্তরাল বেড়ি বা Moulding দ্বারা বিভক্ত। মসজিদে প্রবেশের জন্য উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে এবং পূর্বদিকে মিহরাব বরাবর তিনটি খিলানসম্বলিত প্রবেশপথ রয়েছে। পশ্চিম প্রাচীরের তিনটি অর্ধগোলাকার মিহরার দেখা যাবে, যার মধ্যে মাঝেরটি আকারে একটু বড়। বহিঃ-প্রাচীরে পশ্চিমদিকে একটি বাড়তি দেওয়াল বা প্রজেকশন রয়েছে। গম্বুজগুলো পেনডেনটিভের সহায়তায় নির্মিত। খুলনার মসজিদকুড়ের মসজিদের সাথে কসবা মসজিদের সাদৃশ্য রয়েছে। স্থাপত্যিক রীতির বিচারে কসবা মসজিদটি পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নির্মিত হয়েছে বলে মনে হয়। অবশ্য এতে কোনো শিলালিপি পাওয়া যায়নি।

২। কমলাপুর, কসবার সন্নিকটে মসজিদ, ষষ্ঠদশ শতাব্দী (৫৭)

গৌরনদী থানার কসবার সন্নিকটে কমলাপুর নামক স্থানে অপর একটি আকর্ষণীয় মসজিদ দেখা যাবে। বাকরগঞ্জের অন্যতম প্রাচীন এই ধর্মীয় ইমারতটির আয়তন ২৯ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রস্থ এবং তিন গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার এই মসজিদটিতে কোনো ড্রাম ব্যবহৃত হয়নি, যার জন্য গম্বুজগুলো বেশি উঁচু মনে হয় না; মাঝের গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত বড়। গম্বুজের চূড়া অলঙ্কৃত। মসজিদের চার কোনায় চারটি গোলাকার সংলগ্ন স্তম্ভ বা

টাওয়ার রয়েছে, যা সমান্তরাল মৌল্ডিং দ্বারা বিভক্ত। পূর্বদিক থেকে তিনটি খিলানপথ দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। কিবলার দিকে তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণদিকের প্রাচীরে জানালা দেখা যাবে আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য। কমলাপুর মসজিদের যে শিলালিপি ছিল, তা বহু পূর্বে হারিয়ে গেছে। যাহোক, ধারণা করা হয় যে মাসুম খান এবং সুফী খান নামে দুই ভাই এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। স্থাপত্যিক রীতিকৌশল দেখে মনে হয় এ ইমারতটি প্রাক-মুঘল থেকে মুঘল যুগের স্থাপত্যরীতিতে উত্তরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

৩। সুজাবাদ দুর্গ, সপ্তদশ শতাব্দী

বাকরগঞ্জ শহরের পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে নলচিটি নদীর পাড়ে একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাবে। স্থানটি শাহ সুজার নাম থেকে সুজাবাদ নামে পরিচিত। জলদস্যুদের দমন করার জন্য এ দুর্গটি নির্মিত হয়। হেনরি বেভারিজের মতে, "আয়তাকার এ দুর্গটি মাটির প্রাচীরবেষ্টনী দ্বারা ঘেরা ছিল এবং প্রত্যেক কোনায় একটি বুরুজ ছিল। অভ্যন্তরে রাস্তা দিয়ে বিভক্ত চারটি ছোট ছোট জলাশয় ছিল। মধ্যভাগে একটি প্রাসাদ নির্মিত হয়। ১৭৬৪-৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত রেনেলের মানচিত্রে বাখরগঞ্জ জেলার দক্ষিণাংশে দু'টি দুর্গ দেখানো হয়েছে। বর্তমানে এগুলোর কোনো চিহ্ন নেই। সম্ভবত একটি ছিল আদমপুরের নিকট সোনাকোট এবং অপরটি ছিল কেল্লাঘাটায়।"

বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে সুজাবাদ দুর্গ জরিপ করে এবং এতে প্রতীয়মান হয় যে এ মাটির দুর্গটি ১০০ ফুট দৈর্ঘ্য ছিল। অভ্যন্তরে টাওয়ার বা প্রাসাদ নামে পরিচিত ধ্বংসস্তূপটি ৫২ ফুট × ৪৮ ফুট। জে. সি. জ্যাকের মতে সমগ্র দুর্গ এলাকা ৭৭ একর জমির উপর নির্মিত হয়।

৪। সেলগুনী, মসজিদ

বেভারিজ তাঁর 'বাকরগঞ্জের ইতিহাসে' উল্লেখ করেন যে বাকরগঞ্জ থানার অধীন সেলগুনী নামক স্থানে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। একসময় এ মসজিদটি নানারকম লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশা দিয়ে অলঙ্কৃত ছিল। এর শিলালিপিটি বহু পূর্বে হারিয়ে গেছে। ধারণা করা হয় যে, মসজিদের পাশে একটি পীলখানা বা হাতিশালা ছিল।

৫। কারাপুর, মিয়াবাড়ির মসজিদ, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ

বরিশাল শহরের কয়েক মাইল পূর্বে কারাপুর গ্রামে একটি অনিন্দ্যসুন্দর মসজিদ দেখা যাবে। মিয়াবাড়ির মসজিদ নামে পরিচিত এই ইমারতটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে নির্মিত হয়। এ মসজিদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে ঢাকায় কারতালাব খান ও মুসা খান মসজিদটি যেভাবে উঁচু প্লাটফর্ম বা তাহাখানার উপর নির্মিত হয়েছিল এটিও অনুরূপ স্থাপত্যকৌশলে স্থাপিত হয়, যার ফলে এর সৌন্দর্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। মূলত মুঘল আমলের আয়তাকার তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের অনুকরণে কারাপুরের মসজিদটি নির্মিত হয়। পূর্বদিকে তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে এবং বহু খিলানসম্বলিত প্রবেশপথের মধ্যবর্তীটি অপেক্ষাকৃত বড়। চার কোনায় অষ্টভুজাকৃতি কৌণিক টাওয়ার ছাড়াও

প্রবেশপথের উভয় পাশে ক্ষুদ্রাকৃতি টারেট শোভা বৃদ্ধি করছে। কোনার টাওয়ারের মতো প্রধান প্রবেশপথের উভয় দিয়ে সুউচ্চ টাওয়ার দেখা যাবে। ড্রামের উপর নির্মিত গম্বুজ তিনটির মধ্যে মাঝেরটি বড় এবং গম্বুজের ওপরে চূড়া বা ফিনিয়েল রয়েছে। চূড়া সাধারণত কলসাকৃতি হয়ে থাকে।

অভ্যন্তরে নামাজ পড়ার স্থান এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকে জানালা রয়েছে আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য। পশ্চিম অর্থাৎ কিবলার দিকে তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব আছে, মধ্যরর্তীটি অপেক্ষাকৃত বড়। মিয়াবাড়ির মসজিদটি নিঃসন্দেহে স্থানীয়ভাবে প্রধান আকর্ষণীয় ইমারত।

৬। সারিকাল, দুর্গ, অষ্টাদশ শতাব্দী

ধারণা করা হয় যে নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লাহর পতনের পর তাঁর অনুচরেরা সরিকালে এসে একটি দুর্গ নির্মাণ করে। তবে এ ধারণা কতটা সত্য তা বলা কঠিন। একটি সম্ভাবনা হতে পারে যে, পলাশী যুদ্ধের পর তাঁর সৈন্যসামন্তগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য এ দুর্গটি নির্মাণ করে। যাহোক, ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজবাহিনী দুর্গটি দখল করে ধ্বংস করে দেয়। এখনও এ দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যাবে।

৭। সুতালরী, মসজিদ , অষ্টাদশ শতাব্দী (১৭৩২) (অধুনালুপ্ত)

বাকরগঞ্জের ঝালকাটি বাজার থেকে এক মাইল পূর্বে নলচিটি নদীর তীরে সুতালরী গ্রাম অবস্থিত। কোনো একসময় এখানে মুঘল আমলের একটি অতি সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য অনুযায়ী ফার্সি ভাষায় উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি এ মসজিদে ছিল। বর্তমানে ঢাকার জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত এই শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মুঘল সম্রাট মুহাম্মদ শাহের শাসনামলে গোলাম মুহাম্মদ নামে এক ব্যক্তি সুতালরী গ্রামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, এই মসজিদটি ১৭৩২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়।

ময়মনসিংহ

বাংলাদেশে অন্যতম বৃহত্তম জেলা ময়মনসিংহ ২৩°.৫৭ দক্ষিণ এবং ২৬°৬ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৩৮ পশ্চিম এবং ৯১°১৫ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। এ জেলার উত্তর-পশ্চিম জেলায় গারো পাহাড় এবং আসামের গোয়ালপাড়া জেলা; উত্তর-পশ্চিমে এবং পশ্চিমে বগুড়া, রংপুর এবং পাবনা; দক্ষিণে ঢাকা জেলা এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সিলেট জেলা দ্বারা পরিব্যপ্ত। এ জেলার আয়তন ৬৩৮১ বর্গমাইল। বর্তমানে ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায় বিভক্ত হয়েছে।

ময়মনসিংহ জেলার নামকরণ সম্বন্ধে নানা ধরনের মতামত প্রচলিত ছিল। ময়মনসিংহ শহর থেকেই সমগ্র জেলা ময়মনসিংহ নামে পরিচিত এবং এই সমগ্র অঞ্চলটি একটি পরগনা বা রাজস্ব এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আদি নাম ছিল সম্ভবত মোমেন শাহী। বিশেষজ্ঞদের মতে, সুলতান নসরত শাহের রাজত্বকালে মোমেনশাহ নামের একজন সেনাপতির নামানুসারে জেলার নাম হয়েছে মোমেনশাহী। নাসির শাহের নাম থেকে অনেকে এ জেলাকে নাসিরাবাদ নামে অবহিত করেন।

যশোহর জেলার মতো ময়মনসিংহ জেলার প্রাচীন ইতিহাস রহস্যাবৃত। হিন্দু পুরাণে এ অঞ্চলটি প্রাগজোতিষ নামের একটি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহাভারতে কামরূপের উল্লেখ আছে। এই কামরূপই প্রাগজোতিষ বলে অনেকে ধারণা করেন। ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতাব্দীতে এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল প্রকট। চীনা ও তিব্বতী তথ্যসূত্র থেকে একথা স্পষ্টভাবে জানা যায়। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, ভাগদত্ত নামে প্রাগজোতিষের একজন প্রভাবশালী রাজা ছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কিরাতের রাজা নামে পরিচিত ভাগদত্ত সমগ্র আসামে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং গোহাটীতে রাজধানী স্থাপন করেন। যে স্থানে তিনি তাঁর বিশালাকার প্রাসাদ নির্মাণ করেন তা মধুপুর জঙ্গলের বড় তীর্থ (Bara Tirtha) নামে পরিচিত। এ ছাড়া আরও জানা যায় যে, প্রাগজ্যোতিষ নামক রাজ্য মোঙ্গলীয় বংশোদ্ভূত কয়েকজন রাজার দ্বারা শাসিত ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন সাং যখন বাংলায় আসেন তখন প্রাগজোতিষে একটি সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। এ রাজ্যের সীমানা দক্ষিণ দিকে ধলেশ্বরী এবং পশ্চিম দিকে করতোয়া নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীতে সেনবংশীয় রাজা বিজয় সেন গৌড়ের পালরাজাকে পরাজিত করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত করেন। বিজয় সেন এবং তাঁর পুত্র বল্লাল সেন কনৌজ ও অন্যান্য স্থান থেকে কুলীন ব্রাহ্মণদের বাংলাদেশে সাদরে অভ্যর্থনা জানান। মুসলমানদের নদীয়া বিজয় এবং সেনবংশের পতনে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে সমগ্র বাংলায় মুসলমানগণ বসতি স্থাপন করে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করে। ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনায় শাহ সুলতান নামে একজন মসহুর দরবেশ বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে পীর জামাল এবং বাবা আদম কাশ্মীরী কাগমারী ও অতিয়ায় বসতি স্থাপন করেন। ময়মনসিংহ জেলা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সামসউদ্দীন ফিরোজ শাহের শাসনামলে মুসলমানদের কর্তৃক বিজিত হয়। এরপর পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে গৌড়ের স্বাধীন সুলতানগণ ময়মনসিংহ জেলায় তাঁদের আধিপত্য কায়েম রাখেন। মুসলিম আমলে মুদ্রায় এ অঞ্চলটি মোয়াজ্জামাবাদ নামে পরিচিত। উল্লেখ্য যে, মোয়াজ্জামাবাদের সীমানা সিলেটের লাউর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ জেলার পূর্বাঞ্চল সুলতান হোসেন শাহ এবং তাঁর উত্তরাধিকারী নস্রত শাহ দখল করেন ষোড়শ শতাব্দীতে। উল্লেখ্য যে, সুলতান নুসরত শাহ একডালায় একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এই দুর্গ দিনাজপুরে সুলতান ইলিয়াস শাহ এবং সেকান্দার শাহ কর্তৃক নির্মিত একডালা দুর্গ থেকে পৃথক ছিল। আসামের আহম রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের জন্য ময়মনসিংহে একডালা দুর্গ নির্মাণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এ অঞ্চলটিতে বারো ভুঁইয়াদের দ্বারা শাসিত কতিপয় স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। এ সমস্ত বারভুঁইয়ার মধ্যে বিশেষভাবে প্রভাবশালী ছিলেন মসঁনদ-ই-আলী ঈসা খান। রালফ ফিচ্ তাঁকে বাঁর ভুঁইয়াদের (রাজাদের) মধ্যে প্রধান বলে অভিহিত করেন। ঈসা খান হায়বতনগর এবং জঙ্গলবাড়ির প্রখ্যাত দেওয়ান শাহের নামে শাসক পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি সোনারগাঁয়ে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে বৃহত্তর ময়মনসিংহে শাসনকার্য স্বাধীনভাবে পরিচালিত করেন। আকবরনামা'য় ঈসা খানকে 'মেরজবান-ই-ভাট্টি' নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রবাদ রয়েছে যে, সেনাপতি মানসিংহের সাথে ঈসা খানের একক সংঘর্ষ বা duel হয়েছিল এবং ঈসা খানের তরবারির আঘাতে মানসিংহের তরবারি ভেঙে যায়। ঈসা খান মানসিংহকে আর একটি তরবারি দেন কিন্তু তা প্রত্যাখান করে মানসিংহ ঈসা খানের বীরত্বে প্রীত হয়ে আলিঙ্গন করেন এবং উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। ঘটনাটির সত্যতা যাচাই করা যায়নি। তবে সম্রাট আকবরের দরবারে ঈসা খান গমন করেন এবং সম্রাট তাঁকে ঢাকা, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, বগুড়া, ত্রিপুরা জেলায় ২২টি পরগনায় জায়গীর দান করেন। ঈসা খান সম্ভবত ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

উল্লেখ্য যে, ময়মনসিংহ জেলা ভাওয়াল গাজীর শাসিত অঞ্চল ছিল। তিনি স্বাধীনভাবে রাজ্যত্ব করতেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে পালওয়ান শাহ নামে এক সামরিক নেতা ভাওয়াল গাজী বা জনপ্রবাদে ভাওয়াল সন্ন্যাসী বংশের গোড়াপত্তন করেন।

এগারসিন্ধু

১। এগারসিন্ধু, দুর্গ, ষোড়শ শতাব্দী (অধুনালুপ্ত)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, 'আইন-ই-আকবরী'তে ঈসা খানকে 'মেরজবান-ই-ভাট্টি' অর্থাৎ ব-দ্বীপ অঞ্চলের একচ্ছত্র অধিপতি বলা হয়েছে। প্রথম দিকে তিনি মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করে স্বীয় ক্ষমতা সুদৃঢ় ও সুসংহত করেন। মুঘলবাহিনী বহু চেষ্টা করেও সরাইল থেকে ঈসা খানকে বিতাড়িত করতে পারেনি। তিনি তাঁর আধিপত্য সুসংহত করে ময়মনসিংহের এগারসিন্ধু অঞ্চলে একটি দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন। বানার ও ব্রহ্মপুত্র নদীর মোহনায় এ দুর্গটি নির্মিত হয়। এগারসিন্ধু দুর্গ প্রসঙ্গে আ. ক. ম. যাকারিয়া বলেন, "কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীনে পাকুন্দিয়া থানার অন্তর্গত এগারসিন্ধু একটি প্রাচীন স্থান। এখানে বাঙলার বারো ভুঁইয়াদের প্রধান ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলার একটি শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। তিনি এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন বলে বলা হয়ে থাকে। এ দুর্গের কোনো চিহ্ন বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যায় না। সমগ্র এলাকা জুড়ে এখন চাষাবাদের কাজ চলছে। দুর্গপ্রাচীর কেটে, পরিখাগুলি ভর্তি করে সেখানে ধানক্ষেত্র করা হয়েছে। তবে দুর্গ এলাকা বলে চিহ্নিত স্থানটি দেখে মনে হয় যে দুর্গের পশ্চিম দিকে ছিল প্রশস্ত পরিখা এবং উত্তর ও পূর্বদিকে ছিল শঙ্খ নদীর বাঁক দ্বারা সৃষ্ট স্বাভাবিক পরিখা। এখন এটিকে শঙ্খনদীর বিল বলা হয়ে থাকে। দক্ষিণদিকে ছিল বিশালকার ব্রহ্মপুত্র-শীতলক্ষ্যা নদী। নদীর অপর তীরেই ঢাকা জেলার শুরু। সমগ্র দুর্গ এলাকা ছিল বিশাল আকারের।"

ঈসা খান পরবর্তী পর্যায়ে সরাইল থেকে তাঁর রাজধানী বুখতারপুরে স্থানান্তরিত করেন। এ স্থানটি লক্ষ্যা নদীর বাম পাড়ে। মুঘল সুবাদার ও নৌধ্যক্ষ বুখতারপুর ধ্বংস করলে ঈসা খান তাঁর রাজধানী কার্ট্রাবোতে সরিয়ে নেন। কার্ট্রাবো ছিল খিজিরপুর দুর্গের অপর দিকে লক্ষ্যা নদীর পাড়ে। ঈসা খান তাঁর পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যকে জঙ্গলবাড়িতে স্থানান্তরিত করে বাকি সদস্যদের নিয়ে কার্ট্রাবোতে বসবাস করতে থাকেন। কার্ট্রাবোতে ঈসা খান মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পুত্র মুসা খান এবং পৌত্র মুনওয়ার খান জঙ্গলবাড়িতে বসবাস করতেন। ঈসা খানের পরিবার 'দেওয়ান পরিবার' নামে পরিচিত লাভ করে। জঙ্গলবাড়ি এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে; কিন্তু একসময় এ অঞ্চলটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা ছিল, যেখানে রাস্তা-ঘাট, মসজিদ, মাদ্রাসা, পুল, বাগান এবং অসংখ্য ঘরবাড়ি প্রাসাদ ছিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত কীর্তিগুলো ঈসা খানের স্থাপত্য-কলার জ্বলন্ত নিদর্শন হয়ে রয়েছে।

২। এগারসিন্ধু, সা'দীর মসজিদ, ১৬৫২ খ্রিঃ (৫৮)

ময়মনসিংহ জেলায় যে সর্বপ্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গেছে তা ১৪৫২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান প্রথম মাহমুদ শাহের সময়ে উৎকীর্ণ। শিলালিপিটি ময়মনসিংহ জেলার ঘাগরা থেকে উদ্ধার করা হয় কিন্তু বর্তমানে এ মসজিদটি কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। এ মসজিদের নির্মাতা ছিলেন উলুঘ খান। এগারসিন্ধুতে মুঘল আমলের দু'টি অপূর্ব ইমারত দর্শকদের আকর্ষণ করে তাদের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য এবং আলঙ্কারিক শৈলীর জন্য। এ

দু'টি হচ্ছে সা'দীর মসজিদ এবং শাহ মুহম্মদের মসজিদ। উল্লেখ্য যে, ময়মনসিংহ জেলায় সুলতানী আমলের আর একটি শিলালিপি ঘুরাই নামের একটি জায়গা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এ শিলালিপির পাঠোদ্ধার করে জানা যায় যে, এটি সুলতান বরবক শাহের আমলে ১৪৬৭ খ্রিস্টাব্দে মজলিস-ই-আলী নামে একজন স্থপতি নির্মাণ করেন। লক্ষ্যনীয় যে, মসজিদটির স্থাপত্যরীতি ও অলঙ্করণ সম্বন্ধে শিলালিপিতে উল্লেখ রয়েছে। স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এ মসজিদটি প্লাস্টার ও সোনালি রঙের প্রলেপ দিয়ে শোভিত করা হয়। Gilding বা সোনার গিল্টির ব্যবহার হোসেনশাহী আমলে নির্মিত গৌড়ের ছোট সোনা এবং বড় সোনা মসজিদে পরবর্তীকালে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানে মসজিদটি অবলুপ্ত।

এগারসিন্ধুতে মুঘল বাদশাহ শাহজাহানের শাসনামলের যে মসজিদটি কালের স্বাক্ষর বহন করে রয়েছে তা সা'দীর মসজিদ নামে পরিচিত। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এই মসজিদটি চতুষ্কোণাকার এক গম্বুজবিশিষ্ট ইমারত। সম্পূর্ণ পোড়া ইট দিয়ে নির্মিত সা'দীর মসজিদটির পরিমাপ ২৭ বর্গফুট এবং এর চার কোনায় চারটি বুরুজ দেখা যাবে। অষ্টকোণাকার বুরুজগুলো সমান্তরাল বেড়ি বা মৌল্ডিং দিয়ে বিভক্ত করা হয়েছে এবং এর উপরে কুপোলা এবং কলসচূড়া দ্বারা অলঙ্কৃত। লক্ষণীয় যে, মুঘল যুগের মসজিদে ব্যবহৃত অন্যান্য বুরুজের তুলনায় সা'দীর মসজিদের বুরুজগুলো অপেক্ষাকৃত সরু এবং বক্রাকার কার্নিশের উপরে উঠে গেছে। এই মসজিদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, মুঘল যুগে নির্মিত হলেও বাগেরহাটের সুলতানী আমলের মসজিদে ব্যবহৃত বক্রাকার কার্নিশ দেখা যাবে। সা'দী মসজিদের দেওয়ালের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে একটির স্থলে এখানে দুইস্তরে বক্রাকার কার্নিশ ব্যবহৃত হয়েছে। নিচের কার্নিশটি এতই বক্রাকার যে দূর থেকে মনে হবে সে মসজিদটি দোচালা ধরনের, অবশ্য গম্বুজ থাকায় এটিকে তা বলা যাবে না। নিচের কার্নিশের উপরে প্যারাপেটটিও বক্রাকারে নির্মিত এবং এটির সঙ্গে মোগরাপাড়ায় নির্মিত মুঘল মসজিদটির তুলনা করা যায়।

পশ্চিমদিকের প্রাচীরে আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ তিনটি প্যানেল দেখা যাবে। এই প্যানেলের মধ্যভাগে নকল খিলানাকৃতি জানালার নকশা দেখা যাবে।

সা'দীর মসজিদটিতে তিনটি খিলানপথ দিয়ে পূর্বদিক থেকে প্রবেশ করতে হয়। মধ্যবর্তী খিলানপথটি অপেক্ষাকৃত বড়। উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। খিলানগুলো খাঁজকাটা (cusped) এবং পোড়ামাটির অলঙ্করণ দ্বারা শোভিত। সা'দীর মসজিদটি মুঘল আমলের চিরাচরিত shoulder গম্বুজ দ্বারা আবৃত এবং এটি একটি ড্রামের ওপর থেকে নির্মিত। গম্বুজের চূড়া কলসাকৃতি। অভ্যন্তরে কিবলাপ্রাচীরে তিনটি মিহরাব রয়েছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড়। আ. ক. ম. যাকারিয়া বলেন, "চিত্রফলকের সাহায্যে যে অলঙ্করণের কাজ আছে তা সাধারণত মোঘল আমলের কোনো মসজিদে দেখা যায় না। মিহরাবের আয়তাকার ফ্রেমটি উপরের দিকে কিছুটা বাঁকানো। মিহরাবের তিনদিকে পোড়ামাটির ফলকচিত্রের সাহায্যে অতি সুন্দরভাবে লতাপাতার অলঙ্ককরণের কাজ করা আছে।" মধ্যবর্তী খিলানটির বাইরের

দিকে সুন্দরভাবে খাঁজকাটা। উপরের দিকে আছে ফুলের প্রতিকৃতি। খাঁজকাটা অংশের নিচের দিক সুন্দর প্যানেল দ্বারা অলঙ্কৃত। অন্য দুটি মিহ্‌রাবও বেশ সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত। এগুলিতে সুলতানী আমলের কারুকার্যের প্রভাব দেখা যায়। এতে মনে হয় যে, মুঘল আমলেও এ স্থানে সুলতানী আমলের স্থাপত্যকৌশল টিকে ছিল এবং পোড়ামাটির চিত্রফলক ব্যবহারের প্রথাও প্রচলিত ছিল। আহমদ হাসান দানীও এ ধরনের মন্তব্য করেছেন, "The creeper device round the main entrance, embossed designs at the spandrels and applied cusps at the outer faces all speak of a revival of the terracotta art after the Mughals established peace in the province." এক গম্বুজবিশিষ্ট চতুষ্কোণাকার সা'দী মসজিদের প্রভাব ময়মনসিংহ জেলার এগারসিন্ধুতে নির্মিত শাহ্ মুহম্মদের মসজিদ ও গুরাই মসজিদে লক্ষ করা যাবে।

সা'দী মসজিদের প্রধান প্রবেশপথের উপরে পলেস্তারার উপরে যে শিলালিপি রয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, সম্রাট শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে শেখ সিরুর পুত্র সা'দী হিজরী ১০৬২/ইংরেজি ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। সামসুদ্দীন আহ্‌মদ মনে করেন যে যেহেতু এগারসিন্ধুর ঈসা খানের ঘাঁটি ছিল সেহেতু সম্ভবত এ মসজিদটি ঈসা খানের সেনাপতি মাসুম খান কাবুলি কতৃক বারো ভুঁইয়াদের আমলে নির্মিত হয়। কিন্তু শিলালিপিতে মাসুম খানের উল্লেখ নেই। উপরন্তু, এইচ. ই. স্টেপলটন, যিনি শিলালিপিটি উদ্ধার করেন, বলেন যে, তিন গম্বুজবিশিষ্ট একটি মসজিদ থেকে শিলালিপিটি উদ্ধার করা হয়েছে। বস্তুত সা'দীর মসজিদ, যেখানে পলেস্তারায় ঢাকা অবস্থায় শিলালিপিটি পাওয়া যায়, এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার ইমারত।

৩। এগারসিন্ধু, শাহ্ মুহম্মদের মসজিদ, সপ্তদশ শতাব্দী (৫৯)

সা'দী মসজিদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বড় এবং অধিকতর আকর্ষণীয় মসজিদ হচ্ছে শাহ্ মুহম্মদের মসজিদ। সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত এ মসজিদটি একগম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার। এর পরিমাপ ৩২ বর্গফুট। সা'দী মসজিদের মতো এ মসজিদের চার কোনায় চারটি অষ্টকোণাকার বুরুজ বা টারেট রয়েছে। বুরুজগুলো সমান্তরাল বেড়ি বা মৌল্ডিং দিয়ে বিভক্ত এবং এগুলো ছাদের উপরে উঠে গেছে। এর শীর্ষদেশে কুপোলা এবং কলস চূড়া দেখা যাবে। মসজিদটির পূর্বদিকে একটি জলাশয় রয়েছে। এ জলাশয়ের পশ্চিমপাড়ে মসজিদ অঙ্গনের পূর্বদিকে একটি বেষ্টনীপ্রাচীর দেখা যাবে। মসজিদটি সমতলভূমির উপর নির্মিত না হয়ে একটি অনুচ্চ বেদী বা ভিতের উপর স্থাপিত। মসজিদের সামনে প্রশস্ত অঙ্গন এবং পূর্ব প্রান্তে দোচালা ধরনের প্রবেশপথ রয়েছে।

শাহ্ মুহম্মদের মসজিদটি খুবই আকর্ষণীয় ইমারত। পূর্বদিকে তিনটি খিলানপথ-বিশিষ্ট ফটক দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। মধ্যবর্তী খিলানপথটি অপেক্ষাকৃত বড়। চার-বিন্দু থেকে টানা (four-centred) উপরে খাঁজকাটা নকশা রয়েছে। প্রধান প্রবেশপথটি সামনের দিকে সামান্য উদ্গাত এবং এর দু'পাশে দু'টি সরু টারেট রয়েছে। পাশের প্রবেশপথ দুটিও আয়াতাকার ফ্রেমে আবদ্ধ এবং নকশাকত প্যানেল এবং পোড়ামাটির নকশা শোভা পাচ্ছে। উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে খিলানপথ সৃষ্টি

করা হয়েছে। এ খিলানপথগুলোও খাঁজকাটা ও প্যানেল নকশা দ্বারা শোভিত। দু'পাশে টারেট রয়েছে। শাহ মুহম্মদ মসজিদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ এর বিশালাকার বাল্বের আকৃতিতে নির্মিত গম্বুজ। গম্বুজটি অষ্টকোণাকার ড্রামের উপর স্থাপিত এবং এর ফিনিয়েল বা চূড়া পদ্মপাতার ভিত থেকে উপরে উঠে গেছে।

শাহ মুহম্মদের মসজিদের ছাদের চতুর্দিকে প্যারাপেটের নকশা দেখা যাবে। মার্লন নামে অভিহিত এ ধরনের প্যারাপেটের নকশা ড্রামের চারপাশে রয়েছে। কিন্তু সা'দীর মসজিদে যেমন বক্রাকার কার্নিশ রয়েছে অনুরূপ কার্নিশ শাহ মুহম্মদের মসজিদে নেই। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সপ্তদশ শতাব্দী থেকে সুলতানী আমলের স্থাপত্যরীতির প্রধান অঙ্গ বক্রাকার কার্নিশ ক্রমশ বিলুপ্ত হতে থাকে। অভ্যন্তরে কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অলঙ্কৃত খাঁজকাটা খিলানাকৃতি অবতলাকার মিহরাব রয়েছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং সমগ্র দেওয়াল পোড়ামাটির অলঙ্করণ দ্বারা শোভিত। এতে প্রমাণিত হয় যে, প্লাস্টারে কাটা নকশার চেয়ে সুলতানী আমলের পোড়ামাটির ফলক অলঙ্করণ হিসাবে প্রাধান্য পাচ্ছে। এ মসজিদের চত্বরে পূর্বদিকে প্রাচীরঘেরা দোচালা যে ঘরটি দেখা যাচ্ছে তাই মসজিদের অঙ্গনে প্রবেশের পথ। আ. ক. ম. যাকারিয়া বলেন, "মসজিদের তোরণ হিসাবে নির্মিত উত্তর দক্ষিণে লম্বা এই দোচালা ঘরের আয়তন ২৫′ × ১৩′ ৮″। ঘরের ঠিক মাঝখান দিয়ে প্রবেশপথ। পূর্ব দেয়াল দরজা ও জানালার আকারে নির্মিত কুলুঙ্গী ও প্যানেল দ্বারা সুশোভিত। উপরের পাকা ছাদ ঠিক বাঙলাদেশের দোচালা ঘরের মতো। এ ধরনের দোচালা-ঘরের মধ্য দিয়ে প্রবেশপথের সৃষ্টি এক অভিনবত্বের সূচনা করেছে।" এই দোচালা প্রবেশপথটির সাথে গৌড়ে নির্মিত ফাতেহ শাহের সমাধির হুবহু সাদৃশ্য রয়েছে। ধারণা করা হয় যে, ১৬৫৭-১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ে নির্মিত ফাতেহ খানের দোচালা সমাধি থেকে অনুকরণ করে শাহ মুহম্মদের মসজিদের তোরণটি নির্মিত হয়েছে। এ তোরণটি মসজিদের সমসাময়িক এবং মসজিদের সম্মুখভাগে প্রধান প্রবেশপথের উপরে যে শিলালিপি ছিল তা হারিয়ে যাওয়ায় এর সঠিক নির্মাণকাল নির্ধারণ করা না গেলেও দানী মনে করেন যে, শাহ মুহম্মদের মসজিদ ও তোরণটি ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। দোচালা ইমারতের নিদর্শন রয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত ঢাকার করতলাব খানের মসজিদের পূর্বদিকে দোচালা গৃহটিতে। সম্ভবত এটি ইমামের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এগারসিন্ধুর দোচালা তোরণটির পরিমাপ ২৫′ × ১৩′ ৮″ এবং দোচালার কুঁড়েঘরের অনুকরণে নির্মিত এ ইমারতটির চতুর্দিক কুলঙ্গি, প্যানেল নকল খিলান দ্বারা অলঙ্কৃত। শাহ মুহম্মদ কে ছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না।

৪। মসজিদপাড়া, মসজিদ, ১৬৬৯ খ্রিঃ

এগারসিন্ধু থেকে চার মাইল উত্তর-পশ্চিমে মসজিদপাড়া নামে একটি ছোট গ্রাম রয়েছে। এ স্থানের প্রধান আকর্ষণ মুঘল আমলের একটি মসজিদ। মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উপরে যে শিলালিপি আছে তা থেকে জানা যায় যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে হিজরী ১০৮০/ইংরেজি ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে এ অঞ্চলে একটি মসজিদ নির্মিত

হয় এবং সম্ভবত মসজিদের নামানুসারে স্থানটি মসজিদপাড়া নামে পরিচিত। একগম্বুজ-বিশিষ্ট বর্গাকার মসজিদপাড়া মসজিদটির পরিমাপ ২৯ বর্গফুট। এর চার কোনায় চারটি অষ্টকোণাকার বুরুজ বা টারেট রয়েছে। বুরুজগুলো ছাদের উপরে উঠে গিয়ে কুপোলা ও কলসচূড়ায় শেষ হয়েছে। কুপোলায় খাঁজকাটা নকশা দেখা যাবে এবং আতিয়ার মসজিদের বুরুজের তুলনায় সরু। মসজিদটিতে প্রবেশের জন্য পূর্বদিকে একটি খিলানাকৃতি প্রবেশপথ রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণদিকে অনুরূপ দু'টি খিলানপথ দেখা যাবে। মসজিদবাড়ি মসজিদটি পূর্বদিকে সমান্তরাল বেড়ি বা মৌল্ডিং দিয়ে বিভক্ত করা হয়েছে। উপরের অংশ খিলান প্যানেল এবং নিম্নাংশ আয়তাকার প্যানেল দ্বারা অলঙ্কৃত। সা'দী মসজিদের মতো এ মসজিদের কার্নিশ বক্রাকার নয়, সমান্তরাল। বাল্বের আকৃতির গম্বুজটি সমগ্র মসজিদকে আবৃত করে রেখেছে। ড্রামের উপর নির্মিত এ গম্বুজটিতে কলস-চূড়া দেখা যাবে। কিবলার দিকে তিনটি মিহরাব রয়েছে। সমগ্র দেওয়ালে লতাপাতা, নকশা ও জ্যামিতিক কারুকার্য প্রভৃতি দ্বারা শোভিত।

৫। অষ্টগ্রাম, কুতুবশাহী মসজিদ, ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ

কিশোরগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) অন্তর্গত অষ্টগ্রাম একটি অতি প্রাচীন স্থান ভাটি অঞ্চলের এই স্থানটি সম্ভবত হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে একটি অতি পরিচিত জনপদ ছিল। মুঘল যুগে এ স্থানের উন্নতি ঘটে এবং সে সময়কার বহু প্রাচীন কীর্তি এখনও দেখা যাবে। এখানকার সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ইমারত হচ্ছে কুতুবশাহের মসজিদ। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী কুতুবশাহ ছিলেন একজন খুব প্রভাবশালী ও কামেল পীর। তাঁর নাম থেকে মসজিদের নামকরণ হয়েছে কুতুবশাহী মসজিদ। আয়তাকারবিশিষ্ট এই ইমারতের পরিমাপ ৩০ ফুট × ১৬ ফুট ৯ ইঞ্চি। এই মসজিদটির চার কোনায় চারটি অষ্টকোনাকার বুরুজ রয়েছে। মোটা ভিতের উপর থেকে বুরুজগুলো উপরের দিকে উঠে গেছে এবং সমান্তরাল মৌল্ডিং বা ব্যান্ড দিয়ে এগুলোকে বিভক্ত করা হয়েছে। ছাদের উপরে কুপোলা এবং কলসচূড়া ছিল বলে মনে হয়। বর্তমানে উপরের অংশ ভাঙা অবস্থায় আছে। কুতুবশাহী মসজিদটির পূর্ব প্রাচীরে তিনটি খিলান দরজা রয়েছে এবং এগুলোর মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। খিলানপথের উপর খাঁজকাটা নকশা এবং দেওয়াল গোলাপ, লতাপাতা, জ্যামিতিক নকশা দ্বারা শোভিত। আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ খিলান-দরজাগুলোর উপরে তিনটি সমান্তরাল মৌল্ডিং এবং তার উপরে রোজেট বা ছোট গোলাপের পোড়ামাটির ফলক দেখা যাবে। প্রবেশপথের উভয় পাশে আয়তাকার প্যানেল এবং দু'সারি প্যানেলের মধ্যে খিলান নকশা দেখা যাবে।

বৃহদাকার কুতবশাহী মসজিদটির উপরিভাগে প্রথমে সমান্তরাল প্যারাপেট বা battlement রয়েছে এবং তার উপরে বাংলার দোচালা ঘরের কার্নিশের অনুকরণে বক্রাকার কার্নিশ শোভা পাচ্ছে। এ ধরনের বক্রকার কার্নিশ সা'দীর মসজিদ এবং টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদে দেখা যাবে। প্রধান বা কেন্দ্রীয় খিলানপথটি পাশের কৌণিক খিলানপথ অপেক্ষা বৃহদাকার। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণদিকে দু'টি করে অনুরূপ খিলানপথ রয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালগুলো প্রায় ৫ ফুট এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকের দেয়াল দু'টি ৪$\frac{১}{২}$ ফুট করে প্রশস্ত।

কুতুবশাহী মসজিদটিতে পাঁচটি গম্বুজ রয়েছে। প্রধান গম্বুজটি বৃহদাকার এবং ঠিক মধ্যভাগে রয়েছে। এ ছাড়া গম্বুজ দেখা যাবে। অভ্যন্তরে দু'সারি আইল রয়েছে এবং পাথরের স্তম্ভ দিয়ে খিলানের সাহায্যে বিভক্ত এ দু'ই সারি আইলের মধ্যভাগের উগরে প্রধান গম্বুজটি অবস্থিত। অনেকটা ক্রুশাকৃতি নকশা ব্যবহৃত হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় গম্বুজের স্থাপত্যিক গাম্ভীর্য ও সৌকর্য বজায় রাখার জন্য চার কোনায় চারটি ক্ষুদ্রাকার গম্বুজ নির্মাণ খুবই বিরল। মসজিদ অপেক্ষা সমাধিতে এ ধরনের ভূমি-নকশা দেখা যাবে, যেমন গৌড়ের শাহ নিয়ামতউল্লার সমাধি (সপ্তদশ শতাব্দী) এবং ঢাকার লালবাগ পরী বিবির সমাধিতে। অবশ্য ভূমি-নকশায় সাদৃশ্য থাকলেও এ দু'টি ইমারতের ছাদে কোনো গম্বুজ দেখা যায় না, কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ ছাদ (underceiling) গম্বুজাকৃতি।

কুতুবশাহী মসজিদের কিবলাপ্রাচীরে তিনটি নকশাকৃত খিলানাকৃতি অবতলাকার মিহরাব দেখা যাবে। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড়। মিহরাব প্রাচীর পোড়ামাটির ফলকদ্বারা অলঙ্কৃত। মসজিদের ১২ ফুট দক্ষিণে পাঁচটি কবর নির্মিত হয়, যা পাঁচপীরের মাজার নামে পরিচিত। বর্তমানে চারটি অক্ষত অবস্থায় আছে। কুতুবশাহী মসজিদের সন্নিকটে একটি কবরের সন্ধান পাওয়া গেছে। জনশ্রুতি অনুযায়ী এটি কুতুবশাহের মাজার বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্তমানে মসজিদে কোনো শিলালিপি নেই তবে স্থাপত্য-কৌশল শৈলী ও আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ইমারতটি ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে নির্মিত হয়েছে বলে মনে হয়। লক্ষণীয় যে, এতে সুলতানী ও মুঘল আমলের স্থাপত্যের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

৬। তাজপুর, দুর্গ, সপ্তদশ শতাব্দী (আধুনালুপ্ত)

বারো ভুঁইয়াদের শিরোমণি ঈসা খান মসনদ-ই-আলার শাসনকালে ময়মনসিংহ একটি সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলে রূপান্তরিত হয়। তিনি এ জেলায় বহু ইমারত নির্মাণ করেন যার মধ্যে বোকাইনগরের কিল্লা ও তাজপুরের কিল্লা তাঁর স্থাপত্যকীর্তির স্বাক্ষর বহন করছে। বোকাইনগর থেকে ৫ মাইল উত্তর-পূর্বে বালুয়া নদীর তীরে তাজপুরের কিল্লা নির্মিত হয়। এই দুর্গের আয়তন ছিল প্রায় ২৪০০ × ১২০০ ফুট। প্রশস্ত ও উঁচু মাটির দেয়ালঘেরা তাজপুর কিল্লা বহুদিন আগেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এর চারিপাশে যে বুরুজ ও পরিখা ছিল তা সহজেই নজরে পড়ে। একথা সত্য যে, মুঘল আগ্রাসন বন্ধের জন্য পাঠানবংশীয় শাসকবর্গ তাজপুর দুর্গ নির্মাণ করেন। আ. ক. ম. যাকারিয়া বলেন, "এ দুর্গটি কে নির্মাণ করেছিলেন এবং কবে তা নির্মিত হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে খাজা ওসমান যখন মোঘলদের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে বোকাইনগর দুর্গ পরিত্যাগ করেন তখন কিল্লা তাজপুর হয়ে তিনি শ্রীহট্টের দিকে পালিয়ে যান। সে সময়ে খাজা ওসমাজার অধিকারে সে দুর্গটি ছিল। খাজা ওসমান এ দুর্গ নির্মাণ করেননি। এতে সহজেই বোঝা যায় যে দুর্গটি অনেক আগে থেকেই সেখানে অস্তিত্বশীল ছিল। স্থানীয় জনপ্রবাদ মতে জানা যায় যে সুলতান সায়েফউদ্দীন দ্বিতীয় ফিরোজ শাহের আমলে (১৪৮৬–৮৯ খ্রিঃ) তাঁর সেনাপতি মজলিস খাঁ হুমায়ূন এ দু'টি নির্মাণ করেন কামরূপ রাজের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা এবং তাঁর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য।" কিন্তু যাকারিয়ার মন্তব্যর সাথে সৈয়দ মুহম্মদ তৈফুরের মন্তব্যের মিল

নেই। তৈফুরের মতে, "ঈশ্বরীগঞ্জের থানাধীন কিল্লা তাজপুরে একটি পাঠান দুর্গ ছিল এবং নাসির খান এবং দরিয়া খান নামের দুর্গ পাঠান অধিপতি কর্তৃক নির্মিত। তাজপুর কিল্লার প্রকৃত নির্মাতা সম্বন্ধে মতবিরোধ রয়েছে।"

নাজিমউদ্দীন আহমদ তাঁর 'Discover the Monuments of Bangladesh' গ্রন্থে তাজপুর কিল্লা সম্বন্ধে বলেন, "This mud fort. is about a mile long and three quarters of a mile wide. Except for the ruins of a comparative modern brick building known as Poddar Baris virtually the entire area enclosed within the high mud rampart and moat are bereft of any remains of original structure ...... The area, however, is littered profusely with brick bats and pottery under heavy undergrowth. At the southeastern corners near Butacona Bazar the rampart has been washed away by a small tributory of the Brahmaputra River-exposing a structure, averaging 30´-0″ wide by its base and tapering to a height of about 15′-0″ from the surrounding ground. The ramparts have semi-circular bastions at intervals."

৪। ইটনা, মসজিদ ও মাজার, অষ্টাদশ শতাব্দী (অধুনালুপ্ত)

কিশোরগঞ্জের (বর্তমান জেলা) ইটনা নামক স্থানে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে। বলাই বাহুল্য যে, ইটনা ছিল স্থানীয় বর্ধিষ্ণু ও প্রভাবশালী দেওয়ান পরিবারের নিজস্ব এলাকা। এখানে দেওয়ান পরিবার কর্তৃক নির্মিত মসজিদ ও মাজারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়।

৮। জঙ্গলবাড়ি, ঈসা খানের স্থাপত্যকীর্তির ধ্বংসাবশেষ, ষোড়শ শতাব্দী

কিশোরগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) অন্তর্গত এবং করিমগঞ্জ থানাধীন জঙ্গল-বাড়িতে মসনদ-ই-আলা ঈসা খানের প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দের ঈসা খান সম্রাট আকবরের বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে প্রথমে কিশোরগঞ্জ এবং জঙ্গলবাড়িতে কোচ রাজা লক্ষণকে বিতাড়িত করে সেখানে ঘাঁটি স্থাপন করেন। স্টেপলটন বলেন, ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে ঈসা খান কোচদের কাছ থেকে জঙ্গলবাড়ি দখল করেন এবং এখানে তিনি এবং তাঁর বংশধরেরা বংশপরম্পরায় বসবাস করত। জঙ্গলবাড়ি তরফ বাজার পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। ঈসা খান সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানা যায় না, তবে ঐতিহাসিকগণ বলেন যে তিনি একজন রাজপুত থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান এবং বাংলায় আগমন করে বারো ভুঁইয়াদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী নৃপতি হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে আফগান নেতা দাউদ খানের পতনের পর থেকে ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে মানসিংহ কর্তৃক আসাম এবং পূর্ববঙ্গ বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। 'আইন-ই-আকবরী'তে ঈসা খানের উল্লেখ আছে এবং সেখান বলা হয়েছে যে, তিনি ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সেনাপতি শাহবাজ খানের আক্রমণ প্রতিহত করেন। ব্রিটিশ পর্যটক রালফ ফিচ্ ঈসা খানকে (Isacan) বারো ভুঁইয়াদের নেতা বলে অভিহিত করেন এবং বলেন যে, তিনি খ্রিস্টানদের পরম বন্ধু ছিলেন।

জঙ্গলবাড়ির বিশালাকার মাটির দুর্গের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। তবে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে আ. ক. ম. যাকারিয়া এ অঞ্চল পরিদর্শন করে গোলাকার বেষ্টনীপ্রাচীর, ইটের ভগ্নাংশ এবং বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মৃৎপাত্রের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পান। দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তরদিকে গভীর ও প্রশস্ত পরিখা এবং পূর্বদিকে একটি নদী রয়েছে। নদীটি নরসুন্দা নামে পরিচিত। এ থেকে মনে হয় যে দুর্গটিকে সুরক্ষিত করে নির্মিত হয়। এর আয়তন ৩৫ একরের বেশি হবে না। জঙ্গলবাড়ি দুর্গে ঈসা খান স্বপরিবারে একটি প্রাসাদে বসবাস করতেন। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের ইমারত ছিল এই দুর্গের অভ্যন্তরে।

৯। জঙ্গলবাড়ি, মসজিদ, ষোড়শ শতাব্দী

জঙ্গলবাড়ি ঈসা খানের রাজধানী ছিল এবং তিনি একটি সুরক্ষিত দুর্গে বসবাস করতেন। বর্তমানে এর কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে সেখানে একটি বিশালাকার দরবারকক্ষ ছিল, যার কিছু ধ্বংসাবশেষ এখনও লক্ষ করা যায়। এই দরবারকক্ষটি খুবই রুচিসম্মতভাবে অলঙ্কৃত ছিল কারণ নীল, সবুজ, সোনালি রঙের দেওয়ালচিত্রের কিছু ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে। এখানে একটি প্রাচীন মসজিদ ছিল, যা বহুপূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এই মসজিদটি ঈসা খানের সময়ে ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত হয়। ভূমি-নকশা থেকে মনে হয় যে এটি ছিল তিন গম্বুজবিশিষ্ট আয়তকার মসজিদ-এর পরিমান উত্তর-দক্ষিণে ৫০ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২১ ফুট। পূর্বদিক থেকে তিনটি খিলানপথ দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে হত। উত্তর ও দক্ষিণদিকে দু'টি দরজা ছিল। কিবলাপ্রাচীরে, খিলানাকৃতি তিনটি মিহরাব দেখা যাবে। বর্তমানে জঙ্গলবাড়ির বাসিন্দাগণ মসজিদটিকে পুনঃনির্মাণ করেছে।

১০। কোটিয়াদি দরগা

কিশোরগঞ্জ মহকুমায় বহু পীর দরবেশ ও সাধকপুরুষের আগমন ঘটে। বিশেষ করে কোটিয়াদি গ্রামে সামসুদ্দীন আওলিয়া বুখারী নামে একজন প্রভাবশালী দরবেশের দরগা-মাজার দেখা যায়। এ সমস্ত পীর-ফকিরগণ ধর্মপ্রচারের জন্য এতদঞ্চলে আগমন করে স্থানীয় হিন্দু জনগোষ্ঠীকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেন।

১১। কিশোরগঞ্জ, জাওয়ার মসজিদ, ষোড়শ শতাব্দী (অধুনালুপ্ত)

কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীনে শরাইল থানার অন্তর্গত জাওয়ার নামে একটি গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাবে। সামসুদ্দীন আহমদ তাঁর Inscriptions of Bengal (vol II) গ্রন্থে জাওয়ার থেকে প্রাপ্ত একটি শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেন। এই শিলালিপিতে বলা হয়েছে যে, সুলতান গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে রাহাত খানের পুত্র নাসির খান হিজরী ৯৪১/ইংরেজি ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে একটি 'মজবুত ইমারত' নির্মাণ করেন। এটি যে মসজিদের শিলালিপি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জাওয়ার মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে পরবর্তীকালে নসরতগঞ্জে নির্মিত একটি আধুনিক মসজিদে শিলালিপিটি স্থাপন করা হয়।

১২। কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ, মসজিদ, ষোড়শ শতাব্দী

কিশোরগঞ্জ মহকুমার কুলিয়ারচর নামে একটি গ্রাম রয়েছে। এখানে প্রাচীন আমলের একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষে পাওয়া গেছে। দশ গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার এই মসজিদটির আয়তন ৬০ × ২০ ফুট। মসজিদটির অভ্যন্তরে স্তম্ভের উপর এক সারি খিলান দিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং পূর্ব-পশ্চিমে পাঁচটি 'বে' বা সারি দেখা যাবে, অর্থাৎ সর্বমোট দশটি চতুষ্কোণাকার এলাকার উপর দশটি গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। কিবলাপ্রাচীরে পাঁচটি অবতলাকৃত মিহরাব নির্মিত হয়েছে। কিবলাপ্রাচীরে পোড়ামাটির ফলক ও নকশা দ্বারা অলঙ্কৃত। হাবিবা খাতুন বলেন, 'A distinctive element of its decoration is the inclusion of a crescent motif which is still traceable beneath its modern whitewash. It is dated from the 16th century."

ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত কুলিয়ারচর মসজিদটি ব্যতিক্রমধর্মী। সাধারণত দশ গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ দেখা যায় না। তবে সর্বপ্রাচীন দশগম্বুজ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল ত্রিবেণীতে। জাফর খান গাজীর মসজিদটি চতুর্দশ শতাব্দীর ইমারত। এ ছাড়া দশগম্বুজ-বিশিষ্ট মসজিদের মধ্যে গৌড়ের তাঁতিপাড়া মসজিদ (১৪৮০), বাঘার মসজিদ (১৫২৩) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুলিয়ারচর মসজিদে পূর্বদিক থেকে পাঁচটি খিলান-দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। খিলানগুলো কৌণিক এবং নকশাকৃত। এই মসজিদের চার কোনায় চারটি অষ্টকোণাকৃতি বুরুজ রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণদিকে দু'টি করে প্রবেশপথ রয়েছে। মসজিদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই এবং এটি যে সুলতানী ও মুঘল আমলের মধ্যবর্তী সময়ে নির্মিত হয়েছিল তা এর বক্রাকার কার্নিশ থেকে প্রতীয়মান হয়।

১৩। বোকাইনগর, দুর্গ, সপ্তদশ শতাব্দী

ময়মনসিংহ শহরের প্রায় ১২ মাইল পূর্বে বোকাই নামে একজন কোচ রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর নাম অনুসারে স্থানটি বোকাইনগর নামে পরিচিত। জনশ্রুতি আছে যে, তিনি, আ.ক.ম. যাকারিয়ার মতে, একাদশ শতাব্দীতে এখানে রাজত্ব করতেন কিন্তু এটি নির্ভরযোগ্য তথ্য নয়। নাজিমউদ্দীন আহমদ তাঁর Discover the Monuments of Bangladesh গ্রন্থে বোকাইনগর সম্বন্ধে একটি নির্ভরযোগ্য বিবরণ দিয়েছেন : "The site of Bokainagar which is situated about twelve miles east of Mymensingh town on the eastern bank of the Brahmaputra river is an important medieval defence post. It is said to have been established in the 15th century by a certain local chief called Bokai when the ancient kingdom of Kamrup was beginning to disintegrate. Soon after it was annexed by Hussain Shah in 1495 and he placed his son Nusrat Shah in charge of it." বঙ্গানুবাদ : "ময়মনসিংহ শহরের ১২ মাইল পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদী তীরে বোকাইনগর নামে একটি মধ্যযুগীর প্রাচীন দুর্গ নির্মিত হয়। এই দুর্গটি বোকাই নামক একজন কোচ রাজা পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মাণ করেন

বলে ধারণা করা হয়। তখন বোকাইনগর প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কামরূপ রাজ্যের পতনের যুগে বোকাইনগরের অভ্যুত্থান। মুসলিম আমলে ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান হোসেন শাহ কর্তৃক বোকাইনগর অধিকৃত হয় এবং হোসেন শাহ তদীয় পুত্র নসরত শাহকে এ অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করেন।" পরবর্তীকালে মুঘলদের দ্বারা বিতাড়িত হলে পাঠান শাসক ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে বোকাইনগর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি দুর্গটি পুনঃনির্মাণ করে সপরিবারে বসবাস করতে থাকেন। খাজা উসমান বোকাইনগর থেকে মুঘলদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েন এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর পূর্ব পার্শ্বে হাসানপুর এবং এগারসিন্ধুসহ কয়েকটি ঘাঁটি থেকে মুঘলদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। যাহোক, ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে খাজা উসমানকে জাহাঙ্গীরের আমলের বাংলার সুবাদার ইসলাম খান বোকাইনগর থেকে বিতাড়িত করেন।

বোকাইনগরের দুর্গটি এখন একটি ধ্বংসস্তূপ। আ. ক. ম. যাকারিয়া বলেন, "দুর্গটি ছিল পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় এক মাইল লম্বা এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রায় আধমাইল চওড়া : চারদিকে ছিল মাটির তৈরী উঁচু প্রাচীর। প্রাচীরের বাইরে ছিল গভীর ও প্রশস্ত পরিখা। তবে দুর্গের দক্ষিণদিকে পরিখার কোন চিহ্ন এখন (১৯৮২ খ্রিঃ) দেখা যায় না। দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে ছিল খাজা ওসমাজার বসতবাড়ি। কিন্তু বসতবাটির কোন চিহ্ন এখন দেখা যায় না।"

বোকাইনগরের প্রাচীন কীর্তির মধ্যে রয়েছে একটি ছাদবিহীন মুঘল মসজিদ (বর্তমানে পুনঃনির্মিত), মাজার, পুল, দুর্গপ্রাচীরের ভগ্নাংশ ইত্যাদি। দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এবং দুর্গ এলাকার বাইরে একটি মাজার আছে। অনুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত উত্তর-দক্ষিণে লম্বা প্রায় আধবিঘা জমির উপর মাজাবটি অবস্থিত। দক্ষিণ দেয়ালে একটি তোরণ রয়েছে। জনশ্রুতি অনুযায়ী মাজারটি মিজানশাহের মাজার বলে অভিহিত। মাজার থেকে প্রায় ২৫০ গজ উত্তরে সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলের অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি মসজিদ রয়েছে। আ. ক. ম. যাকারিয়ার মতে ১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে এক গম্বুজবিশিষ্ট এই মসজিদটি নির্মিত হয়। গম্বুজবিহীন এই মসজিদটি ভগ্নাবস্থায় রয়েছে।

১৪। শেরপুর, মাঈ সাহেবার মসজিদ, ষোড়শ শতাব্দী

ময়মনসিংহের শেরপুর অঞ্চল খুবই প্রাচীন এবং এখানে অনেক প্রাচীন কীর্তি রয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় গম্বুজবিশিষ্ট বৃহদাকার একটি মসজিদ। বর্গাকার এই মসজিদটির চত্বরে একটি পাকা কবর দেখা যাবে। মসজিদটিতে পূর্বদিক থেকে তিনটি খিলানপথ দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। খিলানপথের বরাবর কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব রয়েছে। খিলানপথ তিনটি আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ ও নকশাকৃত। উত্তর ও দক্ষিণদিকের দেওয়ালে একটি করে জানালা রয়েছে। মসজিদটিতে কোনো শিলালিপি নেই। তবে জনশ্রুতি অনুযায়ী এই মসজিদটি বারুই বিবি নামের একজন মহিলা নির্মাণ করেন, যাঁর প্রকৃত নাম মাঈ সাহেবা এবং তিনি প্রখ্যাত পীর ও সাধক শাহ কামালের স্ত্রী ছিলেন। খুব সম্ভব এই মসজিদটি হোসেনশাহী আমলে ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত হয়।

১৫। ঘাগরা, মসজিদ, ১৪৫২ খ্রিঃ (অধুনালুপ্ত)

গাফরগাঁও উপজেলার গয়েশপুর গ্রামে ঘাগরা নামক স্থানে একটি প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যাবে। গয়েশপুরের নামকরণ হয়েছে সম্ভবত গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহের নাম থেকে। তিনি সম্ভবত ১৩১১ খ্রিস্টাব্দে এখানে একটি টাঁকশাল স্থাপন করেন। সামসুদ্দীন আহমদ বলেন যে, এখানে প্রাপ্ত শিলালিপিতে হিজরী ৮৫৬/ ইংরেজি ১৪৫২ সনের উল্লেখ আছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, যে উলুঘ খান ঘাগরাতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। যদিও এই শিলালিপিতে কোনো সুলতানের নাম উল্লেখ নেই তবুও ঐতিহাসিক সূত্রে বলা যায় যে সুলতান মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে এই মসজিদটি স্থাপিত হয়। বর্তমানে এই মসজিদটির কোনো অস্তিত্ব নেই। বর্তমানে এখানে একটি আধুনিক মসজিদ নির্মিত হয়েছে। ভূমি-নকশা থেকে বলা হয় যে, এটি তিন গম্বুজ-বিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদ ছিল।

১৬। আইলাজোলা, মসজিদ, ষোড়শ শতাব্দী

মধুপুর থানা থেকে ৪ মাইল উত্তরে আইলাজোলা নামে একটি জনপদ রয়েছে। এখানে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। আ. ক. ম. যাকারিয়ার মতে, ২৪ বর্গফুটবিশিষ্ট এই মসজিদটি একটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত ছিল। মসজিদটি এভাবে ধ্বসংপ্রাপ্ত হয়েছে যে এর কোনো স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় না এবং এ কারণে এর নির্মাণ-তারিখ সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু ধারণা করা যায় যে, হোসেনশাহী আমলের শেষভাগে, সম্ভবত সুলতান নসরত শাহের রাজত্বকালে এই মসজিদটি স্থাপিত হয়।

১৭। মদনপুর, শাহ্ সুলতানের দরগা, সপ্তদশ শতাব্দী

নেত্রোকোনা মহকুমার (বর্তমানে জেলা) অন্তর্গত কেন্দুয়া থানাধীন মদনপুর গ্রামের সাথে স্থানীয় কামেল পীর-সাধক ও দরবেশ শাহ সুলতানের স্মৃতিবিজড়িত। যদিও শাহ সুলতানের মাজারটি খুবই সাদামাটা এবং বৈচিত্র্যহীন তবুও ধারণা করা হয় যে, তিনি তুরষ্ক থেকে ৪০ জন সাহাবী নিয়ে এদেশে ধর্মপ্রচারে আসেন। যাকারিয়ার মতে, তাঁর আগমনকাল হিজরী ৪৪৫/ইং ১০৫২ সন। যাহোক, কথিত আছে যে, মদন কোচ নামের একজন স্থানীয় রাজা কামেল পীরকে হত্যার জন্য বিষপানে বাধ্য করেন। কিন্তু দরবেশের বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া না হওয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়নি এবং মদন রাজা অভিভূত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। বর্তমানে এটি দরগা-মদন নামে পরিচিত। খুব সম্ভব ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে শাহ্ সুজা এ দরগা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লা-খেরাজ সম্পত্তি দান করেন।

১৮। গড় জরিপা, জামালপুর, দুর্গ (অধুনালুপ্ত), পঞ্চদশ শতাব্দী

জামালপুর মহকুমায় (বর্তমানে জেলা) শেরপুর গ্রামের ৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গড় জরিপা নামক একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। কথিত আছে যে, ইলিয়াস শাহী আমলে সুলতান সেকান্দার শাহের রাজত্বকালে এ অঞ্চলে জরিপ বাদশা নামে একজন শাসক

ছিলেন। তাঁর নামানুসারে স্থানটি গড় জরিপা বা জরিপার ঢিপি বলে পরিচিত। এগারসিন্ধু দুর্গের মতো সম্ভবত এখানে একটি মাটির দুর্গ ছিল। এখানে কোনো লেখা পাওয়া যায়নি এবং এ কারণে এই প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গের কোনো বিষদ বিবরণ জানা যায় না। এখানে প্রাপ্ত ধ্বংসকীর্তির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য বারদুয়ারী মসজিদ কিন্তু খনন করে এখানে কায়েকটি কুঠরী পাওয়া গেছে। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, এখানে একটি প্রাসাদ ছিল। যাহোক, গড় জরিপার মাটির দুর্গের তোরণে সুলতান দ্বিতীয় ফিরোজ শাহের আমলের (১৪৮৬-৮৯ খ্রিঃ) একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। কলকাতার ইন্ডিয়ান জাদুঘরে রক্ষিত এই শিলালিপিটি থেকে জানা যায় যে, এখানে বিশালাকার ভল্ট বা মায়ার নির্মিত হয়েছিল। এইচ. ব্লকম্যান এই মাজারের নির্মাতার নাম 'মজলিস শামনা' বা হুমায়ুন শাহ বলে অভিহিত করেন।

১৯। মুখশিমলা, প্রাচীন মসজিদ, সপ্তদশ শতাব্দী (অধুনালুপ্ত)

জামালপুর মহকুমার ইসলামপুর থানাধীন মুখশিমলা গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। মসজিদটি মুঘল আমলে নির্মিত হয় বলে ধারণা করা যায়।

২০। ধরমট, শাহ কাঁমালের দরগা, সপ্তদশ শতাব্দী

জামালপুর মহকুমার ধরমট নামে একটি গ্রামে শাহ কামাল নামে একজন বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক ও সাধকের মাজার-দরগা রয়েছে।

২১। গুরাই, টাঙ্গাইল, মসজিদ, সপ্তদশ শতাব্দী

এগারসিন্ধুর ১৬ মাইল পূর্বে গুরাই নামে একটি স্থানে সপ্তদশ শতাব্দীর একটি অতি সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয়েছে। বর্গাকার এক গম্বুজবিশিষ্ট গুরাই মসজিদের সাথে মসজিদপাড়া মসজিদের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যাবে। সুলতানী ও মুঘল আমলের স্থাপত্য-রীতির সংমিশ্রণে সৃষ্ট গুরাই মসজিদটি বর্গাকার এবং এর চার কোনায় চারটি অষ্টকোণাকার বুরুজ রয়েছে। পূর্বদিক থেকে তিনটি খিলানপথ দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয় এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। প্রাক-মুঘল যুগের বক্রাকার কার্নিশ ব্যবহৃত না হলেও বাইরের প্রাচীরে যে আয়তাকার প্যানেল, নকশা পলেস্তরার নকশা ও ছোট ছোট টারেট বা pinnacle রয়েছে তা মসজিদের শোভা বৃদ্ধি করেছে।

গুরাই মসজিদের কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকার মিহরাব দেখা যাবে। মধ্যবর্তী মিহরাবটি আয়তনে বড় এবং বাইরের দিকে উদ্গত। আহমদ হাসান দানীর মতে, এ মসজিদটি ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি নির্মিত হয়েছে। অবশ্য এ মসজিদে কষ্টিপাথরে খোদাইকৃত কোনো শিলালিপি দেখা যায় না।

২২। খামারপাড়া, মসজিদ ও মাজার, (ধ্বংসপ্রাপ্ত), পঞ্চদশ শতাব্দী

টাঙ্গাইল মহকুমার (বর্তমানে জেলা) অন্তর্গত গোপালপুর থানাধীন সাবেক পুকুরিয়া পরগনার অধীন খামারপাড়া নামে একটি গ্রাম রয়েছে। এ স্থানটিকে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক আকর বললে অত্যুক্তি হবে না; কারণ এখানে বিস্তৃর্ণ এলাকা জুড়ে ঢিপি, ধ্বংসস্তূপ

পোড়ামাটির নকশা, মৃৎপাত্রের অংশ, প্রাচীন ইমারতের ভিত দেখা যাবে। এ ছাড়া রয়েছে মসজিদ, মাজার, জলাশয়। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় আবিষ্কারের মধ্যে ১৯টি শবাধার বা মাজার (tomb) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া একটি প্রাচীন মসজিদের ভিতও পাওয়া গেছে। ১৫ থেকে ২০ ফুট উঁচু একটি ঢিবিতে জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় এই মসজিদটি এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ জঙ্গল পরিষ্কার করে যে মসজিদটি খামারপুরে আবিষ্কার করেছে তা একগম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার ইমারত। এর পরিমাপ ১৬′-৬″ প্রতি দিকে। দেওয়ালের প্রশস্ততা ৫ ফুট। মসজিদের চার কোনায় চারটি অষ্টকোণাকার বুরুজ ছিল, যা বর্তমানে দেখা যায় না। পূর্বদিকে তিনটি খিলান প্রবেশপথ এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে প্রবেশদ্বার ছিল, যা খিলানাকৃতির। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব দেখা যাবে। মধ্যবর্তী মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং মিহরাব-প্রাচীরে টেরাকোটার অলঙ্করণ ব্যবহৃত হয়েছে। খামারপুর মসজিদের সন্ধান দেন মুজাফফর আহমদ কিন্তু তাঁর মন্তব্য যে এটি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আলী মার্দান খলজী কর্তৃক নির্মিত তা গ্রহণ করা যায় না; কারণ স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই মসজিদটি সুলতানী আমলের এবং এর সাথে হযরত পাণ্ডুয়ায় নির্মিত একলাখী সমাধির সাদৃশ্য রয়েছে। এমতাবস্থায় এটিকে পঞ্চদশ শতাব্দীর ইমারত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

মসজিদসংলগ্ন ১৯টি ইটের তৈরি বক্স-মাজার বা শবাধার (Cenotaph) সম্বন্ধে সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে বাংলাদেশে এ ধরনের বহু সারিবদ্ধ মাজার, যেমন পাঁচ পীরের মাজার দেখা যাবে। সম্ভবত ১৯ জন ধর্মপ্রচারক সাধক সুফী বাংলাদেশের বাইরে থেকে এদেশে আসেন এবং টাঙ্গাইল অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন।

২৩। টাঙ্গাইল, আতিয়া, জামে মসজিদ, ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দ

সমগ্র ময়মনসিংহ জেলায় সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় স্থাপত্যকীর্তি হচ্ছে টাঙ্গাইলের (বর্তমানে জেলা) আতিয়ার জামে মসজিদ। টাঙ্গাইল শহর থেকে ৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে লৌহজঙ্গ নামক একটি মরা নদীর পূর্ব তীরে আতিয়া মসজিদ অবস্থিত। আয়তাকার মসজিদটিতে একটি বারান্দা রয়েছে। মূল মসজিদটি বর্গাকার এবং সম্ভবত ৪০ × ৪০। বারান্দাসহ পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ৬০ ফুট। বারান্দা ৪০′ × ২০′ ফুট। বাংলাদেশের মসজিদ স্থাপত্যে বারান্দাবিশিষ্ট এক গম্বুজ দ্বারা আবৃত বর্গাকার মসজিদসমূহের মধ্যে আতিয়ার মসজিদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের সুলতানী আমলের মসজিদ বিভিন্ন স্থানে দেখা যাবে, যেমন গোপালগঞ্জ (১৪৬০), চামকাটি, গৌড় (১৪৭৮), মালদহ এবং রাজবিবি, গৌড়, রাজশাহী (১৪৩৭-৮৯)। আতিয়া মসজিদের দেয়াল খুব প্রশস্ত, ৭ $\frac{১}{২}$ ফুট। মসজিদটির গঠনশৈলী খুবই আকর্ষণীয় এবং বড় আকারে চারটি অষ্টকোণাকার বুরুজ চার কোনায় দেখা যাবে। মূল নামাজকক্ষটি একটি বিশালাকার গম্বুজ দ্বারা আবৃত এবং বারান্দায় তিনটি ছোট আকৃতির গম্বুজ রয়েছে। আতিয়া মসজিদটির স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দুই স্তরের বক্রাকার কার্নিশ যা পূর্বদিকে কৌণিক বুরুজের সাথে সংযোগ রক্ষা করেছে।

সুলতানী আমলের অন্যতম স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য এখানে স্পষ্টত দেখা যায়, যদিও এটি মুঘল যুগে নির্মিত ইমারত। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী দোচালা ঘর থেকে এ ধরনের বক্রাকার কার্নিশ অনুকরণ করা হয়েছে। গৌড়ের একলাখী সমাধিতে এর প্রয়োগ দেখা যাবে। এগারসিন্ধুর মসজিদে ব্যবহৃত বক্রাকার কার্নিশ অপেক্ষা আতিয়ার কার্নিশ অধিকতর সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং এখানে এটি প্রাধান্য পেয়েছে। কৌণিক বুরুজগুলো মৌল্ডিং দ্বারা বিভক্ত এবং দেয়ালের অলঙ্করণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রাচীরের উপরে উঠে গেছে।

আতিয়া মসজিদের পূর্বদিকে তিনটি কৌণিক খিলানাকৃতি প্রবেশপথ রয়েছে। মধ্যবর্তী খিলানপথটি অপেক্ষাকৃত বড়। খিলানের উভয় পাশে ছোট ছোট প্যানেল এবং টেরাকোটার নকশাদ্বারা শোভিত। সামনের প্রবেশপথের উপরে বক্রাকার মৌল্ডিং বা ব্যাণ্ড দেখা যাবে এবং তার উপরে অসংখ্য আয়তাকার প্যানেল নকশা দ্বারা ফাসাদটি রুচিসম্মতভাবে অলঙ্কৃত। বুরুজের উপরিভাগে কুপোলা রয়েছে এবং তার উপর কলস-চূড়া শোভা পাচ্ছে। মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হলে বারান্দা পার হয়ে নামাজ-কক্ষে যেতে হয়। বারান্দার উপরে অতি চমৎকার একই মাপের তিনটি গম্বুজ রয়েছে, যার উপরে কলসচূড়া শোভা পাচ্ছে। ড্রামের চারপাশে প্যারোপেটের নকশা। মধ্যবর্তী বড় গম্বুজটি ড্রামের উপর স্থাপিত এবং এর চারপাশে প্যারাপেটের নকশা দেখা যাবে। পাঁচটি বিভিন্ন আকারের কলসের সাহায্যে চূড়া তৈরি করা হয়েছে। চূড়া পদ্মপাতার ভিত থেকে উপরে উঠে গেছে। অভ্যন্তরে তিনটি অলঙ্কৃত অবতল মিহরাব নির্মিত হয়েছে কিবলাপ্রাচীরে। উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে খিলান প্রবেশপথ রয়েছে।

আতিয়া মসজিদের সম্মুখভাগে প্রধান প্রবেশপথের উপরে একটি শিলালিপি আছে। এর পাঠোদ্ধার করে জানা যায় যে, ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে বায়জিদ খান পন্নী, পুত্র সৈয়দ খান পন্নী 'প্রখ্যাত দরবেশ জীর আলী শাহানশাহ বাবা কাশ্মীরীর সম্মানে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। পীর আলীর দরগাহ মাজার মসজিদের সংলগ্ন। বিশেষজ্ঞদের মতে আতিয়া মসজিদটি সুলতানী স্থাপত্য থেকে মুঘল স্থাপত্যরীতির উত্তরোণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

২৪। আতিয়া, শাহ্ বাবা কাশ্মীরীর মসজিদ ও মাজার

আতিয়া মসজিদের আধ মাইল উত্তর-পূর্বে আতিয়ার সাধকপুরুষ শাহ্ বাবা কাশ্মীরীর মাজার দেখা যাবে। বর্তমানে এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ইটের দেওয়াল ঘেরা একটি শবাধার এবং এর উপরে টিনের চালা দেওয়া রয়েছে। আর. ডি. ব্যানার্জী এ অঞ্চল থেকে একটি প্রাচীন কষ্টিপাথরের উপর উৎকীর্ণ শিলালিপি আবিষ্কার করেন। সামসুদ্দীন আহমদ তাঁর Inscriptions of Bengal-এ এই শিলালিপির উল্লেখ করেন। এতে বাবা আদম কাশ্মীরীর নাম পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত, বাবা আদম কাশ্মীরীর রামপালের বাবা আদম শহীদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই এবং এ দুজন সাধকপুরুষ দু'টি পৃথক স্থানে সমাহিত রয়েছেন। এই শিলালিপিতে বাবা আদম কাশ্মীরীর মৃত্যুর তারিখ দেওয়া হয়েছে ৭ই জুমাদিউস সানী, ৯১৩ হিজরী অর্থাৎ খ্রিস্টীয় ১৫০৭। এই শিলালিপি

শবাধারের মাথার দিকে গাঁথা ছিল। তারিখটি সঠিক হলে ধারণা করা হয় যে, সুলতান হোসেন শাহের আমলে এই মাজারটি নির্মিত হয়। মাজারের পাশে একটি ছোট আকারের মসজিদ ছিল, যা বহু পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে টাঙ্গাইলের বিখ্যাত পন্নী পরিবারের সদস্য বায়েজীদ খান পন্নীর পুত্র সাঈদ খান পন্নী এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ফরাসী ভাষায় উৎকীর্ণ এই শিললিপিটি পন্নী পরিবারে হেফাজতে ছিল। বর্তমানে ঢাকার জাতীয় জাদুঘরে এটি সংরক্ষিত রয়েছে।

২৫। আতিয়া, একটি অসমাপ্ত মসজিদ, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দী

আতিয়া মসজিদ থেকে ২০০ গজ উত্তর-পশ্চিমে একটি নদীর তীরে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। নদীটির নাম লৌহজঙ্গ এবং যে ইমারতটির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তা যে অসমাপ্ত ছিল তা এর গঠনপ্রণালী দেখে বোঝা যায়। ভূমি-নকশা দেখে মনে হয় যে, এটি এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার মসজিদ ছিল এবং সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে অথবা কোম্পানির আমলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এটির নির্মাণ শুরু হয়েছিল কিন্তু রহস্যজনক কারণে এর নির্মাণ অসমাপ্ত রয়ে যায়। আ. ক. ম যাকারিয়া এই অসমাপ্ত কাজটির যে কারণ দেখিয়েছেন তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তিনি বলেন যে, একজন সওদাগর এই মসজিদটির নির্মাতা এবং কর্মব্যস্ত ব্যবসায়ী অনত্র চলে যাওয়ায় এ মসজিদটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মূল কারণ অন্য হতে পারে যেমন নদীর ভাঙন, অর্থাভাব, ওস্তাগার ও কারিগরদের অভাব।

২৬। টাঙ্গাইল, কসবা, মসজিদ, ষোড়শ শতাব্দী (অধুনালুপ্ত)

ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) অন্তর্গত কসবা নামক স্থানে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এ স্থানটিতে প্রাচীন ইমারতের অংশবিশেষ, মৃৎপাত্রের টুকরো, পোড়ামাটির অলঙ্করণ প্রভৃতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীগণ মনে করেন যে, এটি সুলতানী আমলের একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ। লক্ষণীয় যে, সমগ্র ময়মনসিংহ জেলায় অসংখ্য স্থাপত্যকীর্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এ থেকে ধারণা করা যায় যে এগুলো ঘনবসতিপূর্ণ মুসলিম অঞ্চল ছিল এবং মসজিদ স্থাপন তাই প্রমাণ করে। কসবা অর্থ ব্যবসাকেন্দ্র এবং এখানে মসজিদ স্থাপন বিচিত্র ছিল না। বহু স্থানে পোড়া মাটির নকশাসম্বলিত দেওয়ালের অংশ দেখা যায়। ভূমি-নকশা থেকে ধারণা করা হয় যে, এখানে তিনগম্বুজ-বিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদ ছিল। সম্ভবত শাহ-কামাল নামে একজন দরবেশ এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদটির মোট এলাকা হচ্ছে ৩০০ বর্গফুট।

২৭। টাঙ্গাইল, তেজপুর, মসজিদ, ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ (অধুনালুপ্ত)

সুলতানী আমলে বাংলায় সর্বত্র অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়, যার প্রায় অর্ধেকই কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াও যথেচ্ছভাবে ধ্বংসযজ্ঞ মুসলিম রীতিগুলোকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। Inscriptions of Bengal or Corpus of Muslim Inscriptions শীর্ষক গ্রন্থাবলীতে যত শিলালিপির বর্ণনা রয়েছে তার

অর্ধেকই দেখা যায় অধুনালুপ্ত এবং মূল শিলালিপিগুলো অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। হয়তো অন্য কোনো অপেক্ষাকৃত আধুনিক বা পরবর্তী পর্যায়ে নির্মিত ইমারতে গেঁথে দেওয়া আছে, কিংবা ইমারত ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে ব্যক্তিগত সংগ্রহে শিলালিপিগুলো রাখা হয়েছে কিংবা জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। এ ধরনের একটি শিলালিপি ঢাকার জাতীয় জাদুঘরে রয়েছে। টাঙ্গাইলের তেজপুর নামক একটি স্থান থেকে যে শিলালিপি পাওয়া গেছে তাতে ইংরেজি ১৪৬৫ সন উৎকীর্ণ রয়েছে। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, এটি সুলতান বরবক শাহের আমলে নির্মিত মসজিদ। হাবিবা খাতুনের মতে, তেজপুরের মসজিদটি যদি ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়ে থাকে তা হলে তা সুলতান মাহমুদ শাহের আমলে নির্মিত হওয়ার কথা। কিন্তু শিলালিপিতে ১৪৬৫ সন থাকায় ধারণা করা যায় এটি বরবক শাহের রাজত্বকালে স্থাপিত হয় যদিও শিলালিপিতে 'সুলতান' শব্দটি পাওয়া যায় না।

অবস্থিত। এটি আয়তাকার। সাইট-এর পরিমাণ উত্তর-দক্ষিণে ১৭৬৫ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৩০০ ফুট। প্রত্নকেন্দ্রটি বেতাই নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত এবং উত্তর দক্ষিণ ও পূর্বদিকে পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাই দেখা যায় প্রত্নকেন্দ্রটি পশ্চিম দিকেও নদী, পূর্ব-উত্তর ও দক্ষিণে কৃত্রিম খাল খনন করে সুরক্ষিত করা হয়েছে। দুর্গ প্রাচীর দিয়ে পরিবেষ্টিত এ প্রত্নকেন্দ্রে পূর্ব প্রাচীর ঘেঁষে বিরাট দীর্ঘ দুটি জলাশয় (দীঘি) রয়েছে, যার মধ্যভাগে পরিখার একটি সংযোগ দেখা যায় এবং পরিখার সাথে রয়েছে নদীর সংযোগ। এই জলাশয়ের সাথে পরিখা ও নদীর সংযোগ এই ইঙ্গিত বহন করে যে জলযান বা জাহাজ নদীপথে এই জলাশয়ে এসে থামে এবং এখান থেকে দুর্গে যাত্রীগণ প্রবেশ করে। এই কারণে সম্ভবত পূর্ব দিকে সিংহদ্বার নামে দুর্গের একটি ফটক আছে বলে ধারণা করা হয়। দুর্গের দক্ষিণ দিকে পরিখার বাইরে আবার একটি মাটির প্রাচীর তৈরী ও আর একটি পরিখা খনন করা হয়েছে। দুর্গকে নিরাপদ করার জন্য দক্ষিণ দিকে দ্বিগুণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা অনুমিত হয় যে দক্ষিণ দিকে শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা বেশি ছিল। কিন্তু উত্তর দিকে দুর্গ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ভিন্ন ধরনের অর্থাৎ উত্তর দিকে পরিখার ভিতরের দিকে মাটির প্রাচীর দেখা যাবে।"

মাটির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এই বৃহদাকার আয়তক্ষেত্রের অভ্যন্তরে ইটের তৈরি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত আর একটি আয়তাকার দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এর পরিমাণ ৮২০ × ৫০০ ফুট। এই অভ্যন্তরীণ দুর্গের মধ্যভাগে পূর্ব-পশ্চিমে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দু'টি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে উত্তরের অংশটি আকারে বড়। উত্তরাংশে উত্তরদিকে যে উঁচু ঢিবি দেখা যায় তা সম্ভবত একটি প্রহরী টাওয়ার বলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা। এর পরিমাপ ৪৮ × ৭৩ ফুট এবং পাশের সমতল ভূমি থেকে ২২ ফুট উঁচু। বুরজ ঢিবির দক্ষিণ-পশ্চিম কোনা থেকে যে ইটের তৈরি প্রাচীর দক্ষিণ-দিকে চলে গেছে, যা সম্ভবত পশ্চিম প্রাচীর বলে ধারণা করা হয়। এই অভ্যন্তরীণ দুর্গের দক্ষিণভাগে ইটের পাড়বিশিষ্ট একটি জলাশয় দেখা যাবে। পুকুরের পূর্বদিকে কয়েকটি কবর রয়েছে। বুরুজ ঢিবির দক্ষিণ অংশ খনন করে কয়েক ধাপবিশিষ্ট সিঁড়ি উন্মোচিত হয়েছে। পূর্ব প্রাচীরের ঠিক মাঝামাঝি একটি খালি অংশ চোখে পড়বে এবং এই খালি অংশটিতে ৪-৫ ফুট উঁচু ঢিবি দেখা যাবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই স্থানে সিংহফটক বা Lion's Gate ছিল। দুর্গের উত্তর-পুর্ব কোনে পাঁচ কক্ষবিশিষ্ট একটি ইমারত ছিল। এর দেয়াল পোড়ামাটির নকশা দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। সমগ্র এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে পাথর ও ইটের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

রোয়াইলবাড়ি ময়মনসিংহের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন কীর্তির কেন্দ্রস্থল, ঠিক যেমন যশোহরের বাজারে দেখা যায়। এ স্থানে যে সমস্ত প্রত্নকীর্তি কালের স্বাক্ষর বহন করে রয়েছে তার মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

(ক) বারদুয়ারী মসজিদ,

এই ঢিবিটি অভ্যন্তরীণ দুর্গপ্রাচীরের দক্ষিণাংশে নিয়ামত বিবির মাজার থেকে ১২৫ ফুট দক্ষিণে অবস্থিত। এই ঢিবিটি স্থানীয়ভাবে বারদুয়ারী নামে পরিচিত। এখানে খনন করে সুলতানী আমলের একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এই

মসজিদটি আয়তাকার ছিল এবং এর চার কোনায় অষ্টকোণাকার বুরুজের অংশবিশেষ এখনও দেখা যাবে। বুরুজের ব্যাস ৪′-০২″ এবং মসজিদটির পরিমাপ ৭১৯ × ৪৭ ফুট। বর্তমানে এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত; দেয়াল মাত্র ৬′ ফুট পর্যন্ত অবশিষ্ট রয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তর দুই সারিতে চারটি করে মোট আটটি পাথরের স্তম্ভ ছিল। বর্তমানে শুধু ভিত রয়েছে। একটি স্তম্ভ থেকে অন্যটির দূরত্ব ও ৯′-৯″। অভ্যন্তরে ৫টি 'বে' অর্থাৎ পূর্ব-পশ্চিমে ৫টি সারি এবং উত্তর-দক্ষিণে ৩টি সারি অর্থাৎ ১৫টি বর্গাকার এলাকায় বিভক্ত। এই ১৫টি বর্গাকার এলাকার প্রতিটি একটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত ছিল। অর্থাৎ বারদুয়ারী মসজিদটির ১৫ গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার একটি ইমারত ছিল তা ভিত থেকেই প্রমাণিত হয়। পূর্বদিকে পাঁচটি খিলানাকৃতি প্রবেশপথ ছিল এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকে তিনটি করে দরজা ছিল অর্থাৎ সর্বমোট দরজার সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ১৫টি, কিন্তু ভুলক্রমে এটিকে বারদুয়ারী মসজিদ বলা হয়।

মসজিদের অভ্যন্তরে কিবলার দিকে পাঁচটি মিহরাব ছিল। এ সমস্ত মিহরাব পোড়া মাটির নকশা বা ফলক দ্বারা শোভিত। নকশাবলীর মধ্যে লতাপাতা, ফুল, জামিতিক নকশা প্রাধান্য পেয়েছে। মসজিদের প্রাচীর ৫′ চওড়া। অবতলাকৃতি পাঁচটি মিহরাবের মধ্যে মধ্যবর্তী মিহরাবটি আকারে বড় এবং বাইরের দিকে উদ্গত।

(খ) আয়তাকার ইমারতের ধ্বংসাবশেষ

রোয়াইলবাড়ি দুর্গের উত্তর প্রাচীর ঘেঁষে প্রায় মাঝখানে একটি উঁচু ঢিবি রয়েছে। ঢিবিটির উচ্চতা পার্শ্ববর্তী সমতলভূমি থেকে প্রায় ২২ ফুট। খনন করে এখানে একটি আয়তাকার ইমারতের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এর পরিমাপ ৭৫′ × ৬৪′। এটি ২০ ফুট উঁচু পর্যবেক্ষণ বুরুজ বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর পশ্চিম ও দক্ষিণ দেয়াল প্রায় ১৭′ চওড়া। এই ইমারতে ওঠার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি সিঁড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে। সিঁড়ির ধাপগুলো অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

রোয়ালবাড়ির ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সুলতানী আমলে চতুর্দশ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীতে এখানে দুর্গ, মসজিদ এবং অন্যান্য ইমারত নির্মিত হয়। বিশেষ করে পোড়াইটের ব্যবহার, নকশাকৃত ইটের অলঙ্করণ, মসজিদ ভূমি-নকশা দেখে প্রতীয়মান হয় যে এটি পঞ্চদশ শতাব্দীতে শাহজাদপুরে নির্মিত ১৫ গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের সমসাময়িক। কিন্তু মোঃ আবু মুসা ভুলক্রমে এটিকে ১৩/১৪ শতাব্দীর নির্মিত মসজিদ বলেছেন।

যশোহর

২২° ৪৭′ দক্ষিণ এবং ২৩° ৪৭′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮° ৪০′ পশ্চিম এবং ৮৮° ৪০′ পশ্চিম এবং ৮৯° ৫০′ পূর্ব দক্ষিমাংশের মধ্যে যশোহর জেলা অবস্থিত। এর উত্তরে ফরিদপুর জেলা, পশ্চিমে এবং উত্তরে নদীয়া জেলা, দক্ষিণে খুলনা এবং উত্তর-পূর্ব দিকে গোরাই বা মধুমতি নদী। এই জেলার আয়তন ৪,৫৪৭ বর্গমাইল। হুগলী এবং মেঘনা মোহনার মধ্যবর্তী ব-দ্বীপের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এ জেলা অবস্থিত।

আলেকজান্ডার কানিংহামের মতে 'যসর' বা সেতু নামের উৎপত্তি হয়েছে ছোট ছোট নদীনালা দ্বারা পরিবেষ্টিত অঞ্চল থেকে। বর্তমাজার সেতু, পুল ও সড়ক নির্মিত হবার পূর্বে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম ছিল নৌকা।" যশোহর নামের উৎপত্তির প্রসঙ্গে অপর একটি ব্যাখ্যা হল এ জেলার আদি নাম ছিল যশোহর বা যশোহারা—এর অর্থ গৌরববিহীন (depriver of glory)। একসময় যশোহরের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্থান ঈশ্বরীপুর, যা রাজা বিক্রমদিত্যের রাজধানী ছিল গৌরব ও ঐতিহ্যমণ্ডিত শহর ছিল কিন্তু মুসলিম আমলে গৌড়ে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হলে ঈশ্বরীপুরের গৌরব বা যশ লোপ পায়। রাজা প্রতাপাদিত্য যশোহর বা যশরকে যাশাহারা নামে অভিহিত করেন তাঁর পিতার রাজধানী ঈশ্বরীপুরের স্মৃতি অবিস্মরণীয় করার জন্য।

১। শৈলকূপা, মসজিদ, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ (৬১)

যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমাধীন (বর্তমানে জেলা) কুমার নদীর পাড়ে, ঝিনাইদহ শহরের দশ মাইল উত্তরে একটি প্রাচীন মসজিদ দেখা যাবে। উত্তরে একটি প্রাচীন মাজার দেখা যাবে। এর সংলগ্ন একটি সমাধিও রয়েছে। সমাধিটি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আরব বা স্থানীয়ভাবে মাওলানা সাহেবের সমাধি নামে পরিচিত। আব্দুল ওয়ালী শৈলকূপার প্রাচীন কীর্তির বিষদ বিবরণ দেন :

"প্রাচীন মসজিদের (যা রাজকীয় ফরমানে 'মসজিদ-ই-জা'মী বা জা'মী মসজিদ নামে অভিহিত) প্রাচীন ইতিহাস প্রসঙ্গে বলা যায় যে বাংলার সুলতান হোসেন শাহের পুত্র সুলতান নাসির (নসরত) শাহ গৌড় থেকে ঢাকা যাওয়ার পথে মৌজা শৈলকূপায় অবস্থান করেন। নাসির শাহের সাথে হযরত মওলানা মুহাম্মদ আরব নামে একজন প্রখ্যাত দরবেশ এবং রাজার মুর্শিদ বা আধ্যাত্মিক গুরু সাথে ছিলেন। আরও যাঁরা সঙ্গী

ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাকিম খান নামে একজন পাঠান, সৈয়দ শাহ্ আবদুল কাদির-ই-বাগদাদী এবং একজন ফকির। মওলানা এ স্থানটি দেখে বলেন যে, এ জায়গাটি আমার খুব পছন্দ এবং আমি এখানে বসবাস করব। মওলানার সাথে অপর যে তিনজন ছিলেন তারাও শৈলকূপায় থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। নাসির শাহ্ তাঁর সম্মতি দেন এবং ওয়াজির শাহ আলীকে পীরের খেদমতের জন্য নিয়োগ করেন। সুলতান কয়েক বিঘা লাখেরাজ সম্পত্তি প্রদান করেন এবং এ মৌজাটিকে তাঁর নাম অনুসারে নাসিরপুর মৌজা রাখা হয়।"

শৈলাকূপা মসজিদটি বারংবার সংস্কারের ফলে এর প্রাচীনত্ব নষ্ট হয়ে গেলেও স্থাপত্যকলার ইতিহাসে এটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি। মসজিদটির পরিমাপ ৩১$\frac{১}{২}$′ × ২১′ এবং দেয়াল ৫$\frac{১}{২}$′ পুরু। আয়তাকার বহু গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ হিসাবে এটি রামপালের বাবা আদমের মসজিদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। বাইরে মসজিদের চার কোনায় গোলাকার বুরুজ দেখা যাবে, যা ছাদ থেকে উঁচু হয়ে উপরে উঠে গেছে। সুউচ্চ এই বুরুজগুলো সমান্তরাল মৌল্ডিং দিয়ে কয়েকটি অংশে বিভক্ত। এর একটি অংশ খাঁজ-কাটা, চূড়ায় কুপোলা বা নিরেট গম্বুজ দেখা যাবে। তার উপরে কলসচূড়া। এরূপ সুউচ্চ মিনারেট বা বুরুজ সচরাচর দেখা যায় না। কুমিল্লার শাহ সুজার মসজিদে অবশ্য এ ধরনের মিনারেট নির্মিত হয়েছে তবে এগুলো সমসাময়িক নয়। মসজিদটিতে পূর্বদিক থেকে তিনটি খিলানপথ দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। মধ্যবর্তী খিলানপথটি অপেক্ষাকৃত বড়। এ ছাড়া উত্তর ও দক্ষিণদিকে দু'টি করে প্রবেশপথ রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণদিকের প্রবেশপথের উপরে জালির জানালা দেখা যাবে।

শৈলকূপা মসজিদটির অভ্যন্তরে দুটি আইল এবং তিনটি 'বে' রয়েছে। দুটি পাথরের স্তম্ভের সাহায্যে এটি বিভক্ত করা হয়েছে এবং অভ্যন্তরের ছয়টি চতুষ্কোণের উপর ছয়টি ক্ষুদ্রাকৃতি গম্বুজ নির্মিত হয়। সুলতানী আমলে নির্মিত গম্বুজগুলো অর্ধগোলাকৃতি ইটের তৈরি। এই ইমারতটিতে কোনো ড্রাম ব্যবহৃত হয়নি। গম্বুজের উপর কলসচূড়া শোভা পাচ্ছে। অভ্যন্তরে কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃতি গোলাকার মিহরাব দেখা যাবে। মধ্যবর্তী মিহরাবটি আয়তনে বড়। সংস্কারের পূর্বে কার্নিশ নিশ্চয় বক্রাকার ছিল। এখন সমান্তরাল করা হয়েছে। আব্দুল ওয়ালীর ভাষায়, "চতুর্দিকের কার্নিশসমূহ অত্যন্ত সুন্দর এবং সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিত। সম্মুখভাগের মধ্যবর্তী স্থানটি উঁচু করে নির্মিত হয়েছে ও ইটের নকশাকৃত।"

আহমদ হাসান দানী শৈলকূপা মসজিদের সাথে বাগেরহাটের তথাকথিত ষাইট গম্বুজ মসজিদের তুলনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাগেরহাটের মসজিদটি আয়তনে বিশাল এবং সত্তরটি গম্বুজ ও সাতটি চারচালা ছাদ দিয়ে আবৃত। শৈলকূপা মসজিদে ছয়টি গম্বুজ দেখা যাবে, যা রামপালের বাবা আদমের মসজিদে রয়েছে। উপরন্তু, বাগেরহাটের তথাকথিত ষাইট গম্বুজের যে সুস্পষ্ট বক্রাকার কার্নিশ দেখা যায় শৈলকূপা মসজিদে তা নেই।

আ. ক. ম. যাকারিয়া বলেন, "মসজিদের পূর্ব দিকে অনুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত আনুমানিক ৪৫′ × ৬০′ ফুট আয়তনের একটি উন্মুক্ত স্থানে প্রাচীন আমলের একটি মাজার আছে। স্থানীয় লোকের মতে এটি শাহ মোহাম্মদ আরিফ-ই-রব্বানী, ওরফে আরেফ শাহের মাজার। আব্দুল ওয়ালী আরফ শাহকে আরব শাহ বলেছেন।"

২। হিতেমপুর, শৈলকূপা, শাহী মসজিদ (অধুনালুপ্ত), ষোড়শ শতাব্দী

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলমগীর ঝিনাইদহের শৈলকূপার সন্নিকটে হিতেমপুর গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদের সন্ধান পান। মসজিদটি বহুপূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তবে স্থাপত্যিক নকশা ও নিদর্শনাদি দেখে মনে হয় সম্ভবত এ মসজিদটি সুলতানী আমলের শেষভাগে ১৫১৮-২০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। সুলতান নসরত শাহের আমলে প্রতিষ্ঠিত এই মসজিদটি এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার ইমারত ছিল। ২৭ বর্গফুট পরিমাপের এই মসজিদটির চার কোনায় অষ্টভুজাকৃতি বুরুজ ছিল। এর মধ্যে কেবলমাত্র দক্ষিণ-পশ্চিমের বুরুজটি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। বুরুজগুলো সমান্তরাল মৌল্ডিং দিয়ে বিভক্ত ছিল এবং চূড়ায় কুপোলা দ্বারা আবৃত ছিল। মসজিদটির প্রাচীর ৪′ – ৪″ চওড়া করে নির্মিত হয়। প্রাচীরে পোড়ামাটির নকশা থাকাই স্বাভাবিক যদিও এর কোনো চিহ্ন বর্তমানে নেই।

শাহী মসজিদটি এক গম্বুজবিশিষ্ট এবং কোনো ড্রাম ছাড়াই এটি নির্মিত হয়। পূর্বদিকে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকে দু'টি করে খিলানপথ দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হত। পূর্বদিকের মধ্যবর্তী খিলানপথটি অপেক্ষাকৃত বড়। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃত মিহরাব দেখা যাবে, মধ্যবর্তী মিহরাবটি আয়তনে বড়। মসজিদের পশ্চিমদিকের দেয়াল সামান্য উদ্গত বা projection দেখা যাবে। অলঙ্করণের দিক থেকে হিতেমপুরের শাহী মসজিদটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ জ্যামিতিক ও লতাপাতার নকশাসম্বলিত এই ইমারতটিকে বিশেষভাবে হোসেনশাহী আমলে সোনারগাঁয়ের গোয়ালদীতে নির্মিত মসজিদের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

৩। বিদ্যানন্দকাটি, জলাশয় এবং ভগ্নপ্রাপ্ত মসজিদ, পঞ্চদশ শতাব্দী

যশোহর শহরের ২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং কেশবপুর উপজেলার ৪ মাইল পশ্চিমে বিদ্যানন্দকাটি নামে একটি গ্রাম আছে। উল্লেখ্য যে, যশোহর জেলার বহু অঞ্চলের সাথে প্রখ্যাত সাধক, যোদ্ধা এবং শাসক খান জাহানের নাম জড়িত রয়েছে। তিনি খুলনার বাগেরহাটে বসতি স্থাপন করার পূর্বে যশোহর জেলার বার বাজার, বিদ্যানন্দকাটি, মুরলী কসবা প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থান করেন। এমতাবস্থায় বিদ্যানন্দকাটিতে খান জাহানের স্মৃতিবিজড়িত প্রাচীন ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। আ. ফ. ম. আবদুল জলীল বলেন, "যশোর থেকে সর্বপ্রথম তাঁরা (খান জাহান ও তাঁর অনুচরবর্গ) খানপুরে উপস্থিত হয়ে সেখানকার বহু অধিবাসীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। খানপুর থেকে অনুচরবর্গ বিদ্যানন্দকাটিতে আস্তানা স্থাপন করেন। এখানে তাঁরা একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনন করেন। সে আমলের বহু কীর্তিমালার ধ্বংসাবশেষ এখনও এতদঞ্চলে বিদ্যমান। বিদ্যানন্দকাটির দীঘির দৈর্ঘ্য ১৬০০ হাত এবং প্রস্থ প্রায়

৭০০। দীঘি ছাড়াও খান জাহানের পৃষ্ঠপোষকতায় এখানে মসজিদসহ বিভিন্ন ধরনের ইমারত নির্মিত হয়।"

৪। বারবাজার, সাওদাগর মসজিদ, পঞ্চদশ শতাব্দী (অধুনালুপ্ত)

যশোহর ঝিনাইদহ সড়কের ১০ মাইল উত্তরে একটি অতি প্রাচীন জনবসতিপূর্ণ এলাকা রয়েছে। সাধারণভাবে বারবাজার নামে পরিচিত প্রাচীন স্থানটি মজে যাওয়া ভৈরব নদীর একটি শাখায় অবস্থিত ছিল। এ অঞ্চলে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ জরিপ করে অনেক প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছে। জরিপের ফলে দেখা যায় যে, দুই থেকে তিন, আবার অনেকের মতে দশ থেকে পনেরো মাইল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বার বাজারের স্থাপত্যকীর্তি, ইমারত ও ধ্বংসাবশেষ, জলাশয় সড়ক, বিক্ষিতভাবে মৃৎপাত্রের টুকরো নাকশাকরা ইট. ভিটি. ঢিপি প্রভৃতি লক্ষ করা যাবে। 'সুন্দরবনের ইতিহাস' প্রণেতা আ. ফ. ম. আবদুল জলীল বলেন, "বারবাজার অঞ্চলে এখনও বহু দীঘি (লোকে বলে ছয় বুড়ি ছয়টি অর্থাৎ একশত ছাব্বিশটি) বিদ্যমান থেকে এর প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করে আসছে। প্রত্যেকটি পুকুরে পাকা ঘাট ছিল। অনেকগুলো পুকুর এখনও প্রায় পূর্বাবস্থায় আছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান আমলে প্রায় দশ বর্গমাইল জুড়ে এ শহর বিস্তৃত ছিল।" আ. ক. ম. যাকারিয়া এ সমস্ত জলাশয়ের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করেন, যথা—(১) রাজমাতার দীঘি, (২) সওদাগর দীঘি, (৩) পীর পুকুর, (৪) মীরের পুকুর, (৫) ঘোড়ামারি পুকুর, (৬) চেরাগদানী দীঘি, (৭) গলাকাটা দীঘি, (৮) ভাইবোন পুকুর, (৯) শেখের পুকুর, (১০) মিঠা পুকুর, (১১) পাঁচ পীরের দীঘি. (১২) কানাই দীঘি (১৩) চাল-ধোওয়া দীঘি ইত্যাদি।

আ. ক. ম. যাকারিয়া মন্তব্য করেন, "পাকা সড়ক থেকে বাজারের ভিতর দিয়ে যে কাঁচা রাস্তাটি পশ্চিম দিকে গ্রামের দিকে চলে গেছে তার উভয় পার্শ্বে বর্তমানে বেশিরভাগ প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ ও জলাশয়গুলোর অস্তিত্ব দেখা যায়। পাকা সড়কের নিকটবর্তী এলাকায় বর্তমানে বাজার, স্কুল, অফিস ও আবাসগৃহাদি গড়ে উঠেছে। এ সমস্ত স্থানে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তি ছিল বলে স্থানীয় লোকের কাছে জানা যায়। কিন্তু বর্তমানে এগুলো খুঁজে বের করা আর সম্ভব নয়। বাজারের পথ ধরে আর একটু অগ্রসর হলেই আর একটি বড় জলাশয় চোখে পড়ে। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ ও ৩৬ বিঘা ভূমি নিয়ে গঠিত জলাশয়কে সওদাগরের দীঘি বলা হয়ে থাকে। দীঘির পশ্চিম তীরে প্রায় দেড় বিঘা ভূমি জুড়ে প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ ১০ ফুট উঁচু একটি মাঝারি ধরনের ঢিবি আছে। লোকে বলে সওদাগর দীঘি।"

বারবাজারে প্রাক-মুসলিম যুগের কীর্তি লক্ষ করা যায়। এটি হিন্দু-বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মনে করেন। হিন্দু আমলে এর নাম ছিল চম্পানগর। নাজিমউদ্দীন আহমদ বলেন, "বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বসতির ধ্বংসাবশেষ ভৈরব নদীর উত্তর তীর ব্যাপী প্রায় ৩ মাইল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যা এ স্থানের প্রাচীন গৌরবকে ইঙ্গিত করে। অসংখ্য ইমারতের ধ্বংসাবশেষ, মন্দির, মঠ, মসজিদের নিদর্শন ভগ্নাবস্থায় দেখা যাবে। এ স্থানটি বিশেষভাবে ১২৬টি পুরাতন বৃহদাকার জলাশয়ের জন্য বিখ্যাত

ছিল। বারবাজারের পশ্চিম দিকে ১৫/১৬টি কৌণিক স্তূপের আকৃতির ঢিপি দেখা যাবে। ধ্বংসাস্তূপের মধ্যে নকশাকৃত পাথরের স্তম্ভ এবং হিন্দু ইমারতের ভিত্ জঙ্গলের মধ্যে দেখা যাবে। জনশ্রুতি অনুযায়ী এ সমস্ত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলো চম্পানগর নামে পরিচিত। চম্পানগর শব্দটি চম্পাইনগর থেকে উদ্ভূত। এটি খুবই অস্বাভাবিক যে এ সমস্ত ভিটিগুলো বৌদ্ধ স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন বহন করছে।"

যাহোক, মুসলিম আমলে, বিশেষ করে পঞ্চদশ শতাব্দীতে উলুখ খান জাহান বাগেরহাটে যাবার পথে বারবাজারে অবস্থান করেন। আবদুল জলীল বলেন, বারবাজার অতীব প্রাচীন স্থান—এর একাংশের নাম ছাপাই নগর ছিল। খান জাহান বারবাজারে এসে অনেকগুলো দিঘি ও মসজিদের প্রতিষ্ঠা করেন। বারবাজারের জরাজীর্ণ ঐতিহাসিক মসজিদটি এখনও খান জাহানের কীর্তি ঘোষণা করছে। খান জাহান নামীয় কোনো দিঘি না থাকলেও এর কয়েকটি যে তিনি খনন করেছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। বারবাজারের মসজিদটি এক গম্বুজবিশিষ্ট এবং তা বাগেরহাটের পশ্চিমে রণবিজয়পুরে ফকিরবাড়িতে অবস্থিত খানজাহানের অন্যতম মসজিদের আকৃতিবিশিষ্টঅ 'বারবাজার' নামের উৎপত্তির সম্বন্ধে নানারকম মত প্রচলিত রয়েছে। এখানে সম্ভবত বারোটি বাজার ছিল তাই এর নামাকরণ হয়েছে বারবাজার। কিন্তু সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হচ্ছে উলুঘ খান জাহানের বারোজন শিষ্য সম্ভবত এ অঞ্চলে থেকে যান পীরের নির্দেশে এবং তাঁরা ইসলাম প্রচারে নিজেদের জীবন কাটিয়ে দেন।

সওদাগর দিঘির পশ্চিমপাড়ে প্রায় ১০ ফুট উঁচু টিপির উপর প্রায় ১$\frac{১}{২}$ একর জুড়ে প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যাবে। এই ধ্বংসস্তূপটি সাওদাগর মসজিদের বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। এ মসজিদটি সুলতানী আমলে ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছে বলে মনে হয়। বর্তমানে খনন করে মসজিদটির ভিত্তিভূমি ও ধ্বংসাবশেষ বের করা হয়নি। খুব সম্ভব বাগেরহাটের খানজাহানী স্থাপত্য রীতিতে সওদাগর মসজিদটি নির্মিত হয়।

৫। বারবাজার, গোরার মসজিদ, ষষ্ঠদশ শতাব্দী (ধ্বংসপ্রাপ্ত) (৬২)

ঝিনাইদহ থানার বারবাজার নামক স্থানে ধ্বংসপ্রাপ্ত বহু ইমারতের মধ্যে গোরার মসজিদটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। বর্গাকার এক গম্বুজবিশিষ্ট গোরার মসজিদের পরিমাপ ২০ বর্গফুট। পূর্বদিক থেকে এ মসজিদে তিনটি খিলানপথ দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। এর ছাদ বহুপূর্বে ধসে পড়েছে, সমস্ত দেয়াল অক্ষত অবস্থায় নেই। উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। বাংলার সুলতানী আমলে বর্গাকার এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের আদলে গোরার মসজিদটি নির্মিত। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব দেখা যাবে। এর মধ্যে মধ্যবর্তী মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড়। মিহরাবগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে খাঁজকাটা খিলান নকশা এবং সরু পিলাস্টার যা থেকে মিহরাবের আলকোভে বা অর্ধগোলাকার ছাদ উঠে গেছে, পেনাডেনটিভের সাহায্যে গম্বুজটি নির্মিত। কার্নিশ কি ধরনের ছিল বলা যায় না কারণ ছাদের উপরের অংশ বহু পূর্বে পড়ে গেছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ গোরার মসজিদটি পুনঃনির্মাণ করেছে। এ থেকে

ধারণা করা যায় যে, এটি নিশ্চিতভাবে সুলতানী আমলে নির্মিত হয়। চারকোনায় চারটি আটকোনা করে সমান্তরাল মৌল্ডিং বা ব্যান্ড দ্বারা বিভক্ত বুরুজগুলো নিচে থেকে উপরের দিকে সরু হয়ে গেছে। ছাদের সমান্তরাল প্যারাপেট ও মার্লন রয়েছে।

গোরার মসজিদটি যে টেরাকোটা অলঙ্করণ দ্বারা শোভিত ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। জ্যামিতিক লতাপাতার নকশা প্রাধান্য পেয়েছে। অলঙ্করণের সামান্যতম নির্দশন কেন্দ্রীয় মিহরাবে লক্ষ করা যায়। অবতলাকৃতি এই মিহরাবটির খিলান দু'পাশে দুটি মোটা স্তম্ভ থেকে নির্মিত ঝুলন্ত শিকল ও প্রদীপ, গোলাপ ফুল, বরফিসহ বিভিন্ন ধরনের মোটিফ ব্যবহৃত হয়েছে। টেরাকোটা পোড়ামাটির অলঙ্করণে গোরার মসজিদে সোঁনারগাঁর গোয়ালদীর মসজিদ, বাগেরহাটের খান জাহানের আমলে নির্মিত মসজিদসমূহের অলঙ্করণের প্রতিফলন দেখা যায়।

৬। বারবাজার, চিরাগদানী মসজিদ, পঞ্চদশ শতাব্দী (অধুনালুপ্ত)

বারবাজরের চিরাগদানী দিঘির পাশে একটি প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ করা যায়। এটি একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসস্তূপ বলে মনে হয়। সম্ভবত এটি বর্গাকার এক গম্বুজবিশিষ্ট ছিল। এর পরিমাপ ২০ বর্গফুট। ভগ্নপ্রাপ্ত দেয়ালটি ৪$\frac{১}{২}$ ফুট প্রশস্ত। এই মসজিদটি জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। কেবলমাত্র উত্তর-দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের প্রাচীরের কিছু অংশ ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। পূর্বদিকে তিনটি প্রবেশপথ ছিল এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে খিলানপথ ছিল। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব ছিল। বর্গাকার মসজিদটি একটি অর্ধগোলাকৃতি গম্বুজ দিয়ে আবৃত ছিল।

৭। বারবাজার, সাতগাছিয়া মসজিদ, পঞ্চদশ শতাব্দীর ধ্বংসপ্রাপ্ত (৬৩)

গোরার মসজিদের সন্নিকটে একটি জঙ্গলাকীর্ণ ঢিপি পরিষ্কার করে সুলতানী আমলের একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

স্থানীয়ভাবে এ মসজিদটি সাতগাছিয়া নামে পরিচিত। বর্তমানে এই বিশালাকার মসজিদটির প্রাচীরের কিছু অংশ দেখা যাবে। হাবিবা খাতুন তাঁর নিবন্ধ 'Sonargaon : its History and Monuments'-এ এই মসজিদের বিষদ বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে, যেহেতু এই মসজিদটি অদিনা নামে এক দিঘির পাড়ে নির্মিত হয় সেজন্য সাতগাছিয়া মসজিদটি আদিনা মসজিদ নামে পরিচিত। উল্লেখ্য যে, মালদা জেলার হযরত পাণ্ডুয়ায় সুলতান সেকেন্দার শাহ আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন চতুর্দশ শতাব্দীতে। এ ছাড়া গুজরাটের পাটান নামক স্থানেও আদিনা নামে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। 'আদিনা' ফার্সি শব্দ এবং এর অর্থ শুক্রবার—এ থেকে ধারণা করা যায় যে সাতগাছিয়া মসজিদটি ওয়াকতিয়া মসজিদ না হয়ে জামে মসজিদ ছিল। মসজিদটি জঙ্গলাকীর্ণ থাকায় বহুদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে স্থানীয় মুসল্লীদের চেষ্টায় জঙ্গল পরিষ্কার করে মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। এজন্য মসজিদটি সাতগাছিয়া গায়েবানা ঢিপি নামে পরিচিত ছিল। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই মসজিদটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে সংস্কার করে। আবদুল বারী বরেন্দ্র রিসার্চ

সোসাইটির জার্নালের একটি সংখ্যায় সাতগাছিয়া মসজিদের উপর গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

সাতগাছিয়া মসজিদটির ভূমি-নকশা পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হবে যে, এই আয়তাকার মসজিদটির অভ্যন্তরে চার সারিতে ছয়টি করে পাথরের স্তম্ভ ছিল, যা বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। কেবল পাথরের স্তম্ভের ভিত্তিগুলো অবশিষ্ট রয়েছে। এভাবে অভ্যন্তর চার সারিতে ছয়টি স্তম্ভ দিয়ে সর্বমোট ৩৫টি বর্গাকার এলাকায় বিভক্ত করা হয়েছে। এই ৩৫টি বর্গাকার এলাকা ৩৫টি গম্বুজ দিয়ে আবৃত ছিল, অর্থাৎ সাতগাছিয়া মসজিদটি ৩৫ গম্বুজবিশিষ্ট বিশালাকার ইমারত ছিল। বাংলার সুলতানী স্থাপত্যকলার ইতিহাসে হযরত পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ ও বাগেরহাটের তথাকথিত ষাইট গম্বুজ (প্রকৃতপক্ষে সত্তর গম্বুজ ও সাতটি চৌচালা) ব্যতীত ৩৫ গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ দেখা যায় না। ধ্বংসাবশেষ থেকে যা বোঝা যায় তা এই যে মসজিদটি আয়তনে ছিল দৈর্ঘ্যে ৭৮ ফুট এবং প্রস্থে ৬০ ফুট। মোটা দেয়ালবেষ্টিত মসজিদের চার কোনায় চারটি বুরুজ ছিল যার মধ্যে মাত্র একটির মূল ভিতটি অক্ষত রয়েছে। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, গোলাকার ভিতের উপর সুউচ্চ অষ্টকোণাকার বুরুজ ছিল। মধ্যে rubble বা অবিন্যস্ত ইটের খণ্ড দেখা যাবে। পুনঃনির্মিত সাতগাছিয়া মসজিদটির পূর্বদিকে সাতটি খিলানাকৃতি প্রবেশপথ ছিল যার বর্তমানে চিহ্ন নেই। কেবলমাত্র দরজার খোলা জায়গা রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণে পাঁচটি প্রবেশপথ ছিল। বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত এ সমস্ত খিলানগুলোর কি ধরনের নকশা ছিল তা বলা দুষ্কর।

সাতগাছিয়া মসজিদের অভ্যন্তরে চার সারিতে মোট ২৪টি পাথরের স্তম্ভ দেখা যাবে যা ভগ্নপ্রাপ্ত। এই স্তম্ভগুলোর সাহায্যে খিলান নির্মিত হয় এবং পেনডেনটিভের সাহায্যে ক্ষুদ্রাকার ৩৫টি গম্বুজ ছাদকে আবৃত করে রেখেছিল। কিবলাপ্রাচীরে সাতটির স্থলে ছয়টি মিহরাব দেখা যাবে এবং সপ্তমটির স্থানে তথাকথিত ষাইট গম্বুজের মিহরাব দেয়ালের মতো একটি দরজা রয়েছে। মিহরাবগুলো অবতলাকৃতি এবং অর্ধগালাকার। বর্তমানে কিবলার দিকে কিয়দংশ দোচালার ঘর তৈরি করে নামাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাতগাছিয়া মসজিদের পোড়ামাটির অলঙ্করণ ছিল খুবই আকর্ষণীয় ও উচ্চ মাজার লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশা সমস্ত মসজিদের দেয়ালকে শোভিত করে রেখেছিল।

৮। বারবাজার, তথাকথিত জোড়বাংলা মসজিদ (অধুনালুপ্ত), আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দী

বারবাজারে জোড়বাংলা মসজিদ নামে একটি প্রাচীন কীর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। আ. ক. ম. যাকারিয়া বলেন, "গোরাই মসজিদ থেকে কিছু দূরে এবং রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে একটি মাঝারি আকারের প্রাচীন জলাশয় আছে। জলাশয়ের পশ্চিম পাড়ে পরস্পর সংলগ্ন দুটি অনুচ্চ ঢিবি আছে। আয়তনে এক একটি প্রায় এক বিঘা। ঢিবি দু'টি প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ। লোকে বলে এটি জোড়বাংলা মসজিদ। একসঙ্গে লাগানো দু'টি মসজিদের অস্তিত্ব সাধারণত দেখা যায় না। তবে মসজিদের সঙ্গে হুজুরখানা বা

এবাদতখানা নির্মাণের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আবার সেকালে জোড়বাংলা মন্দির নির্মাণের অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়।" যাকারিয়ার মন্তব্য বিভ্রান্তিকর কারণ পাবনাসহ বাংলার অনেক অঞ্চলে জোড়বাংলা মন্দির (বিষ্ণুপুর) নির্মিত হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত জোড়বাংলা মসজিদ আবিষ্কৃত হয়নি।

৯। বারবাজার, মনোহর মসজিদ, (অধুনালুপ্ত), পঞ্চদশ শতাব্দী

বৃহত্তর বারবাজার এলাকার মনোহর নামক স্থানে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসস্তূপ দেখা যাবে। অনুসন্ধান ও জরিপ করে প্রতীয়মান হয় যে, সাতগাছিয়া মসজিদের মতো মনোহরেও আয়তাকার ৩৫ গম্বুজবিশিষ্ট একটি মসজিদ নির্মিত হয়। স্থাপত্যকীর্তি ও অলঙ্করণের দিক থেকে মনোহরের মসজিদটি এর পূর্বসূরি সাতগাছিয়া দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল। এই মসজিদটির পরিমাপ ২২.৬৭ × ১৬.১০ মিটার। সাতগাছিয়া মসজিদের মতো এই মসজিদটির প্রাচীরের ভগ্নাংশ ভিত ও পাথরে স্তম্ভের ভিত্তিমূলগুলো (stump) অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। এর দেয়াল ১.৬৫ মিটার পুরু ছিল। গোলাকার বুরুজ দ্বারা সংরক্ষিত এই মসজিদটির অভ্যন্তর চার সারি ইটের স্তম্ভ দিয়ে বিভক্ত করা হয়। প্রতি সারিতে ছয়টি স্তম্ভ ছিল। স্তম্ভগুলো সমান্তরালভাবে সাতটিতে বিভক্ত, যার ফলে অভ্যন্তরে সর্বমোট ৩৫টি বর্গাকার এলাকার সৃষ্টি হয়েছে। এই বর্গাকার এলাকা ৩৫টি ক্ষুদ্রাকার গম্বুজ দিয়ে আবৃত ছিল। পূর্বদিকে সাতটি খিলানপথ ছিল এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকে অনুরূপ পাঁচটি খিলানপথ ছিল। সাতটি 'বে'-র বরাবর কিবলাপ্রাচীরে ছয়টি অর্ধগোলাকার অবতলাকৃত মিহরাব ছিল। সপ্তমটি বাগেরহাটের তথাকথিত ষাইট গম্বুজের কিবলা দরজার মতো একটি দরজা দেখা যাবে। মনোহরের মসজিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, উত্তর-পশ্চিম কোণে যে খাদ দেখা যায় তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পশ্চিম দেয়াল ঘেঁষে একটি ইমারত নির্মিত হয়। এই ইমারতটি ইমামের বাসস্থান বলে মনে হয়।

বিশালাকার মনোহর মসজিদটির চারপাশে প্রাচীর ছিল। সম্প্রতি এই ইমারত থেকে খননের ফলে দুটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। একটি ইটের, যাতে হিঃ ৮০০/ ইং ১৩৯৭ সনের উল্লেখ আছে। অপরটি হোসেনশাহী রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হয়। স্থাপত্যিক রীতি ও অলঙ্করণ দেখে ধারণা করা যায় যে মনোহর মসজিদটি সাতগাছিয়া মসজিদের সমসাময়িক অর্থাৎ উভয় ইমারত পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত।

১০। বারবাজার, পীরের মাজার (অধুনালুপ্ত), সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দী

বারবাজারের অসংখ্য ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এটি একসময়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা ছিল এবং বাগেরহাটের খান জাহানের স্মৃতি বিজড়িত বহু কীর্তি এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মসজিদ ছাড়া মাজার, বসতবাড়ি, জলাশয়, রাস্তা, চিল্লাখানা, খানকা প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দেখা যাবে। আ. ক. ম. যাকারিয়া বলেন, "গোরাই মসজিদ থেকে প্রায় ১৫০ হাত উত্তরে এবং রাস্তার উভয় পার্শ্বে প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ একটি ছোট অনুচ্চ ঢিবি আছে। লোক বলে পীরের মাজার। কোন্ পীরের মাজার তা কেউ বলতে পারে না। এটি কোন ছোট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলেই মনে

হয়। ইটগুলো খুবই প্রাচীন এবং মুসলমান আমলের বলে মনে হয় না।" বারবাজারে পীর ফকিরদের আস্তানা থাকাই স্বাভাবিক কারণ মুরলী কসবা হয়ে খানজাহান বাগেরহাটে যাবার পথে তাঁর অনুচরদের ইসলাম প্রচারের জন্য এ অঞ্চলে রেখে যান এবং বারো আওলিয়ার নাম থেকেই সম্ভবত বাররাজার নামাকরণ হয়েছে।

১১। বারবাজার, গলাকাটা দিঘি এবং প্রাচীন কীর্তিসমূহ (অধুনালুপ্ত)

গোরাই মসজিদ থেকে প্রায় ২০০ গজ উত্তর-পশ্চিমে এবং রাস্তা থেকে প্রায় ১০০ গজ উত্তরে মাঝারি ধরনের একটি জলাশয় বা দিঘি রয়েছে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এবং আয়তনে ৫ বিঘা সম্বলিত এই দিঘির দক্ষিণ পাড়ে একটি ঢিবি রয়েছে। এর পরিমাপ লম্বায় ২৫ ফুট এবং উচ্চতায় প্রায় ৮ ফুট। এ স্থানের প্রাচীন কীর্তি আ. ক. ম. যাকারিয়া সরেজমিনে জরিপ করেন। তিনি বলেন, "বেশ বড় বড় পাথরের টুকরাও এখানে ওখানে পড়ে আছে। ঢিবির উপরে দু'টি কালো পাথরের স্তম্ভের মুখ বের হয়ে আছে। আনুমানিক ১ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট প্রায় গোলাকার স্তম্ভ দু'টির পারস্পরিক দূরত্ব প্রায় ৮ ফুট। স্তম্ভের উপরিভাগে ৩″ গভীর ও $১\frac{১}{২}$″ ব্যাসবিশিষ্ট ছিদ্র আছে। এতে মনে হয় স্তম্ভের উপর আরও পাথর সংযুক্ত ছিল। স্তম্ভ ও পাশের দেয়ালের উপর ছাদ ছিল বলে অনুমান করা যায়। এটিকে কেউ বলে গলাকাটার মসজিদ আবার কেউ বলে গলাকাটার মন্দির। খনন না করে এটি মসজিদ ছিল কি মন্দির ছিল, সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা কঠিন।"

১২। বারবাজার, শুভরাঢ়া মসজিদ, পঞ্চদশ শতাব্দী

অভয়নগর থানাধীন এবং থানা থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এবং ধূল গ্রাম থেকে মাইল পাঁচেক উত্তরে ভৈরব নদীর পাড়ে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাবে। পুণ্যাত্মা উলুঘ খান জাহান বারবাজার থেকে মুরলী কসবা হয়ে হাবেলী খলিফাতাবাদ অথবা বাগেরহাটের যাবার পথে অসংখ্য জলাশয়, মসজিদ, ইমারত, সড়ক নির্মাণ করেন। এমন একটি প্রাচীন জনপদ হচ্ছে শুভরাঢ়া। এখানে নির্মিত ও অধুনালুপ্ত মসজিদটি শুভরাঢ়া মসজিদ নামে পরিচিত। খুব সম্ভব খান জাহানের কোন শিষ্য এই ক্ষুদ্রাকার বর্গাকৃতি মসজিদ নির্মাণ করেন। বাইরের দিকে এর পরিমাপ ২৮′৬″ এবং ভিতরের দিকে ১৬′ ১০″ লম্বা ছিল। এর চার কোনায় চারটি বুরুজ ছিল। পশ্চিমদিকে একটি মিহরাব দেখা যাবে। উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্বদিকে একটি খিলানপথ দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হত। মসজিদটি একটিমাত্র গম্বুজ দ্বারা আবৃত। শিলালিপি না থাকায় সঠিকভাবে নির্মাণ-তারিখ বলা যাবে না। তবে খান জাহানের স্থাপত্যরীতির সাথে সাদৃশ্য থাকায় এটি সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত বলে ধারণা করা হয়। বাগেরহাটের ইমারতের মতো এতে কৌণিক বুরুজ, গম্বুজ, বক্রাকার কার্নিশ ও পোড়ামাটির নকশা থাকায় এটি সুলতানী আমলের কীর্তি বলে প্রতীয়মান হয়।

১৩। মির্জানগরের মুঘল স্থাপত্যকীর্তি, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ

কেশবপুর থানাধীন এবং থানা থেকে ৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে মির্জানগর অবস্থিত। মির্জানগর মুঘল অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল এবং এ যুগের বহু প্রাচীন কীর্তি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এ স্থানটির নামকরণ হয়েছে যশোহরের মুঘল ফৌজদার মির্জা

সফশিখানের নাম থেকে। সুবাদার শাহ সুজার শাসনামলে তাঁর শ্যালকপুত্র সফশিখান যশোহরের বারো ভুঁইয়ার অন্যতম প্রতাপশালী রাজা প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করে মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। মির্জানগর শাহ সুজার (১৬৩৯-৬০ খ্রিঃ) সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু এ নগরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য। তিনি ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষার্ধ যশোহর নামে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রতাপাদিত্যের যশোহর বর্তমানে যশোহর শহর নয়। অবশ্য প্রতাপাদিত্যের পতনের পর মুঘল ফৌজদার মির্জানগরেই বসবাস করতেন।

মির্জাপুরের মুঘল আমলের অনেক স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন দেখা যাবে। জেম্স্ ওয়েস্টল্যান্ড মির্জানগরের ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে বিষদ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "ত্রিমোহিনী থেকে আধ মাইল দূরে সড়কের পাশে, যা কেশবপুরের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে, একটি প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। ইমারতটি বর্গাকারে নির্মিত ২টি অঙ্গনে (courtyard)-এ বিভক্ত ছিল; এবং এর মাঝখানে ছিল একটি উঁচু প্রাচীর। উত্তরদিকের অঙ্গনের উত্তরদিকে এবং দক্ষিণদিকের অঙ্গনের দক্ষিণদিকে অনুরূপ উঁচু দেয়াল ছিল। উভয় অঙ্গনের পূর্বভাগে ২ সারি বাসগৃহ ছিল এবং এগুলো ছিল খুব সম্ভব অনুচরদের (retainers) আবাসস্থল। এগুলোর ভিতর দিয়েই ছিল অঙ্গনের প্রবেশপথ। উত্তরদিকের অঙ্গনের উত্তরভাগে ছিল ৩ গম্বুজবিশিষ্ট একটি ইমারত এবং সেটিই ছিল প্রকৃত বাসগৃহ। ইমারতটি জীর্ণ হলেও গম্বুজটি টিকে আছে। গম্বুজবিশিষ্ট ইমারতটির সম্মুখে এবং চত্বরের মধ্যে একটি বড় ধরনের জলাশয় রয়েছে। এটি গোসলখানা হিসাবে ব্যবহৃত হত। পাম্পের সাহায্যে চৌবাচ্চায় পানি-সরবরাহ করার ব্যবস্থা ছিল এবং গোসলের পানি ভূতল পাইপের সাহায্যে নিষ্কাশন করা হত। পার্শ্ববর্তী ভদ্রা নদী থেকে পানি সরবরাহ করা হত। দক্ষিণদিকের অঙ্গনে কয়েকটি মুসলিম সমাধি দেখা যাবে। এর বাইরেও কয়েকটি কবর দেখা যাবে। এই ইমারতের এক মাইল দক্ষিণে কিল্লা বা দুর্গ অবস্থিত। এটি আট থেকে দশ ফুট মাটির পাহাড় দিয়ে সৃষ্ট। উঁচু এলাকার চারিপাশে পরিখা দেখে মনে হয় যে এগুলো থেকে মাটি কেটে নেওয়া হয়েছিল। এটি বর্তমানে মতিঝিল নামে পরিচিত। এই উঁচু এলাকাটি এক সময়ে প্রাচীর বেষ্টিত ছিল যার বর্তমানে কোনো চিহ্ন নেই। পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত কেল্লাটির প্রধান তোরণ ছিল পূর্বদিকে। প্রবেশপথটি সুরক্ষিত ছিল এবং এখানে তিনটি কামান রাখার ব্যবস্থা ছিল যার একটি এখনও সেখানে রয়েছে।

ওয়েস্টমেকটে তিনগম্বুজবিশিষ্ট ইমারতকে ভুলবশত বাসস্থান বলেছেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি মসজিদ। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ এই মসজিদটির ভিতরের আয়তন ৫০′ × ১৪′, দেয়াল ছিল প্রায় ৪ ফুট প্রশস্ত। মাটি থেকে গম্বুজের উচ্চতা ছিল ২২ ফুট। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণে ১টি করে প্রবেশপথ ছিল। কিবলার প্রাচীরে ৩টি অবতলাকার মিহরাব দেখা যাবে। মসজিদের সামনে ছিল একটি চৌবাচ্চা। আশেপাশে অনেকগুলো পাকা কবর রয়েছে।

১৪। মির্জানগর, কিল্লাবাড়ি ও হাম্মামখানা, সপ্তদশ শতাব্দী

মির্জানগরের অনেক প্রাচীন কীর্তির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কিল্লাবাড়ি ও হাম্মামখানা। কিল্লাবাড়ি সম্বন্ধে আ. ক. ম. যাকারিয়া বলেন, "(মির্জাপুরের) মসজিদ থেকে ১ মাইল দক্ষিণে ছিল নূরনগর কিল্লাবাড়ি নামক একটি দুর্গ। পূর্ব পশ্চিমে দীর্ঘ এই দুর্গের প্রধান তোরণ ছিল পূর্ব দিকে। মাটির তৈরি উঁচু প্রাচীরের বাইরে উত্তর-দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে ছিল গভীর ও প্রশস্ত পরিখা (moat) পূর্বদিকে কোনো পরিখা ছিল না। দুর্গে প্রবেশদ্বারের কাছে ৩টি কামান অবহেলিত অবস্থায় বহুকাল ধরে পড়েছিল। ১টি কামান এখন যশোরে রাস্তার মোড়ে রাখা আছে। বাকি ২টি কামানার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। এই দুর্গের ভিতরে একটি প্রাসাদ ছিল আর ছিল একটি হাম্মামখানা বা স্নানাগার।

ফৌজদার নরুল্লাহ খান এ প্রাসাদে বাস করতেন। প্রাসাদের কোনো চিহ্ন এখন দেখা যায় না। হাম্মামখানাটির ধ্বংসবশেষ এখনও দেখা যায়। মির্জানগরের হাম্মামখানা ও কিল্লাবাড়ি সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়। নূরনগর কিল্লাবাড়ি নামে পরিচিত এ স্থানে একটি প্রাচীন হাম্মাম দেখা যাবে। বাংলার মুসলিম ইতিহাসে হাম্মাম খুব কম দেখা যায়। এগুলোর মধ্যে লালবাগ দুর্গের অভ্যন্তরের হাম্মামখানা, জিঞ্জিরার হাম্মামখানা, মির্জানগরের হাম্মামখানা, ঈশ্বরীপুরের হাম্মামখানা, জাহাজঘাটার হাম্মামখানা, সাতক্ষীরা, গৌড়ে নিয়ামতউল্লাহ ওয়ালীর তাহখানাসংলগ্ন হাম্মামখানা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

খন্দকার আলমগীর তাঁর 'বাংলাদেশের হাম্মাম স্থাপত্য ও লালবাগ দুর্গের হাম্মাম' প্রবন্ধে অনেকগুলো হাম্মামের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "জাহাজঘাটা এবং মীর্জানগর হাম্মাম দুটিতে পার্শ্ববর্তী কুয়া থেকে পানি সরবরাহ করা হত। মীর্জানগর হাম্মামের কুয়াটি অনেকদূর উঁচু পর্যন্ত গেথে তোলা হয়েছে যা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঈশ্বরীপুর, মীর্জানগর, গৌড়ের তাহখানা হাম্মাম এবং লালবাগ হাম্মামে মেঝের মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট জলধারা আছে। গৌড়ের তাহখানা হাম্মাম ঈশ্বরীপুর হাম্মাম এবং লালবাগ হাম্মামে পানি সংরক্ষণের জন্য দেয়াল গাত্রে পৃথক পৃথক জলাধার আছে।

মীর্জানগর হাম্মাম প্রসঙ্গে বলা যায় যে, কিল্লাবাড়িতে যে হাম্মাম নির্মিত হয়েছে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও ভূমি-নকশা থেকে এ স্থাপত্যকীর্তি ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে জানা যায়। আ. ক. ম. যাকারিয়া এটি সম্বন্ধে বিষদ বিবরণ দেন। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এ গৃহে ২টি স্নানকক্ষ ছিল। পশ্চিমদিকের কক্ষের আয়তন ছিল ১৮′ ৮″ × ১৮″। এ কক্ষের পূর্বদিকে যে কক্ষটি ছিল সেটিকে উত্তর-দক্ষিণে ২টি ছোট কক্ষে বিভক্ত করা হয়েছিল। উত্তরদিকের কক্ষটির আয়তন ছিল ১০′ ৩″ × ১১′ ১০″ এবং দক্ষিণ দিকেরটির আয়তন ছিল ১০′ ৩″ × ৭′। এ দু'টি কক্ষ জুড়ে ২টি উঁচু চৌবাচ্চা ছিল। পার্শ্ববর্তী কূপ থেকে (৯ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট) চৌবাচ্চা দু'টিতে পানি সরবরাহ করা হত। এর পূর্বদিকে ছিল আর একটি স্নানকক্ষ। এর আয়তন ছিল ১৮′ ৮″ × ১৭′।

১৫। পাকুল্লা, মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ

মির্জানগরের উত্তরে পাকুল্লা গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ দেখা যাবে। উত্তর-দক্ষিণে ৭০ ফুট এবং পূর্বপশ্চিমে ৩০ ফুট আয়তনের এই মসজিদটির দেয়াল ৫ ফুট প্রশস্ত। আয়তাকার তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটিতে পূর্বদিক থেকে তিনটি খিলানপথ দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে প্রবেশপথ আছে। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব দেখা যাবে। মিহরাবগুলো নকশাকৃত। মধ্যবর্তী মিহরাবটি আয়তনে বড়। পাকুল্লা মসজিদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উত্তর ও দক্ষিণ পাশে দুটি দোচালা কুঠরী (Annexe) দেখা যাবে। উত্তরের কুঠরীটি ইমামের বাসস্থান এবং দক্ষিণদিকের কুঠরীটি মাদ্রাসা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই মসজিদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে আধুনিকতার ছাপ থাকায় খুব পুরাতন বলা যাবে না। সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীতে এটি নির্মিত হয়।

১৬। যশোহর শহর, সমাধিসমূহ, অষ্টাদশ শতাব্দী

যশোহর শহরের কতিপয় প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বসম্বলিত ইমারত দেখা যাবে। এগুলোর মধ্যে গবির শাহ এবং বাহরাম শাহের সমাধি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কালেক্টরেট বিল্ডিং-এর পাশে রয়েছে গরিব শাহ এবং এ থেকে একটু দূরে বাহরাম শাহের সমাধি দেখা যাবে। এ দুই দরবেশ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে সম্ভবত তাঁরা খান জাহানের শিষ্য ছিলেন।

১৭। হরিরামপুর, মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দী (অধুনালুপ্ত)

যশোহর জেলার হরিরামপুর গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাবে। জনশ্রুতি অনুযায়ী এই মসজিদটি সুবাদার শাহ সুজার আমলে নির্মিত।

স্থাপত্যরীতি দেখে এটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের ইমারত বলে চিহ্নিত করা যায়।

রঙ্গপুর

২৫°০২´ দক্ষিণ এবং ২৬° ২৭´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮°৪৪´ পশ্চিম এবং ৮৯°৫৪´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে উত্তরাঞ্চলের রঙ্গপুর জেলা অবস্থিত। রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত রঙ্গপুরের উত্তরে ভারতের জলপাইগুঁড়ি জেলা এবং কুচবিহার স্টেট, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদী যা গারো পাহাড় দিয়ে গোয়ালপাড়া ও ময়মনসিংহের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করেছে, পশ্চিমে দিনাজপুর এবং দক্ষিণে বগুড়া জেলা। রঙ্গপুর জেলার উপর সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যাবে Glazier-এর রিপোর্ট : Report on the District of Rangpur. Glazier বলেন, "- রঙ্গপুর আদিতে কামরূপ রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত ছিল এবং করতোয়া নদী কামরূপ এবং বাংলার মৎস্যরাজের সীমানা নির্ধারণ করত। পৌরাণিক কাহিনীতে উল্লেখ আছে যে, মহাভারতের যুদ্ধে রাজা ভগদত্ত রাজা ধারিউদান (Dhanyudan) এর পক্ষ অবলম্বন করেন কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের নিকট পরাস্ত হয়ে নিহত হন। রঙ্গপুর ছাড়াও কামরূপ রাজ্যের অর্ন্তগত ছিল আসাম, মণিপুর, জয়ন্তিয়া, কাছার এবং ময়মনসিংহ ও সিলেটের অংশবিশেষ। রঙ্গপুর কথার অর্থ আনন্দের স্থান বা প্রশান্তির নিবাস। একথাটির উৎপত্তি হয়েছে ঘোড়াঘাটের তীরে রাজা ভগদত্ত কর্তৃক নির্মিত একটি আনন্দভবণ থেকে যেখানে তিনি আরামে ও আয়েশে বসবাস করতেন। গোহাটিতে আর একটি রঙ্গপুর রয়েছে। গোহাটি ছিল কামরূপ রাজ্যের রাজধানী। রঙ্গপুর শহরের অদূরে এবং ঘোড়াঘাটের দক্ষিণ-পশ্চিমে পায়রাবন্দ পরগনা এবং এ পরগনার নামকরণ হয়েছে রাজা ভগদত্তের কন্যা পায়রাবতী থেকে। পায়রাবন্দ পায়রাবতীর জমিদারী ছিল। 'আইন-ই-আকবরীর' ভাষ্য আনুযায়ী ভগদত্তের ১৩ জন উত্তরাধিকারী ছিল এবং যোগনীতন্ত্রে ভগদত্তের উত্তরাধিকারীদের সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন জলপেস্বর (Jalapessor), যিনি দুয়ারের জলপেশে একটি শিব-মন্দির নির্মাণ করেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের দিক থেকে বগুড়ার পরেই উত্তরবঙ্গে রঙ্গপুরের স্থান। যদিও প্রাকৃতিক কারণ এবং ইচ্ছাকৃত ধ্বংসযজ্ঞের (Vandalism) জন্য অধিকাংশ প্রাচীন কীর্তি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, তবুও রঙ্গপুরের অবশিষ্ট প্রত্নকীর্তি মুসলিম আমলের

প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে রয়েছে। একজন প্রত্নতাত্ত্বিক বলেন, "রঙ্গপুরে খুব কমই স্থাপত্যিক নিদর্শন রয়েছে, যা গুরুত্বপূর্ণ। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই কারণ এ অঞ্চলে কোন নির্মাণ সামগ্রী হিসাবে পাথর এবং উচ্চমানের পোড়া ইটের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।" এতদসত্ত্বেও রঙ্গপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্নকীর্তি দেখা যাবে। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রঙ্গপুর জেলায় কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ, খনন সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ১৯২৪-২৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সর্বপ্রথম জরিপের কাজ শুরু করে, বিশেষ করে দক্ষিণ রঙ্গপুর অঞ্চলে। এ অঞ্চলটি সান্তাহার থেকে পার্বতীপুর; পার্বতীপুর থেকে কাউনিয়া এবং কাউনিয়া থেকে সান্তাহার রেললাইনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত।

রঙ্গপুরের প্রত্নসম্পদ সম্পর্কে যিনি পথিকৃৎ তিনি হচ্ছেন ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটন। তিনি ১৮০৭-৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিনাজপুর ও রঙ্গপুরে জরিপ করে একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে মান্টোগোমারি মার্টিন লন্ডন থেকে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির শিরোনাম 'The History, Antiquities Topography and Statistics of Eastern India. Vol I & II. ঘোড়াঘাটের এতদঅঞ্চলের প্রাক-ইসলামি এবং মুসলিম যুগের প্রত্নকীর্তি, প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষের একটি বিবরণ পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ঘোড়াঘাটে মুসলিম রাজ্যের উত্তর সীমানা ছিল। প্রাক-মুঘল আমলে, বিশেষ করে গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের রাজত্বে পূর্বেদিকে সীমানা গোহাটি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; কারণ গোহাটিতে একটি শিলালিপি পাওয়া যায়। এমনকি আরও পূর্বে গোয়ালপাড়া জেলার রাঙ্গামাটি পর্যন্ত রাজ্যের সীমানা বিস্তার লাভ করে। মুঘল আমলে উত্তর ও পূর্বদিকের রাজ্যের সীমানা বিস্তার লাভ করে বিশেষ, করে মীর জুমলার সময়ে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর উত্তর-বঙ্গের কোচ রাজারা এবং আসামের অহম শাসকবৃন্দ তাঁদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ কর্তৃক ১৯২৪-২৫ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র ঘোড়াঘাট এলাকা জরিপ ও খননের ফলে প্রাক-মুসলিম যুগের বহু প্রত্নকীর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সমস্ত নিদর্শনের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রাচীন দুর্গের পরিখা ও ধ্বংসাবশেষ। বলাই বাহুল্য যে, প্রাক-মুসলিম এবং মুসলিম যুগে উত্তরবঙ্গ কোচ, ভিল, চাচার প্রভৃতি উপজাতির প্রচণ্ড প্রতাপ ছিল এং মুসলিম আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তারা সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করে। করতোয়া নদীর পূর্বপাড়ে দারিয়ন নামে একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, বিশেষ করে সুউচ্চ প্রাচীর আবিষ্কৃত হয়েছে। জি. এইচ. দামান্দ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে কাটাদুয়ারের প্রাচীন কীর্তির সন্ধান পান। তিনি 'রিসালত-উস-শুহাদা' নামে একটি পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন এবং এই পুস্তকে ইসমাইল গাজীর সামরিক অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তিনি উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দু রাজাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন।

রঙ্গপুর, জলপাইগুঁড়ি এবং পার্শ্ববর্তী কুচবিহার রাজ্যে 'দুয়ার' নামে কয়েকটি স্থান রয়েছে। 'দুয়ার' অর্থ নদীর মধ্যবর্তী কয়েকটি স্থানে নৌযান চলাচলের জন্য বাঁধ (ford)। বর্ষার মৌসুমে এগুলো দিয়ে যাতায়াতের জন্য খুলে দেওয়া হত যাতে নৌযান

পারাপারে কোনো অসুবিধা না হয়। রঙ্গপুরের দক্ষিণাঞ্চলে এ ধরনের তিনটি 'দুয়ারের' সন্ধান পাওয়া গেছে। এ সমস্ত 'দুয়ার' দিয়ে পশ্চিমাঞ্চল থেকে বাংলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রবেশ করা যেত। করতোয়া নদীতে এ ধরনের 'দুয়ার' তৈরি করা হত। এখনও পুরাতন নদীতটে এগুলোর চিহ্ন দেখা যায়। বগুড়ায় মহাস্থানগড়ে যে ধরনের প্রত্নকীর্তির নিদর্শন পাওয়া গেছে এরকম উত্তরবঙ্গের বহু অঞ্চলে প্রাচীন বাংলার স্থাপত্যিক ঐতিহ্যের নিদর্শন রয়েছে। এ সমস্ত প্রত্নসম্পদ অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে নির্মিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এতদঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে মুসলিম সীমানা উত্তরে করতোয়া নদী পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। উল্লেখ্য যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হিন্দু রাজ্যগুলোর প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষাটি ছিল এবং তিনটি নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এই করতোয়া এই প্রতিরক্ষাব্যূহ সৃষ্টি করে।

১। দেরিয়ন বা দূর-দুরিয়া, প্রাচীন দুর্গ

করতোয়া নদীর পূর্বতীরে একটি প্রাচীন নদীর বেলাভূমিতে দেরিয়ন বা দূর-দূরিয়া নামে একটি প্রাচীন শহরের নিদর্শন রয়েছে। কাটাদুয়ারের অন্তর্গত এই প্রত্নকীর্তিটি যে দুর্গের সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। দেরিয়ন কথাটির উৎপত্তি দরিয়া বা নদী বা সমুদ্র থেকে। এই দুর্গের তিনদিকে উঁচু ও মজবুত করে ইটের তৈরি প্রাচীর ছিল (rampart), দুর্গের চারপাশে কয়েকটি পরিখা খনন করা হয় বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দুর্গকে রক্ষা করার জন্য। স্থানীয় লোকেরা সাতটি পরিখার কথা বলে যা বর্তমানে শুকিয়ে গেছে। প্রবেশপথ ছিল মাত্র একটি এবং তার উপর দিয়ে তোলা সেতু (drawbridge) ছিল। এটি যে হিন্দু আমলের দুর্গ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। অসংখ্য ঢিবি দেখা যাবে অভ্যন্তরে, সেগুলো প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন। বর্তমানে যে ভগ্নপ্রাচীর রয়েছে তা ৭ ফুট চওড়া এবং কোনো কোনো স্থানে ১৫ থেকে ১৬ ফুট উঁচু।

আ. ক. ম. যাকারিয়া দরিয়া ও দূর-দুরিয়া সম্বন্ধে বিষদ আলোচনা করেন। দূর-দুরিয়ার দুর্গটিকে তিনি নিলাম্বরের দুর্গ বলেছেন। তাঁর ভাষায়, "রংপুর শহর থেকে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে রংপুর-বগুড়া পাকা সড়কের পশ্চিম দিকে অবস্থিত পীরগঞ্জ থানা। থানা থেকে প্রায় ৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে চাতরা হাট নামক একটি বড় বাজার আছে। চাতরা হাট থেকে প্রায় $১\frac{১}{২}$ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে দেরিয়ন বা রাজা নীলাম্বরের দুর্গনগরী অবস্থিত। এ দুর্গনগরী বৃত্তাকার এবং বিশাল পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। ..... এ দুর্গনগরী সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে রংপুর দিনাজপুর বগুড়া অঞ্চলে প্রধান জনপ্রবাদ আছে যে, এটি ছিল কামরূপের রাজা নীলাম্বর রায়ের (১৪৮০ - ৯৮ খ্রিঃ) দুর্গ ও বাসস্থান। এই মতে ইসমাইল গাজী রাজা নীলাম্বরকে পরাজিত ও ধর্মান্তরিত করে এ দুর্গ অধিকার করেন। রাজা নীলাম্বর ইসমাইল গাজী বা তাঁর সুলতান বরবক শাহর সমসাময়িক ছিলেন না।" নীলাম্বর বরবক শাহের সমসাময়িক ছিলেন কি না বলা যায় না তবে বরবক শাহের শাসনামলে ইসমাইল গাজী যে এ দুর্গ দখন করেন সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। রাজা নীলাম্বরের রাজ্য সম্ভবত সুলতান হোসেন শাহের আমলে করতোয়ার পশ্চিম তীর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। নীলাম্বর ১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দে হোসেন শাহের নিকট যুদ্ধে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হন। শাহ ইসমাইল যে বরবক

শাহের সমসাময়িক তার প্রমাণ এই যে সুলতানের নির্দেশে সন্দেহের বশে ইসমাইল শাহাদাত বরণ করেন।

২। কাটাদুয়ার, শাহ্ ইসমাইল গাজীর মাজার ও মসজিদ (অবলুপ্ত) (৬৪)

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, রঙ্গপুর জেলায় অনেকগুলো 'দুয়ার' পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কাঁটাদুয়ার। রংপুর-বগুড়া মহাসড়কের পশ্চিম পাশে অবস্থিত পীরগঞ্জ থানা থেকে আনুমানিক ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি ছোট নদীর তীরে একটি বিরাট ঢিপি দেখা যাবে। আয়তনে এটি দুই বিঘার মতো। প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ ঢিবিটি বর্তমানে ২০ ফুটের বেশি উঁচু নয়। এই ঢিবির আশেপাশে প্রাচীন ইমারতের ভিত্তি, দেয়াল, নকশা ইটের ভগ্নাংশ ইত্যাদি দেখা যাবে। বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে সুফীসাধকদের আবাসস্থল এবং পরবর্তীকালে মসজিদ ও মাজার দেখা যায়, যেমন বাগেরহাটের খান জাহান, শাহজাদপুরের মখদুম শাহ, সিলেটের শাহ্ জালাল, তেমনি কাঁটাদুয়ারে স্থানীয় সাধু দরবেশ ও সেনানী শাহ. ইসমাইল গাজীর প্রাচীন কীর্তি লক্ষ করা যাবে। আ. ক. ম. যাকারিয়া বলেন, "কাটা দুয়ারের ঢিবির সর্বোচ্চ অংশ এবং উত্তরভাগ ঘেঁষে অপেক্ষাকৃত হাল আমলের একটি মাজার আছে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ছাদহীন এই ইমারতের আয়তন প্রায় ১৫′ × ১০′। দেয়ালগুলো খুব পুরু নয় এবং খুবই মামুলি ধরনের। ভিতরের পাকা কবরটি যে একজন মুসলমানের তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশই নেই। কবরটিতে হাল আমলে এমন সংস্কার করা হয়েছে যে এর প্রাচীনত্বের কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট নেই।'

পীর মুহাম্মদ সাত্তারী প্রণীত 'রিসালাতই-উস-শুহাদা' গ্রন্থ থেকে শাহ ইসমাইল সম্বন্ধে জানা যায়। ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে ফার্সি ভাষায় রচিত এই গ্রন্থটি জি. এইচ. দামান্দ আবিষ্কার করেন। এই গ্রন্থে শাহ ইসমাইলের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে যা জানা যায় তা হল এই যে তিনি মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুরাইশ বংশজাত। তিনি শৈশব থেকেই বিদ্যা অর্জনের জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন এবং বড় হয়ে ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি একদল সঙ্গীসাথী নিয়ে বাংলাদেশে আসেন এবং বাংলার সুলতান বরবক শাহের রাজধানী গৌড়ে এসে উপস্থিত হন। কথিত আছে যে, এ সময়ে গৌড়ের উত্তরে ছুটিয়া-পটিয়া নামে যে নদী আছে তার প্লাবনে গৌড় নগরী প্লাবিত হলে সুলতান সুফী-সাধক শাহ ইসমাইলের শরণাপন্ন হন। বাঁধ দিয়ে যখন বন্যার পানি বন্ধ করা গেল না তখন ইসমাইল তাঁর সঙ্গীসাথীদের সাহায্যে একটি সেতু এবং বাঁধ নির্মাণ করে পানির স্রোত বন্ধ করার ব্যবস্থা করেন। এর ফলে শাহ ইসমাইল সুলতানের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং রাজকীয় ফরমান লাভ করে মুসলিম রাজ্যের সীমানাবৃদ্ধির জন্য একটি বাহিনী গঠন করেন।

শাহ ইসমাইল বাগেরহাটের খান জাহানের মতো শুধু একজন দক্ষ সেনাপতিই ছিলেন না।, কামেল সাধক (saint) হিসাবে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেন। 'রিসালাত-উস-শুহাদা'র বর্ণনা অনুযায়ী শাহ ইসমাইল প্রথমে উড়িষ্যার রাজা গঞ্জপতিকে পরাজিত করে গড় মান্দারান দুর্গ দখল করেন। এই বিজয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে শাহ

ইসমাইল কামরূপের রাজা কামেশ্বরকে পরাজিত করে কামরূপ দখল করেন। উড়িষ্যা ও কামরূপ জয় করে শাহ ইসমাইল পরাস্ত রাজাদের সুলতান বরবকের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। এ প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান তালিব বলেন, "ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, সম্ভবত মান্দারান তৎকালে উড়িষ্যার গঙ্গ-বংশীয় রাজাগণের অধিকারভুক্ত ছিল এবং ইসমাইল কর্তৃক পরাজিত কামেশ্বর ছিলেন সম্ভবত কামতাপুরের রাজা। কারণ আসামের আহম বংশীয় রাজাদের ইতিহাসে কামেশ্বর নামে কোনো রাজা নাম পাওয়া যায় না।" অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে, ইসমাইল গজপতি বংশীয় উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ দেবের কোন সেনাধ্যক্ষকে পরাজিত ও নিহত করে মান্দারান দুর্গ জয় করেন। 'রিসালাতে'র বর্ণনা অনুযায়ী কামরূপের রাজা ইসমাইল গাজীর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর নিকট আত্মসমার্পণ করেন এবং স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

সেনাপতি-সাধক শাহ ইসমাইলের মৃত্যু রহস্যজনক। কতিপয় ঐতিহাসিকের মতে, উপর্যুপরি সামরিক বিজয়ের সাফল্যে শাহ ইসমাইল সুলতান বরবক শাহের অতি প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। কিন্তু সুলতানের সাথে শাহ ইসমাইলের ঘনিষ্ঠতা এবং হিন্দু রাজাদের বিপর্যয়ে ঈর্ষান্বিত হয়ে সুলতানের এক হিন্দু সেনাধ্যক্ষ ঘোড়াঘাটের সীমান্ত দুর্গাধিপতি ভান্দসী রায় ষড়যন্ত্র করে সুলতানের নিকট সংবাদ পাঠান যে ক্ষমতায় উন্নীত হয়ে শাহ ইসমাইল স্বাধীনভাবে রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন। সঠিকভাবে বিচার-বিবেচনা ও অনুসন্ধান না করে সুলতান বরবক শাহ ইসমাইলের শিরশ্ছেদ করার জন্য একদল সৈন্য পাঠান। সেনাদল শাহ ইসমাইলকে কতল করে ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দে এবং প্রবাদ অনুযায়ী তাঁর মস্তক কাটাদুয়ারে এবং তাঁর দেহটি প্রায় ২০০ মাইল দূরবর্তী হুগলী জেলার গড় মান্দারানে সমাহিত করা হয়।

ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যের ভিত্তিতে বিচার করলে শাহ ইসমাইল গাজী যে বরবক শাহের কোপানলে পড়েন তা বলা দুষ্কর। প্রথমত বরবক শাহের রাজ্যবিস্তারে শাহ ইসমাইলের অবদান ছিল, বিশেষ করে উড়িষ্যার গড় মান্দারান এবং কামতাপুর দখল এবং সুলতান এত অকৃতঘ্ন ছিলেন না যে তিনি ভান্দাসী রায় এবং কামরূপ রাজার ষড়যন্ত্রে শাহ ইসমাইলকে হত্যা করবেন। বস্তুত ইসমাইল কামতাপুর ও কামরূপ রাজ্য জয় করেন। দ্বিতীয়ত, যদি শাহ ইসমাইলকে হত্যা করা হত তা হলে তিনি 'শহীদ' নামে পরিচিত হতেন। যেমন, বাবা আদম শহীদ, যিনি রামপালে শায়িত রয়েছেন। তাঁর উপাধি গাজী বা ধর্মযোদ্ধা। তৃতীয়ত, যদিও আহমদ হাসান দানী গড় মান্দারানে অবস্থিত শাহ ইসমাইল গাজীর দরগার উল্লেখ করেন তবুও আ. ক. ম. যাকারিয়ার মতে, "গাজীর দেহ গড় মান্দারানে সমাহিত হবার কাহিনী গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। রাজরোষে পতিত ও রাজদ্রোহে দণ্ডিত ব্যক্তির মুণ্ডুহীন দেহ ২০০ মাইল দূরে নিয়ে যাওয়া অবিশ্বাস্য ঘটনা বলে মনে হয়। তা ছাড়া সেখানে যে শিলালিপি আছে তা গাজীর সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। সেটি হোসেন শাহের (১৫১৮ খ্রিঃ) আমলে তৈরি একটি তোরণ নির্মাণের শিলালিপি।" চতুর্থত, ইসমাইল গাজী মাহীগঞ্জ এলাকায় যে স্বীয় স্বাধীন রাজ্য কায়েম করেন এরকম তথ্য পাওয়া যায় না ইতিহাসগ্রন্থে। উল্লেখ্য যে, গাজীর মৃত্যুর পর (১৪৭৪ খ্রিঃ) রাজা নীলাম্বর ঘোড়াঘাটসহ মাহীগঞ্জ অঞ্চল পুনঃদখল

করেন। পঞ্চমত, গড় মান্দারানেই নয়, রঙ্গপুর জেলায় ইসমাইল গাজীর নামানুসারে চারটি দরগা রয়েছে। এগুলো ঘোড়াঘাট, ইসমাইলপুর, কাটাদুয়ার এবং বারাবিয়া।

কাটা দুয়ারের প্রাচীন দুর্গ, মসজিদ এবং শাহ ইসমাইলের আসল মাজারের কোনো চিহ্নই পাওয়া যায় না। এখান থেকে উদ্ধারকৃত শিলালিপিতে হোসেন শাহের উল্লেখ আছে এবং সেটি মসজিদ নির্মাণ প্রসঙ্গে। আর. ডি. ব্যানার্জী মন্তব্য করেন, শুকনা খাল থেকে এক মাইল দূরে একটি সুউচ্চ ঢিবি দেখা যাবে যার উপরে একটি ছোট দরগা অথবা ঈদগাহ নির্মিত হয়েছে সুলতান হোসেন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ)। এই ঢিবিতে মুসলমান দ্বারা ধ্বংসকৃত (?) একটি প্রাচীন মন্দিরের (?) ধ্বংসাবশেষ দেখা যাবে এবং এই মন্দিরকে একটি মসজিদ এবং দরগায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। মসজিদটি বহু পূর্বে ভেঙে পড়ে এবং বর্তমানে এর কোনো চিহ্নই দেখা যাবে না। দরগাটি ছাদবিহীন অবস্থায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে, যা পঞ্চদশ শতাব্দীর মুসলিম স্থাপত্যরীতির একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। একসময়ে এই দরগায় একটি শিলালিপি ছিল-যা দু'টি পাথর খণ্ডে খোদিত হয়। এ দুটি পাথরখণ্ডের উল্টোদিকে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি খোদিত রয়েছে এবং পাথর দুটি প্রবেশ পথের সামনে পাশাপাশি রাখা ছিল। আর. ডি. ব্যানার্জী আরও বলেন—"The dargah was built of small carved bricks in the style of the tomb of Fateh Khan and the Qadam Rasul at Gaud."

আর. ডি. ব্যানার্জী অত্যন্ত ঢালাওভাবে মন্তব্য করেছেন, যার কোনোটিই গ্রহণযোগ্য নয়। ১৯২৪-২৫ খ্রিস্টাব্দের 'আরর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া'র রিপোর্টে ব্যানার্জী যে দুটি শিলালিপি উল্লেখ করেন তা রহস্যজনকভাবে হারিয়ে যায়। পরে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে একটি পুকুরের পাড়ে বটগাছের নিচে থেকে একজন কৃষক তা উদ্ধার করে। এই শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, "কামরূপ ও কামতা বিজয়ী আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে খান-ই-আজম একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।" উল্লেখ্য যে, এই শিলালিপিতে কোনো সন-তারিখ নেই। হোসেন শাহ ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। প্রথমত, এই শিলালিপির সাথে দরগার কোনো সম্পর্ক নেই, কারণ এটি মসজিদ নির্মাণসংক্রান্ত শিলালিপি। সম্ভবত এ অঞ্চলে কাঁটাদুয়ারে শাহ ইসমাইল গাজীর দরগার নিকট হোসেন শাহ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। দ্বিতীয়ত, আর. ডি. ব্যানার্জীর মন্তব্য যে মন্দির ভেঙে মসজিদ ও দরগা নির্মিত হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ বর্তমানে দরগাটি পরবর্তী পর্যায়ে নির্মিত হলেও মূল দরগাটি সুলতান বরবক শাহের (১৪৫৯-৭৪) আমলে নির্মিত হয়; কারণ তিনি হিজরী ৮৭৮ শাবান মাসের ১৪ তারিখে (১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে) মৃত্যুবরণ করেন। তৃতীয়ত, শিলালিপির পিছনে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি খোদিত থাকলে প্রমাণিত হয় না যে সেখানে মন্দির ছিল। থাকলেও বহুপূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তা ছাড়া এ ধরনের বহু কষ্টিপাথর পাওয়া গেছে, যেমন ছোট সোনা মসজিদের মিহরাবের পিছনের বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে (বর্তমানে ব্রিটিশ জাদুঘরে সংরক্ষিত)। চতুর্থত, মন্দির এবং মসজিদের ভূমি নকশা এক

রকম নয় যে সহজেই মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করা যাবে। পঞ্চমত, ব্যানার্জীর মন্তব্য যে মসজিদটি গৌড়ের ফতেহ খানের দোচালা সমাধির মতো, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কাটা দুয়ারের মাজার বা দরগা প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, মূল দরগাটি ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত হলেও তা পরবর্তীকালে ভেঙে যায় এবং হোসেন শাহ এটি পুনঃনির্মাণ করেন। এ সময়ে তিনি একটি মসজিদও তৈরি করেন যার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে এই দরগাটি ভেঙে পড়লে স্থানীয়ভাবে খোলা ছাদবিশিষ্ট ইটের দেওয়াল এবং সামনে চত্বরবিশিষ্ট দরগাটি পুনঃনির্মিত হয়। অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য একটি খিলানবিশিষ্ট আধুনিক ফটক রয়েছে।

যেহেতু হোসেনশাহী আমলের মসজিদটি বিলীন হয়ে গেছে সেহেতু এই ইমারত সম্বন্ধে কিছু বলা যাবে না। আ. ক. ম. যাকারিয়া স্থানটি পরিদর্শন করে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন "এ অঞ্চলে কোনো প্রাচীন মসজিদ ছিল, সে কথা এই অঞ্চলের অতি বৃদ্ধ লোকেরাও বলতে পারেন না। কোনো মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এ এলাকায় ছিল সে কথাও কেউ জানেনা। তবে মসজিদের শিলালিপি যখন এখানে পাওয়া গেছে, তখন এ অঞ্চলে একটি মসজিদ ছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কাটাদুয়ারকে কেন্দ্র করে প্রায় ৮ বর্গমাইল স্থানের মধ্যে কোনো প্রাচীন মসজিদ বা তার ধ্বংসাবশেষ আছে বলে কেউ বলতে পারেনা। সেক্ষেত্রে মসজিদটি মাজারের ঢিবিতেই ছিল বলে ধারণা করা যায়। মাজারের লাগ দক্ষিণে পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৩০ ফুট লম্বা ও উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ২৫ ফুট চওড়া একখণ্ড সমতল ভূমি ঢিবির মধ্যে রয়েছে। খুব সম্ভব এ স্থানেই একটি ছোট আকারে মসজিদ হোসেন শাহের আমলে নির্মিত হয়েছিল। এখানে মাটির নিচে প্রাচীন ইমারতের যে ভিত্তি দেখা যায় সেগুলো খুব সম্ভব সেই মসজিদের ভিত্তি।"

৩। ইসমাইলপুর, শাহ্ ইসমাইল গাজীর বড় দরগা বা মাজার

রংপুর শহর থেকে ১৯ মাইল দক্ষিণে রংপুর-বগুড়া মহাসড়কের লাগোয়া পূর্বে মির্জাপুর বা ইসমাইলপুর নামে একটি স্থান রয়েছে। এখানে বড় দরগা অবস্থিত এবং জনশ্রুত অনুযায়ী এটি শাহ্ ইসমাইল গাজীর মাজার বলে পরিচিত। শাহ্ ইসমাইল গাজী যে কত প্রসিদ্ধ সেনানায়ক ও সাধক ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর নামে নির্মিত অসংখ্য দরগা মাজার। হুগলীর গড় মান্দারান ছাড়াও রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে তাঁর দরগা মাজার রয়েছে কাঁটাদুয়ার, ইসমাইলপুর এবং দিনাজপুরে ঘোড়াঘাটে। ইসমাইলপুরে অবস্থিত পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা প্রায় ৫০ × ৩০ ফুট আয়তনের তিন কক্ষবিশিষ্ট একটি একতলা ইমারত দেখা যাবে। এই ইমারতের মধ্যভাগে পীরের কবর রয়েছে। দরগার দেওয়ালগুলো ৩$\frac{১}{২}$ ফুট চওড়া। ছাদ সমান্তরাল (flat), কোনো গম্বুজ নেই। চারকোনায় চারটি সরু ট্যারেট দিয়ে ছাদ ঘেরা। ইদানীং সামনে প্যারাপেটে একটি খোলা বারান্দা নির্মিত হয়েছে এবং দক্ষিণদিকের এই বারান্দার মাঝখানে একটি খাঁজকাটা খিলান দরজা রয়েছে। মূল মধ্যভাগের কক্ষের দুই পাশে ছোট আকারের দু'টি কক্ষ আছে। এই কক্ষ দুটির ভিতরের দেওয়াল জালি দিয়ে বন্ধ করা আছে। বর্তমান শবাধারটি নূতন

করে তৈরি করা হয়েছে। সাদা চুনকাম করায় এর প্রাচীনত্ব নষ্ট হয়ে গেছে। আ. ক. ম. যাকারিয়া এই মাজার প্রসঙ্গে বলেন, "এই কক্ষের (মূল) দেয়ালের উপর স্থানে ফুলের (rosette) কাজ করা আছে। পলেস্তারা (plaster) ও ঘন চুনকামের ফলে এই ফুলের কাজগুলো পোড়ামাটির ফলক (terracotta plaque), না পলেস্তারার উপর করা তা বোঝা যায় না। রজেটের কাজ দেখে এগুলোকে পোড়ামাটির চিত্রফলক বলে সন্দেহ হয়। ইমারতের গঠনকৌশল দেখে মনে হয় যে এটি মুঘল আমলে তৈরি হয়েছিল।"

৪। মহেশপুর, সমাধি, সপ্তদশ শতাব্দী

কাটাদুয়ারের নিকট অবস্থিত মহেশপুরে একটি প্রাচীন সমাধির ধ্বংসাবশেষ দেখা যাবে। জনৈক লেখক বলেছেন যে, সমাধিটি গৌড়ের ফতেহ্ শাহ্ এবং ঢাকার করতলাব খানের মসজিদসংলগ্ন সমাধির স্টাইলে নির্মিত। স্থাপত্যিক দিক থেকে বিচার করলে প্রতীয়মান হবে যে এ সমাধিটি একটি বক্সটাইপ শবাধার (cenotaph) যার কোনো ইমারত বা structure নেই। সুতরাং এ মুহূর্তে এটির সঙ্গে দো'চালা ছাদবিশিষ্ট গৌড়ের ফতেহ্ শাহের সমাধি অথবা করতলাব খানের সংলগ্ন দোচালা ঘরের (Annexe) সাদৃশ্য থাকার প্রশ্ন আসে না।

৫। মিঠাপুকুর, একটি প্রাচীন মসজিদ, ঊনবিংশ শতাব্দী

রংপুর শহর থেকে প্রায় ১৫ মইল দক্ষিণে বংপুর-বগুড়া পাকা সড়কের মিঠাপুকুর নামে একটি জলাশয় রয়েছে। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা জলাশয়টি যে মুসলিম আমলে খনন করা হয় তাতে সন্দেহ নেই। এর কাছে মুঘল আমলের একটি মসজিদ দেখা যাবে। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ তিনগম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার এই মসজিদটি খুবই আকর্ষণীয়। এই ইমারতের চার কোনায় চারটি গোলাকার বুরুজ রয়েছে এবং এর শীর্ষদেশে কুপোলা ও চূড়া দেখা যাবে। মসজিদটিতে অষ্টকোণাকার ড্রাম থেকে নির্মিত তিনটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। কলসচূড়া পদ্মপাতার ভিত থেকে উপরে উঠে গেছে। পূর্বদিকে তিনটি খিলানাকৃতি প্রবেশপথ রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে দরজা দেখা যাবে যা কিছুটা উদ্গাত। দরজার দু'পাশে দু'টি গোলাকার মিনার আছে। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকার মিহরাব দেখা যাবে। পূর্বদিকের দেয়াল মুঘলধাঁচে প্যানিলিং দ্বারা অলঙ্কৃত। স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হয় যে এই মসজিদটি ঊনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত (১৮১০ খ্রিঃ)।

৬। মাহীগঞ্জ, মুসলিম স্থাপত্যকীর্তি

রংপুর শহরের তিন মাইল দক্ষিণ-পূর্বে তিস্তা শাখার নদীর বাম তীরে মাহীগঞ্জ অবস্থিত। রংপুর জেলার সর্বাপেক্ষা ব্যস্ত অঞ্চল হচ্ছ মাহীগঞ্জ এবং একসময় মাহীগঞ্জ বলতেই শাহীগঞ্জে রংপুর শহরকেই বোঝাত। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানী লাভের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রংপুর জেলায় প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন করে। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে বুকানন হ্যামিলটন মাহীগঞ্জের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সে সময়ে মাহীগঞ্জ বলতে সমগ্র মাহীগঞ্জ, মীরগঞ্জ, নদীগঞ্জ এবং নবাবগঞ্জ অঞ্চলকে বোঝাত। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির কিউরেটর অক্ষয় কুমার মৈত্র সমগ্র মাহীগঞ্জ অঞ্চল

জরিপ করেন এবং এখানকার প্রাচীন কীর্তিসমূহের বিষদ বিবরণ দেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর বিভাগ এ অঞ্চলে জরিপ পরিচালনা করে।

মাহীগঞ্জ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে জনশ্রুতি রয়েছে যে শব্দটি 'মাহী' বা মাছ থেকে উদ্ভূত। প্রবাদ অনুযায়ী এ অঞ্চলের পীর-দরবেশ, সাধকপুরুষ শাহ জালাল বোখারী মাছের পিঠে বসে এ অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। এজন্য স্থানটির নাম হয়েছে
মাহীগঞ্জ। বগুড়ার মহা়ঃ মাউলিয়ার আসার
অলৌকিক কাহিনী প্রচি সওয়ার'। আব্দুল
বারী 'ইতিহাস পত্রিকায়' ৩-৫১) মাহীগঞ্জ
এবং এতদঞ্চলের স্থাপত্য বলেন, "উত্তরে
মাহিগঞ্জ ও খাসবাগ হতে গাসাইহাড়ী হতে
পশ্চিমে তাজহাট পর্যন্ত গ্রাম ও বগমাহল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল পুরাতন মাহীগঞ্জ শহর। শহরের যত্রতত্র এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় বহু প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ও ভিত, ছড়ানো ছিটানো পুরানো ইট ও ইটের স্তূপ এবং খাসবাগ এলাকায় জনৈক আংগুর মিঞার বাড়ীতে ৬/৭ ফুট লম্বা কয়েকটি কালো পাথরের খণ্ড পরিলক্ষিত হয়। মুঘল আমলে যে একটি ব্যস্ত ও জনবহুল শাসনকেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল তা বোধ হয় মোটামুটি জোর দিয়ে বলা যেতে পারে।"

৭। মাহীগঞ্জ, খাসবাগ মসজিদ, মুঘল, অষ্টাদশ শতাব্দী, (অধুনালুপ্ত)

মাহীগঞ্জ বাজারের উত্তরে খাসবাগ এলাকায় বর্তমান রঙ্গপুরের প্রধান সড়কের বামপাশে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ করা যাবে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে যে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয় তার ফলে বাংলার বহু মুসলিম স্থাপত্যকীর্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মাহীগঞ্জের খাসবাগ মসজিদের ছাদ ধসে পড়ে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে। ভূমি পরিকল্পনার দিক থেকে বিচার করলে এটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার মুঘল মসজিদের অনুরূপ। মসজিদটি বহুদিন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। পরবর্তীকালে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে পূর্ব ও পশ্চিমদিকের দেয়ালের অংশবিশেষ উন্মোচিত হয়। বর্তমানে ব্যবহারের অনুপযুক্ত খাসবাগ মসজিদটির চারকোনায় চারটি বুরুজ ছিল, সম্ভবত আটকোনাকার। অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য পূর্বদিক থেকে তিনটি খিলান দরজা ছিল। উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে প্রবেশপথ নির্মিত হয়। অভ্যন্তরে উত্তর-দক্ষিণে দু'টি লম্বালম্বি খিলান দ্বারা তিনটি সমআয়তনের বর্গাকার অংশে বিভক্ত ছিল। এর উপর তিনটি গম্বুজ নির্মিত হয়। পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব ছিল, তার মধ্যে মধ্যবর্তী মিহরাবটি আকারে বড়। এই মিহরাবের অবতলাকৃতি কুলুঙ্গিটি অষ্টভূজাকার। কেন্দ্রীয় মিহরাবটির বাইরের দিকে উদ্গত। মসজিদে মুঘল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য টারেটের চিহ্ন দেখা যায়।

শিলালিপি না থাকায় খাসবাগ মসজিদটির নির্মাণকাল সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য এবং স্থানীয় প্রবাদ অনুযায়ী এটি সম্ভবত সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে নির্মিত হয়। (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রিঃ)। আবদুল বারীর মতানুসারে এই মসজিদটির নির্মাতা ছিলেন মীর্জা মোহাম্মদ তর্কী।

৮। মাহীগঞ্জ, খাসবাগ, দুর্গ, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী

মাহীগঞ্জের খাসবাগ এলাকায় ঘাঘট নদীর বাম তীরে মুঘল আমলের একটি দুর্গ ছিল বলে স্থানীয় লোকেরা বলে থাকেন। যদিও বর্তমানে দুর্গের কোনো চিহ্ন নেই তবে স্থানটি ঢিবির মতো এবং এখানে চুন-সুরকিমিশ্রিত তামাটে রঙের প্রচুর ইটের টুকরো লক্ষ করা যায়। উত্তরে কুচবিহার রাজ্য থেকে প্রতিরক্ষার জন্য কোনো মুঘল সুবাদার কর্তৃক এখানে একটি সীমান্ত ফাঁড়ি নির্মিত হয়। আবদুল বারীর মতে, "দক্ষিণে করতোয়া তীরবর্তী ঘোড়াঘাট ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্র তীরবর্তী রাঙ্গামাটির ন্যায় এই সীমান্ত ফাঁড়িটিই সম্ভবত ধীরে ধীরে শহরে পরিণত হয় এবং অত্র এলাকার প্রশাসনিক ও সামরিক দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়মিতভাবে এখানে একজন ফৌজদার নিয়োগ করা হয়। মুসলিম তথা মুঘল যুগের শেষের দিকে মাহীগঞ্জের অত্র এলাকায় নায়িব নাজিমের জেলাখানা ছিল বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেন।"

৯। মাহীগঞ্জ, কাজিটারী মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দী

মাহীগঞ্জ বাজারের দক্ষিণ-পূর্বে কাজিটারী মহল্লা অবস্থিত। এখানে একটি মজাপুকুরের পাড়ে নির্মিত কাজিটারী মসজিদটি মহল্লার নাম থেকে গৃহীত। এটি ভগ্নাবস্থায় রয়েছে। আয়তাকার তিন গম্বুজবিশিষ্ট এই মসজিদটি ব্যতিক্রমধর্মী কারণ এর পূর্বদিকে একটি আঙিনা বা চত্বর রয়েছে। এর পরিমাপ ৩.৯′ × ১১′। দেওয়াল ৩ ফুট চওড়া। পূর্বদিক থেকে তিনটি খিলানপথ দিয়ে মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। মধ্যবর্তী প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত বড়। মসজিদের চার কোনায় চারটি অষ্টকোণাকার বুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলো ছাদের উপরে উঠে গেছে এবং সেগুলো কুপোলা বা নিরেট ছোট গম্বুজ দ্বারা আবৃত। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকার মিহরাব আছে এবং মধ্যবর্তীটি অপেক্ষাকৃত বড়। লক্ষ্যণীয় যে, মধ্যবর্তী মিহরাবটি অষ্টকোণাকার নয়, অর্ধবৃত্তাকার এবং এর বাইরের অংশ সামান্য উদ্গত। প্রবেশপথের উভয় দিকে টারেট রয়েছে, যা মুঘল স্থাপত্যকলার বৈশিষ্ট্য। ঢাকার শাহবাজের মসজিদে এ ধরনের টারেট দেখা যায়।

কাজিটারী মসজিদের গম্বুজগুলো ড্রামের উপর থেকে নির্মিত এবং চূড়া কলসাকৃতি। পেনডেনটিভ পদ্ধতিতে গম্বুজ নির্মিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিতে মুঘল মসজিদসমূহের সাথে সাদৃশ্য থাকায় এটি অষ্টাদশ শতাব্দীর মুঘল স্থাপত্যকীর্ত বলে চিহ্নিত করা যায়। আবদুল বারীর মতে, "পূর্ব দেয়ালের বহিরগাত্র চিরাচরিত মোগলকীর্তিতে স্বল্প গভীর আয়তাকৃতির প্যানেলে সজ্জিত। মিহরাব কুলুঙ্গিসমূহ খাঁজ কাটা খিলানে আবৃত। অভ্যন্তরে দেয়ালগাত্রের একঘেয়েমী দূরীকরণার্থে প্রতিটি মিহরাব ও খিলানপথের উভয় পার্শ্বে খাঁজবিশিষ্ট স্বল্প গভীর কুলুঙ্গির (shallow niche) প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য।"

১০। মাহীগঞ্জ, তামফাট, মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দী (অধুনালুপ্ত)

আবদুল বারী 'ইতিহাস' পত্রিকায় মাহীগঞ্জের মুসলিম নিদর্শন শীর্ষক একটি প্রবন্ধে মুসলিম আমলের ধ্বংসপ্রাপ্ত অনেক কীর্তির উল্লেখ করেছেন। এগুলোর

মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য তামফাটে অধুনালুপ্ত মুঘল আমলের একটি মসজিদ। যদিও মসজিদটিকে স্থানীয়ভাবে আকবরের আমলের বলা হয়ে থাকে কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে প্রতীয়মান হবে যে এটি অনেক পরে, সম্ভবত আওরঙ্গজেবের শাসনামলে অষ্টদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়। ইস্টার্ন বেঙ্গল এবং আসাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, রংপুরে (এলাহাবাদ ১৯১১, পৃষ্ঠা ১৪৮ –১৪৯) এ ধরনের একটি অধুনালুপ্ত মসজিদ ছিল বলে উল্লেখ করা হয়। এ ধরনের কত যে হারানো মানিক লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে গেছে তার কোনো হিসাব নেই।

১১। মাহীগঞ্জ, শাহী মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দী (সম্পূর্ণ সংস্কারকৃত)

মাহীগঞ্জের বাজারের মাঝখানে শাহী মসজিদ নামে যে ইমারতটি দেখা যাবে তাতে প্রাচীনত্ব বা মুঘল স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য বলতে কিছুই নেই। তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মুঘল মসজিদের সঙ্গে এক আইলবিশিষ্ট আয়তাকার তিন গম্বুজ দ্বারা আবৃত এই ইমারতটি বহু পূর্বে নির্মিত হয়। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে এই মসজিদটির দেয়াল ও ছাদ ধসে পড়ে। বর্তমানে সমতল ছাদ ও অন্যান সংস্কার করে নামাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১২। মাহীগঞ্জ, সুইপার কলোনি মসজিদদ, উনবিংশ শতাব্দী

মাহীগঞ্জ বাজারসংলগ্ন আফানউল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়ের উত্তর পার্শ্বে একটি সুইপার কলোনি রয়েছে। এই স্থানে যে মসজিদটি নির্মিত হয় তা সুইপার কলোনি মসজিদ নামে পরিচিত। খুবই জঙ্গলাকীর্ণ ও জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল মসজিদটি। এই মসজিদটির ভূমি-নকশা দেখে প্রতীয়মান হয় যে এটি এক আইলবিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদ, যার চার কোনায় চারটি গোলাকার বুরুজ রয়েছে। মুঘল রীতিতে এই বুরুজগুলো ছত্রী ও কিউপোলা দ্বারা আচ্ছাদিত। এই মসজিদটির পরিমাপ ৩২′ × ১২′ ৬″। দেওয়াল প্রায় ৩ ফুট চওড়া। পূর্বদিকে তিনটি খিলানপথ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। অভ্যন্তর লম্বালম্বি দুটি (transverse) খিলান দ্বারা তিনটি বর্গাকার এলাকায় বিভক্ত। এই বর্গাকার স্থানের উপর তিনটি গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। ড্রামের সাহায্যে। গম্বুজের উপরে শীর্ষদেশে কলসচূড়া যা লোটাস পেটাল ভিতরে স্থাপিত। মিঠাপুকুর মসজিদের সাথে সুইপার কলোনির মসজিদের সাদৃশ্য থাকায় এটিকে উনবিংশ শতাব্দীর ইমারত বলে অভিহিত করা যায়।

১৩। বড় জামালপুর, গাইবান্ধা, মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দী

গাইবান্ধা মহকুমার (বর্তমানে জেলা) অন্তর্গত সাদুল্লাপুর থানাধীন বড় জামালপুর নামে একটি গ্রাম আছে। মসজিদটি মুঘল আমলের। তিনগম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার এই মসজিদের পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ১১.৪০ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩ মিটার ভিতরের দিকে। বাইরের দিকের মাপ হচ্ছে ১৬.৯০ × ৫.৫০। বাংলাদেশ ললিতকলা একাডেমীতে প্রকাশিত (১৯৯৪ জানুয়ারি, পৃষ্ঠা ৪৭-৫১) একটি প্রবন্ধে সুলতান আহমদ বড় জামালপুর মসজিদের উল্লেখ করেন। চিরাচরিত মুঘল ধাঁচে আয়তাকারে

তিন গম্বুজবিশিষ্ট বড় জামালপুর মসজিদটি খুবই আকর্ষণীয়। পূর্বদিক থেকে তিনটি খিলানপথ দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। উত্তর ও দক্ষিণে একটি করে খিলানপথ সৃষ্টি করা হয়েছে। মধ্যবর্তী পথ পার্শ্ববর্তী পথ অপেক্ষা সামান্য বড়। বর্তমানে এ দু'টি প্রবেশপথ গ্রিল দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। এই মসজিদের যে ব্যতিক্রম দেখা যায় তা হচ্ছে তিনটির স্থলে মাত্র একটি কেন্দ্রীয় আকৃতি মিহরাব। অপর একটি ব্যতিক্রম হচ্ছে শাহজাদপুর মসজিদের মতো এই মসজিদে কোনো কৌণিক বুরুজ নেই। প্রবেশপথগুলোর দুই পাশে সুউচ্চ ও সরু টারেট শোভা পাচ্ছে। এই সমস্ত টারেট ছত্রী ও কুপোলা দ্বারা আচ্ছাদিত।

বড় জামালপুর মসজিদটি অভ্যন্তরে তিনটি বর্গাকার এলাকায় বিভক্ত এবং প্রতিটির উপরে একটি গম্বুজ রয়েছে। অষ্টকোণাকার ড্রামের উপর নির্মিত গম্বুজগুলো। এই তিনটি গম্বুজের মধ্যে মধ্যভাগের গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত বড়। পেনডেনটিভের সাহায্যে গম্বুজগুলো নির্মিত। কলস ফিনিয়েল বা চূড়া গম্বুজের মাথায় শোভা পাচ্ছে। চূড়ার ভিত লোটাস পেটাল বা পদ্মপাতা থেকে উঠে গেছে। প্রাক-মুঘল এবং মুঘল আমলে নির্মিত মসজিদের অনেকগুলো যেভাবে প্রাচীরবেষ্টিত ছিল বড় জামালপুর মসজিদে একসময় সুউচ্চ ইটের বেষ্টনীপ্রাচীর ছিল। এই মসজিদ কবে তৈরি হয়েছিল তা বলা মুস্কিল তবে স্থানীয়ভাবে প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী হাজী জামালউদ্দীন, যিনি মসজিদের উত্তর দিকে সমাহিত রয়েছেন, নির্মাণ করেন। হাজী জামালউদ্দীনের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না, তবে সুলতান আহমদ মন্তব্য করেন যে, তিনি মুঘল আমলে একজন তহসিলদার ছিলেন। তিনি বলেন, "প্রায় ২০০ গজ দূরে নির্মিত দরিয়াপুর মসজিদের সাথে স্থাপত্যিক সাদৃশ্য থাকায় এই মসজিদটি সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নির্মিত হয়।"

১৪। বারিয়া, পীরগঞ্জ, মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দী

রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানাধীন বারিয়া নামক গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ দেখা যায়। থানা থেকে ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বারিয়ায় যে মসজিদটি আবিষ্কৃত হয়েছে তা মুঘল আমলের কীর্তি। সুলতান আহমদ এই মসজিদটি পর্যবেক্ষণ করে তার সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন। আয়তাকার তিন গম্বুজবিশিষ্ট এই মসজিদটি খুব ছোট ভিত্তিভূমির (plinth) উপর নির্মিত। পোড়ামাটির ইট, চুন, সুরকি দিয়ে তৈরি এই মসজিদটি বাইরের দিকে ১৫.১০ মিটার × ৬.৫০ মিটার এবং ভিতরের দিকে ১১.৪০ × ৩.৫০ মিটার। দেয়াল ১.২৫ মিটার চওড়া।

বারিয়া মসজিদে পূর্বদিক থেকে তিনটি খিলানপথ দিয়ে প্রবেশ করতে হয় এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকেও একটি করে খিলানপথ রয়েছে। মধ্যবর্তী খিলানপথটি অপেক্ষাকৃত বড়। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃতি গোলাকার মিহরাব, মধ্যবর্তী মিহরাবটি একটু বড়। মিহরাবের দেয়াল অলঙ্কৃত। মধ্যবর্তী মিহরাবের পিছনে উদ্গাত অংশ বা projection রয়েছে। এর দুই পাশে সরু ও উঁচু ট্যারেট দেখা যাবে।

মসজিদটি তিনটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। গম্বুজের ভিত্তি হচ্ছে অষ্টকোণাকার ড্রাম বা পিপা এবং উপরিভাগে একটি করে কলসচূড়া দেখা যাবে। সুলতান আহমদ বলেন, "On the stylistic ground the Baria mosque resembles Mithapukur Mosque, the Kamdia mosque a Govindaganj, the Nayarhat Mosque at Lalmonirhat, Kagitari Mosque at Pirgacha in the greater Rangpur district." স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মিঠাপুকুর, কামদিয়া (গোবিন্দগঞ্জ) এবং লালমনিরহাটের নয়ারহাট মসজিদের সাথে এবং পীরগাছার কাজিটারী সাদৃশ্য রয়েছে। এ ছাড়া খুব সম্ভবত বারিয়া মসজিদটির, যা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে নির্মিত, মিল দেখা যাবে।

রাজশাহী

রাজশাহী জেলা উত্তরবঙ্গের ২৪°–৭′ দক্ষিণ এবং ২৫°–৩′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°১৮′ বা পশ্চিম এবং ৮৯°২১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। পূর্ববর্তী রাজশাহী জেলা সর্বমোট ৩৬৪০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে গঠিত ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন মহকুমা জেলায় রূপান্তরিত হলে এর আয়তন পূর্ববর্তী রাজশাহী মহকুমায় সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণের সুবিধার্থে পূর্ববর্তী বৃহত্তর রাজশাহী জেলাভিত্তিক বিবরণ দেওয়া হল। এ জেলার উত্তরে দিনাজপুর এবং বগুড়া, পূর্বে বগুড়া ও পাবনা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে পদ্মা এবং পশ্চিমে পশ্চিম-বঙ্গের মালদহ জেলা। ঐতিহাসিক পটভূমিতে এ অঞ্চলটি বরেন্দ্র অঞ্চল নামে পরিচিত। এই বিশাল অঞ্চল প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদে সমৃদ্ধ। বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম আমলের বহু পুরাকীর্তি এখানে পাওয়া গেছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য পাহাড়পুর, গৌড়, কুসুম্বা, মাহিসন্তোষ, পুটিয়া, সুলতানগঞ্জ ইত্যাদি।

রাজশাহী শব্দের অর্থ রাজ বা রাজকীয় এলাকা। কিন্তু একথাটি সঠিক নয়। রাজশাহী শব্দটির উদ্ভব হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন রাজা কানস বা গণেশ এ অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইলিয়াস বংশের শেষার্ধে স্থানীয় ক্ষমতাশালী জমিদার বা রাজা গণেশ, যিনি দনুজমর্দনদেব নামেও পরিচিত ছিলেন, রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত পাণ্ডুয়া এই হিন্দু রাজবংশের রাজধানী ছিল। দনুজমর্দনদেবের পুত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ নাম ধারণ করে শাসন করতে থাকেন। সাধারণভাবে তাঁকে 'রাজা-শাহ' বলা হত এবং এ থেকেই রাজশাহী শব্দের নামাকরণ হয়।

প্রাচীন বৌদ্ধরাজ্য পুণ্ড্রবর্দ্ধন-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল রাজশাহী এবং এ অঞ্চলটি উত্তর-বঙ্গের কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল—বৌদ্ধ রাজবংশ পালদের আমলে রাজশাহী অঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং পাহাড়পুরে বৌদ্ধ বিহার ও মন্দির নির্মিত হয়। যদি বগুড়ার মহাস্থানকে মোয়েন-জোদারোর সাথে তুলনা করা যায় তা হলে পাহাড়পুরকে নালন্দা বললে অত্যুক্তি হবে না। বৌদ্ধ পাল এবং হিন্দু সেনরাজাদের শাসনামলে রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি এখনও কালের স্বাক্ষর বহন করে রয়েছে। সম্ভবত বাংলাদেশের

অপর কোনো এলাকা প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসস্তূপই নয়, প্রাচীন মুদ্রা তাম্রলিপি-শিলালিপিও পাওয়া গেছে। এ অঞ্চলে চীনা পর্যটক দুয়ার-চুয়ার পরিদর্শনে আসেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সৈন্যদের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি এখনও কালের সাক্ষর বহন করে রয়েছে। সম্ভবত বাংলাদেশের অপর কোনো এলাকা প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসস্তূপই নয়, প্রাচীন মুদ্রা, তাম্রলিপি-শিলালিপিও পাওয়া গেছে। এ অঞ্চলে চীনা পর্যটক হুয়াং-চুয়াং পরিদর্শনে আসেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেনদের পরাজিত করে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম শাসনামলের গোড়া থেকেই এ অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ইমারত নির্মিত হতে থাকে যার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন সড়কের অংশবিশেষ এবং অসংখ্য আরবি শিলালিপিতে। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন ইলিয়াস বংশ প্রতিষ্ঠিত হলে স্থাপত্যকলার উন্মেষ হয় এবং মুসলিম স্থাপত্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রাক-মুসলিম যুগের সর্ববৃহৎ ও আকর্ষণীয় প্রত্নসম্পদ হচ্ছে পাহাড়পুর। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৩৩-৩৪ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম এখানে খননকাজ শুরু করে।

মুসলিম আমলের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যিক নিদর্শনাদি দেখা যাবে গৌড় ও হযরত পাণ্ডুয়া নামে দুটি শহরে। বরেন্দ্র অঞ্চলে অবস্থিত এবং প্রাচীন গঙ্গার অবলুপ্ত একটি শাখায় এ দু'টি মুসলিম নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত মালদা ও বর্তমান রাজশাহী জেলার বরেন্দ্র অঞ্চলটিকে বলা হয় 'প্রত্নতাত্ত্বিক আকর'। মহানন্দা গঙ্গা এবং পুনর্ভরা নদী বিধৌত অঞ্চলে এ দুটি প্রাচীন জনপদ গড়ে ওঠে। বস্তুত বাংলাদেশের যে অঞ্চলে এখনও যে সমস্ত আকর্ষণীয় ইমারত দেখা যাবে তা চাপাইনবাবগঞ্জের (বর্তমানে জেলা) ফিরোজপুর উপশহরে অবস্থিত। ভাগীরথী নদীর উভয় দিকে বালুকাময় অঞ্চলে এই জনাবসতি গড়ে ওঠে। ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে কোলব্রুক এ অঞ্চলের একটি মানচিত্র প্রস্তুত করার সময় দেখতে পান মূল নদীর ধারাটি থেকে বর্তমান নদীটি তিন মাইল পশ্চিমে সরে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার প্রধান কার্যালয় ইংলিশ বাজার থেকে ১১ মাইল এবং গৌড় থেকে ২০ মাইল উত্তরে হয়রত পাণ্ডুয়া অবস্থিত। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য এবং মহাকাব্যে পাণ্ডুয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ছাড়া পারস্য ভাষায় লিখিত ইতিহাস পাণ্ডুয়া নগরীর উল্লেখ রয়েছে। চীনা পর্যটকদের ভাষায় এটি 'পান-তু-য়া'। এ সমস্ত পর্যটক সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের শাসনামলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে (১৪০৬) এদেশে আসেন। মা-হুয়ানের ভাষায় দেশটি বা অঞ্চলটি ছিল খুবই প্রশস্ত এবং ঘনবসতিপূর্ণ। রাজধানী পাণ্ডুয়া ছিল প্রাচীরঘেরা একটি অনিন্দ্যসুন্দর নগরী এবং এখানে রাজা, রাজ-কর্মচারীবৃন্দ বসবাস করতেন। ফিরিস্তা হযরত পাণ্ডুয়াকে 'বুন্দুয়া' বলে অভিহিত করেন। ইলিয়াস বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ গৌড় থেকে রাজধানী হযরত পাণ্ডুয়ায় ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে স্থানান্তরিত করেন। এম. এম. চক্রবর্তীর ভাষায়, "পাণ্ডুয়া গৌড়কে জনসংখ্যা এবং চাকচিক্যের দিক থেকে অতিক্রম করে গেছে। শুধু তাই নয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থাকায় এ নগরী ছিল পূত-পবিত্র। রাজধানী হিসাবে পরপর

দুটি রাজ-বংশের-তথা ইলিয়াসশাহী এবং যদুবংশের শাসনামলে এ নগরী বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত হবার ফলে হযরত পাণ্ডুয়ার গুরুত্ব হ্রাস পায়নি। এখানে আওরঙ্গজেবের শাসনামল পর্যন্ত ইমারত নির্মিত হতে থাকে।" রাজধানী পাণ্ডুয়াকে শ্রদ্ধাভরে বলা হয় হযরত পাণ্ডুয়া এ কারণে যে এখানে দু'জন পুণ্যাত্মা সমাহিত আছেন, যাদের ধর্মীয় ভাবধারা ও প্রভাব ছিল অপরিসীম। তাঁরা হচ্ছেন হযরত নূর কুতুব আলম (ছোট দরগা) এবং হযরত শাহ জালালের পবিত্র মাজার (বড় দরগা, শ্রীহট্টের শাহ জালাল নয়) এখনও ভক্তদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। উপরন্তু, হুগলীর ছোট পাণ্ডুয়ার সাথে পার্থক্য সৃষ্টির জন্য 'হযরত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

গৌড়ের কিছু অংশ বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার অন্তর্গত হলেও হযরত পাণ্ডুয়ার সমস্ত বৈশিষ্ট্যপূণ প্রত্নকীর্তি, যেমন আদিনা মসজিদ, মাজারসমূহ, দুর্গ, একলাখী সমাধি পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলায় অবস্থিত। হযরত পাণ্ডুয়ার পুরাকীর্তি প্রসঙ্গে রাভেনশ বলেন, "যদিও গৌড়ের মতো পাণ্ডুয়া প্রাচীনত্ব দাবি করতে পারে না, এতদসত্ত্বেও ধ্বংসস্তূপ থেকে মনে হয় যে পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষ ব্যবহৃত হয়েছে। অপর দিকে হান্টার মনে করেন যে, হযরত পাণ্ডুয়া প্রাচীনতম নগরী এবং গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দিয়েই হযরত পাণ্ডুয়ার স্থাপত্যকীর্তি নির্মিত হয়েছে; এ ছাড়া গৌড়ের মতো হযরত পাণ্ডুয়া বিশাল নদীর তীরবর্তী শহর ছিল না, যদিও পুর্ণভরা নদীর তীরবর্তী ছিল এই নগরী। যাহোক, গৌড় ও হযরত পাণ্ডুয়া যে বিশাল ও জনবহুল এলাকা ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ দুটি শহরে নির্মিত প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদসমূহ নিরীক্ষণ করলে প্রতীয়মান হবে যে, এ স্থান দুটিতে বৌদ্ধ ও হিন্দু আমলে প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন ছিল, যা মুসলিম শাসনের প্রারম্ভে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়, যেমন আদিনা মসজিদে বৌদ্ধ ও হিন্দু মূর্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে।

পেম্বারটন বলেন, "মালদা থেকে দিনাজপুরের দিকে যে প্রধান সড়কটি পরগনার দক্ষিণ-পূর্বদিক দিয়ে গেছে, এ সড়কের উভয় দিকে ধ্বংসাবশেষ দেখা যাবে, যা পুরুয়া বা পাণ্ডুয়ার স্থাপত্যকীর্তি হিসাবে চিহ্নিত। ইটবিছানো এ প্রশস্ত রাস্তাটি ১২ থেকে ১৫ ফুট চওড়া। এটি হযরত পাণ্ডুয়ার মধ্য দিয়ে প্রসারিত এবং দুধারে ইটের তৈরি অসংখ্য ইমারতের ধ্বংসস্তূপ দেখা যাবে। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় এ সড়কটি বাংলার তৎকালীন গভর্নর গিয়াসউদ্দীন ইওয়াজ কর্তৃক নির্মিত হয় এবং এটি দক্ষিণে গৌড়ের সাথে উত্তরে দেবীকোটের যোগসূত্র স্থাপন করেছে।

যথোপযুক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও খননের ফলে যদিও গৌড় ও হযরত পাণ্ডুয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদের সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না, এতদসত্ত্বেও যে সমস্ত মুসলিম ইমারত এখনও বর্তমানে রয়েছে, যা সংস্কারকৃত অথবা ভগ্নাবস্থায় দেখা যাবে, তা সুলতানী স্থাপত্যকলার ঐতিহ্য বহন করে রয়েছে। হযরত পাণ্ডুয়া ২৪ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত। টাঙ্গন নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত হযরত পাণ্ডুয়া নিঃসন্দেহে একটি প্রাচীন জনপদ ছিল। অন্যদিকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি গৌড় নগরী মহানন্দা নদীর তীরবর্তী এলাকায় অবস্থিত। রেনেলের ভাষায়, "গৌড় অথবা লক্ষ্ণণাবতী ছিল প্রাচীন বাংলার

রাজধানী এবং সম্ভবত টলেমির 'Gangia Regia' যা গঙ্গার পশ্চিমদিকে, রাজমহলের ২৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। এটি খ্রিস্টের পূর্বে রাজধানী ছিল।" ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে মালদায় কুশান আমলের একটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। খ্রিস্টীয় ২০০ সনে রাজা বাসুদেব এই মুদ্রাটি ছাপান। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাক-মুসলিম যুগে এ অঞ্চলটি বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। গৌড়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে। স্থানীয় কিংবদন্তি অনুযায়ী আদিসূর বল্লাল সেন এবং লক্ষণ সেনের আমল থেকে গৌড় প্রসিদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়। এম. এম. চক্রবর্তীর মতানুসারে গৌড় পাল রাজবংশের শাসনামলে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয় : গৌড় ও হযরত পাণ্ডুয়ায় প্রাপ্ত অসংখ্য বৌদ্ধ-হিন্দু ভাস্কর্য, স্থাপত্যিক ও আলঙ্কারিক নিদর্শন পাওয়া গেছে, যা মুসলিম ইমারতে ব্যবহৃত হয়েছে। একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, এ দুটি শহর প্রাক-মুসলিম যুগে সমৃদ্ধি লাভ করে। এ ছাড়া কতিপয় তাম্রলিপি উদ্ধার করা হয়েছে এ অঞ্চল থেকে বিশেষ করে ধর্ম পালের আমলের একটি তাম্রলিপি ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের খালিমপুরে আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ছাড়া মহীপাল এবং নারায়ণপাল কতিপয় তাম্রলিপি জারি করেন। সেন রাজবংশের আমলে গৌড় স্বর্ণযুগে পৌঁছায়। এ সময়ে বল্লাল সেন বাংলায় কুলীনপ্রথা প্রচলন করেন। উত্তর-দক্ষিণে সাগরদিঘি খনন করা হয় তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায়। এ ছাড়া তিনি রাজপ্রাসাদ ও দুর্গও নির্মাণ করেন নগরীর উত্তরে সাদুল্লাহপুর এলাকায়। হযরত পাণ্ডুয়ার মতো গৌড় বরেন্দ্র অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। বরেন্দ্র বা বেরিন্দে শব্দটি গায়দুতঙ্গদেবের জারিকৃত তালচর হলফনামায় (Grant) এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে'র কবিপ্রশস্তিতে উল্লিখিত হয়েছে। মিনহাজউদ্দীন সিরাজ, যিনি গৌড় পরিদর্শন করেন, গৌড় সম্বন্ধে বর্ণনা রেখে গেছেন তাঁর 'তবকত ই-নাসিরী' গ্রন্থে। 'জনকভূ বা 'পৃথিবীর সর্বাধিক আকৃষ্ট রত্ন' হিসাবে পরিচিত বরেন্দ্র অঞ্চল শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি ও স্থাপত্যকলা ভাস্কর্য ও চিত্রকলার প্রধান কেন্দ্র ছিল। সম্রাট আকবরের আমলে বাংলার ১৯টি সরকারের মধ্যে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে উল্লিখিত বারবাকাবাদ বরেন্দ্র অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। বরেন্দ্র অঞ্চলটি মালদা, দিনাজপুর, রাজশাহী এবং বগুড়ার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল।

বরেন্দ্র অঞ্চলের নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের সূচনা হয় মুসলিম বিজয়ের পর ১১৯৯-১২০০ খ্রিস্টাব্দে। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী নদীয়া আক্রমণ করে সেন-বংশের সর্বশেষ রাজা লক্ষণ সেনকে বিতাড়িত করেন এবং পরে গৌড়ে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম শাসন কায়েম করেন। মিনহাজউদ্দীন সিরাজ তাঁর 'তরকত-ই-নাসিরী'তে বলেন যে, গৌড় খুব সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল এবং এখানে অনেক সৌধ নির্মিত হয়। ১৩৩৮ থেকে ১৪৩৭ খ্রিঃ পর্যন্ত গৌড় স্বাধীন বাংলার রাজধানী ছিল। অবশ্য যদু বংশের শাসনামলে রাজধানী গৌড় থেকে হযরত পাণ্ডুয়ায় স্থানান্তরিত হয়। গৌড়ে বিভিন্ন ধরনের ইমারত নির্মিত হয়—দুর্গ, প্রাসাদ, মসজিদ, সমাধি, মাদ্রাসা, সরাইখানা ইত্যাদি। সুলতান হোসেন শাহ একডালা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। এ সময়ে পুর্তুগীজ পর্যটক দি বারোজ বাংলায় আসেন, বিশেষ করে হোসেনশাহী বংশের সর্বশেষ সুলতান তৃতীয় মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে। তিনি বলেন, "এ রাজ্যের প্রধান নগর ছিল গৌর (Gouro)। এটি গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল এবং

ধারণা করা হয়ে থাকে যে তিন অথবা চার লীগ (মাইল) বিস্তৃত ছিল। এর জনসংখ্যা ছিল ২০০,০০০। এ নগরীর সুরক্ষার জন্য একদিকে ছিল নদী এবং অপর দিকে প্রাচীরবেষ্টনী। রাস্তা খুব প্রশস্ত ছিল এবং প্রচুর জনসমাগম হত। অধিকাংশ ইমারত ছিল খুবই জাঁকজমকপূর্ণ।" ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহের বিরুদ্ধে অভিযান করে হুমায়ুন গৌড়ে আসেন। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি এ শহরের সমৃদ্ধি ও জৌলুস দেখে মুগ্ধ হন এবং এর নামকরণ করেন 'জান্নাতাবাদ' বা 'ভূস্বর্গ'। পরবর্তীকালে নদীর গতি পরিবর্তিত হলে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতির সাথে সাথে রাজধানী পরবর্তীকালে গৌড় থেকে বিহারের তাণ্ডায় স্থানান্তরিত হয়।

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারের মতে গৌড়ের আয়তন ছিল .২২ থেকে ৬৩ বর্গমাইল। লম্বালম্বি এ শহরটি উত্তর-দক্ষিণে ছিল ৭$\frac{১}{২}$ মাইল এবং প্রস্থে ১ থেকে ২ মাইল। আবিদ আলীর মতে, ১২$\frac{১}{২}$ মাইল × ২ মাইল বিস্তৃত গৌড় তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল : (ক) দুর্গ কমপ্লেক্স (খ) প্রাচীরবেষ্টিত নগরী (গ) উপশহর। দক্ষিণাংশ অর্থাৎ রাজশাহীর চাপাই নবাবগঞ্জের ফিরোজপুর অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র গৌড় পশ্চিম বাংলার মালদা জেলার অন্তর্ভুক্ত। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে ক্রেটন যে মানচিত্র অঙ্কন করেন তাতে ২৫টি মসজিদ, ১২টি ফটক, অসংখ্য দিঘি দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশে গৌড়ের অংশবিশেষে যে সমস্ত অত্যুৎকৃষ্ট ইমারত স্থাপত্যিক সৌকার্যে সমুজ্জ্বল তা হচ্ছে ছোট সোনা মসজিদ, ধনচক মসজিদ, দরসবাড়ি মসজিদ এবং আধুনিককালে খননের ফলে প্রাপ্ত দরসবাড়ি মাদ্রাসার ধ্বংসাবশেষ, রাজবিবি মসজিদ, শাহ নিয়ামতউল্লাহর মসজিদ, মাজার ও তহখানা। যাহোক, জনৈক পর্যটক আক্ষেপ করে বলেছেন যে, "গৌড়ের প্রাচীন ঐতিহ্য বিলুপ্তই হয়নি, এ-ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের কোনো উপায় নেই।"

১। ফিরোজপুর (গৌড়), দরসবাড়ি, মাদ্রাসা এবং মসজিদ ১৪৭৯ খ্রিষ্টাব্দ (৬৫)

'দরস' আরবি শব্দ এবং ইংরেজিতে এটিকে অনুশীলনী বা বক্তৃতা বলা হয়ে থাকে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, গৌড়ে দরসবাড়ি নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মীয় শিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানটির কিছুদিন আগে পর্যন্ত কোনো চিহ্নই ছিল না; বর্তমানে খননের ফলে এটির ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে।

এলাহী বক্স বলেন, "উমরপুর নামক স্থানে পাথরের স্তম্ভসম্বলিত ইটের একটি বিশাল মসজিদ নির্মিত হয়। পার্শ্ববর্তী মসজিদটি 'মাদ্রাসা' থেকে নামকরণ করা হয়েছে।" মাহদীপুর এবং উমরপুরের মধ্যভাগে কোতওয়ালী ফটকের আধ মাইল দক্ষিণে মসজিদ মাদ্রাসা কমপ্লেক্স স্থাপিত হয়। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে কিং এ স্থান পরিদর্শন করেন এবং উল্লেখ করেন যে, যে মাদ্রাসা থেকে মসজিদটির নামকরণ হয়েছে তা অতীব সুন্দর ইমারত ছিল।

এলাহী বক্স জঙ্গল থেকে যে শিলালিপি উদ্ধার করেন তাতে উদ্ধৃত আছে যে, সুলতান ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় হিঃ ৮৮৪/১৪৭৯ খ্রিস্টাব্দে দরসবাড়ি মসজিদ নির্মিত হয়। আরবি লিপিশৈলী 'তুঘরা' রীতিতে উৎকীর্ণ এ

শিলালিপিটি বর্তমানে কলকাতার ইন্ডিয়ান জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু কিং ইংলিশ বাজারের একটি মসজিদে প্রোথিত হোসেন শাহের আমলের হিঃ ৯০৭, ১৫০২ খ্রীস্টাব্দে যে শিলালিপির উল্লেখ করেন তার সাথে দরসবাড়ি মসজিদের শিলালিপির কোনো সম্পর্ক নেই। অবশ্য একথা সঠিক যে সুলতান হোসেন শাহ উক্ত সনে গৌড়ে বেলবাড়ি নামক স্থানে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

মসজিদ ঃ দরসবাড়ি মাদ্রাসা ও মসজিদের মধ্যভাগে একটি দিঘি রয়েছে। বর্তমানে ভগ্নপ্রাপ্ত দরসবাড়ি মসজিদটি ছাদবিহীন অবস্থায় পরিত্যক্ত ইমারত হিসাবে অবহেলিত। বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ এটি সংস্কার করেছে। মসজিদটির ভূমি নকশা আয়তকার। মধ্যবর্তী স্থানে একটি নেভ বা ভল্টযুক্ত চৌচালা ধরনের হলের সাহায্যে উত্তর ও পশ্চিমদিকে দুটি কক্ষের সৃষ্টি করা হয়েছে। মসজিদটির পরিমাপ ৯৮ ফুট × ৫৭ ফুট। অক্ষত অবস্থায় মসজিদটির চার কোনায় অষ্টকোণাকৃতি বুরুজ ছিল, যা বহু দিন পূর্বে ভেঙে গেছে। নেভটির ছাদ ভল্টদ্বারা আবৃত, যা গৌড়ের গুণমন্ত এবং হযরত পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদের 'নেভে' দেখা যাব। মসজিদের অভ্যন্তরে তিনভাগ বিভক্ত। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা কেন্দ্রীয় কক্ষের আয়তন ছিল ৩৮′-৯″ × ১৭′- ৯″ এবং পূর্ব পশ্চিমে লম্বা পাশের দু'টি অংশের প্রত্যেকটির আয়তন ছিল ৩৮′ - ৯″ × ৩৭′- ৪″। পাশের দু'টি অংশের প্রত্যেকটি আবার দু'সারি স্তম্ভ দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত। খিলানগুলোর প্রতি অংশ ছয়টি পাথরের স্তম্ভের সাহায্যে নির্মিত। নেভের উত্তর পাশের নামাজঘর দুটির প্রতিটিতে ৯টি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। গম্বুজগুলো ড্রামবিহীন এবং অর্ধ-গোলাকৃতি অর্থাৎ মূল মসজিদে চৌচালা ধরনের তিনটি ভল্ট এবং আঠারোটি গম্বুজ ছিল যা বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত।

দরসবাড়ি মসজিদের উত্তরদিকে বারান্দা রয়েছে, যা বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মূল মসজিদের মতো মধ্যবর্তী অংশটি চৌচালা ধরনের ভল্ট এবং পার্শ্ববর্তী অংশ দুটি তিনটি করে মোট ছয়টি গম্বুজ দ্বারা আবৃত ছিল। বারান্দার উত্তর এবং দক্ষিণ কোণায় মসজিদের অনুরূপ অষ্টকোণাকৃতি বুরুজ নির্মিত হয়। দরসবাড়ি মসজিদে প্রবেশের জন্য উত্তরদিক থেকে সাতটি খিলানপথ নির্মিত হয়। ইটের তৈরি বিশাল স্তম্ভের সাহায্যে এগুলো তৈরি করা হয়। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত বড়। বারান্দার খিলানপথ বরাবর মসজিদেও সাতটি খিলানপথ সৃষ্টি করা হয়, যার মধ্য দিয়ে নামাজঘরে প্রবেশ করতে হয়। বারান্দার উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে প্রবেশপথ ছিল।

দরববাড়ি মসজিদটি স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য এবং অলঙ্করণের দিক থেকে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। মিহরাব-প্রাচীরে নয়টি অবতলাকৃতি মিহবার দেখা যাবে। উত্তর-পশ্চিম অংশে জেনানাদের জন্য দ্বিতল গ্যালারি নির্মিত হয় এবং উপরন্তু একটি মিহরাব ছিল। মিহরাব-প্রাচীরের বাইরের দেওয়াল উদ্গত বা Projection ছিল।

দরসবাড়ি মসজিদের পোড়ামাটির অলঙ্করণ সুলতানী আমলের অন্যান্য মসজিদ, যেমন চামকাটি, তাঁতিপাড়া ও আদিনা মসজিদকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ মসজিদের

অন্যতম আকর্ষণ বাংলার দোচালা ধরনের কুঁড়েঘরের অনুকরণে দোচালা নির্মাণ যা বাগেরহাটের তথাকথিত ষাইট গম্বুজ মসজিদে দেখা যাবে। এ মসজিদের খিলানাকৃতি খাঁজকাটা এবং বিশেষ ভাবে জ্যামিতিক ও লতপাতা নকশা দ্বারা অলঙ্কৃত। আহমদ হাসান দানী দরসবাড়ি মসজিদের ইটের নকশার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর ভাষায়, "যে নকশা করা হয় তা খুবই চাতুর্যের সাথে খোদিত হয়েছে এবং সুসমন্বিত।"

এ. বি. এম. হোসেন সম্পাদিত এবং এশিয়েটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'গৌড় লখনাউতী" শীর্ষক গ্রন্থে জনাব এম. এ. কাদেরের দরসবাড়ি মাদ্রাসা সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ রয়েছে। কাদেরের ভাষায়, "১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে দরসবাড়ি এলাকায় যে শিলালিপি পাওয়া যায় তার ফলে এ স্থানে যে একটি অত্যুৎকৃষ্ট স্থাপত্যিক ইমারতের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে তার সন্ধান পাওয়া যায়। এ প্রত্নসম্পদটি এতকাল মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকে। এর পর ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে এখানে বাংলাদেশ প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ কর্তৃক সামান্য খনন কাজ পরিচালিত হয়।"

দরসবাড়ি মসজিদসংলগ্ন এ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানটি মোটামুটি একটি চতুষ্কোণাকার ঢিবি (mound), যার পরিমাপ প্রায় ২০০ বর্গফুট এবং ৫ থেকে ৭ ফুট উঁচু ছিল। এ ঢিপিটির নামাকরণ হয় দরসবাড়ি থেকে, যা মাদ্রাসাকে ইঙ্গিত করে। এখানকার বহু ইট ও প্রত্নসামগ্রী চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়, যার ফলে ঢিবিটি আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ইলাহী বক্স তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'খুরশীদ-ই-জাহান নামা' গ্রন্থে দরসবাড়ি মাদ্রাসার উল্লেখ করেন। তিনি বর্তমানে কলকাতার ইন্ডিয়ান জাদুঘরে রক্ষিত একটি শিলালিপির কথাও বলেন যা সম্ভবত দরসবাড়ি মাদ্রাসা এলাকা থেকে সংগৃহীত হয়। কিন্তু কানিংহাম বলেন যে, "স্থানটি দরসবাড়ি বা কলেজ নামে পরিচিত কিন্তু শিলালিপিতে একটি মসজিদ নির্মাণের উল্লেখ আছে। খুব সম্ভব মসজিদটি মাদ্রাসার সংলগ্ন ছিল।"

এম. এ. কাদের দরসবাড়ি মাদ্রাসার খননকাজ পরিচালনা করেন। তাঁর ভাষায়, "ভূমি নকশার দিক থেকে মাদ্রাসাটি চতুষ্কোণাকার কারণ যার প্রতি বাহু ১৬৯ ফুট দীর্ঘ। মধ্যভাগে রয়েছে একটি খোলা চত্বর এবং এর চারপাশে চল্লিশটি কক্ষ দেখা যাবে। এ কক্ষগুলো চারটি খণ্ডে বিভক্ত করা হয়। চত্বরটির পরিমাপ ১২৩ বর্গফুট। এই মাদ্রাসাটি চার কোনায় চারটি বুরুজ দ্বারা সুগঠিত। বুরুজগুলো অষ্টকোণাকৃতি। দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্তর দেওয়ালের মধ্যভাগে তিনটি প্রবেশপথ ছিল। ফটকগুলো দেওয়ালের বাহিরে উদ্গত ছিল। ফটকের উভয় পাশে অষ্টকোণাকৃতি মিনার (টারেট) শোভা পেত। পশ্চিমদিকের মধ্যভাগে একটি নামাজঘর স্থাপিত হয়। এটি পূর্বদিকের ফটকের উল্টো দিকে রয়েছে। পশ্চিম বা কিবলাপ্রাচীরে তিনটি মিহরাব ছিল। প্রতিটি ফটকের তিনটি অংশ ছিল, উভয় দিকে ৮ ফুট × ৪ ফুট দীর্ঘ দুটি ৭৪′ এবং ১১ ফুট ৪ ইঞ্চি বর্গ পরিমাপের প্রবেশকক্ষ।

দরসবাড়ি মাদ্রাসায় চল্লিশটি কক্ষ ছিল, প্রতিটি কক্ষ চতুষ্কোণাকার, যার পরিমাপ ১১ ফুট ৪ ইঞ্চি। কেবলমাত্র নামাজঘরটি ছিল একটু বড়, পরিমাপ ১৬ বর্গফুট। মাদ্রাসার চার কোনায় চারটি কক্ষ ছিল এবং এ সমস্ত কক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে দেওয়াল

ঘেরা অবস্থায় বত্রিশটি কক্ষ নির্মিত হয়। প্রতিটি কক্ষ চত্বরের দিকে খোলা ছিল। মাদ্রাসাটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে বিধায় এটির ছাদ কিরূপ ছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। কাদের ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধারকৃত ছাদের অংশ বিশেষ পরীক্ষা করে এ সীদ্ধান্তে আসেন যে, মাদ্রাসাটি গম্বুজবিশিষ্ট ছিল। সর্বমোট চল্লিশটি কক্ষের জন্য চল্লিশটি ক্ষুদ্রাকৃতি গম্বুজ নির্মিত হয়। গম্বুজগুলো পানদানটিভ বা দেওয়ালের চার কোনায় ত্রিকোণাকার অংশের সাহায্যে নির্মিত হয়।

দরসবাড়ি মাদ্রাসা সে পোড়ামাটির অলঙ্করণ দ্বারা শোভিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ধ্বংসস্তূপ থেকে আবিষ্কৃত পোড়া মাটির নকশা থেকে। লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশাকৃত মধ্যবর্তী স্থানে একটি আয়তাকার প্যাভেলিয়ন দেখা যাবে। কি উদ্দেশ্যে এটি নির্মিত হয় তা সঠিকভাবে বলা যাবে না।

দরসরাড়ী মাদ্রাসার সঠিক নির্মাণকাল সম্বন্ধে মতবিরোধ রয়েছে। এস্থান থেকে হোসেনশাহী আমলের যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হয় তার সন হিজরী ৯০৯ অর্থাৎ খ্রিস্টাব্দ, ১৫০৩–১৫০৪। এম. এ. কাদের এ শিলালিপির উপর ভিত্তি করে মনে করেন যে, মাদ্রাসাটি হোসেন শাহী আমলে নির্মিত হয়। উল্লেখ্য যে, এই শিলালিপিটি কোনো ইমারতে প্রোথিত ছিল না। ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। অপরদিকে পার্শ্ববর্তী মসজিদটি দরসবাড়ি মসজিদ নামে পরিচিত এবং এটি ১৪৭৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ইউসুফ শাহ কর্তৃক নির্মিত হয়। এশিয়েটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত জার্নালে গ্রন্থকারের যে প্রবন্ধটি ছাপা হয় তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যেহেতু মসজিদটি পার্শ্ববর্তী মাদ্রাসা থেকে নামাকৃত হয়েছে সেহেতু মাদ্রাসাটি ইউসুফ শাহ কর্তৃক নির্মিত হয়।

২। রাজবিবি মসজিদ, পঞ্চদশ শতাব্দী (৬৬)

দরসবাড়ি মসজিদের মত সুলতানী আমলের অপর একটি আকর্ষণীয় ইমারত হচ্ছে রাজাবিবি মসজিদ। এটিও অক্ষত অবস্থায় ছিল না, প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ এটি সংস্কার করেছে। মসজিদটির নির্মাতা কে তা সঠিকভাবে বলা যায় না। এক গম্বুজবিশিষ্ট এবং বারান্দাসম্বলিত রাজবিবির মসজিদটি কোতওয়ালী ফটকের দক্ষিণ-পূর্বে নির্মিত হয়। এটি খানিয়া দিঘির পাড়ে স্থাপিত বলে এটিকে খানিয়া দিঘির মসজিদও বলা হয়ে থাকে। যাহোক, এর নাম রাজবিবি হওয়ায় ধারণা করা হয় যে সুলতানী আমলের কোনো রানী এটি নির্মাণ করেন। এলাহী বক্সের মতে, এর পরিমাপ ৩৭ বর্গহাত পূর্ব-পশ্চিমে এবং ২৯ বর্গহাত উত্তর-দক্ষিণে। পূর্ব সামনের দিকে যে বারান্দা রয়েছে তা তিনটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত ছিল। মসজিদের চার কোনায় এবং বারান্দার দুই কোণে মোট ছয়টি অষ্টকোণাকৃতি বুরুজ রয়েছে। এলাহী বক্স্ যে পরিমাপ দেন তা সঠিক নয়। দানী বলেন যে, মূল নামাজঘরটি ১৮ বর্গফুট এবং মসজিদটির পরিমাপ ৬২ ফুট × ৪২ ফুট।

রাজবিবি মসজিদের পশ্চিম দেওয়ালে একটি কেন্দ্রীয় মিহরাব এবং দু'পাশে দুটি ক্ষুদ্রাকৃতি অবতল মিহরাব দেখা যাবে। পূর্বদিক থেকে তিনটি খিলানপথের মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। বারান্দায় উত্তর ও দক্ষিণদিকেও একটি করে খিলানপথ

ছিল। এ মসজিদে কোনো শিলালিপি পাওয়া যায়নি। এতদসত্ত্বেও একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে সুলতানী আমলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে এ মসজিদটি স্থাপিত হয়। দানী বলেন যে, রাজবিবির মসজিদ খুবই অলঙ্কৃত ছিল এবং অপূর্ব লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশায় পোড়ামাটিতে খোদিত হয়েছে। বাংলার ঢালুছাদ বা কার্নিশ ছিল কি না তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে থাকাটাই স্বাভাবিক ছিল, যেমনটি দরসবাড়ি মসজিদ, বাগেরহাটের তথাকথিত ষাইট গম্বুজ মসজিদে ব্যবহৃত হয়েছে। দানী বলেন যে, হযরত পাণ্ডুয়ার একলাখী সমাধির সঙ্গে গৌড়ের রাজবিবি মসজিদের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

৩। ধনচক মসজিদ, পঞ্চদশ শতাব্দী (৬৭)

গৌড়ের অবিন্যস্ত ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আজও ঐতিহ্যবাহী মসজিদ রীতির নিদর্শন-স্বরূপ ভগ্নাবস্থায় টিকে আছে ধনচক মসজিদ। কালের স্বাক্ষর হিসাবে ছয় গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার এ মসজিদটির নামকরণ কিভাবে হয়েছিল তা বলা যায় না। গ্রন্থকার তাঁর 'Mosque Architecture of Pre-Mughal Bengal' শীর্ষক পি-এইচ. ডি. নিবন্ধে বলেছিলেন, "মাহদীপুর এলাকায় উত্তরে দরসবাড়ি এবং দক্ষিণে শাহ নিয়ামত উল্লাহর মাযারের মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপত্যিক উপকরণ সম্বলিত একটি ইটের ঢিবি দেখা যাবে (যা পরবর্তীকালে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ পরিষ্কার ও সংস্কার করে।) স্থানীয় ধুনরীদের নামানুসারে এ মসজিদের নাম হয় ধনচক বা ধুনীচক মসজিদ।" ল্যামবার্ন বলেন যে, ধনপাট সাওদাগরের নাম থেকে ধনচক মসজিদের নামকরণ হয়েছে। সম্ভবত ধনচক গৌড়ে ষোড়শ শতাব্দীতে কিংবদন্তিখ্যাত চাঁদ সওদাগরের ভাই ছিলেন। কিন্তু একথাটি সত্য নয়। প্রথমত, কানিংহাম প্রদত্ত মানচিত্রে ধনচক দেখানো হয়নি এবং দ্বিতীয়ত, ধনচক নামক মসজিদটি ষোড়শ শতাব্দীর নয়, পঞ্চদশ শতাব্দীর।

প্রাচীরটি কালের স্বাক্ষী হিসাবে দাণ্ডায়মান। এ মসজিদটির সঠিক পরিমাপও জানা যায় না। আবিদ আলী খান ধনচক মসজিদের সঙ্গে রাজবিবি মসজিদের তিনটি গম্বুজবিশিষ্ট বারান্দাসহ এক গম্বুজে আবৃত একটি ইমারতের সাথে ধনচক বা ধূনীচক মসজিদটি গুলিয়ে ফেলেন। প্রকৃতপক্ষে ধূনীচক মসজিদটিতে কোন বারান্দা নেই এবং এটি আয়তাকারে ছয় গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ। কিন্তু আহমদ হাসান দানী ভুলবশত বলেন, "পশ্চিমদিকে দেয়ালে পাথরের সংলগ্ন পিলাস্টার রয়েছে এবং উত্তর-পূর্ব কোণে ইটের খাঁজকরা সারি দেখা যাবে। এ থেকে ধারণা হয় যে, ইমারতটি একটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত ছিল।" কিন্তু তিনি দুটি প্রস্তরস্তম্ভের উল্লেখ করে বলেন যে, একটি প্রোথিত অবস্থায় এবং অপরটি নিজ স্থান থেকে দূরে সরে পশ্চিমদিকে একটি মিহরাবের সামনে পড়ে রয়েছে। দুটি স্তম্ভ থাকলে একসারিতে তিনটি খিলান নির্মিত হয় এবং খিলানসারি (arcade) মসজিদকে দু'টি আইলে বিভক্ত করেছে অর্থাৎ অভ্যন্তরে ছয়টি বর্গাকার এলাকার সৃষ্টি হয়েছে। তাই স্বাভাবিক কারণেই এ ইমারতে ছয়টি গম্বুজ ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায়।

আদিতে মসজিদটির চার কোনায় বুরুজ ছিল এবং পূর্বদিকে খিলানপথ ছিল খাঁজকাটা খিলান তিনটির মধ্যে মধ্যবর্তী খিলানটি একটু বড় থাকার কথা নিয়ম-মাফিক। খিলানগুলো সম্ভবত আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ ছিল। কার্নিশও ছিল হয়তো সামান্য ঢালু কিংবা সমান্তরাল। বারান্দাবিহীন ছয় গম্বুজবিশিষ্ট এ মসজিদটির অবশিষ্টাংশ কিবলাপ্রাচীরে তিনটি পরিপাটির সাথে পোড়ামাটির অলঙ্করণসমৃদ্ধ মিহরাব দেখা যাবে। তিনটি মিহরাবের মধ্যে মধ্যভাগের প্রধান মিহরাবটি একটু বড় এবং খাঁজকাটা খিলান দ্বারা সমৃদ্ধ। মিহরাব-প্রাচীরে অলঙ্করণের সমারোহ। তিনটি মিহরাব আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ। দানী অলঙ্করণ প্রসঙ্গে বলেন, "The arch is cusped while its spandrels show tree-motif intertwining within its branches the prominently projected rosettes. The rectangular frame which borders the mihrab has the usual creeper device and its upper side is decorated with tiers of moulding. The crowning pattern is a row of ornamental merlons equally distributed between five spaced kalasha motifs. The designs are boldly curved and speak of free movements." অর্থাৎ "খিলানগুলো খাঁজকাটা এবং খিলানের পাশে লতাপাতা ও ক্ষুদ্রাকৃতি গোলাপফুলের নকশাসম্বলিত গাছ দেখা যাবে। মিহরাবগুলোকে আবৃত করে যে আয়তাকার ফ্রেম রয়েছে তার চারপাশে প্রলম্বিত লতাপাতার নকশা দেখা যাবে এবং উপরিভাগ বেড়ি বা মৌল্ডিং দ্বারা অলঙ্কৃত। ফ্রেমের সর্বোচ্চ অংশটিতে যে আকর্ষণীয় মোটিভ রয়েছে তা অলঙ্কৃত মার্লন, যা পাঁচটি কলস নকশার মধ্যে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। নকশাগুলো অত্যন্ত সুচারু এবং সাবলীলভাবে করা হয়েছে।"

বাংলার মুসলিম স্থাপত্যকলায় ছয় গম্বুজবিশিষ্ট যতগুলো মসজিদ দেখা যায় তার মধ্যে গৌড়ের ধনচক ধুনীচক মসজিদ একটি। এ ছাড়া বিক্রমপুরের বাবা আদমের মসজিদ এবং রাজশাহীর কুসুম্বা মসজিদের উল্লেখ করা যায়।

৪। ছোট সোনা মসজিদ, ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ (৬৮—৬৯)

বাংলার মুসলিম আমলের মসজিদসমূহের মধ্যে 'গৌড়ের রত্ন' (Gem of Gaud) নামে খ্যাত সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ইমারত হচ্ছে সুলতান হোসেন শাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ছোট সোনা মসজিদ। বর্তমানে রাজশাহীর চাপাই নবাবগঞ্জ অঞ্চলে ফিরোজপুরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত এই অপূর্ব মসজিদটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার দক্ষিণদিকে যেখানে কোতায়ালী দরজা অবস্থিত তার ২ মাইল দক্ষিণে বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত এই অতুলনীয় মসজিদ। স্থাপত্যকলা ও অলঙ্করণের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। বর্তমানে এ অঞ্চলটি ফিরোজপুর মহল্লা নামে পরিচিত। সুলতানী স্থাপত্যকলার চূড়ান্ত পর্যায়ে ছোট সোনা মসজিদটি একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত যা 'গৌড়ের রত্ন' বলে অভিহিত হয়েছে।

ছোট মসজিদের নামকরণ সম্বন্ধে নানাবিধ মতবাদ রয়েছে। ক্রেটন তাঁর 'Ruins of Gaud'-এ ছোট সোনা মসজিদের বিবরণ দেন এবং স্কেচ করেন। তাঁর ভাষায়, "মিহরাব-প্রাচীরে সোনার প্রলেপের অংশবিশেষ দেখা যায় এবং এ থেকে এই মসজিদ (ছোট সোনা) এবং বড় সোনা মসজিদের নামকরণ হয়।" একথার প্রতিধ্বনি করে আলেকজান্ডার কানিংহাম বলেন, "ইমারতের অলঙ্করণে ব্যবহৃত সোনালি রং থেকে ছোট সোনা মসজিদের বর্তমান নামকরণ হয়েছে। এটি প্রকৃত নাম না হলেও স্থানীয় জনগণের উপলব্ধির জন্য সঠিক বলে মনে হয়।" জনশ্রুতি অনুযায়ী লোটন মসজিদের মতো এই মসজিদে আচ্ছাদন-প্রাচীর এবং ইটের গম্বুজে অফুরন্ত সোনালি রং-এর প্রলেপ দেওয়া হয়, বর্তমানে যার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ জাদুঘরে রক্ষিত বৌদ্ধ মূর্তিতে, যার পশ্চাদভাগের, ছোট সোনা মসজিদের অলঙ্করণ ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে সোনালি পেইন্ট বা রং দেখা যাবে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের কতিপয় মসজিদ সোনা মসজিদ নামে অভিহিত। এর মধ্যে দুটি গৌড়ের ছোট সোনা ও বড় সোনা এবং বাগেরহাটেও সোনা মসজিদ নামে একটি ইমারত দেখা যাবে।

এবং ছোট সোনা ও বড় সোনা মসজিদের সোনালি রঙের গম্বুজ।" মোশাররফ হোসেন মুঘল আমলে শায়েস্তা খানের শাসনকালে ঢাকার লালবাগ দুর্গের অভ্যন্তরে নির্মিত বিবি পরির সমাধির তামার গম্বুজ বা ছত্রিতে ব্যবহৃত রঙের প্রলেপের কথা বলেননি। এ প্রসঙ্গে মোহম্মদ যাকারিয়ার উদ্ধৃতি দেওয়া যায়, "ঈষৎ কন্দাকৃতিবিশিষ্ট তাম্রনির্মিত এই উঁচু গম্বুজ ইমারতের (বিবি পরির সমাধি) সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। আদিতে এই গম্বুজে সোনালি রং করা ছিল। এখন তা আর টিকে নেই।"

ছোট সোনা মসজিদের নামকরণ প্রসঙ্গে এন. বি. বি. কিং বলেন যে, অনিন্দ্যসুন্দর ছোট সোনা মসজিদটি 'খাজা কি মসজিদ' নামেও অভিহিত। এর মূল কারণ এই যে, এই মসজিদের নির্মাতা ছিলেন আলীর পুত্র ওয়ালী মোহাম্মদ যিনি সম্ভবত একজন খোজা ছিলেন। সামসুদ্দীন আহমদ বলেন, "It is also called by another name as Khwajah-ki-Masjid as tradition associates the sanetuary having been built by a eunuch who was the treasurer in charge of the royal harem." অর্থাৎ "এ মসজিদটি খাজা-কি মসজিদ নামে পরিচিত কারণ কিংবদন্তি অনুযায়ী এটি রাজকীয় হেরেমের তোশাখানার দায়িত্বে নিয়োজিত একজন খোজা কর্মকর্তা কর্তৃক নির্মিত হয়।" যাহোক, ছোট সোনা মসজিদটি স্থাপত্যরীতির অসাধারণ নিদর্শন।

ছোট সোনা মসজিদটি বাইরের দিকে ৮২′ × ৫২′ পরিমাপ এবং ভিতরের দিকে ৭০′৪″ × ৪০″। জমি থেকে এ ইমারতটি ২০ ফুট উঁচু। মসজিদটি পোড়ামাটি দিয়ে তৈরি (burnt brick) হলেও বাইরের দিকে সম্পূর্ণভাবে পাথর দিয়ে তৈরি। দেয়ালের ভিতরের অংশ সম্পূর্ণরূপে পাথর দিয়ে আবৃত ছিল না। দেয়ালের নিচের অংশ পাথর দিয়ে আবৃত। সোনা মসজিদের স্থায়িত্বের জন্য বাইরে ও ভিতরে পাথরের আচ্ছাদন দেখা যায়। তবে বাইরের মতো অভ্যন্তরে দেওয়ালে পাথর দ্বারা আচ্ছাদিত। তবুও যেখান থেকে গম্বুজ নির্মাণের জন্য ধনুকাকৃতির খিলানের কাজ শুরু হয়েছে সেখানে পাথরের কাজ শেষ হয়েছে।

ছোট সোনা মসজিদের চার কোনায় চারটি অষ্টকোণাকৃতির টারেট দেখা যাবে। এ টারেটগুলো নিচ থেকে উপরে সরু হয়ে গেছে অর্থাৎ সামান্য ঢালু এবং নিম্নাংশে চারটি এবং উপরের অংশে তিনটি বেড়ি বা মৌল্ডিং দ্বারা অলঙ্কৃত ও বিভক্ত। ছাদের কার্নিশে কয়েকটি ব্যাটলমেট দেখা যাবে এবং সামান্য বক্রাকার। টারটেগুলো ছাদ পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে, এর উপরিভাগ কোনো নিরেট গম্বুজ বা কিউপলা দ্বারা আবৃত নয়। কেন্দ্রীয় মিহরাবের পিছনে এমন দেওয়ালে যে উদ্গত অংশকে তার দুপাশে ২টি সরু টারেট আছে। এটি অষ্টকোণাকৃতি। অত্যন্ত সুচারুরূপে নির্মিত ও স্থাপত্যিক ভারসাম্য রক্ষাকারী ছোট সোনা মসজিদটিতে প্রবেশের জন্য পূর্বদিকে পাঁচটি খাঁজকাটা খিলানসম্বলিত প্রবেশপথ রয়েছে। এ ছাড়া উত্তর ও দক্ষিণদিকে তিনটি করে ছয়টি অনুরূপ প্রবেশপথ দেখা যাবে। প্রবেশথগুলো আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ। খাঁজকাটা খিলানে তীরের ফলার অলঙ্করণ খুবই সুন্দরভাবে গঠিত। এ ধরনের অলঙ্করণ হযরত পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদের মিহরাবের উপরের খিলানে দেখা যাবে। উত্তরদিকের

দেয়ালে সর্বপশ্চিমের প্রবেশপথ দেখা যাবে, যা দ্বিতলবিশিষ্ট। এ পর্চের নিম্নাংশ ভল্ট দ্বারা সৃষ্ট এবং উপরের অংশ সিঁড়ির সাহায্যে জেনানা গ্যালারিতে খিলানপথ দিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের অনেক মসজিদে জেনানা গ্যালারি দেখা যাবে যেমন হযরত পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ।

ছোট সোনা মসজিদটির ভূমি-নকশার সাথে বাগেরহাটের তথাকথিত ষাইট গম্বুজ ও গৌড়ের দরসবাড়ির মসজিদের সাদৃশ্য দেখা যাবে, বিশেষ করে ছাদ নির্মাণকৌশলে। এ তিনটি ইমারতের মধ্যভাগে যে নেভ রয়েছে তা কিবলামুখী এবং চৌচালা ছাদ দ্বারা আবৃত। গ্রন্থকার তাঁর Mosque Architecture of pre-Mughal Bengal শীর্ষক নিবন্ধে বলেন, "The architects of pre-Mughal Bengal experimented with a very peculiar type of building art, which is commonly known as hut shaped or curvilinear type." অর্থাৎ প্রাক-মুঘল যুগের স্থপতিগণ বক্রাকার কার্নিশ অথবা চালাসদৃশ ছাদ নির্মাণের এক নূতন কৌশল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ফারগুসন বলেন, "Besides elaborating a pointed arched brick style of their own, the Bengalis introduced a new form of roof, which has had a most important influence on both the Muhammadan and Hindu styles in more recent times. The Bengalis taking advantage of the elasticity of bambu, universally employ in their dwellings curvilinear form of roof, which has become so familiar to their eyes that they consider it beautiful.... certain it is, at all events, that after being elaborated into a feature of permanent architecture in Bengal, this curvilinear form found its way in the 17th century to Delhi and in the 18th century to Lahore and all the intermediate buildings from say A.D 1650, betrary its presence to a greater or less extent." বঙ্গানুবাদ : "কৌণিক খিলান-সম্বলিত ইটের স্থাপত্যরীতির প্রচলন ছাড়াও বাঙালিগণ (স্থপতি) একটি নূতন ধরনের ছাদ নির্মাণকৌশল আবিষ্কার করে, যা পরবর্তীকালে মুসলিম ও হিন্দু স্থাপত্যরীতিতে অসামান্য প্রধান্য বিস্তার করে। বাঁশের বক্রতা বা স্থিতিস্থাপকতাকে অবলম্বন করে তাদের বাসগৃহে বক্রাকার বা ঢালু ছাদ নির্মাণ করে, যা শুধুমাত্র দেখতেই মনোরম নয় আবহাওয়ার উপযোগী .... পরবর্তীকালে একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে বাংলার কুঁড়ে ঘরে ব্যবহৃত ঢালু ছাদের নকশা ইট ও পাথরের ইমারতে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন দিল্লির সপ্তদশ শতাব্দী এবং লাহোরের অষ্টাদশ শতাব্দীর ইমারতসমূহে। উল্লেখ্য যে, ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দের পর হতে কম অথবা বেশি, প্রায় সমগ্র ইমারতে দোচালা অর্থবা চারচালা ছাদ ব্যবহৃত হয়েছে।" এ প্রসঙ্গে দিল্লির লালকিল্লায় আওরঙ্গজেবের সময়ে নির্মিত মতি মসজিদ, আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে বাংলাঘর বা 'বাঙ্গলা-ই-দরশন-ই-মুবারক' নামে পরিচিত এবং লাহোর দুর্গে নৌলক্ষ্যা বা নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ইমারত।

চৌচালা প্রসঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ নানাবিধ মন্তব্য করেন। তাঁরা বলেন যে, বাংলাদেশে বৃষ্টিপাতের আধিক্যের জন্য ইমারতের চালাগুলোকে সহজে পানি নিষ্কাশনের জন্য ঢালু করা হয় এবং এটি স্থাপত্যকলায় প্রাকৃতিক প্রভাব। পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য এটি একটি স্থাপত্যরীতিতে পরিণত হয়। নেভে চৌচালা ছাদের ব্যবহার খান জাহান কর্তৃক নির্মিত তথাকথিত বাগেরহাটের মসজিদে (পঞ্চদশ শতাব্দী), তারপর গৌড়ের দরসবাড়ি মসজিদে এবং পরবর্তীকালে ছোট সোনা মসজিদে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমটিতে সাতটি এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টিতে বারান্দাসহ চারটি চৌচালা ব্যবহৃত হয়েছে। চালা-ছাদ প্রসঙ্গে দানী বলেন, "a decoration copied from bamboo framework, a design which emphasize the local character of the dome." অর্থাৎ এ ধরনের ছাদ গ্রামদেশে বাঁশের ফ্রেমে ঢালু ছাদের অনুকরণে একধরনের অলঙ্করণ (অলঙ্করণ বলা যাবে না, স্থাপত্যিক কৌশল), যা গম্বুজের স্থলে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছাদ নির্মাণকে ইঙ্গিত করে। ফ্রান্সিস বুকানন বলেন, "The style of private edifices that it has resemblance to a boat when overturned. The kind of hut, it is said, from being peculiar to Bengal is called by the natives Bangala" অর্থাৎ বাসগৃহে ব্যবহৃত এ ধরনের ছাদ বাংলায় শুধুমাত্র যথোপযুক্তই নয়, অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, যাতে ঢালু ছাদ (Pent-roof) শোভা পাচ্ছে। এটি দুপাশ অথবা চারপাশ থেকে ছাদ বক্রাকারে উপরে বা শীর্ষ একটি রিজ বা দণ্ডে মিলেছে। একনজরে দেখে মনে হবে যেন উল্টানো একটি নৌকা। এ ধরনের চালা বাংলার স্থাপত্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের দাবিদার এবং সাধারণভাবে বর্তমানে এগুলো বাংলা নামে সমধিক পরিচিত। এমনকি সম্রাট আকবরের নবরত্নসভায় একজন সদস্য ও প্রখ্যাতে ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী'তে এ ধরনের বাংলা ছাদের উল্লেখ করেন যা মূলত বাঁশ থেকে সৃষ্ট। ফারগুসন বাংলা চৌচালা বা দোচালা ছাদকে স্থাপত্যে বাংলার মৌলিক অবদান বলে অভিহিত করেন। দানী বলেন যে, কেন্দ্রীয় নেভের ব্যবহার আদিনা মসজিদ থেকে গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদে অনুকরণ করা হয়েছে; কিন্তু এ দু'টি ইমারতে নেভের ছাদ ভিন্ন ধরনের ছিল; আদিনায় ভল্ট ছিল এবং ছোট সোনা মসজিদের নেভ চারচালা ছাদ সম্ভবত।

অভ্যন্তরের কেন্দ্রীয় নেভটি ছোট সোনা মসজিদকে দু'টি অংশে বিভক্ত করেছে। অভ্যন্তরে দুই সারিতে চারটি করে খাঁজকাটা পাথরের স্তম্ভ দেখা যাবে, এগুলো অভ্যন্তরকে তিন সারিতে বিভক্ত করেছে। প্রতি সারিতে পাঁচটি খিলান নির্মিত হয়েছে। উত্তর-দক্ষিণ প্রলম্বিত খিলানগুলো দেয়ালে এসে মিশেছে। স্তম্ভগুলোর সাথে আদিনা মসজিদের জানালা গ্যালারির স্তম্ভের সাদৃশ্য দেখা যাবে। কোনো প্রকার মূর্তি না থাকলেও মনে হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত কোনো প্রাক-মুসলিন ইমারত থেকে সংগৃহীত। কেন্দ্রীয় নেভ পার্শ্ববর্তী দুটি অংশ অপেক্ষা পরিমাপে বড় এবং উত্তর-দক্ষিণদিকের অংশগুলোর উপরে ছয়টি করে মোট বারোটি গম্বুজ রয়েছে। কেন্দ্রীয় নেভটি ১৪–৫″ প্রশস্ত এবং পার্শ্ববর্তী নামাজস্থান দুটি ১১–৪″ প্রশস্ত। র‍্যাভেনশ কানিংহাম এবং আ. ক. ম.

যাকারিয়া ভুলবশত ছোট সোনা মসজিদটি ১৫টি গম্বুজ দ্বারা আবৃত বলেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ইমারতে ১২টি গম্বুজ ও ৩টি চৌচালা রয়েছে যার সাথে দরসবাড়ি মসজিদের সাদৃশ্য দেখা যায়। গম্বুজগুলো গোলাকৃতি বা hemispherical.

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে ছোট সোনা মসজিদ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর কিবলা-প্রাচীর ও ছাদের কিছু অংশ ভেঙে পড়ে যায়। পরবর্তীকালে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ (১৯০০) ও আরও পরে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এ মসজিদের সংস্কার করে সংরক্ষিত করে। অভ্যন্তরে উত্তর-পশ্চিমে কোণে স্তম্ভের উপর নির্মিত হয়েছে জেনানা গ্যালারি। এই জেনানামহলে প্রবেশের পথ ছিল বাহির থেকে যা পূর্বে বলা হয়েছে। এখানে মহিলাদের পৃথক করে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা ছিল। জেনানা গ্যালারিতে কিবলাপ্রাচীরে একটি মিহরাব দেখা যাবে (উল্লেখ্য যে ভারতবর্ষের মুসলিম স্থাপত্যে সর্বপ্রথম জোনানা গ্যালারি দেখা যাবে দিল্লির কুওয়াত উল-ইসলাম এবং আজমীরের আড়াই-দিন-কা ঝোপড়া মসজিদে), পশ্চিমদিকের কিবলাপ্রাচীরে পাঁচটি মিহরাব দেখা যাবে মিহরাবগুলো অবতলাকৃতি এবং অর্ধগোলাকৃতি। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে পাথরে খোদিত অপূর্ব কেন্দ্রীয় মিহরাবটি ধসে পড়ে পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডে পাচার হয়ে যায় এবং বর্তমানে ২৯ খণ্ডে এডিনবরার রয়াল স্কটিশ জাদুঘরের সংরক্ষণশালায় সংরক্ষিত আছে। গ্রন্থকার গবেষণাকালে এ মিহবারটি পর্যবেক্ষণ এবং বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, যা পাকিস্তান হিস্টোরিকাল সোসাইটি জার্নালে ছাপা হয়। কিবলাপ্রাচীরের বাইরে কেন্দ্রীয় মিহরাবের ঠিক পিছনে কিছু উদ্গত অংশ আছে এবং এই প্রজেকশনের দুধারে অষ্টকোণাকৃতি টারেট ব্যবহৃত হয়েছে।

ছোট সোনা মসজিদের সম্মুখভাগে পাথরের উপর কতিপয় শিলালিপি খোদিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের ফ্রেমের উপরদিকে যে শিলালিপি রয়েছে তার মাঝের পঙ্ক্তিতে ৩টি কারুকার্যকৃত বৃত্ত দেখা যাবে। মাঝের বৃত্তের ভিতরে 'ইয়া আল্লাহ', ডান দিকেরটিতে 'ইয়া হাফিজ' এবং বামদিকেরটিতে 'ইয়া রহিম' কথাগুলো আরবি হরফে খোদিত। সামসুদ্দীন আহমদ সন-তারিখবর্জিত ছোট সোনা মসজিদের যে শিলালিপি উল্লেখ করেন তা পূর্বদিকের কেন্দ্রীয় পথের উপরে অবস্থিত। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে আলেক-জান্ডার কানিংহাম যখন ছোট মসজিদটি দর্শন করেন তখন মসজিদটি খুব জীর্ণ অবস্থায় ছিল যদিও তিনি গিল্টিকরা গম্বুজের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "মধ্যভাগের প্রবেশপথের উপর খোদিত যে শিলালিপিটি রয়েছে তার উপরের দক্ষিণদিকের অংশ এবং নিচের বামদিকের কোনা বহুপূর্বে ভেঙে গেছে। নিচের অংশে হিজরীসম্বলিত সন-তারিখের উল্লেখ ছিল। কিন্তু সুলতানের নামের উল্লেখ থাকায় এটি যে হোসেন শাহের আমলে নির্মিত (হিজরী ৮৯৯-৯২৯/১৪৯৪-১৫২৪ খ্রিঃ) তা সঠিকভাবে বলা যায়। শিলালিপিতে স্থপতি হিসাবে আলীর পুত্র ওয়ালী মোহাম্মদের নাম পাওয়া যায়।"

ছোট সোনা মসজিদের অলঙ্করণ অপূর্ব ও অতুলনীয়ই নয় বরং বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং তাৎপর্যবিশিষ্ট, এ ইমারতে তিন ধরনের অলঙ্করণ দেখা যাবে (ক) পোড়ামাটির নকশা; (খ) পাথরে খোদাইকৃত নকশা; (গ) গিল্টির অলঙ্করণ। পোড়ামাটির অলঙ্করণ ছাদে

এবং খিলানগুলো উপরে দেখা যাবে। কানিংহাম লতাপাতা, ফুল, ঝুলন্ত বাতি, ছোট ছোট গোলাপ প্রলম্বিতপাতা (creeper)-সহ বিভিন্ন নকশাসম্বলিত পোড়ামাটির অলঙ্করণের কথা বলেন। তাঁর ভাষায়, "The whole of the interior of the Masjid is covered with carving of the same kind ... in it original state, therefore, I can easily believe that the interior of the mosque was strikingly rich and beautiful." অর্থাৎ মসজিদের অভ্যন্তর পোড়ামাটির অলঙ্করণ দ্বারা শোভিত—আদিতে মসজিদের অভ্যন্তর দেখতে খুবই সুন্দর ও সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু পোড়ামাটির নকশার তুলনায় ছোট সোনা মসজিদের ভিতরে ও বাইরে সর্বজনীনভাবে পাথরে কাটা (stone carving) নকশা দ্বারা সমৃদ্ধ। মোহম্মদ যাকারিয়া বলেন, "মসজিদের বাইরের দেয়ালে বিশেষ করে সামনের দেয়ালে অতি মনোরম কারুকার্য আছে। পোড়ামাটির চিত্রফলকের (terracotta plaques) অনুকরণে এসব অলঙ্করণের কাজ পাথরের উপরে করা। লতাপাতা, গোলাপফুল (rosette), ঝুলন্ত শিকল ও ঘণ্টা (hanging bell and chain motif) ইত্যাদির প্রতিকৃতিসহ নানারকম অলঙ্করণের কাজ মসজিদের গায়ে দেখা যায়। একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, প্রয়োজনের খাতিরে মুসলিম স্থপতি ও কারিগরেরা স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত ভগ্নপ্রায় কোনো হিন্দু বৌদ্ধ ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ব্যবহার করেছেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এ ধরনের কতিপয় পাথরে খোদিত নকশা গ্রন্থকার । দেখতে পান, যার বাইরের দিকটিতে বৌদ্ধ বা হিন্দু মূর্তি ছিল কিন্তু পিছনের দিকে অপূর্ব লতাপাতা, জ্যামিতিক বা arabesque-এর নকশা দেখা যাবে। চাতুর্যের সাথে স্থপতি বিগ্রহটি দেয়ালে প্রোথিত করত এবং এর পিছনের মসৃণ অংশে নভোন্নত (low relief) খোদাই করে অসাধারণ অলঙ্কার করত বিভিন্ন মোটিভের মাধ্যমে। এ কারণে ছোট সোনা মসজিটির অলঙ্করণ পাথরে খোদিত নকশার চূড়ান্ত পর্যায় বা 'culmination of stone cutters' art in Bengal' বলে অভিহিত করা হয়। তৃতীয় ধরনের অলঙ্করণ সোনালি প্রলেপ বা সোনার গিল্টিকরণ যা কানিংহাম গম্বুজ ও দেওয়ালে দেখতে পান। কানিংহামের ভাষায়, "It received its present name of the Little Golden Mosque from the quantity of gilding employed in the ornamentation of which some still remains to justify the popular appellation Creighton first noticed it and verified his statement myself by inspecting some renains of gilding found by my servant."

ছোট সোনা মসজিদের পূর্বদিকের তোরণ থেকে সামান্য পূর্ব-উত্তর দিকে ১৫ × ১০$\frac{১}{২}$ ফুট আয়তনের মঞ্চাকারে নির্মিত একটি উঁচু প্লাটফর্ম দেখা যাবে। এতে দুটি বাঁধানো পাথরে খোদিত পাশাপাশি দুটি শবাধার রয়েছে। কবরের দেয়ালে উৎকীর্ণ লিপিগুলোতে কুরআনের বাণী খোদিত রয়েছে। ধারণা করা হয় যে, এ কবর দুটি মসজিদ নির্মাতা ওয়ালী মোহাম্মদ ও তাঁর পিতা আলীর। ছোট সোনা মসজিদে প্রবেশের জন্য পূর্ব দিকে একটি চত্বর রয়েছে এবং এখানে প্রবেশের জন্য খিলানসম্বলিত তোরণ নির্মিত হয়। এটি জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল। বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সংস্কার করে এটিকে

দর্শনীয় করে তুলেছেন। সম্ভবত দু'টি ফটক ছিল, উত্তর ও পূর্বদিকে, উত্তরদিকের ফটকটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কেবলমাত্র পূর্বদিকেরটি ভগ্নাবস্থায় টিকে ছিল, যা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ যত্নসহকারে সংস্কার করে।

২, "The Gateway opened under a multi-cusped stone arch which largely fell out. The stone materials used originally in the arch and on the wall surface of the Gateway after their fall remained scattered and covered under nearby shrubs, bushes and debris. These materials were recovered after clearance of jungle and debris but they were not sufficient to restore the Gateway completely.... The shortage was covered by imitation slabs produced by proportionate mixture of cement concrete and matching colours." অর্থাৎ ফটকটি বহু খাঁজবিশিষ্ট পাথরের খিলান দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল এবং এর ভিতর দিয়ে মসজিদ চত্বরে প্রবেশ করতে হত, যা বহু পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। ইটের তৈরি ফটকের প্রাচীর খিলান আচ্ছাদনের জন্য যে সমস্ত পাথর ব্যবহৃত হয়েছে তা অবিন্যস্তভাবে পড়েছিল জঙ্গলের মধ্যে। জঙ্গল পরিষ্কার করে এ সমস্ত ভগ্নপ্রাপ্ত পাথর উদ্ধার করে এবং নতূন উপাদান সংযোজন করে ফটকটির সংরক্ষণ করা হয়।

৫। শাহ্ নিয়ামতউল্লাহর সমাধি এবং সংলগ্ন মসজিদ, সপ্তদশ শতাব্দী (৭০-৭১)

'Memoirs of Gaur and Pandua' গ্রন্থের প্রণেতা ও বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদ আবিদ আলী খান শাহ নিয়ামতউল্লাহর সম্বন্ধে বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় (শাহ নিয়ামতউল্লাহ) সমাধিটি ছোট সোনা মসজিদের উত্তর-পশ্চিম থেকে অর্ধমাইল দূরে অবস্থিত এবং এটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি দিঘির পশ্চিম তীরে নির্মিত। একজন প্রখ্যাত সাধকের শবদেহের উপর এক গম্বুজবিশিষ্ট সমাধিটি স্থাপিত হয়, শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ্ ওয়ালী সম্বন্ধে মুন্সী এলাহী বক্স বলেন যে, "তিনি কর্নাল নামে দিল্লির একটি প্রদেশ বা অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন এবং তিনি ভ্রমণবিলাসী ছিলেন। ভ্রমণ করে তিনি রাজমহলে আসেন যেখানে তাঁর (আধ্যাত্মিকতা দেখে) শাহ্ সুজা (বাংলার সুবাদার) তাঁকে সাদরে অর্ভথ্যনা জানান। অবশেষে তিনি গৌড়ের সন্নিকটে ফিরোজপুর অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। এক বিবরণী অনুযায়ী তাঁর মৃত্যু হয় হিজরী ১০৭৫/১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে। অপর একটি তথ্য অনুযায়ী তিনি হিঃ ১০৮০/১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

ফার্সী ভাষায় গণনারীতি কবিতাচ্ছলে (chronogram) শাহ্ নিয়ামতউল্লাহর মৃত্যুর সম্পর্কেও উল্লেখ করা হয়েছে : "নিয়ামতউল্লাহ্ বাহর উলুম মুদানী" অর্থাৎ নিয়ামত উল্লাহ্ একজন জ্ঞানতাপস ব্যক্তি ছিলেন। বিশেষজ্ঞগণ এর সংখ্যানুপাত বিচার করে হিজরী ১০৭৫ বলেছেন।

নিয়ামতউল্লাহ একজন একনিষ্ঠ মুসলমান ছিলেন। কথিত আছে যে, শরীফ খান নামক একজন বিদ্রোহীকে তার সঙ্গীসহ কতল করার উদ্দেশ্যে শাহ সুজার নিকট আনা হলে সাধক-সুফী নিয়ামতউল্লাহর অনুরোধে তাদের ক্ষমা করা হয় এবং তাদের জীবন রক্ষা পায়। নিয়ামতউল্লাহর সমাধি ও তৎসংলগ্ন মাজারটি প্রাচীরবেষ্টিত এলাকায় অবস্থিত। মাজারের দক্ষিণ দেয়ালে একটি ছোট ফটক রয়েছে। মসজিদের চত্বর থেকে ফটকের ভিতরে ইটবাঁধানো পথের উপর দিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হলে সামনেই মাজার পড়বে। মাজারটি এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার ইমারত। এর পরিমাপ বাইরের দিকে ৫৩ বর্গফুট এবং ভিতরের দিকে ৪৫ বর্গফুট। ইটের প্রাচীরের প্রশস্ততা ৪ ফুট। অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য পূর্ব দেয়ালে তিনটি খিলানপথ রয়েছে। মধ্যবর্তী খিলানপথটি অপেক্ষাকৃত বড়। মোটামুটিভাবে দরজাগুলো ৫$\frac{১}{২}$ ফুট প্রশস্ত। চতুর্দিকে তিনটি করে খিলান-দরজা থাকায় মোট প্রবেশপথের সংখ্যা দাঁড়ায় বারোতে। এ কারণে অনেক ঐতিহাসিক একে 'বারদুয়ারী' বলেছেন। মূল সমাধিকক্ষটি মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এবং বাইরের দিকে ২৪$\frac{১}{২}$ ফুট ও ভিতরের দিকে ১৬ ফুট ৮ ইঞ্চি পরিমাপের। এই কক্ষের কেন্দ্রস্থলে নির্মিত হয়েছে শাহ নিয়ামতউল্লাহর শবাধার। এ কামরায় প্রবেশের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর দেয়ালে একটি করে খিলানপথ ছিল, বর্তমানে কেবলমাত্র দক্ষিণদিকের দরজাটি খোলা আছে। বাকি দুটি দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমদিকে একটি মিহরাব রয়েছে বলে দানী মন্তব্য করেন। শবাধারসম্বলিত কক্ষ এবং বাইরের প্রাচীরের মধ্যে একটি বারান্দা রয়েছে যা সমাধিকক্ষকে প্রদক্ষিণ করেছে।

শাহ নিয়ামতউল্লাহর সমাধি ও মসজিদে মুঘল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতিভাত। মাজারের চার কোনায় অষ্টকোণাকৃতি টারেটদ্বারা সমৃদ্ধ। ক্ষুদ্রাকৃতি টারেটগুলো ছাদের উপরের দিকে মিনারের মতো প্রলম্বিত। টারেটের উপরের অংশে খাঁজকাটা নক্শা ও ব্যান্ড রয়েছে এবং একটি নিরেট খাঁজকাটা কিউপলা দ্বারা আবৃত। খিলানগুলো চার কেন্দ্রবিন্দু ভিত্তিক যা মুঘল স্থাপত্যরীতির পরিচায়ক সম্মুখভাগ কুলুঙ্গি ও প্যানেলের নকশা দ্বারা সুসমৃদ্ধ। কার্নিশ সমান্তরাল এবং মার্লন অলঙ্করণে শোভিত। গম্বুজটিও বাল্বের আকৃতিতে নির্মিত। এর চূড়া কলসাকৃতি। বারান্দাগুলো ফ্লাট ভল্ট দ্বারা আবৃত। আসমা সিরাজউদ্দীন তাঁর 'Mughal Tombs in Dhaka' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে বলেন যে, তৃতীয় প্রকারের মুঘল সমাধিসমূহ খুবই জটিল এবং অত্যন্ত সুচারুরূপে নির্মিত। এ কারণে এ ধরনের সমাধি বাংলায় বেশি দেখা যায় না। যে কয়েকটি পাওয়া যায় তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঢাকার লালবাগ দুর্গের আভ্যন্তরে বিবি পরীর মাজার ও নারায়ণগঞ্জের হাজীগঞ্জে বিবি মরিয়ামের সমাধি। ঢাকার বাইরে বারান্দা বা প্রদক্ষিণকক্ষ সম্বলিত নকশা গৌড়ের শাহ নিয়ামতউল্লাহর মাজার এবং রাজমহলের বিবি হোমার সমাধিতে দেখা যাবে। কিন্তু এ সমস্ত ইমারতের নির্মাণকৌশল এক নয়। বিবি মরিয়ম এবং শাহ নিয়ামতউল্লাহর মজারে টানা প্রদক্ষিণপথ রয়েছে। অন্যদিকে বিবি পরীর সমাধিতে চার কোনায় চারটি কক্ষ এবং মধ্যভাগে বারান্দা দেখা যাবে। উপরন্তু, বিবি পরী এবং শাহ নিয়ামতউল্লাহর মাজারের চারদিকের প্রতিদিকে তিনটি করে মোট বারোটি প্রবেশপথ রয়েছে। এ কারণে এটিকে 'বারদুয়ারী' বলা হয়। অবশ্য

বিবি মরিয়মের সমাধিতে প্রবেশপথের সংখ্যা বেশি। প্রতিবাহুতে পাঁচটি করে মোট বিশটি।

কথিত আছে যে, শাহ নিয়ামতউল্লাহ প্রাচীরবেষ্টিত গৌড় নগরীর কোতোয়ালী দরওয়াজার নিকট প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণে ফিরোজপুর অঞ্চলে আস্তানা স্থাপন করেন এবং সেখানেই তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে। সুতরাং মাজারটি সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়। এ মাজারটির প্রকৃত নির্মাতা সম্বন্ধে সঠিক জানা যায় না। সুবাদার শাহ সুজা এ মাজারটির নির্মাতা বলে অনেকে ধারণা পোষণ করেন, যদিও একথা নিশ্চিত যে, তিনি আওরঙ্গজেবের কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ থেকে ব্রহ্মদেশে আত্মগোপন করেন। শাহ নিয়ামতউল্লাহ ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে শাহ সুজা কিভাবে মাজার নির্মাণ করলেন, যদিনা নিয়ামতউল্লাহর মৃত্যুর পূর্বেই তিনি ইমারতটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

মসজিদ

মাজারের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রাচীরবেষ্টিত এলাকার মধ্যে শাহ নিয়ামতউল্লাহর মসজিদ দেখা যাবে। ৬৩$\frac{১}{২}$ × ২৪$\frac{৩}{৪}$ ফুট আয়তনবিশিষ্ট এবং সাদামাটা প্রাচীরবিশিষ্ট এ ইমারতটি তিন গম্বুজসম্বলিত একটি আয়তাকারক্ষেত্রে। মাজারের সাথে বাহ্যিক পরিপাটির দিক থেকে মসজিদটির যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। মুঘল স্থাপত্যের সকল বৈশিষ্ট্য এতে বিদ্যমান। চার কোনায় চারটি ক্ষুদ্রাকৃতি অষ্টকোণাকার টারেট যা সরু হয়ে ছাদের উপরে উঠে গেছে। উপরের অংশ খাঁজকাটা ও গোলাকৃতি। শীর্ষদেশে নিরেট খাঁজকাটা (fluted) কিউপোলা রয়েছে। মসজিদের সম্মুখে একটি দেয়ালঘেরা আঙিনা, যা সচরাচর বাংলাদেশের মসজিদে দেখা যায় না, কারণ অধিকাংশই চত্বর (courtyard) বিহীন। সম্মুখভাগ মাজারের মতো প্যানেল ও কুলুঙ্গি (niche) দ্বারা অলঙ্কৃত। পূর্বদিকে প্রবেশপথ তিনটি, যা চারবিন্দুকেন্দ্রীক ও স্ফীত খিলান-প্রবেশপথগুলো সামনের দিকে প্রসারিত (projected)। উত্তর ও দক্ষিণদিকে আছে একটি করে প্রবেশপথ। সম্মুখের মধ্যভাগের প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত বড়। মসজিদের উপরিভাগের কার্নিশ বা battlement সমান্তরাল; প্রাক-মুঘল যুগের কার্নিশের মতো বক্রাকার নয়। ছাপের উপরের অংশ মার্লন দ্বারা অলঙ্কৃত। কিবলাপ্রাচীরে কেন্দ্রীয় মিহরাবের পিছনের অংশ সামান্য উদ্গত।

শাহ নিয়ামতউল্লাহর মসজিদের অভ্যন্তরে কোনো স্তম্ভ নেই। আয়তাকার মসজিদটি তিনটি বাল্বের আকৃতিতে গম্বুজ দ্বারা আবৃত এবং এটি ড্রামের উপর থেকে নির্মিত হয়েছে। চূড়ায় কলসাকৃতি অলঙ্করণ দেখা যাবে। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব স্থাপিত হয়েছে। মধ্যবর্তী মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড়। প্লাস্টারে কাটা অলঙ্করণ কিবলাপ্রাচীরে শোভা পাচ্ছে। মাজারের মতো সংলগ্ন মসজিদটিও সপ্তদশ শতাব্দীর স্থাপত্যকীর্তি বলে প্রতীয়মান হয়। এ মসজিদের প্রকৃত নির্মাতা কে তা সঠিকভাবে বলা যায় না। সম্ভবত শাহ সুজার সময়ে নির্মিত। তবে জনশ্রুতি আছে যে, সম্রাট শাহজাহান শাহ নিয়ামতউল্লাহকে বছরে পাঁচ হাজার টাকা আয়ের একটি সম্পত্তি দান করেছিলেন এবং এ থেকে মসজিদ ও খানকার ব্যয় নির্বাহ হত। অন্যদিকে অনেকে সম্রাট আওরঙ্গজেবকে দাতা হিসাবে চিহ্নিত করেন। খুব সম্ভব প্রথম মতটি সঠিক।

৬। তাহখানা, সপ্তদশ শতাব্দী (৭২)

ছোট সোনা মসজিদের ৫০০ গজ উত্তরে এবং পশ্চিম পাশ দিয়ে যে রাস্তা গিয়েছে তার পাশে ভগ্নাবস্থায় শাহ নিয়ামতউল্লাহর তাহখানা নির্মিত হয়। বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এটি সংস্কার করেছে। তাহখানার পাশেই রয়েছে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি বিরাট দিঘি। দিঘির পশ্চিমদিকে ৩টি ইমারত। সর্বদক্ষিণের ইমারতটি শাহ সুজার তাহখানা বা শাহ সুজার তোরণ বলা হয়ে থাকে বলে আ. ক. ম. যাকারিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহখানা এবং তোরণ এক নয়। তাহখানা হচ্ছে গরম পানি সরবরাহকৃত হাম্মাম গোসলখানা যা Roman Bath-এর সমতুল্য এবং তোরণ হচ্ছে ফটক বা প্রবেশদ্বার।

আ. ক. ম. যাকারিয়া বলেন, "এককালে এটি ছিল দুইতলাবিশিষ্ট একটি বিরাট ইমারত এবং উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এই ইমারতের আয়তন ছিল ১১৬ × ৩৮ ফুট। তিনভাগে বিভক্ত এই অট্টালিকা এককালে খুবই জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। মেরামতের অভাবে ইমারতটি প্রায় ভেঙে পড়েছিল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এটিকে মেরামত করে কোনো-রকমে টিকিয়ে রেখেছে এবং বর্তমানে নিচের তলাটিই টিকে আছে। সারা ইমারতে বেশ কয়েকটি কক্ষ আছে। মাঝের কক্ষের দু'পাশের কামরাগুলিতে ছিল খুব সম্ভব হাম্মামখানা। ইমারতটির লাগা পূর্বদিকেই আছে পূর্বে উল্লিখিত দিঘিটি। দিঘির ভিতর থেকে ভিত্তি গেড়ে ইমারতটির পূর্বাংশ নির্মিত হয়েছিল। দিঘির ভিতর থেকে পাইপের সাহায্যে দু'পাশের কামরাতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। সেই পাইপের চিহ্ন এখনও টিকে আছে।"

আবিদ আলী খান মনে করেন যে, সুলতান শাহ সুজা মধ্যবর্তী কক্ষে তাঁর পীর শাহ নিয়ামতউল্লাহর সঙ্গে দেখা করতে আসলে বসতেন। এ ইমারতটি কাঠের বিমের সাথে কংক্রিটের গাঁথুনি দিয়ে নির্মিত হয়। সম্ভবত তিনি ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে তাহখানাটি নির্মাণ করেন। দানীর গ্রন্থে তাহখানার কোনো উল্লেখ দেখা যায় না।

হাম্মামখানা মুসলিম স্থাপত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। ভারত উপ-মহাদেশের বাইরে মুসলিম বিশ্বে, বিশেষ করে তুরস্কে হাম্মামের বহুল প্রচলন ছিল। দিল্লিতে তোঘলক আমলে ফিরোজ কোটলায় তাহখানা দেখা যাবে। গরম পানি সরবরাহ একটি প্রাচীন কৌশল যা রোমানদের মধ্যে বিশেষ প্রচলন ছিল। উল্লেখ্য যে, নিয়ামত তাহখানাটি বাংলাদেশে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ইমারত। এ ধরনের হাম্মামকে হাইপোকষ্ট বলা হয় এবং এর অর্থ নিচে থেকে পানি গরম করে পাইপের সাহায্যে গোসলখানায় পানি সরবরাহ করা। এ ধরনের হাম্মাম লালবাগ দুর্গে, ঈশ্বরীপুরে, সাতক্ষীরা, জাহাজঘাটা (সাতক্ষীরা) এবং মির্জানগরে দেখা যাবে।

৭। বাঘা, মসজিদ, ১৫২৩ খ্রিস্টাব্দ (৭৩–৭৪)

রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে, লালপুর থানা থেকে প্রায় ৮ মাইল পশ্চিমে ও চারঘাট থেকে প্রায় ১১ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত বাঘা নামক স্থান অবস্থিত। পূর্বে এটি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। জনমানবশূন্য এ এলাকায় বসতি শুরু করেন

সাধকপুরুষ ও ইসলামপ্রচারের এক জবরদস্ত পীর। জনশ্রুতি অনুযায়ী তিনি সুলতান হোসেন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি) পাঁচজন পীর ফকিরের এক দলসহ শ্বাপদসঙ্কুল এ গহীন জঙ্গলে এসে আস্তানা গাড়েন। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ছিলেন শাহ মোয়াজ্জম-উদ-দৌলা বা মোহাম্মদ দৌলা ওরফে শাহদৌলা। তাঁর আধ্যাত্মিকতা, কেরামতি ও মারেফতি ছিল সর্বজনবিদিত এবং তাঁর প্রচেষ্টায় শুধু ইসলামপ্রচার সদূরপ্রসারিতই হয়নি, বাঘা ক্রমশ একটি ধর্মপ্রচারের কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাঁর অসংখ্য.ভক্ত শিষ্য ছিল।

আবদুল মান্নান তালেব শাহ মুয়াজ্জেম দানিশ মন্দা সম্বন্ধে বলেন "গৌড়ের সুলতান নুসরাত শাহের আমলে (১৫১৯-১৫৩২ খ্রিঃ) হযরত শাহ মুয়াজ্জেম দানিশ মন্দা বাগদাদ থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আগমন করেন। কথিত আছে, তিনি বাগদাদে খলীফা হারুন-অর-রশীদের বংশধর ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ইসলামী শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হবার সাথে সাথে অধ্যাত্ম জ্ঞানের উচ্চ আসনের অধিকারী ছিলেন। রাজশাহী জেলায় তিনি ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করেন। এ জেলার বাঘা নামক গ্রামে এসে তিনি বসবাস শুরু করেন। তাঁর গুণে ও চরিত্রের মাহাত্মে মুগ্ধ হয়ে নিকটবর্তী মখদুমপুর নামক স্থানের প্রভাবশালী জমিদার আল্লাহ বখস বরখুরদার লশ্‌করী নিজের কন্যাকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন। এরপর থেকে তিনি স্থায়ীভাবে বাঘায় বসবাস করতে থাকেন। তাঁর প্রচেষ্টায় এ অঞ্চলে ইসলাম ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। তিনি একটি মাদ্রাসা ও একটি খানকাহ স্থাপন করে এ অঞ্চলের মুসলমানদের জ্ঞানসাধনার পথ প্রশস্ত করে গেছেন। সুলতান নসরাত শাহের আমলে নির্মিত বাঘার প্রাচীন মসজিদটি এখনো তাঁর ইসলাম প্রচারের সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর পুত্র মওলানা হামিদ দানিশমন্দও একজন উঁচুদরের আলেম ছিলেন। বস্তুত রাজশাহী জেলায় ইসলাম প্রচারে এ পরিবারের দান (অবদান) অপরিসীম। বাঘায় হযরত দানিশমন্দের সমাধি অবস্থিত।

বাঘার মসজিদটি স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ দশ গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার এ মসজিদটি গৌড় নির্মিত তাঁতিপাড়া মসজিদ থেকে অনুকরণ করে স্থাপিত হয়েছে। মসজিদটি নির্মাণের জন্য ইটের প্রয়োজন হয় এবং সেজন্য সম্মুখভাগে ৪০০ × ২০০ গজ আয়তনের একটি দিঘি খনন করা হয়। এ থেকে প্রাপ্ত মাটি পুড়িয়ে ইট তৈরি করা হয় এবং সেই ইটের সাহায্যে জলাশয়ের তীরে ১৬০ ফুট বাহুবিশিষ্ট বর্গাকার একখণ্ড উঁচুভূমি তৈরি করা হয়। এটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এতে প্রবেশের জন্য খিলানপথবিশিষ্ট দুটি ফটক রয়েছে। এই উঁচু ভূমির পশ্চিমাংশে বাঘার অতুলনীয় মসজিদটি নির্মিত হয়েছে, যা স্থাপত্যিক সৌকর্য এবং আলঙ্কারিক বিন্যাসের জন্য বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ এবং বাগেরহাটের তথাকথিত ষাইট গম্বুজের মতো এখানে দুটি খিলানপথ দিয়ে মসজিদ ও মাজার প্রাঙ্গণে যেতে হয়। উত্তর ও দক্ষিণের বেষ্টনী প্রাচীরে একটি করে খিলানপথ বা ফটক নির্মিত হয়েছে। দক্ষিণ দেয়ালের প্রবেশপথে আটকোণাকৃতি স্তম্ভ, খিলান ও উপরে একটি গম্বুজ দেখা যাবে। তোরণের দু'ধারে ইটের দেয়ালের উপর লতাপাতা, ফুল প্রভৃতি মোটিভের সাহায্যে অলঙ্করণ করা হয়েছে। এখানে পোড়ামাটির অলঙ্করণ প্রাধান্য পেয়েছে।

বাঘার মসজিদটি আয়তাকার এবং এর পরিমাপ ৭৫′ – ৮″ × ৪২′ – ২″ এবং দেয়াল ৭′– ৪″ প্রশস্ত। চারদিকে অষ্টকোণাকৃতি টারেট রয়েছে। এগুলো কারুকার্য-খচিত। সমান্তরাল মৌল্ডিং বা বেড়ী দ্বারা বিভক্ত এবং এর প্রতি অংশে আয়তাকার প্যানেলের মধ্যে ঝুলন্ত চেন ও ফুলের নকশা দেখা যাবে। উপরের অংশে চার সারি সমান্তরাল বেড়ি খুবই আকর্ষণীয়, যা কার্নিশ বা প্যারাপেটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। টারেটগুলো ছাদের উপরে গিয়ে শেষ হয়েছে। একসময় এগুলো নিরেট গম্বুজাকৃতির কিউপোলা দ্বারা আবৃত ছিল। বাঘা মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য পূর্বদিকে পাঁচটি খিলানপথ রয়েছে এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকেও দুটি করে অনুরূপ খিলানপথ দেখা যাবে। খিলানপথগুলো খুবই চাতুর্যের সাথে স্থাপন করা হয়েছে। আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ খিলানগুলো কৌণিক এবং উপর ও পাশের অংশে সামান্য recessed বা সামান্য নিচু, যাতে অলঙ্কৃত পত্র দেখা যাবে। প্রবেশপথের উপরে পোড়ামাটির নকশা ও মৌল্ডিং শোভা পাচ্ছে। পার্শ্ববর্তী দেয়ালেও প্যানেল ও লতাপাতার নকশা ইমারতকে সমৃদ্ধ করেছে। পাঁচটি খিলানপথ দিয়ে পশ্চিম দিকে কিবলার পাঁচটি মিহরাবের দিকে যাওয়া যায়। বাঘা মসজিদের অভ্যন্তরে এক সারিতে চারটি পাথরের স্তম্ভ দ্বারা দুটি আইলে বিভক্ত, যাতে পাঁচটি 'বে' দেখা যাবে অর্থাৎ সমগ্র অভ্যন্তর দশটি অংশে বিভক্ত এবং প্রতিটি অংশের উপর একটি করে গম্বুজ রয়েছে অর্থাৎ সর্বমোট ১০টি গম্বুজ। সুলতানী আমলে ড্রামবিহীন গোলাকার (hemispherical) গম্বুজের অনুরূপ গম্বুজ ছিল, যা বহুপূর্বে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রবল ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে গম্বুজগুলো পুনঃনির্মাণ করেছে। কিবলাপ্রাচীরে পাঁচটি মিহরাব কথার কথা কিন্তু কেন্দ্রীয় মিহরাবের দক্ষিণ পার্শ্বে দু'টি মিহরাব রয়েছে এবং উত্তরদিকের মিহরাবের স্থানে মিমবার দেখা যাবে। সর্ব উত্তরে স্তম্ভ দ্বারা দ্বিতলের সৃষ্টি হওয়ায় কোনো মিহরাব নেই। এ উঁচু স্থানটি জেনানা গ্যালারি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে এবং দ্বিতলের পশ্চিম দেওয়ালে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি মিহরাব দেখা যায়। এক্ষেত্রে জেনানা গ্যালারি গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদের অনুকরণে সৃষ্টি করা সমগ্র মিহরাব দেয়ালটি পোড়ামাটির অলঙ্করণে সুশোভিত। আহমদ হাসান দানী বলেন, "The central mihrab shows a floreat frame round the mihrab niche, which opens through a cusped arch, springing from decorated pillar. which are faceted in design. The spandrels of the arch are enriched with rupturous, overgrowth of boughs and leaves intertwining the central rosettes. অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মিহরাবটির খাঁজকাটা খিলান পার্শ্ববর্তী কারুকার্যখচিত ইটের স্তম্ভ দুটি থেকে উপরে উঠে গেছে। অবতল মিহরাবটির অভ্যন্তর প্যানেলের নকশা দ্বারা সমৃদ্ধ যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পোড়ামাটির লতাপাতা, ফুল, ঝুলন্ত ফুল ও শিকল দেখা যাবে। সমগ্র মিহরাবটি আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ এবং খাঁজকাটা খিলানের উপরে ও পাশে লতাপাতা, ফুল, রোজেটের সমারোহ। দেখে মনে হবে যে, টব থেকে ফুলের চারা

উপরের দিকে উঠে গেছে। মিহরাবের উপরের অংশেও অনুরূপ পোড়ামাটির অলঙ্করণ দেখা যাবে। টেরাকোটার বর্ণনা দিতে গিয়ে মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেন, "টেরাকোটা শিল্পের অতুলনীয় নিদর্শন মসজিদের দেয়ালের বাইরের দিকেও আছে। প্রবেশপথের পার্শ্বে ও উপরে বিভিন্ন প্যানেলে পোড়ামাটির ফলকে লতাপাতা, ফুল, টব থেকে গজিয়ে ওঠা ফুলন্ত বৃক্ষের প্রতিকৃতি অতি সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে করা। প্রাচীরঘেরা মসজিদ অঙ্গনের উত্তর-পূর্ব কোণে শাহদৌলার তাঁর পাঁচ সঙ্গী ও নাম-না-জানা অনেকের সমাধি আছে। শাহ আবদুল হামিদ দানিশমন্দ ও মওলানা শের আলীর সমাধিও এখানে আছে। শাহ দৌলা এখানে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বর্তমানে করাচির জাতীয় জাদুঘরে সুলতান নসরত শাহের আমলের যে শিলালিপি রয়েছে, তাতে সন ৯৩০ হিজরী/ ১৫২২-২৩ খ্রিস্টাব্দ খোদিত রয়েছে। এটি একসময় বাঘা মসজিদের বাইরের প্রধান প্রবেশপথের উপর প্রোথিত ছিল। এ শিলালিপিতে শাহ দৌলার অথবা তাঁর পুত্র আবদুল হামিদের কোনো উল্লেখ নেই, যদিও মসজিদ নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। কাজী মোহম্ম; মেছের তাঁর 'রাজশাহীর ইতিহাসে' বলেন যে, "যুবরাজ খুররম (পরে বাদশাহ শাহজাহান) ১০০৩ হিজরী সনে (১৬২৩-২৪ খ্রিস্টাব্দে) শাহ আবদুল হামিদের তৃতীয় পুত্র শাহ আবদুল ওহাবকে বাৎসরিক ৮০০০ টাকা আয়ের ৪২টি মৌজা দান করেন।" বাঘা নামটির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হচ্ছে এই যে, এখানে বাঘের উপদ্রব ছিল এবং শাহ দৌলা এ সমস্ত বাঘকে তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দ্বারা বশ করেন।

৮। বাঘা, দরগাহ-খানকা এবং সমাধি, সপ্তদশ-উনবিংশ শতাব্দী

পূর্বেই বলা হয়েছে যে শাহ মুয়াজ্জেম দৌলা বাঘায় বসতি স্থাপন করে খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানেই তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। দরগাটি একসময় খুবই জনপ্রিয় ছিল ইসলামি কেন্দ্র হিসাবে। মসজিদটির আশেপাশে অসংখ্য শবাধার ও সমাধি দেখা যাবে। এ সমস্ত সমাধির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শাহ দৌলার সমাধি।

কাজী মেছের তাঁর 'রাজশাহীর ইতিহাস' রচনার পূর্বে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাঘা অঞ্চল পরিদর্শন ও সার্ভে করেন। তাঁর গ্রন্থে অনেক প্রাচীন ইমারতের উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে (ক) বাগদাদী দরগা যা বাঘা মসজিদের উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত; (খ) জোহার খাকীয় মসজিদ ও মাজার; (গ) মোস্তান শাহের সমাধি; (ঘ) লোহাস শাহের সমাধি; (ঙ) সুফী বেগু দেওয়ানীর সমাধি; (চ) আরানীতে কামেল দরবেশ শেখ লাবু দেওয়ানের সমাধি; (ছ) রাধাকৃষ্ণপুরে অবস্থিত বদর শাহের দরগা; (জ) ঘোড়া পীরের দরগাহ। শেষোক্ত শবাধারের চারিদিকে অসংখ্য পোড়ামাটির ঘোড়ার খেলনা দেখা যাবে।

৯। কুসুম্বা, মসজিদ, ১৫৫৮ খ্রিস্টাব্দ (৭৫-৭৭)

পুরাতন রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমায় (বর্তমানে জেলা) রাজশাহী শহর থেকে ২১ মাইল উত্তরে ও মান্দা থানা থেকে মাত্র ৪ মাইল দক্ষিণে কুসুম্বা নামে একটি প্রাচীন জনপদ রয়েছে। এ স্থানের প্রধান আকর্ষণ একটি অলঙ্কৃত মসজিদ। ২৫০ × ৯০০ ফুট

পরিমাপের একটি বিশাল দিঘির পাড়ে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এ মসজিদটি সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত হয়। এর আয়তন ৫৮ × ৪২ ফুট। দেয়ালগুলো প্রায় ৬ ফুট প্রশস্ত। সম্পূর্ণ পোড়াইটের তৈরি মসজিদটি নকশাকৃত পাথর দ্বারা আচ্ছাদিত এবং এক্ষেত্রে গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদের সাথে এর সাদৃশ্য রয়েছে। অবশ্য গম্বুজ এবং মিহরাবের অংশবিশেষে পাথরের কোন আচ্ছাদন নেই। কুসুম্বা নামকরণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে বিশেষজ্ঞগণ কৌশাম্বী থেকে কুসুম্বার উৎপত্তি হয়েছে বলে যে মন্তব্য করেন তা সঠিক নয়। কারণ প্রাক-মুসলিম ভারতে কৌশাম্বী অতি প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান এবং এর সাথে রাজশাহী অঞ্চলের কুসুম্বার কোনো সংস্পর্শ নেই। মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেন, "কুসুম্বাকে কোন কোন ঐতিহাসিক প্রাচীন কৌশম্বী নগর বলে মনে করেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' ও মহারাজ বিজয় সেনের দত্তপাড়া লিপিতে সে বর্ধন রাজার উল্লেখ আছে তাঁদের মতে সেই বর্ধন রাজা ছিলেন আলোচ্য কুসুম্বার (প্রাচীন কৌশম্বী) অধিপতি। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা একমত নন। কুসুম্বা প্রাচীন কৌশম্বী না হলেও এ স্থান অত্যন্ত প্রাচীন এবং এখানে যে প্রাচীন হিন্দু, বৌদ্ধ যুগের অসংখ্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নির্দশন ছিল তাতে সন্দেহ নেই। মসজিদে ব্যবহৃত পাথর কোনো প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল বলে ধারণা হয়। মসজিদ প্রাঙ্গণের নিচে কতগুলি পাথরে বিষ্ণু ও গণেশের মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। এগুলো ছাড়াও কুসুম্বা অঞ্চলে প্রাক-মুসলিম আমলের অনেক প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখা যায়।" এসব কারণে বর্তমান কুসুম্বাতে বৌদ্ধ-হিন্দু যুগের একটি প্রাচীন জনপদের অস্তিত্ব ছিল বলে প্রমাণিত হয়। পরবর্তীকালে মুসলিম আমলে এ স্থানে আবার নূতন করে একটি জনপদ গড়ে ওঠে এবং প্রাচীন আমলের অনেক উপকরণ দিয়ে আলোচ্য মসজিদটি নির্মিত হয়। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র কুসুম্বা মসজিদেই নয়, ভারতবর্ষের মুসলিম স্থাপত্যের উষালগ্নে দিল্লির কুওয়াত-উল-ইসলাম এবং আজমীরের আড়াই-দিন-কা-ঝোপড়া মসজিদে অমুসলমান স্থাপত্যিক উপকরণ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত ধ্বংসপ্রাপ্ত হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাবে আদিনা মসজিদ ও ছোট সোনা মসজিদে।

কুসুম্বা মসজিদটি আয়তাকার ছয় গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ। এর চার কোনায় চারটি অষ্টকোণাকার টারেট রয়েছে যা নিচ থেকে সরু হয়ে উপরে উঠে গেছে। টারেটটি সমান্তরাল মৌল্ডিং বা বেড়ি দিয়ে কয়েকটি অংশে বিভক্ত এবং উপরে কোনো নিরেট গম্বুজাকৃতি কিউপোলা দেখা যাবে না। এ মসজিদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ বক্রাকার কার্নিশ এবং পূর্বদিকে তিনটি খিলানপথ। খাঁজকাটা কৌণিক খিলানের উপরে বেড়ির নকশা এবং উভয় পাশে আয়তাকার ফ্রেমে প্যানেলের অলঙ্করণ দেখা যাবে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুটি করে চারটি খিলানপথ রয়েছে। দক্ষিণদিকের দরজা দু'টি পাথরের জাফরি দ্বারা বন্ধ। পূর্ব দেয়ালে তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে। এগুলো কৌণিক খাঁজকাটা খিলান দ্বারা গঠিত। পূর্বদিকের খিলানপথ দিয়ে অভ্যন্তরে মিহরাবের দিকে যাওয়া যায়। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি মিহরাব রয়েছে। অবতলাকৃতির মিহরাবগুলো নকশাকৃত পাথরে

আচ্ছাদিত। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পার্শ্ববর্তী মিহরাব দু'টি অপেক্ষা আয়তনে বড়। মিহরাবের সামনে পাথরের স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি ছোট দ্বিতল জেনানা গ্যালারি রয়েছে, যা ছোট সোনা মসজিদের গ্যালারির অনুকরণে নির্মিত।

কুসুম্বা মসজিদটি ছয় গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদ, যার ভূমি-নকশা রামপালের বাবা আদমের মসজিদে দেখা যাবে। মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেন, "মসজিদের ভিতরের অংশ পূর্ব-পশ্চিমে দুইভাগে (aisles) বিভক্ত এবং উত্তর-দক্ষিণে তিনভাগে (bays) বিভক্ত। মসজিদের অভ্যন্তরে মাত্র ২টি প্রস্তরস্তম্ভ আছে। এ দু'টি স্তম্ভ ও চার পাশের দেয়ালের পিলাস্টারের উপর ভিত্তি করে মসজিদের ৬টি গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। জেনানা-মহলের স্তম্ভ থেকে এ দুটি স্তম্ভ সম্পূর্ণ আলাদা। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে ৩টি গম্বুজ ভেঙে পড়ে ও মসজিদের বহু ক্ষতিসাধিত হয়।" প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ গম্বুজগুলো পুনঃনির্মাণ করে।

বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের অলঙ্করণের পোড়ামাটির নকশা (terracotta) পাথরে কাটা অলঙ্করণে এরূপ প্রয়োগ সচরাচর দেখা যায় না। লতাপাতা, ফুল ও জ্যামিতিক নকশা অথবা Arabesque-এর চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করেছে। মূলত ইটের তৈরি হলেও কুসুম্বা মসজিদের ভিতর ও বাহির কালো পাথর দিয়ে আচ্ছাদিত যার উপর কারুশিল্পী অপরিসীম দক্ষতা ও সৃজনশীলতার সাথে নানা ধরনের অপরূপ মোটিভ সৃষ্টি করে সম্পূর্ণ মসজিদটিকে অলঙ্কৃত ইমারতে পরিণত করেছেন। এক অসাধারণ অলঙ্করণ নজরে পড়বে কেন্দ্রীয় মিহরাবের দিকে তাকালে। অবতলাকৃতি এ মিহরাবটির প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে পাশের দুটি খোদিত পাথরের স্তম্ভ থেকে বহুখাঁজবিশিষ্ট খিলান উপরে উঠে গেছে। খিলানের উপর সূর্যমুখী ফুল, লতাপাতা, প্রলম্বিত লতা (creeper), আঁকাবাঁকা পাতা (serpentine), ক্ষুদ্রাকৃতি গোলাপ (rosette)। স্তম্ভের গায়ে ঝুলন্ত শিকল ও ফুল এক অপূর্ব অলঙ্করণের সমারোহ সৃষ্টি করেছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি আয়তাকার ফ্রেমে আবদ্ধ এবং এ দেয়ালও অনুরূপভাবে শোভিত। পাথর-খোদাই (stone cutters' art) শিল্প যেন এক অভিনব পর্যায়ে পৌঁছেছে। আহমদ হাসান দানীর ভাষায়, "The stone cutters' art has reached its evening of life ; where nothing intelligent remains but everything points to its decay and death. Hereafter we no more hear of stone works in Bengal excepting the inscription tablets, a few cenotaphs and those used at the tomb of Bibi Pari at Dacca, probably a work of foreign masons." অর্থাৎ "পাথরে কাটা শিল্প এমন এক শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এতে কোনো বুদ্ধিমত্তা দেখা যায় না এবং সমস্ত কিছুতে যেন পরিসমাপ্তির ছায়া দেখা যাচ্ছে। এর পর শিলালিপি ও কতিপয় শবাধার, যেমন ঢাকার বিবি পরীর সমাধি, যা বিদেশী শিল্পীদের দ্বারা সৃষ্ট; ছাড়া পাথরে কাটা নকশা দেখা যায় না। দানীর এহেন উক্তি গ্রহণযোগ্য নয় বরং একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, আদিনা মসজিদের মিহরাবের প্রাচীরে পাথরে কাটা যে নকশা চতুর্দশ শতাব্দীতে দেখা যায় তা গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদের মাধ্যমে (পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী) সুলতানী-উত্তর যুগে (১৫৫৮ খ্রিস্টাব্দে) চূড়ান্ত (climax) পর্যায়ে পৌছায়। অলঙ্করণের মহামেলা (exuberance) ইতিপূর্বে অন্য কোনো ইমারতে দেখা যায় না। অবশ্য একথা

স্বীকার করতে হবে যে সর্বোচ্চ মাজার নকশার ব্যবহারের পর ভাটা পড়াই স্বাভাবিক। গ্রন্থকার তাঁর মূল গ্রন্থ 'Muslim Monuments of Bangladesh'-এ বলেন "In no other monument of Bengal workmanship of later period has ever rivalled the sumptuous and sensitive stone carvings of the Kusumbha Masjid. It is, however, true that in its perfection lie the germs of decay and degeneration in its over-simplification and plastic quality." অর্থাৎ পরবর্তী পর্যায়ের বাংলাদেশের অপর কোনো ইমারতে এ ধরনের কারুশিল্প দেখা যায়নি যা কুসুম্ভার অসাধারণ এবং সুচারুরূপে খোদিত পাথরের নকশায় দেখা যাবে। অবশ্য অতিরঞ্জিত ও বহুল ব্যহারের ফলে মোটিভগুলোর প্রয়োজনীয়তা স্তিমিতই হয়নি, খোদাইশিল্পের যে চাতুর্য ব্যাহত হয়েছে তার মধ্যে এর অবলুপ্তি নিহিত ছিল।

কুসুম্ভা মসজিদের নির্মাতা কে ছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। রাজশাহীর তৎকালীন কালেক্টর কার্সটেয়ার্স কিংবদন্তির উল্লেখ করে বলেন যে. সোলায়মান নামে একজন ধর্মান্তরিত মুসলমান এটি নির্মাণ করেন। তাঁর নামে ছিল চিলমন মজুমদার এবং তিনি ছিলেন একজন হিন্দু জমিদার। অবশ্য কার্সটেয়ার্স তার বক্তব্যের সপক্ষে কোনো যুক্তি দিতে পারেননি। সামসুদ্দীন আহমদ বলেন যে, কুসুম্ভা মসজিদের শিলালিপিটি কার্সটেয়ার্স আবিষ্কার করেন। এই শিলালিপিটি মসজিদের পূর্বদিকের প্রধান খিলানপথের উপরে প্রোথিত রয়েছে। শিলালিপির পাঠোদ্ধার করে জানা যায় যে, মাহমুদ শাহ গাজীর পুত্র সুলতান গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহের শাসনামলে জনৈক সোলায়মান কর্তৃক হিজরী ৯৬৬/১৫৫৮ খ্রিস্টীয় সনে এ মসজিদটি নির্মিত হয়।

কুসুম্ভা মসজিদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অনেক ধ্বংসস্তূপ বিক্ষিপ্ত ইটের পাজা দেখা যাবে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে এ সমস্ত স্থানে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ যা সম্ভবত এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার ইমারত ছিল। বসতবাড়ির ভগ্নাবশেষ, পরিখা, দিঘি রয়েছে।

১০। নওদা, আটকোণাকার সমাধি, সপ্তদশ শতাব্দী (৭৮)

পশ্চিমবাংলার মালদা থেকে ১৬ মাইল পূর্ব-দক্ষিণে এবং চাপাই নবাবগঞ্জ মহকুমার অধীন রোহনপুর রেলস্টেশন থেকে প্রায় ২ মাইল উত্তর-পূর্বদিকে নওদা গ্রাম অবস্থিত। এখানে অনেক প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এ অঞ্চলের পুরাকীর্তি প্রসঙ্গে মোহাম্মদ যাকারিয়া বিস্তারিত বলেন, "এককালে নওদা ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি নিয়ে একটি বিরাট নগরী গড়ে উঠেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়, নওদা, মীরাপুর, পীরপুর, রহনপুর, ভাগলপুর, পুনার, প্রসাদপুর, কসবা প্রভৃতি গ্রাম যেখানে অবস্থিত, সেখানেই ছিল এই প্রাচীন জনপদ এবং তা ছিল আয়তনে প্রায় ১৫/১৬ বর্গমাইল। এ স্থানে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের যেসব চিহ্ন পাওয়া যায় তাতে মনে হয় যে প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে এখানে একটি বিরাট নগরীর অস্তিত্ব ছিল। এখানকার প্রায় সব কীর্তিই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রাচীন ইট ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশই এ স্থানের অতীত গৌরবের একমাত্র সাক্ষী।

মুসলিম আমলে এখানে নির্মিত হয়েছে একটি বিচিত্র ধরনের ইমারত যা অষ্টকোণাকৃতি। একটি উঁচু ঢিবির উপর স্থাপিত নওদার এই ইমারতটির আটটি পাশ কুলুঙ্গি দ্বারা অলঙ্কৃত এবং এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হলে চারটি খিলানপথ ব্যবহার করতে হয়। এ ইমারতটি এক গম্বুজবিশিষ্ট। প্রবেশপথগুলোর পাশে সরু pinnacle বা টারেট উপরের দিকে উঠে গেছে। Bangladesh Archaeology 1979-তে উল্লেখ আছে "This tomb is situated at Rohanpur under Gumastapur district Rajshahi and is the only example of an octagonal tomb in Bangladesh. Its walls are 5 feet 8 inches thick and 20 feet 4 inches high and each of its 8 sides measures 14 feet externally. There are four entrances to this tomb on the east, west north and south, each relieved externally with variety of architectural panels in plaster. Slender turrets at the corners of an octagon add to the ornamentation of the building on the basis of architectural elements. The structure may be dated to the late 17th century. If was protected in 1878. অর্থাৎ প্রধান সমাধিটি রাজশাহী জেলার গোমস্তাপুর থানাধীন রোহনপুরে অবস্থিত। এর প্রাচীর ৫-৮″ প্রশস্ত এবং ২০-৮৪″ উঁচু। এর প্রতিটি পাশের প্রশস্ততা ১৪ ফুট বাইরের দিকে। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে চারটি প্রবেশপথ রয়েছে। প্রত্যেকটি পাশে পাথরে কাটা অলঙ্কৃত প্যানেল দ্বারা শোভিত। অষ্টকোণার প্রতি পাশে দু'ধরনের সরু টারেট রয়েছে। সম্ভবত আদিতে ছাদের উপর দিয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে। স্থাপত্যের উপকরণ ও রীতি দেখে মনে হয় যে, এটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে নির্মিত। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে এটি সংরক্ষিত হয়। বাল্বের আকৃতিতে গম্বুজ, ড্রামের ব্যবহার প্যানেল অলঙ্করণ, কুলুঙ্গি দ্বারা দেওয়ালের একঘেয়েমি দূরীকরণ, সমান্তরাল কার্নিশ চার কেন্দ্রবিন্দু থেকে সৃষ্ট খিলান দেখে এটি যে মুঘল আমলের ইমারত তা নিশ্চিত করে বলা যায়।

নওদার ইমারতটি আসলে কি উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। কাজী মেছের তাঁর 'রাজশাহীর ইতিহাস' গ্রন্থে অষ্টকোণাকার ইমারতটিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলের একটি মন্দির বলে মনে করেন। কিন্তু তাঁর এ ধারণা সত্য নয়, কারণ মন্দিরের গর্ভগৃহ, বেদী অথবা কোনো মূর্তির সন্ধান এখানে পাওয়া যায়নি। উপরন্তু, মুসলিম স্থাপত্যকলায় অষ্টকোণাকার ইমারতের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখা যাবে। আহমদ হাসান দানী বলেন, "Local traditions aver that it was a tomb but at present there is no grave in the interior. On the ground of style the building may be dated to the end of the 17th century A.D." অর্থাৎ "স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী এটি এটি সমাধি। যদিও বর্তমানে অভ্যন্তরে কোনো শবাধার নেই। স্থাপত্যকীর্তির ভিত্তিতে একটিকে সপ্তদশ শতাব্দীর ইমারত হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।" অষ্টকোণা স্থাপত্যরীতি প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীতে জেরুজালেমে নির্মিত হয় অষ্টকোণাকৃতি 'ডোম-অব-দি-রক' বা কুব্বাতুস সাখরা। পরবর্তী পর্যায়ে ইরানে, যেমন সুলতানীয়ার ওলজাইতুর সমাধি এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন মুলতানের

রুকুন-ই-আমলের মাজার, দিল্লির খান-ই-জাহান তিলাঙ্গিনির সমাধি ইত্যাদি। কিন্তু বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে নওদার অষ্টকোণাকৃতি সমাধিটি ব্যতিক্রমধর্মী কারণ ইতিপূর্বে বাংলাদেশে এ ধরনের ইমারত নির্মিত হয়নি। সুতরাং দানীর মত সমর্থন করে বলা যায় যে এটি কোনো বুজুর্গ ব্যক্তির সমাধি ছিল, যদিও মধ্যভাগে কোনো শবাধার দেখা যায় না।

রাজশাহী শহর

১১। শাহ মখদুমের সমাধি, সপ্তদশ শতাব্দী

রাজশাহী শহরের প্রধান আকর্ষণ হযরত শাহ মখদুম আওলিয়ার সমাধি। তিনি পুণ্যাত্মা সাধক ছিলেন এবং এ অঞ্চলে দীর্ঘদিন ইসলামপ্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। মাজারে যে শিলালিপি রয়েছে তা পাঠোদ্ধার করে জানা যায় যে জনৈক আলীকুলী বেগ হিজরী ১০৪৫ অর্থাৎ ১৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে এই সমাধি নির্মাণ করেন।

কামেল পীর শাহ দরবেশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন, যেমন শাহ মখদুম দরবেশ, মখদুম শাহ, মখদুম শাহ রূপশ। সামসুদ্দীন আহমদের মতে, শাহ মখদুমের বংশপরিচয় সঠিকভাবে জানা না গেলেও তিনি সম্ভবত মখদুম শেখ আলাউল হকের বংশধর ছিলেন, যিনি সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের (১৩৪২-৫৮ খ্রিঃ) আমলে প্রখ্যাত দরবেশ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। একটি পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি হিজরী ৭৯৬ তথা খ্রিস্টীয় ১৩৮৪ সনের ২৫শে রজব জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এ তথ্য কতটুকু সত্য তা সঠিকভাবে বলা যায় না। খুব সম্ভব শাহ মখদুম মুঘল আমলে সপ্তদশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলে আগমন করেন ধর্মপ্রচারের জন্য। রাজশাহীর দরগাপাড়ায় তাঁর যে দরগাহটি রয়েছে তা ভক্তদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। আ. ক. ম. যাকারিয়া এবং আয়েশা বেগম মনে করেন যে, শাহ মখদুম নাম নয়, উপাধি মাত্র। আবু তালেব শাহ মখদুমকে 'দোখরপোশ' বা 'চাদরে আচ্ছাদিত ব্যক্তি' নামে অভিহিত করেন। মূলত মুখদম অর্থ আল্লাহর দাস; যিনি ইসলামের সেবায় জীবনকে উৎসর্গ করেন। শিলালিপিতে 'মখদুম' বা দোখর পোশ কোনোটির উল্লেখ নেই এবং কোনো সুলতানের নামও খোদিত হয়নি। উপরন্তু পারস্যের সুলতান শাহ আব্বাসের নাম উৎকীর্ণ করা হয়। মাযারের নির্মাতা আলী কুলী বেগ ছিলেন একজন শিয়া, যিনি এই সাধকপুরুষের কবরের উপর সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন।

শাহ মখদুমের দরগাটি ইটের তৈরি। ২০০ বর্গফুট পরিমাপের চতুষ্কোণাকৃতি এই দরগাহটির চার কোনায় চারটি বুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলোর উপরে কিউপলা বা নিরেট গম্বুজ দ্বারা আবৃত। খুব সম্ভব এই দরগাহটি হযরত পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত একলাখী সমাধির অনুকরণে নির্মিত হয়। মাজারটি একটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। পূর্বদিকে রয়েছে একটি প্রবেশপথ। প্রবেশপথের উভয় পাশে কষ্টিপাথরের স্তম্ভ দেখা যাবে। পারস্যের সমাধিগুলো 'গুনবাদ' নামে পরিচিত এবং এর অনুকরণে এ দরগাটিও গুনবাদ বলা হয়ে থাকে। শিলালিপিতে উদ্ধৃত শাহ আব্বাসের নাম থেকে ধারণা করা যায় যে তিনি পারস্য দেশ থেকে বাংলা মুলুকে আসেন। সম্ভবত মুঘল সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে (১৬২৮-৫৮ খ্রিঃ) অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতে মখদুম শাহের দরগা নির্মিত হয়।

১২। সুলতানগঞ্জ, সুলতান শাহের সমাধি, পঞ্চদশ শতাব্দী

১৪৩২ খ্রিস্টাব্দের উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, গোদাগাড়ীর সন্নিকটে সুলতানগঞ্জে সুলতান জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। এ শিলালিপিটি একটি সমাধির বাইরের প্রাচীরে প্রোথিত রয়েছে। বর্তমানে সমাধিটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। তবে শিলালিপির পাঠোদ্ধার করে জানা যায় যে, এই মসজিদের নির্মাতা ছিলেন সুকিয়া বা সুটিয়াব পুত্র আমির হুদা। মসজিদটিও অবলুপ্ত। স্থানীয় কিংবদন্তি অনুযায়ী সমাধিটি সুলতান শাহ নামের কোনো কামেল পীরের।

১৩। রোহনপুর, সুফী খানের মসজিদ, পঞ্চদশ শতাব্দী (অবলুপ্ত)

সুলতান ইউসুফ শাহের শাসনামলে ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দের একটি শিলালিপি ভগ্নপ্রাপ্ত সুলতান শাহের সমাধির দরজার উপরে প্রোথিত ছিল। এ শিলালিপির পাঠোদ্ধার করে বলা হয় যে, উলুঘ সুফী খান এখানে একটি মসজিদ স্থাপন করেন, যা বর্তমানে অবলুপ্ত। এ মসজিদটি সুলতান মোহাম্মদ শাহের আমলে নির্মিত হয়।

উপরোক্ত শিলালিপি ছাড়াও ১৪৮৬ এবং ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দের উৎকীর্ণ দু'টি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, সুলতান ফতেহ শাহ এবং সুলতান হোসেন শাহের আমলে মসজিদ স্থাপিত হয়। এ ছাড়া ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ অপর একটি শিলালিপিতে কিনাপতির পুত্র রামান দৌল্লা হোসেন শাহের আমলে অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। শেষোক্ত মসজিদটি কুসুম্ভা মসজিদের সন্নিকটে ছিল বলে আ. ক. ম. যাকারিয়া উল্লেখ করেন। বর্তমানে উপরোক্ত তিনটি মসজিদের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র শিলালিপিতেই হদিস পাওয়া যায়। এভাবে বাংলাদেশের অসংখ্য মসজিদ, মাজার, খানকা, সমাধি, দুর্গ, বসতবাড়ি, সরাইখানা, পুল প্রভৃতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ধ্বংসপ্রাপ্তির মূল কারণ (১) ভূমিকম্প, (২) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, (৩) অবহেলা, (৪) জঙ্গলাকীর্ণ আগাছা, (৫) নদীর ভাঙ্গন, (৬) মানুষের ধ্বংসস্পৃহা (vandalism)।

১৪। রোহনপুর, সদাই পীরের দরগা

রোহনপুরে সদাই পীর নামে স্থানীয় একজন সাধকপুরুষের সমাধি দেখা যাবে। এ পীর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলাম-প্রচারক পীর দরবেশ ও সুফীদের আগমন হয়েছিল এবং যেখানে তাঁদের জীবনাবসান ঘটে সেখানেই তাঁদের দরগা নির্মিত হয়, যেমন—সিলেটের শাহ জালালের দরগা এবং গৌড়ের শাহ নিয়ামতউল্লাহর দরগা, ঢাকার শাহ আলী বাগদাদীর দরগা।

১৫। নাটোর, দরগাসমূহ, ঊনবিংশ শতাব্দী

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদের নবাবকে খুশি করার জন্য নাটোরের রাজা বারো আওলিয়া বা পীরের শবাধারের উপর একটি দরগা নির্মাণ করেন। এ সমস্ত দরগা নাটোর রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে অবস্থিত। মুসলমান ওস্তাগার নির্মাণ করলেও রাজার অর্থানুকূল্যে এগুলো নির্মিত হয়। তিনি এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি ওয়াক্ফ সম্পত্তি দান করেন। নাটোরের যে সমস্ত দরগা বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ করে তাদের মধ্যে বুড়া মাদারের দরগা, গড়িখানা দরগা, ময়দাপট্টি দরগা, কোতওয়ালী দরগা,

কানাইখালী দরগা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে কোতওয়ালী দরগাটি মসজিদে রূপান্তরিত হয়।

১৬। কানাইখালী, ইটের তাজিয়া, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ

নাটোর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) কানাইখালী মৌজায় একটি অপূর্ব ইটের তাজিয়া দেখা যাবে। শিয়া সম্প্রদায় মোহররমের সময় তাজিয়া ব্যবহার করেন। ইটের অপূর্ব কৌশলে নির্মিত তাজিয়াটি তিন স্তরবিশিষ্ট। উঁচু বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত চতুষ্কোণাকার তাজিয়ার সর্বনিম্ন স্তরটি খুবই মজবুত করে নির্মিত হয় এবং চার কোনায় গোলাকার একটি বুরুজ দ্বারা সুগঠিত ছিল। দেয়ালে সমান্তরাল ও খাড়া প্যানেল নকশা দ্বারা শোভিত ছিল। পিরামিডাকৃতির দ্বিতল ও ভূতল ইটের তাজিয়াটি খুবই আকর্ষণীয় এবং এটি ভগ্নাবস্থায় রয়েছে। সর্বোচ্চ স্তরটি গোলাকৃতি এবং এর উপর গম্বুজ রয়েছে।

১৭। নওগাঁ, প্রাচীন মসজিদ, ষোড়শ শতাব্দী (ধ্বংসপ্রাপ্ত)

পাড় নওগাঁ নামক স্থানে সুলতানী আমলের একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের চিহ্ন দেখা যাবে। এ মসজিদটি কিরূপ ছিল তার ঐতিহাসিক বর্ণনা পাওয়া যায় না তবে ধারণা করা হয় যে, এটি সুলতানী আমলে ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল।

১৮। সুলতানপুর, কাজিবাড়ি মসজিদ, অষ্টাদশ/উনবিংশ শতাব্দী

রাজশাহী জেলার সুলতানপুর নামক স্থানে ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। এটি কাজিবাড়ির মসজিদ নামে পরিচিত। ১৮৮২-৮৩ খ্রিস্টাব্দে এটির সংস্কার করা হয়।

১৯। চাপাই, একটি প্রাচীন মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দী (অধুনালুপ্ত)

মহানন্দা নদীর তীরে চাপাই নামক স্থানে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাবে। মসজিদটি সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়।

২০। কুসুম্বা, সুলতানী মসজিদ, ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দ (অধুনালুপ্ত)

কুসুম্বা গ্রামের সন্নিকটে একটি অজপাড়া গাঁয়ে দু'লাইনে উৎকীর্ণ যে আরবি শিলালিপি পাওয়া যায় তার পাঠোদ্ধার করে জানা যায় যে, হোসেন শাহের আমলে ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। রামানাদৌলা নামে এক ব্যক্তি এর প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু কে এই রামানাদৌলা তা সঠিকভাবে বলা যায় না। সমসাময়িক ইতিহাসে এর কোনোই হদিস পাওয়া যায় না। বর্তমানে এটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

২১। গোদাগাড়ি, কিল্লা বারুই পাড়া, অষ্টাদশ শতাব্দী (অধুনালুপ্ত)

রাজশাহী শহরের ১৯ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গোদাগাড়ি নামক স্থানে কিল্লা বারুই পাড়া নামে একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। কথিত আছে যে, মারাঠাদের আক্রমণের সময় নবাব আলিবর্দি খান তার পরিবার পরিজন ও ধনসম্পদসহ এ অঞ্চলে নিরাপত্তার জন্য মুর্শিদাবাদ থেকে এসে বসবাস করেন। ধারণা করা হয় যে, বারুই পাড়ায় তিনি একটি কিল্লা বা দুর্গ খাজাঞ্জিখানা বা কোষাগার প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এখানে অবিন্যস্তভাবে ইটের স্তূপ, ইমারতের ভগ্নাবশেষ এবং প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া যায়।

২২। মাহীসন্তোষ (মহীগঞ্জ), পুরাতন মসজিদ, সমাধি, মাজার, দিঘি, পঞ্চদশ-সোড়শ শতাব্দী

বাংলাদেশের প্রবীণ পুরাতত্ত্ববিদ আ. ক. ম. যাকারিয়া মাহীগঞ্জের প্রাচীন কীর্তি পরিদর্শন করে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দেন। রাজশাহী জেলার ধামইরহাট থানা থেকে ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে পশ্চিম দিনাজপুর (ভারত) জেলার বালুরঘাট থেকে আনুমানিক ২ মাইল পূর্ব-দক্ষিণে আত্রাই নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত মাহীসন্তোষ বা মহীগঞ্জ বর্তমানে চৌঘাট মৌজায় অবস্থিত। প্রাচীন হিন্দু-মুসলমান আমল পর্যন্ত এ স্থানে একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ বলে বরাবরই পরিচিত ছিল। এখানে অবস্থিত বিভিন্ন প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ, অসংখ্য প্রাচীন জলাশয়, বিভিন্ন স্থানে স্তূপীকৃত প্রস্তরখণ্ড ও অসংখ্য প্রাচীন ইট এবং এখানে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নবস্তু এ স্থানের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করে।

মাহীসন্তোষ অথবা মহীগঞ্জের পূরাকীর্তি সর্বপ্রথম অনুসন্ধান করেন রাজশাহীর বরেন্দ্র জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা কিউরেটর অক্ষয়কুমার মৈত্র। তিনি বরেন্দ্র অঞ্চলের কীর্তিসমূহ সার্ভে করে একটি তথ্যবহুল ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন (Ancient Monuments of Varendra, Rajshahi, 1949) তিনি মাহীসন্তোষ বা মহীগঞ্জকে পালরাজা মহীপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বললেও অনেক ঐতিহাসিকের মতে মাহী ফার্সি শব্দ অর্থাৎ মৎস এবং গঞ্জ শব্দের অর্থ বাজার। মোহাম্মদ যাকারিয়ার মতে, এ স্থানের এই মহীগঞ্জ নাম নিয়ে বিভিন্ন অভিমত দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন যে, সংস্কৃত 'মহী' শব্দের সংগে ফারসি 'গঞ্জ' শব্দের সংযোগে মুসলমান আমলে এই নামকরণ হয়েছিল। আবার কেউ কেউ বলেন 'মায়ি' (মাই বা মা) শব্দের অপভ্রংশ মাহী (এবং তা একজন মহিলা পীরের সমাধির সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে) শব্দের সঙ্গে গঞ্জ শব্দের সংযোগে এ নামকরণ হয়েছিল।

প্রত্নসম্পদের জন্য মাহীসন্তোষ বিশেষভাবে আকর্ষণীয় সামসুদ্দীন আহমদ এখান থেকে প্রাপ্ত তিনটি শিলালিপি সম্বন্ধে বিষদ আলোচনা করেছেন। দিনাজপুরের তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্টমেকট এ স্থান থেকে দুটি শিলালিপি উদ্ধার করেন। এর মধ্যে একটি বড় আকারের অপরটি ছোট আকারের। বড়টি 'মাহি' বা মায়িসন্তোষ' নামক একজন মহিলা পীরের মাজারের ভিতরে দরজার উপরে ছিল। ব্লকম্যান যথার্থই বলেন যে, এটি পার্শ্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদে প্রোথিত থাকত। এর ফলে তুগরায় উৎকীর্ণ শিলালিপি মাচারের মর্যাদা এবং পবিত্রতা বৃদ্ধিই করত না, উপরন্তু মাজারে থাকায় এ সমস্ত অসংখ্য শিলালিপি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এগুলো মাজারসংক্রান্ত না হয়ে মসজিদ নির্মাণকেই ইঙ্গিত করে। যাহোক, মাহী-সন্তোষের প্রথম শিলালিপির পাঠোদ্ধার করে জানা যায় যে, সুলতান বরবক শাহের আমলে খান-উল-আযম উলুঘ ইকরার খান ৮৬৫ হিজরী ১৪৬০-৬১ ইং সনে খান-ই-মোয়াজ্জম আশরাফ খানের মাধ্যমে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। যে মসজিদে এ শিলালিপিটি ছিল তা বহ পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় শিলালিপিটিও ওয়েস্টমেকট উদ্ধার করেন কিন্তু কোন স্থান থেকে এটি উদ্ধার করা হয় তা তিনি বলেননি। উপরন্তু, শিলালিপিটিও ভগ্নদশায় রয়েছে। এটিও মসজিদসংক্রান্ত পাঠোদ্ধার করে জানা যায় যে সুলতান বরবক শাহের আমলে খান-উল-আযম ওয়াল মোয়াজ্জেম উলুঘ (খান) বিখ্যাত বরবকাবাদ শহরের উজির ৮৭৬ হিজরী, ১৪৭১-৭২ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদ নির্মাণ করেন। তৃতীয় শিলালিপিটি রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা কুমার শরৎকুমার রায় একটি বিরাট মসজিদের ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করেন। লিপিপাঠে জানা যায় যে, সুলতান হোসেন শাহর আমলে ৯১২ হিঃ/১৫০৫ খ্রিস্টাব্দে সোহেলের পুত্র (নির্মাতার নামের অংশ ভেঙে গেছে) কর্তৃক এ মসজিদ রমজান মাসে নির্মিত হয়েছিল। এ মসজিদটি সুলতান হোসেন শাহের আমলে স্থাপিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত উপরিল্লিখ তিনটি শিলালিপিতে বর্ণিত মসজিদগুলোর কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট নেই।

হোসেনশাহী আমলের মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও এর কিছু কিছু অংশ, যেমন প্রাচীর, পশ্চিম দেয়ালের সামান্য অংশ এখনও কালের স্বাক্ষর দিচ্ছে। পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর দেয়াল মাটির সাথে মিশে গেছে। কেবলমাত্র পশ্চিমদিকের দেয়ালের সামান্য অংশ এখনও অক্ষত আছে এবং তা মাটি থেকে ৩ ফুট উঁচু। মসজিদের অভ্যন্তরে প্রস্তর-স্তম্ভগুলো অবিন্যস্তভাবে পড়ে রয়েছে। এগুলো সবই কষ্টিপাথরের তৈরি এবং সম্ভবত প্রাক-মুসলিম ইমারত থেকে সংগৃহীত। কোনো কোনোটিতে হিন্দুদের দেবীর মূর্তিও পাওয়া যায়। মাহীসন্তোষের মসজিদটি পুনঃনির্মাণ করা সম্ভব না হলেও এটির ভূমি-পরিকল্পনা সহজেই নজরে পড়ে। এটি দশ গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদ ছিল। অভ্যন্তরে একসারিতে চারটি স্তম্ভ ছিল এবং এটি মসজিদকে দুটি আইলে বিভক্ত করেছে। এটি মোট দশটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত ছিল। উত্তরদিকে ৫টি খিলান প্রবেশপথ দিয়ে মসজিদের অভ্যন্তরে যাওয়া যায়। উত্তর ও দক্ষিণদিকে দুটি করে খিলান-দরজা ছিল। দরজায় কষ্টিপাথরের চৌকাঠ দেখা যাবে। কিবলাপ্রাচীরে পাঁচটি আবতলাকৃতি মিহরাব রয়েছে, যা খিলানাকৃতির। এগুলো প্রস্তর দ্বারা নির্মিত হয় এবং মিহরাবগুলোর দেয়ালে লতাপাতা, ফুল, ঝুলন্ত নিরেট, ছোট গোলাপ প্রভৃতি মোটিভের সাহায্যে অলঙ্কৃত ছিল। এ মসজিদে মোট নয়টি প্রবেশপথ থাকা সত্ত্বেও অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক এটিকে ভুলবশত বারদুয়ারী মসজিদ বলেছেন। বাংলাদেশের কয়েকটি দশগম্বুজ মসজিদ ছিল যেমন গৌড়ের তাঁতিপাড়া মসজিদ এবং রাজশাহীর বাঘা মসজিদ। এ. বি. এম. হোসেন তাঁর 'The Ornamentation of the Sultani Architecture in Bengal' প্রবন্ধে (Shilpakala, vol 1 বলেন যে, "মাহীসন্তোষ মসজিদে (১৫০৭ খ্রিঃ) কষ্টিপাথরে বিভিন্ন ধরনের অলঙ্করণ দেখা যায়, এগুলোর মধ্যে বিশেষভাগে তাৎপর্যপূর্ণ ঝুলন্ত নিরেট এবং ফুলের মোটিভ।"

২৩। কুমারপুর, সমাধি, ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ (ধ্বংসপ্রাপ্ত)

রাজশাহী নবাবগঞ্জ সড়কের পাশে কুমারপুর নামক স্থানে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মাজার-সমাধি দেখা যাবে। এ. বি. এম. হোসেন এ সমাধির একটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দেন বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি মিউজিয়ামের জার্নালে। বর্তমানে এর একটিমাত্র প্রাচীর ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। স্থাপত্যকীর্তিটি কে নির্মাণ করেন এবং এস্থানে কে সমাহিত

রয়েছেন তা সঠিকভাবে বলা যায় না। খন্দকার আখতার আলী ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত একটি বাংলা পাণ্ডুলিপির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, এটি মির্জা আলী কুলী বেগের সমাধি। তিনি পারস্যের সুলতান শাহ্ আব্বাসের একজন সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু এ তথ্য মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। যাহোক, মির্জা আলী কুলী বেগ একজন শিয়া ছিলেন এবং রাজশাহীর সাধক শাহ মখদুমের ভক্ত ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তিনি রাজশাহীর দরগাহটিও নির্মাণ করেন।

কুমারপুরের সমাধিটি শাহ্ মোকাররমের সমাধি নামেও পরিচিত। কিন্তু শাহ্ মোকাররমের সঠিক পরিচয় জানা যায় না। আলী কুলী বেগ এটি নির্মাণ করেন এবং তিনিও সম্ভবত শাহ্ মোকররমের সমাধির নিকটবর্তী কোনো স্থানে সমাহিত আছেন। শাহ্ মোকররম শাহ্ মখদুমের মতো কোনো স্থানীয় দরবেশ ছিলেন বলে ধারণা করা যায়। বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত এই সমাধিটির স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা কঠিন। এতদসত্ত্বেও এ. বি. এম. হোসেন এ ইমারতের একটি পূর্ণ বিবরণ দেন। সম্পূর্ণ ইটের তৈরি এ সমাধিতে মার্বেলের টুকরো ব্যবহৃত হয়েছে। বর্গাকৃতি এ সমাধিটির পরিমাপ ২৩ ফুট ৬ ইঞ্চি বাইরের দিকে এবং ভিতরের দিক থেকে ১৬ ফুট ৬ ইঞ্চি। চার কোনায় চারটি আটকোনাকার বুরুজ দ্বারা এ ইমারতটি সুগঠিত হলেও প্রাকৃতিক কারণে এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বুরুজগুলো সমান্তরাল মৌল্ডিং দ্বারা বিভক্ত। সামসুদ্দীন আহমদ বলেন যে, সমাধির মধ্যভাগে কষ্টিপাথরের একটি শবাধার রয়েছে। ১২ বর্গ হাত পরিমাপের শবাধারটির দু'ফুট উঁচু। চতুষ্কোণাকার এই সমাধিটিতে পূর্বদিকে একটি প্রবেশপথ ছিল, যা ৩ ফুট ৭ ইঞ্চি প্রশস্ত। প্রবেশপথের উভয়দিকে বুরুজ ছিল এবং পূর্বদিকের প্রাচীর বা ফাসাদ আয়তাকার প্যানেল দ্বারা অলঙ্কৃত। পশ্চিম প্রাচীরে তিনটি অবতল মিহরাব রয়েছে। কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী মিহরাব দুটি অপেক্ষা বড়। উত্তরদিকের মিহরাবটি এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে। এটি দেখে প্রতীয়মান হয় যে, মিহরাবগুলো খাঁজকাটা খিলান দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। বাইরের দিকে মিহরাব-প্রাচীর সামান্য উদ্গত। স্থাপত্যিক কৌশল ও রীতি দেখে মনে হয় যে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নির্মিত এক গম্বুজবিশিষ্ট সমাধি, যেমন একলাখীর (হযরত পাণ্ডুয়া) সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। মুঘল আমলে ইমারতে পোড়ামাটির অলঙ্করণের পরিবর্তে প্লাস্টারে কাটা নকশা প্রাধান্য পায়। কুমারপুরের সমাধিতে এ ধরনের নকশা দেখা যাবে।

শবাধারটি (cenotaph) একটি সিমেন্টের বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। এর উপর সাতটি স্তরে কষ্টিপাথরে শবাধারটি নির্মিত হয়। উপরিভাগ ভল্টের আকৃতিতে গঠিত হয়েছে যেমন সোনারগাঁও-এ মোগরাপাড়ায় গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের কষ্টিপাথরের শবাধার। এ সমাধিতে তিনটি 'নাসতালিখে' উৎকীর্ণ শিলালিপি দেখা যাবে। দুটি পূর্বে এবং পশ্চিমে এবং তৃতীয়টি উপরিভাগে। একটি শিলালিপিতে যে তারিখ উল্লেখ আছে তা ১৬৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দ হিজরীর হিসাবে। কুমারপুরের সমাধিটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও একগম্বুজবিশিষ্ট চতুষ্কোণাকার মুঘল সমাধির, যেমন ঢাকার অজ্ঞাত ব্যক্তির সমাধি, মোহাম্মদপুর বিবি চম্পার সমাধির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

২৪। মসজিদ, ১৫৫৮-৫৯ খ্রিস্টাব্দ (অধুনালুপ্ত)

কুমারপুর গ্রামে মোকারম শাহের সমাধির সন্নিকটে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসস্তূপ দেখা যাবে। সুলতান গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহের (১৫৫৮-৫৯ খ্রিঃ) আমলে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি থেকে এ মসজিদের নির্মাণকাল নির্ণয় করা যায়। সামসুদ্দীন আহমদ বলেন, শিলালিপির টেকস্ট দুই সারিতে উৎকীর্ণ করা হয়েছে এবং যে কষ্টি-পাথরে খোদিত হয়েছে তা দৈর্ঘ্যে ৩ ফুট ৫ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ১ ফুট ৪ ইঞ্চি। এ শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহের আমলে মসনদ-ই-আলী তাজ খান ৯৬৭ হিঃ/ ১৫৫৯-৬০ খ্রিঃ তারিখে এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। অধ্যাপক শরফুদ্দীন এ শিলালিপিটি একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ থেকে উদ্ধার করেন যদিও আ. ক. ম. যাকারিয়া এবং সামসুদ্দীন আহমদ মনে করেন যে, পার্শ্ববর্তী মান্দা মসজিদের ধ্বংসস্তূপ থেকে এ শিলালিপি উদ্ধার করে কুমারপুর মসজিদে আনা হয়।

বৃহত্তর রাজশাহী

২৫। বাগধানী মসজিদ, ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দ

বৃহত্তর রাজশাহীর পবা উপজেলায় বাগধানী গ্রামে একটি মসজিদ রয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এম. এ. বারী এশিয়েটিক সোসাইটি জার্নালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের কয়েকটি অজ্ঞাত মসজিদের উল্লেখ করেন। এর মধ্যে বাগধানী মসজিদটি অন্যতম। তাঁর ভাষায়, "বাগধানী প্রাচীন কীর্তি সম্বলিত একটি জনপদ ছিল। এ সমস্ত পুরাকীর্তির মধ্যে ভগ্নপ্রাপ্ত বাসগৃহ, তিনগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ উল্লেখযোগ্য। বারনাই নদীর ডান তীরে এ মসজিদটি নির্মিত হয়। ইটের তৈরি এ ইমারতটি ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি উঁচু বেদীর উপর নির্মিত। পরিমাপে এটি উত্তর-দক্ষিণ ১০২ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩৫ ফুট। পূর্ব দিক থেকে একটি খিলানপথ দিয়ে এ মসজিদে প্রবেশ করতে হয়। প্রবেশপথের উভয় পাশে দু'টি কক্ষ দেখা যাবে। বর্তমানে এটি ছাদবিহীন।

ভূমি-পরিলকল্পনা দেখে মনে হয় যে, মসজিদটি আয়তাকার, এর চার কোনায় চারটি অষ্টভুজাকৃতি কৌণিক বুরুজ রয়েছে। আয়তনে মসজিদটি ৬১ ফুট ৬ ইঞ্চি × ২৪ ফুট ৬ ইঞ্চি বাইরের দিকে এবং ৫১ ফুট ৬ ইঞ্চি × ১৫ ফুট ৬ ইঞ্চি ভিতরের দিকে। মসজিদটিতে প্রবেশ করতে হলে পূর্বদিকে তিন খিলানবিশিষ্ট পথ নির্মিত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ প্রাচীরে একটি করে জানালা রয়েছে। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অর্ধ-গোলাকৃতি মিহরাব রয়েছে। পশ্চিমদিকের প্রাচীরের বাইরে একটি projection দেখা যাবে। এম. এ. বারী যথার্থই বলেন যে, মুঘলরীতিতে সরু টারেট ব্যবহৃত হয়েছে প্রবেশপথের উভয় পাশে।

বাগধানী মসজিদের অভ্যন্তর আয়তাকারবিশিষ্ট যা তিনটি সমান চতুষ্কোণে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি ১৫ ফুট ৬ ইঞ্চি পরিমাপের। দুটি সমান্তরাল খিলান দিয়ে বিভক্ত করা হয়েছে এবং খিলানগুলো চারকেন্দ্রীয় কৌণিক ধরনের। মসজিদটি তিনটি বাল্বের আকৃতিতে (bulbous) নির্মিত গম্বুজ দ্বারা আবৃত। পানদানতিফের (Pendentive)

সাহায্যে গম্বুজ নির্মিত হয়। গম্বুজগুলো কলসাকৃতির চূড়া দ্বারা অলঙ্কৃত। গম্বুজ ড্রাম থেকে উঠে গেছে এবং ড্রাম লতাপাতার নকশা দ্বারা শোভিত। খিলানগুলো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কারণ এগুলোত খাঁজ আছে।

বাগধানী মসজিদে ফারসি ভাষায় উৎকীর্ণ যে শিলালিপি আছে তা পাঠোদ্ধারে জানা যায় যে, এটি হিজরী ১২০৬/ ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। প্রধান প্রবেশপথের উপরে এটি প্রোথিত। শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে এ মসজিদটি মুন্সী ইনায়েতউল্লাহ্ ফায়াদ কর্তৃক নির্মিত হয়। নকশায় দোচালা ধরনের অলঙ্করণ ব্যবহৃত হয়েছে। বারীর মতে, এ ধরনের নকশা মুর্শিদাবাদের আলিবর্দি খানের মসজিদ (১৭৮০ খ্রিঃ) এবং বদরুন্নেসা বেগমের মসজিদে (১৮৪০) দেখা যাবে।

২৬। চুনিয়াপাড়া, মোহনপুর উপজেলা, মসজিদ, অষ্টাদশ/উনবিংশ শতাব্দী

মোহনপুর উপজেলার চুনিয়াপাড়া গ্রামে একটি সুন্দর মসজিদ দেখা যাবে। অষ্টাদশ/উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত এই মসজিদটি রাজশাহীর কুসুম্বার নিকটবর্তী একটি পুকুরের পাড়ে অবস্থিত। যদিও আধুনিককালে এটি সংস্কার করা হয় তবুও স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যে এ মসজিদটি সমুজ্জ্বল। এটি এক গম্বুজবিশিষ্ট চতুষ্কোণাকার মসজিদ যার প্রতি বাহুর পরিমাপ ৭ ফুট ১০ ইঞ্চি। দেওয়ালটি খুব পুরু, ১ ফুট ৬ ইঞ্চি। মসজিদের চার কোনায় বুরুজ রয়েছে, যা কলসাকৃতি। ভিত থেকে উপরে উঠে গেছে। কৌণিক বুরুজগুলো ছাদ অতিক্রম করে কিয়স্কে শেষ হয়েছে। চূড়াও কলসাকৃতি।

মসজিদে প্রবেশের জন্য পূর্বদিকে একটি খিলানপথ রয়েছে। পূর্ব-উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে জানালা দেখা যাবে। দেওয়ালে দোচালা ধরনের নকশা ইমারতের শোভা বৃদ্ধি করেছে। মসজিদটি একটি বাল্ব ধরনের গম্বুজ দ্বারা আবৃত। গম্বুজটি কলসচূড়া দ্বারা অলঙ্কৃত। পানদানতিফের সাহায্যে গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। সমসাময়িক মসজিদসমূহের সাথে তুলনা করলে প্রতীয়মান হবে যে, চুনিয়াপাড়া মসজিদটি অষ্টাদশ/উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল।

২৭। অচিনঘাট, বাগমারা থানা, মসজিদ (অধুনালুপ্ত)

বাগমারা থানাধীন অচিনঘাটে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ করা যায়। কাজী মেছের তাঁর 'রাজশাহীর ইতিহাসে' এ মসজিদের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি এটিকে সুলতানী আমলের ইমারত বলে অভিহিত করেছেন। এটি পাঁচ গম্বুজবিশিষ্ট একসারি আয়তাকার নকশার উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়। মসজিদে প্রবেশের জন্য পূর্ব দিকে পাঁচটি খিলানপথ রয়েছে। এ ছাড়া উত্তর ও দক্ষিণে একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। কিবলাপ্রাচীরে পাঁচটি অবতল মিহরাব দেখা যাবে। ধ্বংসপ্রাপ্ত অচিনঘাটের এই মসজিদটি সংস্কার করে নামাজ পড়ার উপযোগী করা হয়েছে।

কাজী মেছের এর সন্নিকটে এক গম্বুজবিশিষ্ট মুঘল আমলের একটি মসজিদের উল্লেখ করেন।

শ্রীহট্ট

২৩° ৫৯′ দক্ষিণ এবং ২৫° ১৩′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৫৪ পশ্চিম এবং ৮৫° ২৯′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ শ্রীহট্ট জেলা বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত। এই জেলার উত্তরে আসাম এবং জয়ন্তিয়া পাহাড়, পূর্বে আসাম, দক্ষিণ-পূর্ব দক্ষিণে ত্রিপুরাও এবং কুমিল্লা এবং পশ্চিমদিকে ময়মনসিংহ জেলা। সুরমা নদীর তীরে অতি মনোরম পরিবেশে শ্রীহট্ট শহর অবস্থিত। এই শহরের আদি নাম ছিল শ্রী-হাট্টা যা শ্রী-হাট থেকে উৎপন্ন। বর্তমান শ্রীহট্ট শহরে একসময় বিরাট হাট বসত এবং সম্ভবত এ থেকেই শ্রীহট্ট কথাটির উৎপত্তি। মুসলিম আমলে এ জেলা বা শহরের নাম ছিল শেরহেদ অর্থাৎ সীমান্ত অঞ্চল। অন্যকথায় frontier post অথবা pillar. মুসলিম শাসনামলে মোটামুটিভাবে শ্রীহট্টকেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শেষ সীমানা বলে মনে করা হত, যদিও বহুবার মুসলিম শাসকবর্গ আসাম, কামরূপ, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে বিজয়াভিয়ান করেন।

জনৈক লেখক বলেন, "শ্রীহট্ট জেলার ইতিহাস সম্বন্ধে খুব কমই জানা যায় কিন্তু ধারণা করা যায় যে অন্যান্য দেশের মতো সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে এ অঞ্চল বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কোনো এক সময় শ্রীহট্ট ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলিম যুগে শ্রীহট্ট বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ এই শহরের সাথে শ্রীহট্টের সাধক পুরুষ পীর-আওলিয়া শাহ জালালের নাম জড়িত রয়েছে। শাহ জালালের সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রখ্যাত মুসলিম পর্যটক ইবন বতুতা ১৩৪৫-৪৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীহট্ট আগমন করেন। ইবন বতুতা বলেন, "সাতগাঁও (হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত) থেকে আমি কামরূপের উদ্দেশে রওয়ানা হই। আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর প্রিয় আওলিয়া শেখ জালালউদ্দীন তাব্রিজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ ধার্মিক এবং ধর্মপ্রচারক (pillar of faith) এবং তাঁর অলৌকিক ঘটনাবলী সর্বজনবিদিত। তার বয়স ১৫০ বছর। তিনি আমাকে বলেন যে, ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে খলিফা মুসতানসির বিল্লাহ যখন বাগদাদে নিহত হন তখন তিনি সেখানে ছিলেন। (এটি একটি অলৌকিক ঘটনা)। তিনি গত চল্লিশ বছর রোজা রাখছেন এবং প্রতি দশ দিন পর পর রোজা

ভেঙেছেন। তাঁর কিল্লার দুই বাড়ির পিছন থেকে চারজন দরবেশ আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তাঁরা আমাকে বলেন যে, শাহ্ জালাল তাঁদের বলেছে যে পশ্চিম দেশ থেকে একজন পর্যটক আসবেন তাঁর সাথে দেখা করতে এবং তিনি যে সমস্ত উপহার এনেছেন তাঁদের দিয়েছেন। তিনি তাঁর খানকার সামনে একটি গুহায় বাস করতেন এবং এর আশেপাশে কোনো বসতি নেই। তাঁর কাছে অনেক লোক ধর্মান্তরিত হয়। আমি যখন তাঁর সামনে আসলাম তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি আমার ভ্রমণ সম্পর্কে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি দীর্ঘ এবং শীর্ণকায় ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর গাল বসা ছিল। তিনি আমার আরাম-আয়েশের জন্য তার মুরিদদের নির্দেশ দিলেন, বিশেষ করে এজন্য যে আমি আরব ও আযমের দেশ থেকে এসেছি।"

আবদুল করিম যথার্থই বলেন যে, শ্রীহট্টের শাহ্ জালালের সঙ্গে শেখ জালালউদ্দীন তাব্রিজী, যাঁর সমাধি হযরত পাণ্ডুয়ায় এবং চিল্লাখানা পশ্চিম দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে বা দেবীকোটে অবস্থিত কোনো প্রভেদ করা হয়নি। তাব্রিজের মখদুম শেখ জালালউদ্দীন তাব্রিজীর পারস্যের তাব্রিজ শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং উক্ত শহরের সাধকপুরুষ শেখ আবু সাঈদের শিষ্য ছিলেন। তাঁর ওস্তাদের মৃত্যুর পর তিনি শেখ শিহাবুদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর অনুসারী হিসাবে ওস্তাদের বক্তব্য পালন করেন, যা আর কোনো পীর করেননি। এখানে করীম কোন শেখের সাথে ইবন বতুতা সাক্ষাৎ করেন তা বলেননি। শেখ জালাল তাব্রিজী ভারতবর্ষে আসেননি এবং তিনি ১২২৫ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ইবন বতুতার বাংলাদেশ আগমনের একশত বছরেরও (১৩৪৫-৪৬) বহু পূর্বে ইন্তেকাল করেন।

সুতরাং ইবন বতুতা যে শেখ জালালউদ্দীন তাব্রিজীর কথা উল্লেখ করেন তিনি হযরত পাণ্ডুয়ার শেখ জালালউদ্দীন তাব্রিজী নন, শ্রীহট্টের শেখ বা শাহ্ জালাল। হযরত পাণ্ডুয়ার মাখদুম শেখ জালাল উদ্দীন তাব্রিজীর মৃত্যু প্রসঙ্গে আবিদ আলী খান বলেন যে, তিনি হিজরী ৭৩৮/১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। আবিদ আলী খানের সাথে আবদুল করীম প্রদত্ত মৃত্যুর তারিখের গড়মিল রয়েছে। যেহেতু ইবন বতুতা হযরত পাণ্ডুয়ায় আসেননি, শ্রীহট্টে ভ্রমণে যান সেহেতু মনে করা স্বাভাবিক যে পর্যটক শ্রীহট্টের শাহ্ জালালের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইবন বতুতা শেখ জালালউদ্দীন তাব্রিজীর উল্লেখ করায় মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। 'তাব্রিজী' একটি কুনিয়া বা ডাকনাম এবং এর উৎপত্তি হচ্ছে তুরস্কের কুনিয়া থেকে, যদি এ তথ্য সঠিক বলে ধার নেওয়া যায় তা হলে তিনি তুরস্ক থেকে আগমন করেন। অন্য দিকে পারস্যের অন্যতম সমৃদ্ধ নগরী হচ্ছে তাব্রিজ। সেক্ষেত্রে শাহ্ জালাল পারস্য দেশ থেকে বাংলাদেশে আসেন। যত মত-পার্থক্যই থাক না কেন (সর্বজনীন) ঐতিহাসিক মতবাদ হচ্ছে যে তিনি আরবদেশ, সম্ভবত ইয়েমেন থেকে ধর্মপ্রচারের নিমিত্ত বাগদাদ ও দিল্লি হয়ে এদেশে আসেন।

শাহ্ জালাল প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান তালিব তাঁর 'বাংলাদেশে ইসলাম' গ্রন্থে বলেন, "তিনি (শাহ্ জালাল) কুনিয়ার অধিবাসী ছিলেন। কুনিয়া তুরস্কের অধীনস্থ এশিয়া মাইনরে অবস্থিত ছিল। গওস মান্দুরী তার 'গুলজার-ই-আবরার' গ্রন্থে শাহ্ জালাল

সম্পর্কে যে বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন তাও এ বিবরণের সমর্থন করে। গওশ মান্দুরী শায়খ আলী শেরের 'শাহ-ই-নুজহাতুল আরওয়াহ' নামক গ্রন্থে ভূমিকা অবলম্বনে শাহ জালাল সম্পর্কে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেছেন। শায়খ আলী শের নিজেকে হযরত শাহ জালালের সাথী ও শিষ্য শায়খ নুরুল হুদা আবুল কেরামতের বংশধর বলে দাবি করেন। তিনি ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে বা তার কিছুকাল পরে ইন্তেকাল করেন। 'শাহ-ই-নুজহাতুল আরওয়াহ' ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে রচিত বলে ধরে নেয়া যায়। কিন্তু গ্রন্থটির কোনো অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। গওস মান্দুরী ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ হযরত শাহ জালালের ইন্তেকালের পৌনে তিন শত বছর পর তাঁর গ্রন্থটি রচনা করেন। তাঁর বর্ণনামতে, শাহ জালাল তুর্কীস্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি সৈয়দ আহমদ ইয়াসভীর খলিফা ছিলেন। এখানে আমরা শাহ জালালের জন্মস্থানের যে পরিচয় পাই তা তৃতীয় শিলালিপির (৮১১ হিঃ/১৫০৫ ইং) বর্ণনার সাথে অনেকাংশে মিলে যায়। কারণ শিলালিপিতে উল্লেখিত কুনিয়া এশিয়া মাইনরে অবস্থিত। তৃতীয় শিলালিপি প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) দুটি শিলালিপি শাহ জালালের মাজারে পাওয়া গেছে। একটিতে শায়খ জালাল মুজাররাদ ইবন মুহাম্মদ নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু সেখানে তাঁর জন্মস্থান প্রসঙ্গে কিছু বলা হয়নি। দ্বিতীয় শিলালিপিটি হিজরী ৯১১/ ইংরেজি ১৫০৫ সনে উৎকীর্ণ করা হয়। জেম্‌স্ ওয়াইজ কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং ব্লকম্যান কর্তৃক পঠিত এই শিলালিপি প্রসঙ্গে সামসুদ্দীন আহমদ বলেন যে, চিরকুমার শাহ জালাল কুনিয়াবাসী এবং শ্রীহট্টের সাধকপুরুষ শাহ জালালের সম্মানে দারুল এহসান মাদ্রাসা নির্মিত হয় এবং নির্মাতা ছিলেন খালিস খান। এই শিলালিপিতে শাহ জালাল সম্বন্ধে বলা হয়েছে উচ্চতম মর্যাদাসম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠতম আবেদ শায়খ শাহজালাল মুজাররাদ কুনয়ায়ী, মুজাররাদ অর্থ চিরকুমার। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, হোসেন শাহের বহু পূর্বে শাহ জালাল সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের (১৩০১-১৩২২ খ্রিঃ) আমলে শ্রীহট্ট জয় করেন।

'গুলজার-ই-আবরার' ব্যতীত সাধকপুরুষ শাহ জালাল প্রসঙ্গে 'সুহাইল-ই-ইয়ামন' গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। ফার্সি ভাষায় লিখিত এই জীবনীগ্রন্থে তাকে ইয়েমনবাসী বলা হয়েছে। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীহট্টের মুনসেফ নাসীরুদ্দীন হায়দার এই গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি 'রিসালা' ও 'রিওযাতুস সালাতীন' নামে দুটি পুস্তিকার সাহায্যে "সুহাইল-ই-ইয়ামন" রচনা করেন। 'রিসালা' ও 'রওযাতুস সালাতীন' পুস্তক দুটি যথাক্রমে ১৭১১ ও ১৭২১ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়। 'সুহাইল-ই-ইয়ামন' প্রসঙ্গে আবদুল করিম বলেন, এ বইটি প্রধানত স্থানীয় জনশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর লেখক পূর্ববর্তী দু'খানা পুস্তিকার বরাত দিয়ে বলেছেন যে, সেখান থেকেই তিনি এই বইয়ের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। ঘটনা বিবরণীর দিক দিয়ে কল্পনাভিত্তিক হলেও অন্যান্য সমসাময়িক দলিল থেকে সুহাইল ইয়ামনের কোনো কোনো ঘটনার বিবরণের সমর্থন পাওয়া যায়। কাজেই একেবারে গালগল্প বলে বইটিকে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, শাহ জালাল বাংলার সুলতান ফিরোজ শাহের (১৩০১-১৩০৩ খ্রিঃ) আমলে বাংলাদেশে আগমন করেন এবং ১৩৪৫-৪৬ খ্রিস্টাব্দে

প্রখ্যাত মুসলিম পর্যটক ইবন বতুতার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। 'গুলজার-ই-আবরাব' এবং 'সুহাইল-ই-ইয়ামন' গ্রন্থ দুটিতে শাহ জালালের শ্রীহট্টের হিন্দু রাজা গৌর-গেবিন্দের সাথে সংঘর্ষের উল্লেখ আছে। 'গুলজার-ই-আরবার'-এর তথ্যানুযায়ী শাহ জালাল তাঁর খলিফা সুলতান সৈয়দ আহমদ ইয়াসেভীর নির্দেশে ৭০০ জন অনুচর ও শিষ্যসহ বাংলায় ধর্মপ্রচার করতে আসেন। বাংলায় আগমন করে তাঁরা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। শাহ জালাল তাঁর ৩১৩ জন বিশ্বস্ত শিষ্য নিয়ে শ্রীহট্টে আগমন করেন। এখানে স্থানীয় রাজা গৌরগোবিন্দের সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, শায়খ বোরহানউদ্দীন নামে একজন ধার্মিক মুসলমান শ্রীহট্টে বাস করতেন। তাঁর পুত্রসন্তানের জন্ম উপলক্ষে তিনি একটি গরু কোরবানি দেন। একথা জানতে পেরে রাজা গৌরগোবিন্দ গোহত্যার শাস্তিস্বরূপ শায়খ বোরহানউদ্দীনের ডান হাত কর্তন এবং নবজাত সন্তানটিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। রাজার আদেশ কার্যকর হবার পর বোরহানউদ্দীন বাংলার তদানীন্তন শাসক সুলতান ফিরোজ শাহের নিকট ফরিয়াদ করেন। ফিরোজ শাহ তাঁর ভাগ্নের নেতৃত্বে একটি বাহিনী পাঠান কিন্তু যুদ্ধে তিনি পরাজয় বরণ করেন। অতঃপর শাহ জালাল ৩১৩, মতান্তরে ৩৬০ জন শিষ্য নিয়ে শ্রীহট্টের রাজা গৌরগোবিন্দের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। গৌরগোবিন্দের এক লক্ষ পদাতিক এবং কয়েক হাজার অশ্বারোহী বাহিনী ছিল। এতদসত্ত্বেও শাহ জালাল গৌর-গোবিন্দের বাহিনীকে বিধ্বস্ত করেন এবং হিন্দু রাজা রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যান। সুলতান শামসুদ্দীনের আমলে উৎকীর্ণ হিজরী ৭০৩/ ইংরেজি ১৩০৩ সনের একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, উক্ত বছরে মুসলমানগণ শ্রীহট্ট জয় করে। শিলালিপিতে সেনাপতি হিসাবে সিকান্দার খান গাজীর উল্লেখ আছে। এই শিলালিপিতে বলা হয়েছে যে, এটি ৯১৮ হিজরী অর্থাৎ ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ করা হয় সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে। যাহোক, শ্রীহট্ট বিজয়ের প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সিকান্দর খান শাহ জালালের শিষ্য ছিলেন।

আব্দুল মান্নান তালিব বলেন, "শায়খুল মাশয়েখ মখদুম শায়খ জালাল" মুজাররাদ ইবনে মুহাম্মদের অনুকম্পায় শ্রীহট্ট শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলামের প্রথম বিজয় সম্পন্ন হয় সেকান্দার খান গাজীর হাতে এবং সুলতান ফিরোজ শাহ দেহলবীর শাসনামলে ৭০৩ হিজরী সনে (১৩০৩ খ্রিঃ)। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, শিলালিপিতে দেহলবীর উল্লেখ থাকলেও সন-তারিখে সামঞ্জস্য নেই, কারণ দিল্লির তুঘলক সুলতান ফিরোজ শাহ ১৩৫১ থেকে ১৩৮৮ সন পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু আলোচিত শিলালিপিতে ১৩০৩ সনের উল্লেখ আছে। সুতরাং একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, বাংলার সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ ১৩০১ থেকে ১৩২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। সুতরাং ফিরোজ শাহ যে দিল্লির সুলতান না হয়ে বাংলার সুলতান ছিলেন তা ঐতিহাসিক তথ্য থেকে প্রমাণিত হয়। তা ছাড়া ফকরুদ্দীন মোবারক শাহ যখন সোনারগাঁয়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিলেন তখন ১৩৪৫-৪৬ খ্রিস্টাব্দে ইবনে বতুতা বাংলায় আগমন করে শ্রীহট্টে গিয়ে শাহ জালালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

শ্রীহট্টের মুসলিম আধিপত্য বিস্তার সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য হচ্ছে যে সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে আসাম তথা শ্রীহট্টে মুসলিম অভিযান প্রেরিত হয়।

মুসলিমবাহিনী ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু রাজন্যবর্গ রূপনারায়ণ, মাল কুনওয়ার, গোসাল খেন এবং সাবমিল নারায়ণকে পরাজিত করেন। বিশেষ করে কামরূপ হোসেন শাহ কর্তৃক বিজিত হয়।

মুসলিম স্থাপত্যকীর্তির দিক থেকে শ্রীহট্টে অন্যান্য জেলা অপেক্ষা সমৃদ্ধ নয়। অবশ্য সমগ্র জেলায় অসংখ্য মুসলিম স্থাপত্যিক নিদর্শন দেখা যাবে। এ জেলার প্রধান প্রত্নতাত্ত্বিক আকর্ষণ হচ্ছে শ্রীহট্টের শাহজালালের সমাধি ও মাজার।

(১) দরগা কমপ্লেক্স (৭৯)

ফিসার বলেন, "শ্রীহট্টের ধর্মীয় প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে প্রখ্যাত সাধক শাহ জালালের দরগা কমপ্লেক্স। এটি কাচারি থেকে এক মাইল উত্তরে অবস্থিত। প্রায় তিনশত থেকে চারশত গজ দূরে, সুউচ্চ টিলার উপর যার অভ্যন্তরে প্রাক-মুসলিম যুগের প্রত্নকীর্তি থাকতে পারে। দরজাটিতে উঠতে গেলে অনেকগুলো সিঁড়ি পার হতে হয় এবং এরপর একটি খোলা বিশাল চত্বরে আসা যায়। সম্মুখে একটি কেন্দ্রীয় হল রয়েছে যার মধ্য দিয়ে মাজারে প্রবেশ করা যায়।" পূর্বে এখানে একটি সুউচ্চ ও অনিন্দ্যসুন্দর ফটক ছিল, যার মধ্য দিয়ে দরগা ও সংলগ্ন মসজিদে প্রবেশ করতে হত। তিন গম্বুজবিশিষ্ট একটি মুঘল মসজিদের সম্মুখে দরগা কমপ্লেক্সের প্রধান আকর্ষন সুফীসাধক শাহ জালালের মাজার। এই মাজারটি প্লিন্থ বা সমভূমি থেকে অনেক উঁচুতে নির্মিত এবং কয়েকটি স্তরে ইট এবং মার্বেলে তৈরি। শবাধারের উত্তরে একটি চিরাগদান রয়েছে; এখানে বাতি রাখা হয়। দরগাটি একটি ইটের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং পশ্চিমদিকে একটি দরজা দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। মাজারের চার কোনায় চারটি উঁচু স্তম্ভ রয়েছে। জনশ্রুতি অনুযায়ী শাহজালালের মাজারের পূর্বদিকে ইয়েমেনের একজন যুবরাজ এবং পশ্চিমদিকে মুকাবিল খানের সমাধি রয়েছে। একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী মুকাবিল খান ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীহট্টের উজির বা গভর্নর ছিলেন।

আহমদ হাসান দানী বলেন, "দরগায় যে কয়েকটি শিলালিপি পাওয়া গেছে তাতে প্রমাণিত হয় যে এখানে কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমাজার ইমারতটি কোনোক্রমেই সপ্তদশ শতাব্দীর চেয়ে পুরাতন নয়।"

জেমস্ ওয়াইজ বলেন যে, শাহজালালের সমাধিতে কমপক্ষে চারটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন শিলালিপিটি সুলতান ইউসুফ শাহের শাসনামলে (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রিঃ) মজলিস উজাল কর্তৃক একটি মসজিদ নির্মাণের উল্লেখ রয়েছে। এই শিলালিপিটি ৪′ × ১$\frac{১}{৮}$ পরিমাপের। এতে প্রতীয়মান হয় যে এই বিশাল শিলালিপিটি একটি সুর্বহৎ মসজিদের ছিল। এই শিলালিপি চৌকি দিঘি মসজিদে প্রোথিত ছিল। চৌকি দিঘিতে শাহ জালাল বর্তমান স্থানে আস্থা না স্থাপন করার পূর্বে বসবাস করতেন। উল্লিখিত মসজিদটি ভগ্নাবস্থায় ছিল এবং তখনকার ফৌজদার ইস্কেন্দিয়ার খান ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে এটি ভেঙে ফেলেন। দরগা-মসজিদ কমপ্লেক্সের বর্তমান বেষ্টনীপ্রাচীর শ্রীহট্টের ফৌজদার লুতফুল্লাহ সিরাজী (১৬৬০-১৬৬৩ খ্রিঃ)

নির্মাণ করেন। দরগার পাশে এবং দিঘির পূর্বপাড়ে বর্তমাজার মসজিদটি নির্মিত হয় এটি ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে ফৌজদার আবদুল্লাহ্ সিরাজী নির্মাণ করেন।

হযরত শাহ জালালের সুনাম ও প্রভাব এরূপ ছিল যে যুগ যুগ ধরে শ্রীহট্টের মুসলিম শাসকবৃন্দ ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় দরগা কমপ্লেক্সে নূতন নূতন ইমারত নির্মাণ করেন। অবশ্য বর্তমানে এগুলোর কোনো চিহ্ন নেই। সৈয়দ মুর্তজা আলী দরগায় প্রাপ্ত যে শিললিপিটির উল্লেখ করেন তা হিজরী ১০৯১/ ইং ১৬৯৮ সনে নির্মিত ফৌজদার সাদেক খানের সমাধিতে পাওয়া যায়। সাদেক খান ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। হিজরী ১০৬৩/ ইং ১৬৫৩ সনে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে পাঁচ পীর মোকাম নামক স্থানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। মতান্তরে এই মসজিদটি হিজরী ১০৭৪/ ইং ১৬৬৪ খান সৈয়দ জালাল নামে এক ব্যক্তি সম্ভবত মুরীদ তৈরি করেন। হিজরী ১০৭৭/ইংরেজি ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ অপব একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ফৌজদার মীর আলীর সমাধি উক্ত বছরে নির্মিত হয়। ৪ ফুট × ১ ফুট পরিমাপের একটি বিশাল শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, সুলতান হোসেন শাহের আমলে এটি উৎকীর্ণ হয়। এই শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, মোয়াজেমাবাদের সেনাধ্যক্ষ এবং উজির খালিস খান শাহ্ জালাল কর্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে হিজরী ৯১১/ইংরেজি ১৫০৫ অব্দে একটি ইমারত নির্মাণ করেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, চৌকি দিঘি মহল্লায় যে মসজিদটি নির্মিত হয় তা হোসেন শাহী আমলের। বর্তমানে এটি অবলুপ্ত। শিলালিপিটি ভেঙে গেছে এবং কেবলমাত্র সুলতানের নাম পড়া যায়। এ ছাড়া নির্মাতার নাম সার-ই-লস্কার অর্থাৎ সেনাধ্যক্ষ খালিস খান।

২। সর্বপ্রাচীন মসজিদ, ১৪৭৪ -১৪৮১ খ্রিস্টাব্দ

শাহ্ জালালের দরগায় সর্বপ্রাচীন মসজিদ নির্মিত হয় সুলতান ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে। জেমস্ ওয়াইজ যে শিলালিপিটি উদ্ধার করেন তা হেনরি ব্লকম্যান পাঠোদ্ধার করেন। এটিতে সুলতান ইউসুফ শাহের নাম উল্লেখ থাকলেও তারিখের উৎকীর্ণ অংশটি ভেঙে গেছে। তবে মসজিদ নির্মাণের উল্লেখ আছে। জেমস্ ওয়াইজ বলেন যে, দরগায় প্রাপ্ত চারটি শিলালিপির মধ্যে ইউসুফ শাহের শিলালিপিই মসজিদ-সংক্রান্ত। এই শিলালিপিটি সুন্দরভাবে আরবি হরফে তুঘরারীতিতে উৎকীর্ণ হয়েছে। কিন্তু শিলালিপি দেওয়ালের গাঁথুনির সঙ্গে এক-তৃতীয়াংশ গেঁথে গেছে এবং এটি দরজার লিনটেল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, সুলতান ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রিঃ) মজলিস-আল-আজম আল-মুয়াজ্জম দস্তুর কর্তৃক এই মসজিদ নির্মিত হয়েছে। দস্তুর শব্দের অর্থ উজির এবং নির্মাতা অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। এই প্রাচীন মসজিদটি বহুবার সংস্কার করা হয় যার ফলে এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো বহু পূর্বেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। তবে ভূমি-নকশা দেখে ধারণা করা যায় যে, এটি এক গম্বুজবিশিষ্ট চতুষ্কোণাকার মসজিদ। তিনটি খিলানপথ দিয়ে এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতলাকৃতি মিহরাব রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণদিকের দেওয়ালে জালি দিয়ে ঘেরা জানালা দেখা যায়।

৩। দরগাহ মসজিদ, ১৭৪৪ খ্রিঃ

বর্তমান দরগাসংলগ্ন যে মসজিদটি রয়েছে তা আয়তাকার তিনগম্বুজবিশিষ্ট। দরগার বামে অবস্থিত এই ধর্মীয় ইমারতটি ইট এবং প্লাস্টার দিয়ে নির্মিত এবং এটি হিজরী ১১৫৭/ ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে ফৌজদার বাহরাম খান নির্মাণ করেন। এই ইমারতের চার কোনায় চারটি টাওয়ার বা বুরুজ রয়েছে। ছাদ প্যারাপেট দ্বারা অলঙ্কৃত। সুউচ্চ গম্বুজ তিনটি ড্রামের ওপরে অবস্থিত এবং মধ্যবর্তী গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত বড়। চূড়া কলসাকৃতির। পূর্বদিকে তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে।

এই মসজিদের পূর্বদিকে আধুনিককালে একটি বারান্দা নির্মিত হয়েছে। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে মুঘল আমলের এই মসজিদটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে শ্রীহট্টের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জন ওয়ালিস এই মসজিদটির সংস্কার করেন।

৪। বড় গম্বুজ, ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দ

দরগা মসজিদের পরের যে মসজিদটি বিশেষভাবে স্থাপত্যিক সৌকর্যে আকর্ষণীয় তা হচ্ছে বড় গম্বুজ। তিনগম্বুজ মসজিদের উত্তরে অবস্থিত এই ইমারতটি চতুষ্কোণাকার এবং একটিমাত্র গম্বুজ দ্বারা আবৃত। হিজরী ১০৮৮/১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে বড় গম্বুজ ফৌজদার ফরহাদ খান কর্তৃক নির্মিত হয়। আহমদ হাসান দানী এই ইমারতটির বিস্তারিত বিবরণ দেন। তিনি বলেন, "এই ইমারতটির প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা কঠিন। অবশ্য যদিনা এটি সমাধি হয়। চার কোনায় অষ্টভুজাকৃতি বুরুজ দ্বারা সুগঠিত এক গম্বুজবিশিষ্ট এই ইমারতটি খুবই আকর্ষণীয়। কৌণিক বুরুজগুলো উল্টা করে বসানো ভাণ্ড (inverted jar) এর ওপর রয়েছে এবং বুরুজে সমান্তরাল ব্যান্ড দ্বারা অলঙ্কৃত। কিন্তু যেহেতু উপরের দিকে ভেঙে যাওয়ায় এই বুরুজগুলোকে বিসদৃশ মনে হয়। পূর্বদিকে তিনটি প্রবেশদ্বার রয়েছে এবং মধ্যবর্তী প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত বড়। প্রত্যেকটি দরজা উপরে খাঁজকাটা নকশা দেখা যাবে। মধ্যবর্তী প্রবেশপথটি লিনটন পদ্ধতিতে নির্মিত (flat arched) দরজাগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে কুলুঙ্গি রয়েছে। মধ্যবর্তী দরজার উপরে একটি শিলালিপি দেখা যাবে। এতে মুঘলরীতির প্রতিফলন দেখা যাবে প্যারাপেটে এবং এই প্যারাপেট মার্লন দ্বারা শোভিত। গম্বুজটি একটি ড্রামের উপর স্থাপিত এবং এই ড্রামটির চারপাশে অলঙ্করণ রয়েছে। অভ্যন্তরে মিহরাব দেখা যায় না এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকে কোনো প্রবেশপথ নেই।

৫। একটি ক্ষুদ্রাকৃতি মুঘল মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দী

বড় গম্বুজের ডানপাশে তিন গম্বুজবিশিষ্ট একটি মুঘল আমলের মসজিদ দেখা যাবে। এটি মিস্টার ওয়ালিস সংস্কার করেন। আহমদ দানী বলেন, "এই মসজিদটি দরগা-মসজিদ কমপ্লেক্সের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এই মসজিদটিতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত মিহরাব রয়েছে এবং পূর্বদিকে তিনটি প্রবেশপথ দেখা যাবে।"

৬। চিল্লাখানা

হযরত শাহ জালালের চিল্লাখানা খুবই আকর্ষণীয় ছিল। এখানে সাধকপুরুষ শাহ জালাল আরাধনা করতেন। এই স্থানে তাঁর মুরীদদের কবর দেখা যাবে।

৭। লঙ্গরখানা

দরগা-মসজিদ কমপ্লেক্সের অন্যতম আকর্ষণ একটি বিশাল জলাশয়। এটি ওজুর জন্য ব্যবহৃত হয়। এই জলাশয়ের পাশে এবং চত্বরের উত্তর দিকে লঙ্গরখানা ছিল। এখানে দুঃস্থ ব্যক্তিদের জন্য খাবার পরিবেশন করা হত। এখনও এখান থেকে গরিব-দুঃখীদের আহার দেওয়া হয়। এখানে দু'টি তামার বিশালাকার হাঁড়ি (couldron) রয়েছে। এতে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, শাহ্ জালালের একজন কামেল মুরীদ শেখ আবু সাঈদ এটি ঢাকা থেকে ক্রয় করে শ্রীহট্টে পাঠান। আবু সাঈদ মুহাম্মদ জাফরের পুত্র এবং ইয়ার মুহাম্মদের পৌত্র ছিলেন। এতে হিজরী ১১০৬/১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দ উল্লেখ আছে।

৮। নাক্কারখানা (অধুনালুপ্ত)

দরগার পূর্বদিকে এক গম্বুজ দ্বারা আবৃত একটি সুন্দর প্রবেশপথ রয়েছে। এটি মিঃ ওয়ালিস মুঘলরীতির ভিত্তিতে নির্মাণ করেন। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে এই ইমারতটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই ফটকের উপরে নাক্কারখানা ছিল। বর্তমানে এটির কোনো অস্তিত্ব নেই।

৯। চশমা

টিলার ওপরদিকে এবং চত্বরের সন্নিকটে চশমা বা গরম পানির ঝরনা অবস্থিত ছিল। স্থানীয় মুসলমানগণ এই ঝরনার পানিকে খুবই পবিত্র মনে করে। একটি ইটের প্রাচীরবেষ্টিত এই চশমাটি একটি চতুষ্কোণাকার প্লাটফর্মের উপর নির্মিত।

১০। শাহ্ জালালের মুরীদদের সমাধি

শ্রীহট্টের প্রখ্যাত সাধকপুরুষ শাহ্ জালাল ৩১৩ জন মুরীদসহ এ অঞ্চলে আসেন। তাঁরা ইসলামের সেবায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন এবং তাঁদের সমাধি (cenotaph) শাহ্ জালালের সমাধি কমপ্লেক্সে দেখা যাবে।

(১) শাহজাদা আলীর মাজার। শাহজাদা আলী শাহ্ জালালের সঙ্গে ইয়ামেন থেকে বাংলাদেশে আসেন এবং তাঁকে শাহ্ জালালের মাজারের নিকটবর্তী স্থানে সমাহিত করা হয়।

(২) হাজী ইউসুফের মাজার, শাহ্ জালালের মাজারের সন্নিকটে অবস্থিত হাজী ইউসুফের মাজার খুবই আকর্ষণীয়।

(৩) হাজী খলিল এবং হাজী দরিয়া নামে শাহ্ জালালের দু'জন মুরীদের মাজার রয়েছে।

(৪) দরগা কমপ্লেক্সের বাইরেও শাহ্ জালালের শিষ্যদের অনেক কবর দেখা যাবে। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে নিম্নলিখিত সমাধিগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(ক) মানিক পীরের টিলায় সৈয়দ মালিক পীর এবং ছোট পীরের মাজার

(খ) শাহ্ চাটের নিকটবর্তী খাওয়াজা নাসিরুদ্দীনের মাজার

(গ) ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ জালাল কর্তৃক নির্মিত আদিনা মসজিদের সংলগ্ন (অধুনালুপ্ত) মহল্লা খাস দবিরে অবস্থিত খাওয়াজা আদিনার মাজার

(ঘ) দফতরী পাড়ার অবস্থিত মখদুম হাবিবের মাজার
(ঙ) বারুর খানা মহল্লায় অবস্থিত খিজির সুফীর মাজার
(চ) টিলা গড়ে শাহ মদনের মাজার
(ছ) শিবগঞ্জ মহল্লায় শাহ এতিমের মাজার
(জ) ধোপা দিঘির পাড়ে অবস্থিত সৈয়দ উমর আমারকন্দির মাজার
(ঝ) ঈদগাহের নিকট গাজী সাহেবের মাজার
(ঞ) শহীদ মহল্লায় হোসেন শহীদ এবং মুখতার শহীদের মাজার
(ট) কাজীটোলায় জালালউদ্দীনের মাজার
(ঠ) জিন্দাবাজার মহল্লায় জিন্দাপীরের মাজার
(ড) শেখ পাড়ায় অবস্থিত শেখ করম মুহাম্মদের মাজার
(ঢ) শেখ পাড়ায় অবস্থিত দিওয়ান ফতেহ মুহাম্মদের মাজার
(ণ) সওদাগর তোলার লাল সাহেবের মাজার
(ত) গোসাইপাড়া টিলার চশনী পীরের মাজার
(থ) বন্দর বাজারে অবস্থিত শাহ নূরের মাজার
(দ) মিলন দেউড়ীতে অবস্থিত শাহ ফকির রৌশনী চিরাগের মাজার
(ধ) কুশীঘাটে অবস্থিত পীর বোরহানুদ্দীনের মাজার
(ন) জিন্দাবাহার মহল্লায় সৈয়দ জিয়াউদ্দীনের মাজার

দরগা কমপ্লেক্সের বাইরে

১১। আদিনা মসজিদ (অধুনালুপ্ত)

শ্রীহট্টর মধ্যভাগে একটি ছোট টিলার উপর একটি প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এখানে অসংখ্য ভাঙা ইটের টুকরা অবিন্যস্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এ. কে. এম. যাকারিয়া মনে করেন যে এখানে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। স্থানীয়ভাবে এই মসজিদটি আদিনা মসজিদ নামে পরিচিত। উল্লেখ্য যে, মালদা জেলার হযরত পাণ্ডুয়ায় সুলতান সেকেন্দর শাহের নির্মিত যে বিশালাকার মসজিদ রয়েছে তা আদিনা মসজিদ নামে পরিচিত। যাকারিয়া বলেন যে, শ্রীহট্টের আদিনা মসজিদ হযরত পাণ্ডুয়া মসজিদের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। এ মসজিদটি আয়তাকার ছিল এবং সম্ভবত ১৬০টির গম্বুজ দ্বারা আবৃত ছিল। মসজিদের ভগ্ন প্রাচীর এবং কিয়দংশ এখনও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

১২। শ্রীহট্ট শহর, মুঘল মসজিদ

শ্রীহট্ট শহরের মাঝখানে একটি সুন্দর মুঘল আমলের মসজিদ দেখা যাবে। এই মসজিদটি আয়তাকার পরিমাপ ৪৫´ × ২০´। এর দেওয়াল ৫´ চওড়া এবং চার কোনায় বুরুজ দেখা যাবে। পূর্বদিক থেকে এই মসজিদে প্রবেশ করতে হয়। তিনটি খিলানপথ দেখা যাবে পূর্বদিকে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে দরজা রয়েছে। এই মসজিদটি তিনটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি মিহরাব রয়েছে। এটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল।

১৩। সাদীপুর মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দী

শ্রীহট্ট শহরের পার্শ্ববর্তী সাদীপুর নামক মহল্লায় একটি আয়তাকার তিন গম্বুজ-বিশিষ্ট মসজিদ দেখা যাবে। চার কোনায় চারটি বুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলো অষ্টভুজাকৃতি। পূর্বদিক থেকে তিনটি খিলানপথ দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয়। উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে খিলানপথ রয়েছে। মসজিদের চারপাশে একটি বেষ্টনীপ্রাচীর রয়েছে। এটি ৩ $\frac{১}{২}$ ফুট চওড়া, কিবলাপ্রাচীরের তিনটি মিহরাব রয়েছে, কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড়।

১৪। হাটখোলা, আনাইর হাওর মসজিদ, হিঃ ৮০৮/ইং ১৪৬০ (অধুনালুপ্ত)

কে. এন. দিক্ষিত একটি প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতে প্রোথিত একটি শিলালিপির সন্ধান পান। হাটখোলার আনাইর হাওর অঞ্চলে প্রাপ্ত এই শিলালিপি প্রসঙ্গে সামসুদ্দীন আহমদ বলেন, "এই শিলালিপিটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এটি সুলতানী আমলে বাংলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ইসলামের সম্প্রসারণের আলোকপাত করে। উপরন্তু, হিজরী ৮০৮, ইংরেজি ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দের এই শিলালিপিটি শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন এবং এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীহট্টে মুসলিম আধিপত্য বিস্তার লাভ করে।" কিন্তু এটি ভুল তথ্য, কারণ হিজরী ৯১৮/ ইং ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ হোসেন শাহের শাসনামলে একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে সেকেন্দর শাহ গাজী ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে শাহ জালালের নেতৃত্বে শ্রীহট্ট অঞ্চল দখল করে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। সামসুদ্দীন আহমদের (Inscriptions of Bengal p. 76) মন্তব্য যে সুলতান সেকেন্দার শাহের আমলে শ্রীহট্টে মুসলিম আধিপত্য বিস্তৃতি লাভ করে তা সঠিক নয়, কারণ হোসেন শাহের আমলের শিলালিপিটিতে (১৩০৩) যা সুলতান সামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের সময়ে শ্রীহট্টের মুসলিম বিজয় সম্বন্ধে বর্ণিত রয়েছে।

আনাইর হাওর থেকে উদ্ধারকৃত ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দের শিলালিপিতে বলা হয়েছে যে সুলতান বরবক শাহের রাজত্বকালে রাজকীয় হারেমের পরিচালক খান মুয়াজ্জেম খুরশিদ খান কর্তৃক একটি মসজিদ নির্মিত হয়। বর্তমানে এই মসজিদটির কোনো চিহ্ন নেই।

১৫। শাহ্ পরানের দরগা ও মসজিদ, সপ্তদশ শতাব্দী

শ্রীহট্ট শহরের চার মাইল অদূরে জয়ন্তিয়াপুর অঞ্চলে একজন সাধকপুরুষের মাজার রয়েছে। ফিসার 'জার্নাল অব এশিয়েটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৪০'-তে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে বলেন যে, একটি টিলার উপর অবস্থিত এই দরগাটি একজন কামেল ফকিরের। স্থানীয়ভাবে তিনি 'পোতাশাহ' বা শাহ পরান বা বুরহান নামে পরিচিত। চারদিকে প্রাচীরঘেরা এই দরগাটি শাহ পরানের দরগা নামে বহুল পরিচিত। এই মাজারের সম্মুখে একটি চিরাগদান রয়েছে। মাজারের পশ্চিম দিকে তিন গম্বুজবিশিষ্ট একটি মসজিদ দেখা যাবে। আহমদ হাসান দানী মসজিদ প্রসঙ্গে বলেন যে, মসজিদটি আয়তাকার এবং এর চার কোনায় চারটি সুউচ্চ বুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলোর চূড়ায়

কলসাকৃতি ফিনিয়েল দেখা যাবে। পূর্বদিকের প্রাচীরে তিনটি খিলানাকৃতি প্রবেশপথ রয়েছে এবং সম্মুখভাগ প্যানেল দ্বারা অলঙ্কৃত। মধ্যভাগের প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং বহির্ভাগে খাঁজকাটা খিলান দ্বারা অলঙ্কৃত। প্রবেশপথের দু'দিকে গোলাকৃতি ক্ষুদ্রাকৃতি টারেট রয়েছে। ছাদ তিনটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত। পূর্বদিকে তিনটি খিলানপথ রয়েছে এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকে একটি করে দরজা রয়েছে। গম্বুজগুলো স্কুইঞ্চ এবং পেনডিনটিভের সাহায্যে নির্মিত। কিবলাপ্রাচীরে তিনটি মিহরাব রয়েছে। অভ্যন্তরে কেন্দ্রীয় মিহরাবের উপরে একটি শিলালিপি প্রোথিত রয়েছে। শাহ্ পরানের মসজিদটি সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল আমলে নির্মিত হয়েছিল।

১৬। শঙ্করপাশা, মসজিদ, পঞ্চদশ শতাব্দী (৮০)

শ্রীহট্ট জেলার শঙ্করপাশা নামক স্থানে সুলতানী আমলের একটি মসজিদ দেখা যাবে। আ. ক. ম. যাকারিয়া বলেন, "১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীহট্ট অঞ্চলে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই সেখানে ব্যাপকভাবে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়। ধর্ম-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই অঞ্চলে সুলতানী আমলে অনেক মসজিদ নির্মিত হয়েছিল বলে লিপিতে জানা যায়। কিন্তু সেই আমলে নির্মিত বহু মসজিদের শিলালিপি পাওয়া গেলেও একটি ছাড়া সে যুগের অন্যকোনো মসজিদের অস্তিত্ব এ জেলায় দেখা যায় না। সে আমলের যে মসজিদটি এখনও টিকে আছে তা হচ্ছে শঙ্করপাশা মসজিদ। শাহ্জী বাজার রেল স্টেশন থেকে প্রায় ৫ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে হবিগঞ্জ থানার অধীনে শঙ্করপাশা নামকস্থানে এই প্রাচীন মসজিদ অবস্থিত।

স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এ অঞ্চলে শঙ্করপাশা মসজিদটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুলতানী আমলে যে কয়েকটি ইমারত এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে এই মসজিদটি তার মধ্যে বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। মসজিদটি আয়তাকার যা গৌড়ের লোটন মসজিদকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পূর্ব-পশ্চিমে মসজিদটি বাইরের দিক থেকে আয়তনে আনুমানিক ৪৫ × ৩২ ফুট এবং উত্তর দেওয়াল প্রায় ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রশস্ত। মসজিদটি দু'ভাগে বিভক্ত। মূল নামাজঘর যা বর্গাকার, পরিমাপে ২১ ফুট ৫ ইঞ্চি প্রতি বাহু। পূর্বদিকে যে বারান্দা রয়েছে তার পরিমাপ ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি। পূর্বদিক থেকে তিনটি খিলান প্রবেশপথ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে রয়েছে ১টি করে প্রবেশপথ। মূল নামাজঘরের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে তিনটি করে প্রবেশপথ দেখা যাবে। ভূমি-নকশা ও স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যে লোটন মসজিদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।

মসজিদের অভ্যন্তরে কিবলাপ্রাচীরে তিনটি অবতল মিহরাব আছে এবং খিলানগুলো খাঁজকাটা (cusped)। মসজিদটির চার কোনা এবং বারান্দার উত্তর ও দক্ষিণ কোনায় মোট ছয়টি বুরুজ দ্বারা মজবুত করা হয়েছে। বুরুজগুলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এগুলো ঢালু হয়ে নিচু থেকে উপরে উঠে গেছে। তা ছাড়া সমান্তরাল মৌল্ডিং দিয়ে এগুলোকে বিভক্ত করা হয়েছে। বুরুজগুলো গোলাকৃতি নয়, অষ্টভুজাকৃতি এবং নকশা-সম্বলিত। বুরুজের উপরে চূড়া দেখা যাবে। শঙ্করপাশা মসজিদটি আয়তাকার ভূমি-নকশার উপর একটি আকর্ষণীয় ইমারত, যা সাধারণত গৌড়ে দেখা যায়। সুলতানী

আমলের ইটের ব্যবহার, পোড়ামাটির নকশা এবং সম্ভবত ড্রামবিহীন এক গম্বুজবিশিষ্ট নামাজঘর এবং বক্রাকার কার্নিশ, যা সংস্কারের সময় সমান্তরাল করা হয়েছে, দেখা যাবে। এ ছাড়া সুলতানী আমলের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে মিহরাবের পিছনে বাড়তি অংশ বা projection রয়েছে। বর্তমানে কোনো গম্বুজ নেই।

অলঙ্করণ প্রসঙ্গে আ. ক. ম. যাকারিয়া বলেন, "পূর্ব দেয়ালে মিনার দু'টির পাশে একের উপর আর একটি করে পরপর ৩টি সরু ও আয়তাকারে নির্মিত প্যানেল আছে এবং দরজাগুলির উপরে আছে পাশাপাশি অবস্থানরত ২টি করে প্যানেল। কেন্দ্রীয় দরজার দু'পাশে নিচের দিকে আছে ২টি করে আয়তাকারে নির্মিত সরু প্যানেল এবং এগুলির উপরে আছে ১টি করে বড় প্যানেল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দেয়ালেও অনুরূপ প্যানেল ছিল এবং এগুলির ভিতরে পোড়ামাটির চিত্রফলকের সাহায্যে অলঙ্করণ করা হয়েছিল। তবে অলঙ্করণগুলির মধ্যে সুলতানী আমলে বিশেষ করে গৌড় অঞ্চলে প্রচলিত ঝুলন্ত শিকল ও ঘণ্টার (the chain and bell motif) পরিবর্তে এখানে ঝুলন্ত বৃক্ষশাখা থেকে পত্র ও পুষ্পের প্রতিকৃতি অঙ্কিত ছিল। মিহরাবগুলির অলঙ্করণও ছিল অতি উঁচু মাজার। পত্রাকারে নির্মিত মিহরাবগুলির উপরিভাগ খাঁজকাটা ছিল। মিহরাবের ফ্রেমের স্তম্ভগুলিতে লতার সাহায্যে অসংখ্য ছোট ছোট বর্গ ও আয়তক্ষেত্রের সৃষ্টি করে সেগুলির ভিতরে ৪ বা ৮ দলবিশিষ্ট পুষ্পের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করা হয়েছিল। মিহরাবের ভিতরে স্তম্ভগুলিতে ছিল ঝুলন্ত শিকল ও ঘণ্টার প্রতিকৃতি। মিহরাবের উপরিভাগ ও ভিতরে ছিল লতাপাতা ও পুষ্পের প্রতিকৃতি। পুষ্পের মধ্যে রোজেটের নকশা খুবই উল্লেখযোগ্য। এমন সুন্দর ও ব্যাপকভাবে অলঙ্কৃত মসজিদ এদেশে খুব অল্পই দেখা যায়।"

শঙ্করপাশা মসজিদে কোনো শিলালিপি পাওয়া যায়নি। তবে গঠনশৈলী ও শিল্প কৌশল দেখে ধারণা করা হয় যে, এটি সুলতানী আমলের মসজিদ। ডঃ আহমদ হাসান দানীর ভাষায় "All these details no doubt speak of the taste and likes of the local designers. The Mosque as a whole betrays the lavish Ornamentation of the Hussain Shahi Period."

মৌলভীবাজার

১৭। দরগা ও মাজারসমূহ, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী

মৌলভীবাজার পূর্বে শ্রীহট্টের একটি মহকুমা ছিল। বর্তমানে জেলা। এই জেলার বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মাজার ও চিল্লাখানা ও দরগা নজরে পড়ে। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মৌলভীবাজারে বহু পীর-ওয়ালী-আল্লাহ-দরবেশের আস্তানা। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় :

(১) শাহ হেলিমুদ্দীনের দরগা

বাংলার সাধকপুরুষ ও শ্রীহট্টের কামেল পীর ও ইসলামপ্রচারে শাহ জালালের সঙ্গী ছিলেন শাহ হেলিমুদ্দীন। মনু নদীর তীরে এই সাধকপুরুষের মাজার ছিল। বর্তমানে এটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

(২) শাহ্ মোস্তফার দরগাহ

মৌলভীবাজারের উপকণ্ঠে শাহ মোস্তফার দরগাহ রয়েছে।

(৩) শাহ কামালের দরগাহ। শ্রীহট্ট শহরের উপকণ্ঠে শাহ কামালপুরে কামালউদ্দীনের দরগাহ রয়েছে।

(৪) মুখদুম শাহ্ ফকিরের দরগাহ

শ্রীহট্ট শহরের সন্নিকটে কাউদাপানিতে হামিদ ফকিরের পুত্র মখদুম হোসেন ফকিরের মাজার দেখা যাবে।

(৫) শাহ্ হালিমউদ্দীন কুরাইশীর দরগাহ

কুলাউর স্টেশনের নিকট কানাই নদীর তীরবর্তী স্থানে শাহ্ হালিমউদ্দীনের মাজার রয়েছে।

(৬) শাহ্ দারাঙ্গার দরগাহ্

মানুমুখের সন্নিকটে বাকামুরা নামক স্থানে শাহ দারাঙ্গার দরগাহ্ অবস্থিত।

(৭) শাহ্ কালার দরগাহ

কানাইহাটি এবং ভানুগাছ পরগনার মধ্যবর্তী ভাদরদেউল নামক স্থানে শাহ কালার দরগাহ প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৮) সৈয়দ রুকুনুদ্দীনের দরগাহ্

মৌলভীবাজারের ঈদগাহের সন্নিকটে কদমতলায় সৈয়দ রুকুনুদ্দীনের দরগাহ্ অবস্থিত।

সুনামগঞ্জ

১৮। দরগা ও মাজারসমূহ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী

বর্তমান সুনামগঞ্জ একটি জেলায় রূপান্তরিত হয়েছে। এখানেও বহু বিদগ্ধ ধর্মপ্রাণ মুসলিম সাধক ও পীর আওলিয়াদের সমাগম হয়। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ধর্মপ্রচারকগণ এখানে আসেন এবং এ সমস্ত দরবেশের অধিকাংশ শাহ্ জালালের সঙ্গে এদেশে এসে ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। যাঁদের দরগাহ ও মাজার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হচ্ছেন :

(১) শাহ আরেফীনের দরগাহ

(২) শাহ্ কামেলের দরগাহ

(৩) গায়েবী পীরের সমাধি

(৪) শেখ শামসুদ্দীনের দরগাহ

(৫) শেখ কালুর সমাধি

(৬) খাওয়াজা সালেম শহীদের দরগাহ

(৭) সৈয়দ ইউসুফের সমাধি

হবীগঞ্জ

১৯। দরগা ও মাজারসমূহ, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী

শ্রীহট্ট, সুনামগঞ্জের ও মৌলভীবাজারের মতো হবীগঞ্জে বহু দরবেশ ও সুফী-সাধকদের আগমন ঘটে। এ জেলার বিভিন্ন স্থানে মাজার, চিল্লাখানা ও দরগা দেখা যাবে।

(১) খোয়াই নদীর তীরে মিরেরবন্দে 'কুতুব-উল-আউলিয়া' বা দরবেশ ওয়ালী ইলিয়াস কুদ্দুসের দরগাহ।

(২) রঘুনন্দন পাহাড়ে সৈয়দ সালেহের মাজার এবং সুলাইমান শাহের দরগা

(৩) সৈয়দ সিরাজউদ্দীন বা লালপীরের দরগা

(৪) চিল্লা কানাই দাউদ নগরে সৈয়দ দাউদের দরগাহ।

(৫) উচালে শাহ মজলিস আমিনের মসজিদ, জলাশয় ও দরগা রয়েছে।

(৬) বিশগাঁও-এ শাহ গাজীর দরগাহ।

(৭) লস্করপুর মসজিদের সংলগ্ন শহীদের দরগাহ।

(৮) লস্করপুরের সন্নিকটে উর্দুবাজারে সৈয়দ মাহমুদের দরগাহ রয়েছে।

(৯) বাজু পরগনায় শাত্রসতী মৌজার সাদরাবাদে শেখ সাদরের দরগাহ

(১০) পিটান মৌজায় শাহ কামালের দরগাহ

(১১) লস্করপুরে সৈয়দ শাহ সৈফ মিন্নাতুদ্দীনের দরগাহ

(১২) শাহজীবাজারের নিকট ফতেহপুরে রয়েছে সৈয়দ মুহাম্মদ নুরের দরগা।